বয্‌লুর রহমান

জিজ্ঞাসা

ফয্‌লুর রহমান বি-টি

পোঃ গ্রাম—শৌলজালিয়া
জিঃ—বরিশাল
পূর্ব-পাকিস্তান

প্রকাশনায় ঃ

মোঃ শামছুল হক

হক্কোন্নূর দরবার শরীফ

পোঃ গ্রাম—শৌলজালিয়া

জিঃ—বরিশাল

পূর্ব-পাকিস্তান

প্রথম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৭৪

প্রচ্ছদপট ও চিত্র-শিল্পী ঃ

মোঃ শাহ্ আলম

মুদ্রণে ঃ

দি মডার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ

৩৭, হাটখোলা রোড,

ঢাকা—৩

মূল্য ঃ পনর টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

পূব্-পশ্চিমের

সকল বুদ্ধিজীবীর

কর-কমলে—

بسم الله الرحمن الرحيم
اقراء باسم ربك الذي خلق
مهبط الوحي
غار حرا

হেরার গুহায়

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

প্রেসভূত !

সুদূর মফস্বল পল্লী থেকে রাজধানী শহরে এসে বই ছাপানো এক ঝকমারি ব্যাপার ! কিছুতেই প্রেসভূতের হামলা এড়ানো গেলো না। তাই প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসা' এবং 'জবাব [১]' এর মারাত্মক ভুলগুলোর 'সংশোধনী' দেখুন 'জবাব' (১)' এর শেষে ; আর 'জবাব [২]' এর মারাত্মক ভুল গুলোর 'সংশোধনী' দেখুন 'জবাব [২]' এর শেষে ।

'জিজ্ঞাসার' জরুরাত

[১]

নতুনঃ পুরানঃ চিরন্তনঃ

নতুনদের মতিগতি (trend of mind) মূলতঃ কোন্ দিকে এবং কেন তা 'সমকাল' মাসিক পত্রিকা ইং ১৯৬৬, বাং ১৩৭৩, ১০ম বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ১-২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ধর্মের সমাজতত্ত্ব' নিবন্ধের থেকে নিম্নলিখিত কথাগুলো তুলে দিলে বোঝা যাবে।

(১) "জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় ধর্মের বহু ব্যাখ্যাও আজ মিথ্যে প্রমানিত হয়েছে ও হচ্ছে।.......

(২) জ্ঞানের সমষ্টি হিসেবে ধর্ম স্থির, অনড় ও অচল। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে দিন দিন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন পদ্ধতি সংযোজিত হচ্ছে।

(৩) এ মহাজগৎ সম্বন্ধে ধর্মীয় ব্যাখ্যা হলো স্রষ্টিকর্তা পৃথিবী সৃষ্টি করেছে মানুষের আবাস স্থল হিসেবে। আর বাকী সব সৃষ্টি তারই কাজে লাগাবার জন্যে। আর এই পৃথিবীই হলো মহাজগতের কেন্দ্র এবং একে কেন্দ্র করেই চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা পরিক্রম করছে। কিন্তু কোপার্নিকাস কেপলার গ্যালিলিও নিউটনের গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং আমরা জানতে পারি এজগৎ মহাবিশ্বের কেন্দ্র তো নয়ই, সামান্য একটা কণা মাত্র। এর দশদিকে সহস্র সৌরজগৎ বিরাজ করছে। ধর্মীয় নেতারা এ তথ্য বহু দিন মেনে নেয় নি, কিন্তু এক সময়ে মানতে বাধ্য হয়েছে।

(৪) স্রস্টা সম্বন্ধে ধর্মে আমরা যে ছবি পাই তাতে দেখা যাচ্ছে মানুষের যে চরিত্র আল্লাহরও সেই একই চরিত্র। আল্লাহ্ও মানুষের মতো দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। রাজা বা মোড়লরা যেমন চায় সাধারণ জন-সাধারণ তাকে সব সময় হুজুর হুজুর করে চলুক আল্লাহও সেই রকমই চায়। অর্থাৎ দেবতা, আল্লা বা গড্ যেন মানুষ। এই ব্যাপারটাকে বলে অ্যানথ্রোপোমরফিজ্ম্ (Anthropo-morphism) বা মানবত্ব আরোপ। স্রস্টার যে চরিত্র ধর্ম আঁকে তাতে তাকে মানুষ ভাবা যায় নির্দ্বিধায়। নৃ-সমাজতত্ত্ব আজ প্রমাণ করে দিয়েছে ধর্মীয় খোদাকে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম দ্বারা অনুকূলে টানার প্রচেষ্টা চালান যায় মাত্র, কিন্তু

এই জগতের নিয়ম এক অন্ধ শক্তি। একে পূজো দিয়ে বা দোয়া দরুদ পড়ে নিজের পক্ষে টানা যায় না। জাগতিক নিয়ম পরিবর্তিত হবার নয়। তাই ধর্মীয় খোদা সম্পূর্ণ ভাবেই অকেজো—মানুষকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে। অবশ্য হতাশাকে একজনের হাতে তুলে দিয়ে যে শান্তি মানুষ লাভ করে, ধর্ম বা ধর্মীয় খোদার হাতে সে ভার অর্পণ করে সাময়িক ভাবে মানুষ বেশ স্বস্তি লাভ করে।

(৫) মানুষ সম্বন্ধে ধর্মের অভিমত, একেবারে পুরো সভ্য মানুষ হিসেবেই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু ডারউইনের কাছ থেকে পাওয়া বিবর্তনবাদ অনুযায়ী এ তথ্য যে সম্পূর্ণ ফুঁকো তাতে আর দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই।

(৬) এই ভাবে বহু প্রমান তুলে ধরা যেতে পারে ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে এবং করছে। আমাদের দেশে এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ধর্মীয় নেতারা ইংরেজী শিক্ষার ফল এবং এই ইংরেজী শিক্ষাকে শয়তানের দান বলে অভিহিত করে।...

(৭) ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে কি না এ সম্বন্ধে বলা যায়, একই লোক বৈজ্ঞানিক আবার ধর্মও মেনে চলে। এই একটি উদাহরণ থেকেই বলা চলে ধর্ম ও বিজ্ঞান সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরকম কত দিন চলবে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলো ধর্মীয় রীতিনীতি না মেনেই বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছে। তা ছাড়া অসমাজতন্ত্রী দেশেও বহুলোক কোন রকম ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াই জীবন যাপন করে। এ সব দেখে মনে হচ্ছে ধর্ম এক সময় বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ ভাবেই মাথা নত করে দেবে। তবে প্রথা বা সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ধর্ম টিকে থাকলেও তা মোড় নেবে উৎসব ও অনুষ্ঠানে। পূর্বের সেই প্রার্থনার ভংগী আর থাকতে পারেনা।

(৮) যাদু বিশ্বাস ও ধর্ম তখনি এসেছে যখন মানুষ প্রকৃতির বহু কিছু জানতে পারছেনা এবং নিজেকে বড় অসহায় মনে করছে। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীর জাগতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারনা দিয়ে আসছে। এখন মানুষ আর আগের মত শিশু নয়। ধর্ম যেন তাকে করে রেখেছিল দরজায় দাঁড়ান ভিখিরীর মত। ভিখিরী তার কাছেই ভিক্ষা চায় সে যা চাচ্ছে যার কাছে তা আছে। কিন্তু সব মানুষের কাছে যখন আহার্য্য বস্তু থাকবে তখন যেমন ভিখিরী খুঁজে পাওয়া যাবেনা, বিজ্ঞানও যখন সব কিছু মানুষকে দিতে পারবে তখন ধর্মের প্রয়োজনটা কোথায় থাকবে!

(৯) বিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরও মানুষের যদি কোন মানসিক শূন্যতা বোধ দেখা দেয় তা দাঁড়াবে দার্শনিক বোধে বা বিশ্বাসে। কারণ ধর্ম সৃষ্টির সময় মানুষ যে পর্যায়ে ছিল বিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তির পর মানুষের সেই মনোভাব আশা করা বাতুলতা।"

কাজেই ধর্মকে এই বিজ্ঞান-যুগে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার পুরাতন ব্যাখ্যা যে অচল, অকেজো, তা' একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, যা সর্ব দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী নয়, তা' কী করে' সর্বজনীন, বিশ্ব-জনীন ও চিরন্তন ধর্ম হয়? হতেই পারেনা, তা-ও বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কিন্তু ধর্মের এক আত্মরূপ আছে, উৎস আছে, তা' অতি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক এবং অতি অভিজ্ঞতা মূলক আপ্ত বিশ্বাস— ঐ উপসংহারে লেখক যে মানসিক শূন্যতা ও তা' পূরণের দার্শনিক বোধ ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন, তারি আরো গভীরের স্বাভাবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের কথা—প্রেম-অপ্রেমের ব্যাপার—এবং সেই আনুপাতিক অতি নিগূঢ় আচরণ, তা' বিশ্বজনীন, সার্বজনীন এবং চিরন্তন। বাইরের দিকগুলো ছিলো এক এক জমানায় স্থান-কাল-পরিবেশে সমাজ-সাংগঠনিক, কখনো কখনো তার সংগে সুষ্ঠু রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে বিশেষ করে' স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনীয় প্রকল্প— প্রাথমিক ধর্ম-বিশ্বাসও তার অন্তর্গত, এবং যে যে দেশকাল পাত্রে যে যে ভাবে যতোটুকু তার ইজ্‌তেহাদ-মারফত আচরণীয়, আকায়েদ (কায়দা-কানুন) সম্ভবপর, সহজসাধ্য, তা-ই।

আমরা ধর্মের ঐ আদি অকৃত্রিম ও চিরন্তন আত্মরূপ বয়ান করেছি সেই উৎস-মুখ খুলে দিয়েছি অর্থাৎ সেই অবিনশ্বর অতি দার্শনিকতা বৈজ্ঞানিকতা শিল্পকলা তুলে ধরেছি, সেই অতিনিগূঢ় স্বাভাবিক আচরণ সমূহ বা স্বভাব-ধর্ম প্রকাশ করে' দিয়েছি। তার আগে চুল-চেরা হিসাব-নিকাশ করে দেখিয়েছি যে ঐ আধু-নিকদের উপরোক্ত কথাগুলোর মতো বাস্তবিকই—যাকে আমরা

সাধারণতঃ ধর্ম বলি—বাইরে থেকে চাপানো সেই প্রচলিত কোন ধর্ম-বিশ্বাস ও সেই মোতাবেক আচরণ, অনুষ্ঠান—ধর্ম-মতবাদই—চিরন্তন সত্য নয়, হতে পারেনা, কোনদিন ছিলোনা। বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলার (সংস্কৃতির) নিত্য নব নব আবিস্কার গুলো অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম, গুণ-কর্ম গুলোই সে সব ক্ষেত্রে সত্য এবং তার সংগে খাপ খাইয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারলেই মাত্র তার কোন কোন ব্যাখ্যা (Scholasticism) সত্য হতে পারে, নচেৎ নয়।

মধ্য যুগেও (medieval age) এটা করা হয়েছিল। তখন ইউরোপ ছিল অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমেরিকার তো কথাই উঠ্‌তে পারেনা, কারণ, তা তখনও আবিস্কৃতই হয়নি। আবিস্কার করেও তো সেখানে গিয়ে, কি অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে পাওয়া গেলো অসভ্য জাতি সমূহ। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপ (স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, সিসিলি, সাইপ্রাস প্রভৃতি)-অধ্যুষিত মুসলিম জাতিই তখন পৃথিবীতে সর্বে সর্বা। মিশরীয় ফিনিশীয় এশিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা -সংস্কৃতি-পুষ্ট গ্রীক দর্শন বিজ্ঞান পড়ে', শিল্প চর্চা করে' তখন তাঁরা দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতিতে নব নব আবিস্কার সংযোজন করে' চলছিলো, দর্শন বিজ্ঞান শিল্প-কলার মশাল তখন তাঁদের হাতেই জ্বলছিলো। গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-কলায় সুপণ্ডিত একদল মুসলিমের হাতে আবার ধর্মের পরাজয় শনৈঃ শনৈঃ ঘনিয়ে আসছিলো ; কারণ, সেই সম-সাময়িক ধর্মও গ্রীক ও মুসলিম দার্শনিক বিজ্ঞানী শিল্পীদের আবিস্কৃত সত্যের মোকাবিলা করতে পারছিলো না। সেই সমকালীন সব ধর্মীয় জীবন-জিজ্ঞাসারও সঠিক সদুত্তর আদৌ দিতে পাছিলো না। এই দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের প্রধান প্রবক্তা প্রাচ্যে (এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায়) ছিলেন আল কিন্দি, আল ফারাবী ইবনে সিনা, আলবেরুনী, এখওয়ানুচ্ছাফা (পবিত্র ভ্রাতৃ সংঘ), ওমর খৈয়াম, আমির খসরু, ইবনে খালদুন প্রমুখ। প্রতীচ্যে (ইউরো-

পের স্পেনে—আন্দালুসিয়ায়) ছিলেন ইবনে বাজা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশ্‌দ প্রমুখ।

ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ ধর্ম-দর্শন-বেত্তারা (মুতাকাল্লিমুন—Scholastic Philosophers) ঐ গ্রীক দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলার আলোকে ধর্মের যুক্তি-সংগত ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন এবং এল্‌মুল কালাম (ধর্ম-দর্শন—Theology, Scholastic Philosophy) সৃষ্টি করে সাময়িক বাঁচিয়েও গেলেন। মওলানা রুমীর মহাকাব্য 'মস্‌নভি' তাতে আরো রসদ যোগালো, শক্তিশালী করলো। কিন্তু ধর্মের আদি, অন্ত মুল রহস্যের যিনি প্রবক্তা ছিলেন তিনি আর কেউ নন, তানাজ্জোলাত (সৃষ্টিতে স্রষ্টার বিকাশ বা প্রকাশ) ও অহ্‌দতুল অজুদ (স্রষ্টা ও সৃষ্টির একই অস্তিত্ব) প্রমাণের প্রবক্তা মহামরমী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মহাসাহিত্যিক ও কবি শেখে আকবর (শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক—বড়োপীর) ইবনুল আরবী। তাঁর ঐ যুগান্তকারী অথচ চিরন্তন সত্য মতবাদের দরুণ তাঁকে ধর্মান্ধদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আন্দালুসিয়া থেকে পালিয়ে আসতে হয় উত্তর আফ্রিকায়। সেখানেও মুসলিম দেশ সমূহে ঐ একই কারণে পালিয়ে বেড়াতে হয়। পরিশেষে আখেরি ইসলামের উৎপত্তিস্থল ও লালন-পালন-ভূমি (প্রাথমিক খাস আবাস-স্থান) মক্কা মদিনা এসে তিনি তার অত্যুজ্জল অথচ চিরন্তন মতবাদ শেষ ইস্‌লাম প্রবর্তকের দরবারে বসেই প্রকাশ করে দেন, প্রচার করেন। কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারেননি। কারণ, তাঁরা হযরত মোহাম্মদের (স) আসল এল্‌মের দাবীদার খাঁটি প্রতিনিধির (ধর্মীয় খলিফার) প্রমুখাৎই হযরত মোহাম্মদের (স) ওফাত শরীফের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে পুনরায় শুনলো সেই হেরার গুহা, সিনাই পাহাড় [কোহেতুর—মুছা (আ), ঈছার (আ) সাধন-ক্ষেত্র], তপোবন ও বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানের পরমার্থিক গুহ্যসাধনার মূল মর্ম, ধর্মের বাহ্যিকতার (শরিয়তের) অন্তরাল-

বর্তী এবং অতীত সেই চিরন্তন তরিকত, হাকিকত, মারফতের কথা।
তাঁর মতবাদের খানিকটা আমরা প্রথম প্রবন্ধ জিজ্ঞাসার 'পরিশিষ্টে'
দিয়েছি। দিয়েছি জবাব (১)-এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরাণিক বিবর্তনবাদ'
প্রবন্ধের 'প্রজ্ঞার বিবর্তন' প্রসংগে।

সৃষ্টি যখন স্রষ্টারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তখন তার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি রয়েছে তাঁর দিকে ; অস্তিত্ব যখন মূলতঃ একই তখন তা না হয়েই পারে না। দ্বিত্ব মূলতঃ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা। যা যেখান থেকে এসেছে মূলতঃ সেই দিকেই তা' ধাবমান। স্বভাবতঃ তার হয় সেই সত্তার প্রতি মৌল আকর্ষণ—রাবেতা বা সম্পর্ক স্থাপনের—সেই যেখান থেকে সৃষ্টির অনিবার্য কারণে—বিকর্ষণে—ছুটে আসা—সেইখানে পৌঁছার অনুভূতি, প্রেম (১), তেম্‌নি তার স্বাভাবিক গুণগান—জেকের—, তেমনি তার স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গবেষণা—মোরাকেবা—, ফেকের,—তেম্‌নি স্বাভাবিক দর্শন-স্পৃহা ও শেষমেষ দর্শন—মোশাহেদা—দীদার—। কারণ, সৃষ্টি হচ্ছে মোমকেন্নুল অজুদ—Contingent existence—অস্থায়ী স্থিতি। আর স্রষ্টা হচ্ছেন ওয়াজেবুল অজুদ—Necessary existence—স্থায়ী প্রয়োজনীয় সত্তা। অতি এবং অধি দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পে উপরোক্ত উপায়ে, সাধনায়—এবাদতে, রিয়াজতে ঐ দ্বিত্ব-অস্তিত্ব বোধ বিরহিত বিদূরিত হলেই হবে গিয়ে অহ্‌দাতুল অজুদ—একই অস্তিত্বের—উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, অতি এবং অধি প্রজ্ঞা। মধ্যবর্তী সকল রকম প্রতিবন্ধকতা, পর্দা চিরতরে নির্মূল হয়ে ঐ একই সত্তায় স্থিতি স্থাপকতা—সেই আদি আসল স্থান-কাল-পরিবেশে, কি স্থান-কাল-

---

(১) জাগতিক মায়া মমতা, স্নেহ-ভালবাসা সেই মহাজাগতিক প্রেম আর্তিরই ছিটে ফোটা, প্রতিচ্ছায়া বা নকল। নকল নইলে অনেকসময় আসল মেলে না, তাও সত্য। আর কামনা ও অপরাপর রিপু সমূহ ঐ আসল প্রেম, প্রেরণা, অনুভূতি, উপলব্ধি প্রভৃতির বিকৃতি মাত্র, তা দেখুন জবাব (১) এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' প্রভৃতি প্রসংগ সমূহে।

পরিবেশের অতীত আত্মার পরমাত্মায় পৌঁছে —নূরে আহমদ পরমা প্রকৃতির নূরে আহাদ পরম পুরুষে একাকার হয়ে—সকল রকম সংজ্ঞা, সংস্থা ও ব্যাখ্যা বিবৃত বিধৃত ধর্মের ইতি; তওহীদ (একত্ব) বিশ্বাস ও সেই মোতাবেক আচরণ, অনুষ্ঠানের পূর্ণ কার্যে পরিণতি, ঐ রাবেতার সম্পূর্ণতা—মে'রাজ-মিলন ;—ব'লে ক'য়ে বোঝাবার বিষয়-বস্তু নয় মোটেই। তবু আমরা এ পুস্তকে যতদূর সাধ্য ও সম্ভবপর তা বুঝিয়েছি। সেই সব অবিকশিত, অবিজ্ঞানী, অদার্শনিক, অশিল্পিক অনুন্নত জামানায় এতখানি প্রকাশ ও প্রচার করাও ছিল কী কঠিন, বিপজ্জনক ব্যাপার, তা যেমন ঐ উপরে মহামনস্বী ইবনুল আরবীর (র) জীবন বিপন্ন হওয়া থেকে বুঝেছেন, তেম্‌নি তার অনেক আগে অনুরূপ আর এক মহামনস্বী মনছুর হাল্লাজের (র) ঐ একই কারণে 'আনাল হক—আমিই একমাত্র সত্য, সত্তা'— প্রকাশে প্রচারে ঐরূপ অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ জনগণ কর্তৃক তাঁকে শূলদণ্ডে চড়িয়ে শাহাদত বরণে বাধ্য করা থেকেও সম্পূর্ণ আঁচ করে নিন। (২)

কথা হচ্ছে : মানবাত্মা যদি সেই আদি অকৃত্রিম পরমাত্মা থেকেই এসে থাকে এবং তৎকারণে উপরোক্ত স্বাভাবিক করণীয়, কর্তব্যই হয়ে থাকে আদি অকৃত্রিম আসল ধর্ম, তবে তা' সে বিস্মৃত হয়ে যায় কেন, বিস্মৃত হয়ে থাকে কেন? আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে মানব-আত্মা ঐ আসল আদি অকৃত্রিম অস্তিত্ব থেকে এলেও জড়দেহ তাকে ধারণ করতে হয়েছে। তার ফলেই, সেই প্রভাবেই সে আত্ম-বিস্মৃত, ঐ স্বভাবধর্ম-হারা। প্রাথমিক (শুরু—শরিয়ত) রীতি নীতি সেই অচেনতা, আত্ম বিস্মৃত হাল-হাকিকত কাটিয়ে উঠার জন্যও প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তা যদি ঐ প্রাথমিক ধর্ম আচরণে না হয়, না হয়েই থাকে, তবে ঐ প্রাথমিক আচরণ সমূহও ব্যর্থ! কিন্তু ঐ আসল স্বভাব-ধর্মের সন্ধান পেলেই মাত্র তার পক্ষে প্রাথমিক আচরণেও কিছুটা

(২) মনসুর হাল্লাজের (র) ঐ 'আনাল হক' সম্পর্কীয় টীকা (১) দেখুন এক মূল কালাম বিশ্লেষণের শেষে।

উপকার সম্ভবপর হতে পারে, নচেৎ নয়। বইর ভিতরে আমরা পুংখানুপুংখরূপে তার বিচার, বিশ্লেষণ করেছি।

কিন্তু মাপ করবেন, আত্মা যাঁরা মানেন না, কল্‌কব্‌জার যোগ-সাজসে উৎপন্ন সংজ্ঞা মনে করেন, তাঁদের উত্তর এ পুস্তকে খোঁজা বৃথা। আত্মা আছে, পরমাত্মা আছে স্বীকার করে' নিয়েই এ পুস্তকের শুরু এবং সমাপ্তি। আত্মা পরমাত্মা আছে কি নাই, থাক্‌লে কিভাবে আছে, থাকা সম্ভবপর তার বিচার বিশ্লেষণ পাবেন এ ভূমিকার শেষ দিকে উল্লেখিত পুস্তক-পুস্তিকা-মালায়—বিশেষ করে' প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে।—ছবুর করুন। কারণ, ছবুরেই তো মেওয়া ফলে।

সেই সব জমানার এক বিশেষ মনীষি-সংঘ এবং কতিপয় মনীষির বাণী তুলে' দিলেও বোঝা যাবে যে শরিয়ত অর্থাৎ ইস্‌লামের ব্যবহারিক দিক (এবং অপর সকল ধর্মের বেলাই তা-ই) আসল আদত ধর্ম নয়' হতে পারে না, কোন দিন ছিলো না।

এখওয়ানুচ্ছাফা (পবিত্র ভ্রাতৃ সংঘ): শরিয়ৎ সাধারণ মানুষের জন্য। দুর্বল ও বিমারিগ্রস্ত (নাফ্‌ছ্‌আম্মারা তাবেদার) আত্মার পক্ষে এ হচ্ছে এলাজের (ঔষধ) মতো, সন্দেহ নেই; কিন্তু শরিয়তের বাইরের বিষয়-বস্তুর অন্দরে যে দার্শনিক তথ্য ও তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, তা বুঝ্‌তে পারেন বুদ্ধিবিকশিত (নাফছ লাওয়ামা, মুৎমায়েন্না, মুলহেমা স্তরের) মানুষেরা। শরিয়তের শাব্দিক অর্থের অতীত রয়েছে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য (তরিকত হাকিকত, মারেফাত), তা-ই আসল সত্য, এবং জ্ঞানীগণই তা বুঝ্‌তে পারেন।

এই সাধারণ জনপ্রিয় ধর্ম (শরিয়ৎ) সত্যিকার ধর্ম নয় (১)।

ইব্‌নে বাজা, ইব্‌নে তোফায়েল: ধর্মীয় শৃংখলা (শরিয়ৎ) কেবল সেই অবিকশিত-বুদ্ধি পশ্চাদপদ ব্যক্তি বর্গের জন্য প্রয়োজন,

---

(১) An Introduction to Islamic philosophy by—prof. S, Rahman, 2nd Edition, ৭৯-৮০ পৃঃ, ৮৬ পৃঃ।

যাদের খাহেশ এবং ক্ষমতা নেই দার্শনিক যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝ্বার। দর্শন (এল্মে তরিকত, হাক্কিকত, মারেফাত) বুদ্ধি-বিকশিত মানবাত্মার জন্য প্রয়োজন (২)।

ইব্নে রুশদ: জনপ্রিয় বিশ্বাস (শরিয়ৎ) সাধারণের মংগলের জন্যই প্রবর্তিত, প্রয়োজনীয়; দার্শনিকদের (মারফত পন্থীদের) তার বিরুদ্ধে কিছু বল্তে নেই (৩)।

ইমাম গাজ্জালী: অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান শরিয়তে নেই, শরিয়তে নিষিদ্ধ (৪)।

কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার আসল রহস্য নিয়েই তো প্রকৃত ধর্ম, তা-ই যদি শরিয়তে নিষিদ্ধ, না থাকলো, তবে তা' কেমন ধর্ম? এর দ্বারাই বোঝা যায় হেরার গুহায়, এমন কি তপোবনে, কোহেতুরে প্রাপ্ত ও পরিশীলিত ঐ আসল আদত ধর্মের বহিঃরূপ বা সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন-মূলক ধর্ম অর্থাৎ সাধারণ আকিদা (বিশ্বাস), আচরণ ও বিধি-ব্যবস্থাই মাত্র 'শরিয়ত' অর্থাৎ শুরু এবং প্রাথমিক ছবক, কি সাধারণ সৎ চরিত্র গঠনের নিমিত্ত ব্রত হিসাবেই মাত্র গ্রহণীয়, পালনীয়; চরিত্রবান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীদের ধর্ম নয় এবং ঐ দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের আরো গভীর, গভীরতর ও গভীরতম স্তরই তো যথাক্রমে 'তরিকত', 'হাকিকত' ও 'মারেফাত'—তা বইখানার ভিতরে ডুবে ভালো করে বুঝুন।

মাঝখানে হাছান আল আশারি (৮৭৩-৯৩৫ খৃঃ) এই আসল শিক্ষাদীক্ষা (তরিকত) ও সত্য-জ্ঞান (হাকিকত) ও ঐ সর্বাংগীন জ্ঞান মারেফাতকে গোল্লায় দিতে চেয়েছিলেন এইভাবে:

---

(২) ঐ ১৮০, ১৮২ পৃঃ।

(৩) ঐ ১৮৫ পৃঃ।

(৪) 'কিমিয়া ছায়াদত' বাংলা তরজামা 'সৌভাগ্য স্পর্শমনি' দর্শন পুস্তক ১ম খণ্ড 'আত্মার পরিচয়' ৭ পৃঃ, 'তত্ত্ব দর্শন' ৭২—৭৯ পৃঃ, পরকাল দর্শন' ১১৬, ১৪৫ পৃঃ প্রভৃতি।

তিনি তাঁর মাথায় পাগড়ি ও পোষাক থেকে এক একটি অংশ নাটকীয় ভংগীতে ছিড়ে ফেলেন আর বলেন : এই মতে (যুক্তিবাদী মোতাজিলা মতে) বিশ্বাস এই ছেড়া পোষাকের মতোই ছিড়ে ফেললাম। তিনি আরো বলেন : তন্‌কিদ (যুক্তিবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, হাকিকত, মারেফাত) নয়, তক্‌লিদ (অন্ধ বিশ্বাসে অনুকরণ, অনুসরণ) তাও 'বে-লা কায়ফা—কেন, কী' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা জরুরাত-বিহীন স্রেফ মূর্খের মতো—অনুসরণই ধর্ম ; তন্‌কিদ অধর্ম, হারাম, কুফরি, গোনাহ্‌ কবিরা ! —মুসলিম মনীষা ৩৭, ৩৮ পৃঃ।

এই আল আশারিয়া মতবাদকে অগ্রাহ্য করে' তথাপি মুসলিম মনীষিরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা দিকে নানা অমূল্য অবদান সংযোজন করছিলেন, কিন্তু বেশ কিছুকাল পরবর্তী বিশেষ করে' ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার (১২৬৩-১৩২৮ খৃঃ) মতো একেবারে স্থূল আকায়েদের (রীতি নীতির) গুণগান করনেওয়ালা লোকদের আবির্ভাবেই বেহেশতের পুনঃ পুনঃ প্রলোভন ও দোযখের পুনঃ পুনঃ ভয়ানক আযাবের ভয় দেখানোয় পুনঃ ধর্মের নেহাৎ শুক্‌নো স্থূল দিকের (শরা-মছ্‌লার) রীতি-নীতিই মাত্র প্রতিপালনে মুসলিম জন-সমুদ্র ঝুঁকে পড়্‌লো, ভেসে গেলো। ইব্‌নে সিনা, ওস্তাদ আলবেরুনী, ওমর খৈয়াম, ইব্‌নে রুশদের মতো দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্ম অবদানের কথা গেলো বিস্মৃতির অতল-তলে তলিয়ে; ইমাম গাজ্জালীর মতো ধর্ম-দর্শনবেত্তাদের (মোতাকাল্লিমুন) এলমুল কালাম (Scholasticism) চর্চা গেলো হারিয়ে ; এখওয়ানুচ্ছাফা, ইবনুল আরবী, রুমী, আমীর খসরুর অধ্যাত্ম প্রজ্ঞা-পরিশীলন গেলো পেছিয়ে, কিংবা শিবরাত্রির সল্‌তের মতো টিপ্‌ টিপ্‌ করে' জ্বল্‌তে থাক্‌লো।

কি ভাবে হলো তার নজির দেখুন। কোর্‌আনে আছে :

يدبر الامر من السماء الى الارض

ইয়ুদাব্বেরোল আম্‌রা মিনাচ্ছামায়ে এলাল আরদে

তিনি (আল্লাহ্) আছমান থেকে জমীনে কাযের তদ্‌বির (নিয়ন্ত্রন— বিধি-ব্যবস্থা) করেন।—সজদা৫*। শাব্দিক অর্থে কার্য তদ্‌বির ধর্‌লে নিশ্চয়ই আছমান থেকে জমীনে আল্লাহকে নাম্‌তে হয়, নতুবা আছমান জমিন উর্ধ অধ সর্বত্র কার্য তদ্‌বির হবে কী করে' ?

ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়াকে জিগ্‌গেস করা হলো : আল্লাহ কি ভাবে আছমান থেকে জমীনে কার্য তদ্‌বির কর্‌তে নামেন ? তিনি দামেশ্‌কের জামে মসজিদ থেকে সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখালেন 'ঠিক এই ভাবে।'

এ কি ঐ তরুন লেখক যে বলেছেন সেই মানবত্ব আরোপ (Anthropomorphism) নয় ? এতে করে' কি সেই অনাদি অনন্ত অসীম নিরাকার একক (absolute) আল্লাহ্ (তওহীদ)-বিশ্বাস 'ইস্‌লাম' রলো ? চিন্তা করে দেখুন।

এইভাবে ইস্‌লাম জগতে পুনঃ নেমে এলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অন্ধকার। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্গতইতো সাহিত্য, সুকুমার শিল্প-কলা (কাব্য, Fine Arts) প্রভৃতি সব রকম সংস্কৃতি—কালচার—এবং এক এক দেশকালে জাতীয় সাংস্কৃতিক (cultural) সব বৈশিষ্ট নিয়েই তো এক এক সভ্যতা—তা জবাব [২] এর 'শিল্প-সংস্কৃতি (কাল্‌চার) কথা' প্রবন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়েছি। এই সংস্কৃতির পতনই ডেকে আনে রাজনৈতিক পতনও। সে পতনও তো আমরা দেখেছি।

ওস্তাদ আল বেরুনীর 'আল-আসার-উল-বাকীয়া' নামক বিখ্যাত

---

* ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

'ছুম্মা ইয়ারুজু এলাইহে ফি ইয়াওমেন কানা মেকদারাহু আলফা ছানাতেন মেম্মা তায়ুদ্দুন—অতঃপর তা তাঁর নিকট পৌছায় একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বৎসর'। ঐ সজদা ৫ আয়াতের এই বাকী অংশের তাৎপর্য দেখুন জবাব [২]-এর 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধের ৫০ পৃষ্ঠায় শবে মে'রাজ' বর্ণনায়।

গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্য তত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর সাকা (Doctor E. Sachau) বলেন :

'আল্ আশারী ও আল্ গাজ্জালী না জন্মালে আরবীরা গ্যালিলিও, কেপ্লার ও নিউটনের জাতি হতো।"

আসলে আল আশারীই ইস্লামের এই স্বাভাবিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তির গতি রুদ্ধ করার জন্য দায়ী এবং পরবর্তীকালে ইব্নে তাইমিয়ার মতো স্থূল আকায়েদের ব্যক্তিরা তার শেষ জগদ্দল পাথরখান ঠেলে দিয়েছেন সেই গতি-পথে। ইমাম গাজ্জালী তাহ্ফাতুল ফলাসিফা—ফিলোসফারদের অসংগতি—লিখে নিরীশ্বর-বাদী দর্শন বিজ্ঞান হতে ইছলামকে হেফাজত করতে গিয়েই কতিপয় কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। তিনিই আবার ইস্লামিক দর্শনের ঐ বৈশিষ্ট পূর্ণ বেহতর বিভাগ-তাসাউফের [এল্মে তরিকত হাকিকত মারেফাতের]' সারবত্তা সপ্রমান করে 'হুজ্জতুল ইসলাম (ইস্লামের সুপ্রমাণ) স্বরূপ' আখ্যাত হয়ে আছেন। ইব্নে রুশ্দ্ 'তাহ্ফাতুল তাহ্ফুত—অসংগতির অসংগতি'—লিখেও ফিলোসফার ও ফিলোসফিকে সংরক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু আলআশারী পন্থী ইব্নে তাইমিয়া আদির আবির্ভাবে ও প্রভাবেই ক্রমে ক্রমে দর্শন বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি অভিব্যক্তি গেলো লোপ পেয়ে।

[২]

ইউরোপ ইতিমধ্যে মুসলিমদের পরিত্যক্ত সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে, অনুশীলন করে নব নব আবিষ্কার করে হলো জগতে নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ, গুরু। দেশে দেশে তাঁদের রাজ্য বিস্তারের কারণও ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান—এক কথায় সংস্কৃতিতে (সাহিত্যে কাব্যে শিল্পকলায়)—প্রভূত প্রগতি। একটি শেক্সপিয়ার, ফ্রান্সিস্ বেকন এবং নিউটন ইংলণ্ডকে রাষ্ট্র নীতির দিক দিয়েও কতোখানি

এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এগিয়ে দিয়েছিলেন, তাতো ইতিহাস পড়েই জানা যায়। আমরা—যারা একদা ছিলাম শীর্ষস্থানে—হলাম গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-হারা, ফলে ভিখিরী; যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তেমনি রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়েও—হেট মুণ্ডে ইউরোপীয়-আমেরিকান অবদান ভিক্ষা পাত্রে গ্রহণ করে কোন রকমে জীবন সংগ্রামে বেঁচে-থাকা এক অধপতিত জাতি।

কিন্তু ইতিহাসের হয় পুনরাবৃত্তি (History repeats ifself)। আমাদের স্বাধীন আবাসভূমি পাকিস্তান পুনঃ আমাদের সম্বিত-ফিরিয়ে দিয়েছে ;—দার্শনিক বৈজ্ঞানিক গুণী জ্ঞানী হবার যেমন, তেমনি রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়েও এক শ্রেষ্ঠ স্বকীয় রাষ্ট্র সংস্থার শীর্ষস্থানীয়—পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের আদর্শ স্থানীয়—সংবিধান রচয়িতা জাতি হবার সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু তা কি ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান—তথা সংস্কৃতি-পরিপন্থী ধর্মের ঐ শুক্‌নো বাইরের দিকটার, বাহ্যিক রীতি-নীতির পরিশীলনে, অন্ধ বিশ্বাসের উপর অতি মাত্রা জোর দিয়ে সম্ভবপর হবে? না, তা আমাদের প্রাচীন ঐ উপরে উদ্‌ধৃত জমানার মতো পশ্চাদ্দিকেই টান্‌ছে, ঠেলে দিচ্ছে? কোনটা সত্য? তরুণরা যে ইতি মধ্যেই ওতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরিতা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, পশ্চাৎ-বর্তিতার আশংকায় পুনঃ ওর অসারতা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতো তাদের এক মুখপত্র থেকে উদ্‌ধৃতি মারফতই প্রথম প্রতিপন্ন করেছি, প্রতিষ্ঠিত করেছি। তা হলে আমাদের কর্তব্য কী?

পুরান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে-জবাব নেই, নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে হয়তো তা-ই আছে। ইব্‌নে সিনা, আলবেরুনী, এখওয়ানুচ্ছাফা, ওমর খৈয়াম, ইমাম গাজ্জালী, ইবনুল আরবী, রুমী, আমীর খসরু প্রমুখের জমানাও আমরা অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছি। সেই সব জমানার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক উদ্‌বর্তনের মোকাবিলা যে সেই সব সম-সাময়িক দর্শন-বিজ্ঞান-জাত, শিল্প-কলা-সম্মত

ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ছিলো অভূতপূর্ব, অপূর্ব সাফল্য-মণ্ডিত, এ জমানায়—এই সমকালে—বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলার নিত্য নবনব দিগন্ত উন্মোচন ও প্রসারের মোকাবিলা, রাজনৈতিক প্রবল বিপ্লব-প্রবাহ মুখে খড় কুটোর মতো ভাসমান—সে সব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ অকেজো, অসার, অকিঞ্চিৎকর, সব সমাধান দিতে একেবারেই অপারগ। সুতরাং কর্‌তে হবে কী?

ধর্মকে যদি আপনাদের বাঁচাতেই হয়, তা হ'লে নতুন করে' আধুনিক উদ্‌বর্তিত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংগে খাপ খাইয়ে তার নব নব ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দিন অর্থাৎ যুগের চাহিদা-মাফিক সেই সুপ্রয়োজনে নতুন মোতাকাল্লিমুন সেজে নতুন এল্‌মুলকালাম বা স্কলাষ্টিক ফিলোজফির নব নব জন্মদান করুন, ধর্ম বাঁচবে, নতুবা একদা বাঁচবে না। এবং মনছুর হাল্লাজ, এখওয়ানুচ্ছাফা, ইবনুল আরবী, রুমী, শেখসাদি, হাফিজ, আমীর খসরু প্রমুখের চেয়েও বেশী, বিশেষ মাত্রায় যুগের আসল চক্ষু দানের নিমিত্ত গুহ্য আত্মা পরমাত্মার রহস্য উদ্ঘাটন করে দিন—সবদিক বজায় থাকবে। তা না করে যদি প্রাচীন আলআশারী, পরবর্তী ইব্‌নেতাইমিয়ার তক্‌লিদ অর্থাৎ অন্ধ অনুসরণেরই কেবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেন তবে প্রকৃত শিক্ষিতরা, বিদগ্ধরা এবং ঐ তরুণ পন্থীরা জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর না পেয়ে হবেন নাস্তিক, কম্যুনিষ্ট (ঐ তরুনের উক্তির ৭নং প্যারাগ্রাফ দেখুন), আর তার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলবে; প্রতিহত করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষমতার জোরে স্বাভাবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যাহত করলে আবার অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হবে এই জাতি। পাকিস্তান পেয়েও, নব আশার দিগন্ত খুলে গিয়েও তার হবে সমাধি রচনা। পাকিস্তানী জাতি বিশ্বের জ্ঞানীগুণীর দরবারে আসন পাবে না, শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থানীয়, শীর্ষক রাষ্ট্রনীতি—রাষ্ট্র দর্শনও—তাদের দ্বারা সৃষ্টি হ'তে পারেনা। কেন পারে না, পূর্বেই তার আভাস দিয়েছি—

কেবল গতানুগতিক গণ্ডীবদ্ধ পর-চিন্তা-ভাবনার যুপকাষ্ঠে মাথা কুট্‌লে কী করে কোন দিগন্ত খুলবে, নতুন সৃষ্টি কৃষ্টি হবে, হবেই না, হতেই পারে না।

কার্ল মার্ক্‌স্‌ ও এংগেলের ধর্মহীন মতবাদ ও বস্তুতান্ত্রিক (materialistic) সমাজ তন্ত্র ও রাষ্ট্র দর্শন আমাদের অনেক তরুণ তরুণীর ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন হয়ে উঠ্‌চে দিন দিন। তা রুখ্‌তে পুরাণ পন্থী কোন ধর্মীয় বিশ্বাস, সমাজ-তন্ত্র আর রাষ্ট্র-দর্শন যে আর পারগ নয়, তা-ও দেখতে পাবেন। তার মোকাবিলা কোন রকম গোঁজামিলের অবকাশ আর নেই। করতে হবে কী? করতে হবে নতুন দর্শন শিল্প বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন ধর্মীয় বিশ্বাস, সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের পত্তন, এবং ইস্‌লামের যুগোপযোগী ইজ্‌তেহাদ যে তা পারে তারও দিগ্‌দর্শন এ পুস্তক।*

প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসায়' ৩০ পৃষ্ঠা থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এস, এস, সি পরীক্ষার্থীদের ঐচ্ছিক বিষয় যে 'ইস্‌লামিয়াৎ শিক্ষা' পুস্তকের সমালোচনা করেছি, তার লেখকও ঐ পুস্তকের ১৫—১৭ পৃষ্ঠায় ঐ 'ইলমুল কালাম' স্বীকার করেছেন। তার অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারবেন এই জমানায় কি পরবর্তী যে-কোন জমানায় তা কতোদূর যুক্তি-সংগত, বিচার-সহ ও গ্রহনীয়!

"ইসলামে ঈমান বিষয়ক যে সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, সে সম্পার্কে কুরআন মজীদ ও হাদিছ শরীফে বহু যুক্তি প্রমান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম যুগের মুসলিমগণের জন্য এই সকল যুক্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে জ্ঞান-

---

*ইজ্‌তেহাদের—গবেষনা করে' নতুন যুগোপযোগী ফায়ছালা দানের—দুয়ার যে বন্ধ হয়নি, হতে পারেনা, হবেনা কোন দিন, তা দেখুন প্রথম প্রকল্প 'জিজ্ঞাসার' পরিশিষ্টে 'মোজাদ্দিদ' প্রসংগে ইব্‌নুল আরবীর সুসংগত ব্যাখ্যাবিশ্লেষনে এবং জবাব [২] এর শেষ প্রবন্ধের 'পরিশীলনে' বিকৃতি-বিদূরণ" 'ইজ্‌তেহাদ—দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি প্রসংগে।

বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ হইতেই কিছু সংখ্যক মুসলমান ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন এবং ধর্মীয় বিধান-সমূহ বিভিন্নভাবে পালন করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইতে থাকে এবং মুসলমানগণ খারিজী, শিয়া, মু'তাযিলী, কাদরীয়া, জাবরীয়া, প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।"

তাহলেই প্রমাণিত হয় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের মোকাবিলা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিশ্বাস যথেষ্ট ছিলো না। তাই অনিবার্য কারনেই ঐ শিয়া, ছুন্নি, খারিজী, মুতাযিলী, কাদরিয়া, জাবরিয়া প্রভৃতি প্রতিবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

'ইস্‌লামী শাসনের বিস্তৃতি ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ফলে কতক মুসলমান বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ ও গ্রীকদর্শনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা গ্রীক দর্শনের ভিত্তিতে ও মাপ কাঠিতে ইস্‌লামের 'আকাইদ বা বিশ্বাস্য বিষয়গুলির' পুংখানুপুংখ আলোচনা, পরীক্ষা ও যাচাই করিতে আরম্ভ করেন। কতক লোক ভ্রান্ত যুক্তিবাদের ফলে ইস্‌লামী বিশ্বাস্য বিষয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। তখন ইমাম আশ'আরী, ইমাম মাতুরিদী, ইমাম আহম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ মুসলিম মনীষিগণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিবেক-সম্মত যুক্তি প্রমান দ্বারা ইস্‌লামী বিষয় গুলির যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হন। এইভাবে ইস্‌লামী 'আকাইদ বা বিশ্বাস্য বিষয়গুলিকে' নূতনতর যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যুক্তি-প্রমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'আকাইদ শাস্ত্রই' ইল্‌মে কালাম নামে অভিহিত হয়।"

কিন্তু আমাদের বইগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন ঐ সব জমানার উদবর্তিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোকাবিলা ঐ সব 'ইলমুল-কালাম' যথেষ্ট ও যথার্থ সাব্যস্ত হলেও, এ-জমানায় আরো জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং উপরোক্ত কার্ল মার্ক্‌স্‌ ও এংগেলের সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের মোকাবিলা তা অকিঞ্চিৎকর, অসম্পূর্ণ। সকল সমস্যার সঠিক সমাধান সে আদৌ দিতে পারেনা। এবং আমাদের এই 'জিজ্ঞাসা' পুস্তকেই আমরা সেই সব জমানার ইলমুল কালামের আকাইদের ও আকিদার যে সব প্রশ্ন তুলেছি, তাদের সঠিক

সমাধান ছাড়া অর্থাৎ নিত্য নব নব পরিস্থিতিতে নব নব ইলমুল কালাম ছাড়া কী করে' ইসলাম, কি অপর যে-কোন ধর্মই চির সত্য সনাতন বলে' প্রমাণিত হতে পারে? হবেই না কোন দিন।

আর সেই সব জমানায় নিত্য নতুন দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-কলার মোকাবিলা করতে নিত্য নব নব ইলমুল কালামের দরকার হয়ে থাকলে, এই আরো নিত্য নব নব দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-কলার মোকাবিলা করতে আরো নতুন নতুন ইলমুল কালাম সৃষ্টির দরকার হবেনা কেন? কোন্ যুক্তিতে?

"ইলমে কালাম আয়ত্ত করিলে ইস্‌লাম ধর্মে স্বীকৃত বিশ্বাস্য বিষয়গুলি যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার, ঐ বিষয়গুলিতে অযথা সন্দেহ পোষণ কারীর সন্দেহ নিরসন করিবার ক্ষমতা জন্মে। বস্তুতঃ ইল্‌মে কালামের সাহায্যে আল্লাহর রছুল ও ইস্‌লামী ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত রহস্য জানিতে পারা যায়। তাওহীদ ও ঈমানের বিশদ বিবরণ, আল্লাহ্‌র গুণাবলী, কুরআন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল, রিসালত, খুলাফায়ে রাশেদীন, মোজেজা, মে'রাজ, ইবাদতের স্বরূপ, শাফা'আত, বেহেশত, দোযখ, ভাগ্য লিপি, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ইল্‌মে কালামের মূল বিষয়-বস্তু।"

এই পুস্তকের 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন, যে প্রাচীন ঐ ইলমে কালাম আয়ত্ত করলে ইস্‌লাম ধর্মে স্বীকৃত বিশ্বাস্য (?) ঐ বিষয়গুলিতে সন্দেহ পোষণ করা অযথা তো প্রমাণিত হয়ইনা, বরং সন্দেহ পোষণকারীর সন্দেহ নিরসন করবারও আদৌ ক্ষমতা জন্মেনা। ঐ ইল্‌মে কালামের সাহায্যে আল্লাহ্‌র রছুল ও ইস্‌লামী ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত রহস্য আদৌ জানা যায় না। তাওহীদ ও ঈমান, আল্লাহর গুণাবলী, কোরআন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল, রিসালাত, খুলাফায়ে রাশেদীন, মোজেজা, মে'রাজ, ইবাদতের স্বরূপ, শাফাআত, বেহেশত, দোযখ, ভাগ্যলিপি, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐ প্রাচীন ইলমে কালামে সেই যুগ অনুযায়ী যেভাবে যুক্তিতর্ক খাড়া করা হয়েছে, সেই জমানার

আনুপাতিক যে সব সমাধান পেশ করা হয়েছে তা' এই জমানায় আরো নব নব দর্শন বিজ্ঞান, শিল্পকলার মোকাবিলা সর্বত্র সুযুক্তি-পূর্ণ নয়, সর্বত্র সমাধান নয়, তা' এই পুস্তক পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।

এখন, আপনারা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবেন, না, আল-কিন্দি, আলফারাবী, ইব্‌নেসিনা, আল্‌বেরুনী, ইমাম গাজ্জালী, ইব্‌নেরুশ্‌দের যুগোপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করবেন, পালন করবেন এবং মনছুর হাল্লাজ (১) বড়োপীর আবদুল কাদের জিলানী, খাজা মইনুদ্দীন চিশতি, এখওয়ানুচ্ছাফা, ওমরখৈয়াম, ইবনুল আরবী, রুমী, শেখ সাদি, হাফিজ, আমীর খসরু প্রমুখের মতো হযরত মোহাম্মদের (স) সেই হেরার গুহার সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিক আন্তরিক (বাতেন) মর্ম (এল্‌ম) বোঝবার ও বিকাশের প্রয়োজন অনুভব করবেন (২), এবং তা প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রচার ও প্রবর্তন করবেন, তা' সুধিগণ, নিজেরাই এখন ভেবেচিন্তে স্থির করুন এবং এই বই খানির অভ্যন্তরে ডুব দিয়ে সকল দিকের যুগানুপাতিক সার সত্যের অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানাই। আমন্ত্রণ করি।

বিগত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকল জমানার সকল জিজ্ঞাসা ও জবাবের চুম্বক এ পুস্তক। আর যা যা প্রশ্ন ও তার উত্তর বাকী থাকতে পারে, তা পাবেন নিম্নলিখিত পুস্তক মালায়। বিশেষ করে' 'আল্লাহ, (স্রষ্টা), আরওয়াহ্‌ (আত্মা) আছে কি নেই,' 'থাক্‌লে কিভাবে

---

(১) অবশ্য মনছুরের মতো সবাইকে যে 'আনাল হক' (আমিই সত্য, সত্তা) বলতে হবে তাও সত্য নয়, কেন নয় তার বিচার, বিশ্লেষণ বিশদ দেখুন জবাব [১] এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ প্রবন্ধের 'বেলায়ত নবুয়ত' প্রসংগে বিশেষ করে' তার 'পরিশিষ্টে'।

(২) 'বাতেন এল্‌ম' সম্পর্কে ঐ 'পরিশিষ্টে' বড়োপীর আবদুল কাদের জিলানীর এরশাদ দেখুন।

আছে,' 'সৃষ্টির উদ্দেশ্য,' 'পাপ পুণ্য,' 'অন্ধ খঞ্জ আতুর মূক বধির' প্রভৃতি বৈষম্য-বৈচিত্র, 'উচ্চনীচ' 'ধনী দরিদ্র' ভেদাভেদ, 'বেহেশত-দোযখ, বরযখ (মাঝামাঝি স্থান)' প্রভৃতি কি, কেন, কোথায় প্রভৃতি আর যাবতীয় জিজ্ঞাসার জবাব, সমস্যার সমাধান পেতে পারেন প্রধানতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক খানিতে এবং শেষদিকে উল্লেখিত কাব্য তিন খণ্ডে [যদিও কবি দাবীদার নই, তবু কাব্যেও অতি এবং অধি অভিজ্ঞতা লিখে রেখে যাবার তাকিদ অনুভব করছি]।

আপনারা এ 'জিজ্ঞাসা' ও তার 'জবাব [১], [২]' পড়ে' অনুরূপ আরো 'জিজ্ঞাসা ও জবাব' পাবার প্রয়োজনীয়তা মালুম করলেই মাত্র এ পুস্তক মালা প্রকাশ করে' দেয়া যেতে পারে।

১। আত্ম দর্শন, তত্ত্ব দর্শন; ২। মালায়েকা (ফেরেশতা) ও মানব দর্শন; ৩। পাঞ্জেগানা দর্শন; ৪। হযরত মোহাম্মদ (স) ও তাঁর জীবন দর্শন; ৫। সত্য দর্শন, ৬। সর্ব ধর্ম দর্শন, ৭। সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শন, ৮। কাব্য 'খৈয়াম খবর'-মালিকা।

(i) ওমর খৈয়াম, রুবাইয়াত
(ii) সাকি (কাব্য নাটিকা)
(iii) শারাব (ঐ) প্রভৃতি।

জানাবেন।

বই খানা কারো কোন প্রকার উপকার করতে পেরেছে জানতে পারলে কৃতার্থ হবো।

হক্কোন্নূর দরবারশরীফ
পোঃ গ্রাম—শৌলজালিয়া
জিলা—বরিশাল

বয্‌লুর রহমান
তাং ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৮
বাং ১৭ই পৌষ, ১৩৭৪
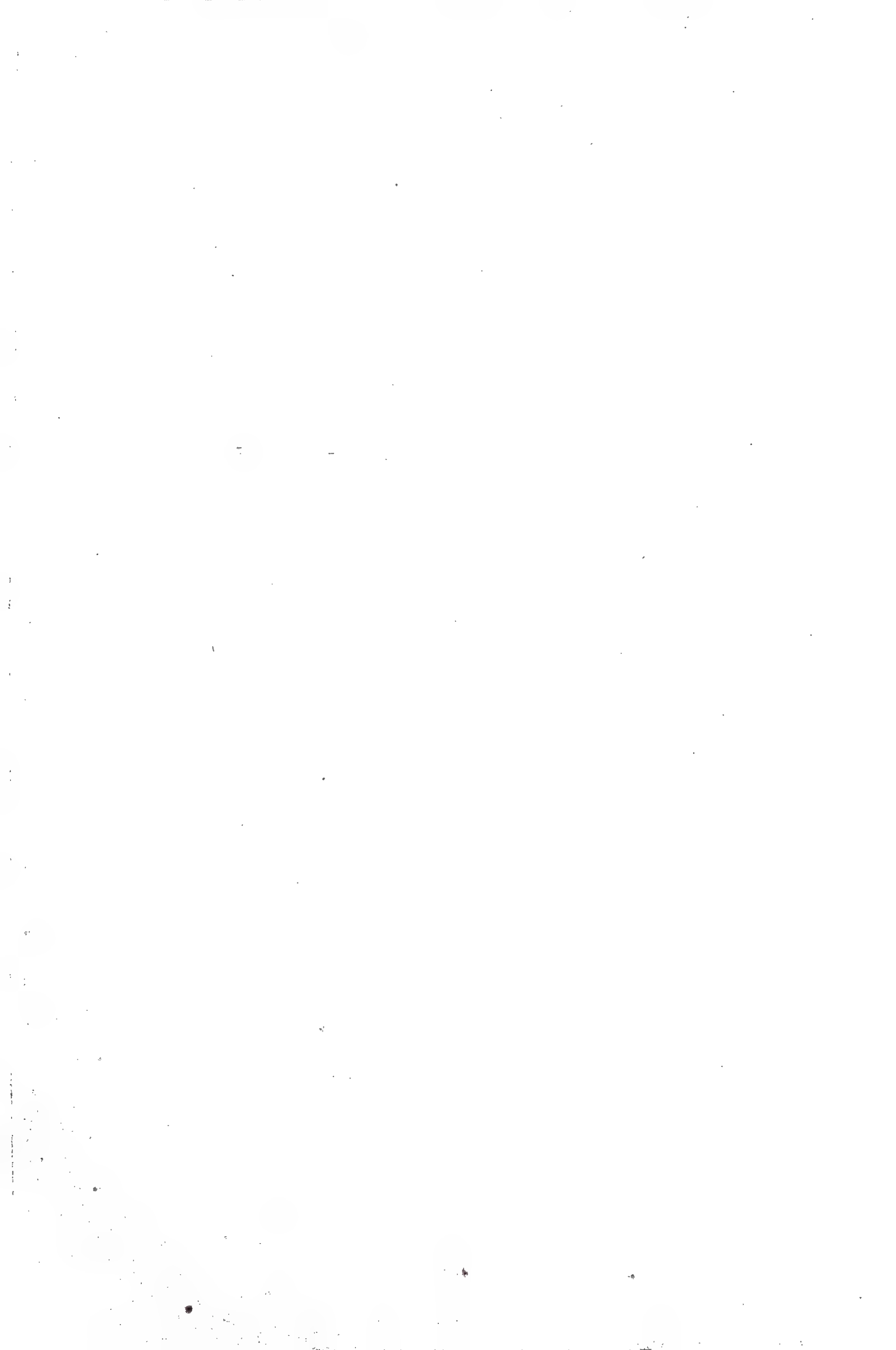
জিজ্ঞাসা

প্রস্তাবনা

এটা দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির যুগ; তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞান যা বলবে তা মুখ বুজে মেনে নিতে হবে, বরং বিজ্ঞানী কেউ কেউ যে আল্লাহ, আত্মা, পরকাল, প্রভৃতি সম্পর্কে ধৃষ্ট উক্তি করে' থাকেন, কখনও কখনও নেই বলে' থাকেন, তা অবশ্য সত্য বলে' মেনে নেয়া যায় না, মেনে নিতে হবে না। এরূপে দর্শনও যদি কখনও কখনও নাস্তিকতার বুলি কপ্‌চাতে থাকে তবে তাও মেনে নেয়া যায় না, অগ্রাহ্য; শিল্পকলাও যদি এভাবে তার সীমা সরহদ্দ ছাড়িয়ে সত্যিকার ধর্মকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে থাকে তবে তাও অগ্রাহ্য বাতেল; কারণ অবশ্য এ 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ষোল আনা বোঝানো যাবে না; আসল পুস্তকগুলি থেকেই পুরোপুরি জেনে নিতে হবে; তবে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ তা হলে ধর্ম-প্রবর্তকরা কি সবাই মিথ্যার বেসাতি করে গেছেন? নিজেরা ধর্মের নামে মিথ্যার দালান কোঠা বানিয়ে তাতে বসবাস করে গেছেন এবং কোটি কোটি মানুষকে বসবাস করতে বাধ্য করে গেছেন, এ আর সত্য হতে পারে না, বিশ্বাসও করা যায় না।

কিন্তু আমরা যে আবার এই দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতির নিত্য নব নব বিবর্তনের মোকাবেলা ধর্মের বিজ্ঞান-সম্মত, দর্শন-দুরস্ত এবং শিল্প-সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারছি না তার ফলও কিন্তু আদৌ ভাল হচ্ছে না; বল্‌বেন দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা (Arts) যদি ভুল করে থাকে? কিন্তু দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলার যেগুলি প্রমাণিত সত্য,

শিব (মঙ্গল-জনক) ও সুন্দর তা যে ভুল করেনি, তাতো পরীক্ষায় বোঝাই যায়; সুতরাং ঈমান দুর্বল বলে' দর্শন, বিজ্ঞান শিল্প-কলার গুণগান করছি এ রকম ধারনাও আসলে অজ্ঞতা এবং 'ও' সম্পর্কে অজ্ঞান ব্যক্তিদেরই তৈরী। ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে এই: আমরা আমাদের ওয়ারিশদিগকে ধর্ম-পুস্তকের ব্যাখ্যায় শুনাচ্ছি এক রকম, ঐ আচরণে দেখাচ্ছি এক রকম, আর তারা দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যে পাচ্ছে আর এক রকম; কাজেই কী করে' ধর্মে তাদের আদৌ আস্থা থাকবে, মান্‌বে? এই কারণেই আমরা দেখছি যে ধর্ম অনেকের জীবন থেকেই আস্তে আস্তে ঝরাপাতার মতো খসে পড়ছে; কারো কারো জীবনে থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মের ভড়ং—ট্রেড মার্ক, সমাজ ও মুরুব্বীদের ভয়ে ধর্মের আকিদা, আচরণ বজায় রাখা; ফল হচ্ছে কি? ফল হচ্ছে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যেরই ক্রমশঃ জয়জয়কার; ধর্মের রাজনৈতিক, কি সামাজিক শ্লোগান হিসাবে কতিপয়ের কপটতায় আজো টিকে থাকা, আর অবৈজ্ঞানিক, অদার্শনিক, অশৈল্পিক পর্যায়ে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কি শিক্ষিত হয়েও যারা অভ্যাসের দাসত্বের গুণে ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—তাঁদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করা,—তাঁদের মধ্যে কোণঠাসা হয়েও অযৌক্তিক কিস্‌সা-কাহিনীর জৌলুসে বেশ বেঁচে আছে।

দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের মোকাবিলা ধর্মের এরকম কতকগুলো পরাজয় দেখতে পাবেন, অথচ বেঁচে আছে; আবার স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য—এক কথায় সংস্কৃতি এবং ধর্মের—পরস্পর বিরোধিতাও আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অবস্থায় নেই। এখন কথা হচ্ছে ধর্মের ফায়সালা এবং ঐ সংস্কৃতির ফায়সালা যেখানে পরস্পর বিরোধী, সেখানে উভয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কি আসল সত্য ফায়সালা দিবেন না? না, এই রকম দুই বিভিন্ন শিবিরের অথচ একই শিক্ষার্থীদের

পরস্পর—বাইরে সব সময়ে প্রকাশ না পেলেও—মানসিক কোন্দল চলতেই থাকবে? আমরা এরকম কতকগুলি অসংগতি দেখাচ্ছি এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা-মোতাবেক মীমাংসা দিচ্ছি। আশা—আরও ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরাই যথাযথ ফায়সালা দিয়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য সকলকেই বাঁচাবেন; তা না হলে ধর্মের আমরা যে সব গতানুগতিক ব্যাখ্যা দিয়ে আস্‌ছি তাতে করে' দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের মোকাবিলা তার বিশেষ কোন মূল্য-মান থাকে না, বাঁচবারই বা অধিকার কী—যখন এ জমানার জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব সে দিতে পারছে না? একে একে এ রকম কতিপয় অসংগতি এবং আমাদের মীমাংসা দেখে যান মানে আমাদের মনে জেগেছে যে সব জিজ্ঞাসা তাদের জবাব আমরা যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করছি আর কি।

(১) বাইবেল (ইঞ্জিল কেতাব) ব'ল্‌ছেন বিশ্ব ছয়দিনে পয়দা হয়েছে, আল কোরআনও তার সমর্থন করে বলছেন:

هو الذی خلق لسموات و الارض فی ستة ایام

তিনিই (আল্লাহ) যিনি আছমান জমীন পয়দা করেছেন ছয় দিনে।—হুদ ৭।

কোন্ কোন্ দিন কোন্ কোন্ বস্তু বানানো হয়েছে, বাইবেলে তার উল্লেখ আছে, কোরআনে তা নেই; কিন্তু কোন কোন আয়াতে ছ'দিনে পৃথিবী বানানোর কথা আছে:

قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین

বল: তোমরা কি তাকে অস্বীকার করছো যিনি পৃথিবী বানিয়েছেন ছ'দিনে?—হা-মীম ৯।

আবার ৪ দিনে ওতে ব্যবস্থাপনার কথা আছে:

وبرك فيها وقدر فيه اقواتها فی اربعة ایا م

এবং বরকত দিয়েছেন ওতে আর ওর জীবিকা (ব্যবস্থাপনা) করে দিয়েছেন চার দিনে।—হা-মীম ১০।

কিন্তু কথা হচ্ছে দিন রাত্রির কারণ এখন বিজ্ঞান সঠিক বলতে পারছে; তা হচ্ছে সূর্যের কিরণ; পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে পৃথিবীর যে অঞ্চল যখন সূর্যালোকে আলোকিত হয় তা-ই দিন; আর যখন যে অঞ্চল আলোক পায় না, তখন সেখানে রাত্রি। তা হলে চন্দ্র-সূর্য পয়দায়েশের পূর্বে কোথায় ছিল সূর্যের কিরণ যে বিশ্ব (আছমান-জমীন) ছয় দিনে পয়দায়েশের কথা বলা হলো? আবার পৃথিবী দু'দিনে বানানোর কথা বলা হলো, আর ওতে চারদিনে ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলো? এখন শূন্যে সফর করে' সঠিকই দেখা গেছে যে পৃথিবীর চারদিকে বার মাইল ঊর্ধ পর্যন্ত সূর্য-আলোক পাওয়া যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর ঐ আহ্নিক গতির কারণে আঞ্চলিক আলোক লাভ, অতএব দিন, তারপর ক্রমশঃ ধূসর বেগুনী হতে হতে বিশ মাইল ঊর্ধে সর্বত্র অন্ধকার; অন্ধকারে জ্বলে দূরত্ব আনুপাতিক আকারে প্রকারে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এবং পৃথিবী।

কাজেই ঐ ছয়দিন, দুই দিন, চারদিনকে যথাক্রমে ঐ ছয়, দুই, চার পর্যায় না ধরলে বাইবেল ও কোরআনের কথার সংগতি রক্ষা হয় না, কিস্‌সা কাহিনী মনে করে কেউ কেউ উড়িয়ে দিতে পারেন, বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যকে তো আর উড়িয়ে দিতে পারছেন না।

কিন্তু ঐ দুই, চার, ছয় পর্যায়ই বা কী? পর্যায় হলো এই রকমঃ বিশ্ব প্রথমতঃ জড় ও চেতন এই দুই পর্যায়; জড় পুনঃ কোন কোন গ্রহে, বিশেষ করে আমাদের পৃথিবী গ্রহে আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস) এই চার পর্যায় লাভ করে। সুতরাং ঐ জড় ও চেতন ধরে' মোট ছয় পর্যায়ই হয়; আল্‌-কোরআন ও বাইবেল মূলতঃ সেই কথাই বলেছেন।

দর্শন বিজ্ঞান

(২) হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে বৃত্রাসুর বধের কারণে দধীচি মুনীর অস্থি দিয়ে বজ্রবাণ তৈরী করার কথা আছে; কবি হেমচন্দ্র ঐ বজ্রবাণের কার্যকারিতা তাঁর 'বৃত্রাসুর মহাকাব্যে' এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

অস্ত্র (বজ্র) গড়ি বিশ্ব কর্মা সহাস্য বদনে
কহিলা সুরেন্দ্রে চাহি' "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান :
মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া
করত্রাণে ঢাকি' কর ঘুরায়ে ঘুরায়ে
ছাড়িতে হইবে দ্রুত, তখনি দম্ভোলি—
রিপু দম্ভ বিনাশন দ্বিতীয় এ নাম—
শত্রু নাশি' অল্পকালে ফিরিবে নিকটে।"

আল কোরআনে আল্লাহ নিশ্চয়ই এ কথার প্রতিধ্বনি করেন নি :

(i) ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزينها لالنظرين وحفظنها من كل شيطن رجيم - الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين -

আমরা (আল্লাহ) শূন্যমণ্ডলে সুনিশ্চিত বুরুজ (বহু সূর্য-গ্রহ উপগ্রহ-নক্ষত্র-নিকর ভরা রাশি-চক্র) বানিয়েছি, আর তা পর্যবেক্ষক পরিদর্শকদের কাছে সুন্দর করেছি। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করেছি (সুরক্ষিত রেখেছি)। কিন্তু কেউ কেউ লুকিয়ে কিছু শুনে পলায় আর তার পিছনে ধায় এক উজ্জ্বল অগ্নিশিখা—জ্বলন্ত অংগার খণ্ড। হিজর ১৬,১৭,১৮; মুল্‌ক ৫।

ঐ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা—জ্বলন্ত অংগার খণ্ডের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বজ্র ও বিদ্যুত, শয়তানকে মারবার জন্যই নাকি বজ্র ও বিদ্যুতের তৈয়ার হয়েছে।

(ii) انا زينا السماء ادنيا بزينة الكواكب - وحفظا من كل شيطن مارد لايسمعون الى الملا الا على ويقذفون من كل جانب - دحورا ولهم عذاب واصب -

আমরা ছুনিয়ার আকাশকে সুশোভন করেছি জ্যোতিষ্ক রাজির (চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের) অলংকরণে, আর সমস্ত অবাধ্য শয়তান থেকে করেছি তাদের সুরক্ষিত, তারা উর্ধস্তরের সংঘের কোন কথা শুনতে পায় না এবং চারদিক থেকে তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় তাদের তাড়াতে এবং এ তাদের প্রাপ্য শাস্তি।—সাফ্ফাত ৬-৯।

ছুনিয়ার আকাশের অর্থ করা হয় নিম্নতম আকাশ এবং তার দ্বারা প্রমাণ করা হয় চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই এই নিম্নতম আকাশে অর্থাৎ পহেলা আছমানে, আর এই রকম নাকি সাত আছমান (সাত আছমানের ব্যাখ্যা একটু পরেই আছে)।

এখন ঐ 'নিক্ষিপ্ত হয়' কথার অর্থ ধরুন। যদি ঐ পৌরোনিক কাহিনীর মতো শাব্দিক অর্থে ওর অর্থ করা হয় বজ্র বিদ্যুত এবং তা ঐ অভিশপ্ত অবাধ্য শয়তানদের মারবার জন্য, তা হলে আল্ কোরআনকে কতখানি খাট করা হয় চিন্তা করুন। তা হলে আল কোরআনকেও যদি ঐ পৌরাণিক কিস্সা কাহিনীরই সেমিটিক (সারাসেনী আরবীয়) রূপ মনে করেন কেউ কেউ, তখন তাদের দোষ দিতে পারেন কি? পারেন না। অথচ ঐ রকম ব্যাখ্যা দিয়ে তা-ই করা হচ্ছে দিন রাত, অথচ প্রকৃত বোজর্গানেদীনেরাও কিছু উচ্চবাচ্য করছেন না, যেন তাঁদেরও এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কিংবা কিছু বলবার নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের স্বল্প সম্বল নিয়েই পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে; আর তা হচ্ছে 'ঐ দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরাই উপরোক্ত পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক' অর্থাৎ আসল সত্য আবিস্কারক, আর তা যারা পারতো না, অথচ দুষ্ট বুদ্ধির খেয়ালে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদিকে (সূর্যসহ) দেব দেবী

জ্ঞানে নিজেরা পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করতো, মন্ত্র আওড়াতো আর অল্প বুদ্ধি জনসংঘকে পূজার অর্ঘ্য দিতে, মন্ত্র মারফতে দেব-দেবী অর্থাৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী ঠাওড়াতে বাধ্য করতো, তারাই এ ক্ষেত্রে ঐ অভিশপ্ত অবাধ্য শয়তান ; তাৎপর্য হলো ঐ করে' তারা আসল চিরন্তন ধর্ম-বিশ্বাস তৌহিদ (একত্ববাদ) থেকে নিজেরা ছিল বিচ্যুত, এবং ঐ অজ্ঞ লোক ঠকিয়ে অদৃষ্ট গননাদি করে' স্বার্থ সিদ্ধি করতো অর্থাৎ রুজী রোজগার যোগাড় করতো, ফলে সংশোধনের জন্য তাদের ইহপরকালে শাস্তি পেতে হবে – 'পেছনে ধায় জ্বলন্ত অংগার খণ্ড', কি 'চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়' কথার রূপকে তা বর্ণিত হয়েছে ; এক্ষেত্রে এবং এরূপ আরো ক্ষেত্রে ঐ অবাধ্য অভিশপ্ত শয়তান কোন অশরীরি জীব নয়, আর অশরীরি কোন জীবকে বজ্র বিদ্যুৎ দিয়ে মারা যায় এও একটা কথা! আর ওর অর্থ বজ্র বিদ্যুৎ নয় কস্মিনকালেও।

এখন, ঐ সাত আছমান জমীনের রহস্য দেখে নিন।

(iii) فقضهن سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها

এরপর তিনি সাজালেন সাত আছমান দু'দিনে ; আর প্রতি আছমানে তার কার্যকলাপ ব্যবস্থা দান করলেন।—হা-মীম ১২।

কোরআনের ঐ সাত আছমানের ব্যাখ্যাও ঐরূপ নেহাৎ স্থুল অর্থে দেয়া হয়, তা কী? ঐ নীল অঞ্চল নাকি পহেলা আছমান তারপর ঠিক কোন্ কোন্ রঙের তা কোনদিন শুনিনি, কিন্তু যে যে রঙেরই হোক, কি রঙ ছাড়াই হোক, আরও ছয়তালা (তবক) আছমানে নাকি আকাশ-মণ্ডলের শেষ ; আর, এক আছমান থেকে আর এক আছমানের দূরত্ব নাকি ৫০০ বৎসরের রাহ্ (পথ) ; কিন্তু এই ৫০০ বৎসর কি হিসাবে? পায়দলে, ঘোড়ায় চড়ে, গাধার পিঠে, খচ্চরের পিঠে, না উটের হাওদায়, তার কোন সঠিক বিবরণ আজ পর্যন্ত পাওয়া গেলো না। কারণ, উড়ো

জাহাজ, রকেট তো এ জমানার আবিস্কার ; অন্ততঃ এতো শক্তিশালী ইঞ্জিন বিশিষ্ট এরোপ্লেন, রকেট এবং তা এতো দূর-পাল্লার, এ সব ছিলো সেই সব অনুন্নত জমানায় কল্পনার অতীত। তা হলে কিসে চড়ে' ঐ ৫০০ বৎসরের রাহ্ পাড়ি ধরা যাবে যে তার ঐ রকম বৎসরের হিসাব দেয়া হলো ? বোররাক ? কিন্তু বোররাক অর্থ বিজলি আর তার আসল তাৎপর্য দেখুন রকেটের রহস্য প্রবন্ধে 'অতি-অভিজ্ঞতা' প্রসংগে, আর বোররাকে চড়ারও কোন বৎসর হিসাব হয় ? ঘণ্টায় তা হলে সে কত মাইল যায় ? আর শূন্যমণ্ডলে দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ ইত্যাদি রূপ কাল (time) এবং স্থান (space) বলে' কিছু আছে নাকি যে বোররাকেও ঐ রকম বৎসরের হিসাব হবে ?

রছুল মকবুলের (স) রেহলাতের (ওফাত শরীফের) প্রায় ২৫০—৩০০ বৎসর পরের যোগাড় করা এই রকম ৫০০ বৎসর রাহার হাদিছের বলে যা বলা হয় তা মান্‌তে গেলে রছুলকে (স) জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে কতোখানি খাট করা হয়, আর অসীম শূন্যমণ্ডল সম্পর্কেও কতো দূর উম্মি ঠাওড়াতে হয় তা-ই যেনো এ-ধরনের হাদিছের দোহাই-দেনেওয়ালাদের হুঁশই নেই, ধারনাই নেই [দেখুন 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধে 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগও]।

কিন্তু তারপর কী ? ঐ সাত আছমানের পর কী ? তার কোন জবাব নেই। আর পহেলা আছমানও কি আসলে আদপেই নীল ? নীল তো বায়ুমণ্ডল সূর্যের নীল রঙ ধরে' রাখে তা-ই (একটু পরেই এর বিশ্লেষণ আছে) ; রাত্রি বেলা তো আর নীল থাকেনা ; ফিকে, বেগুনী হতে হতে কালো রূপ ধারণ করে, তাতে জ্বল্‌তে থাকে চির-রাত্রির মশালচিরা ! তাদের একটি থেকে আর একটির দূরত্ব হিসাব করতে হয় আলোক বর্ষে, তার অর্থ আলোক চলে সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল, এই হারে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বর্ষের হিসাব, তাতেও অনেক ক্ষেত্রে কুলোতে চায়না ;

এতো দূরে দূরে ঐ তারকা, অতি প্রকাণ্ড, অথচ দেখা যায় গায়ে গায়ে অতি ধারে ধারে। সব দেখার ভুল।

কারো শেষ নেই, সীমা নেই; সুতরাং সাত আছমান আবার কোথায়? দিশে-বিশে না পেয়ে বলে দেয়া হলো সূর্যের সাতটা গ্রহের সাত অঞ্চল সাত আছমান; কিন্তু সূর্যের গ্রহ সাতটা নয়, পৃথিবী ধরে' বড়ো বড়ো নয়টা (আর রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা নাকি আর একটা গ্রহ আবিস্কার করেছেন, নাম ভালকান, তার সত্য পুরোপুরি প্রমানিত হলে হবে দশটা), আর গ্রহানুপুঞ্জ (Asteroids), উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি ধরে' হবে অসংখ্য।

আর বোকামী কেন? আর একটু! আল্‌কোরআন আল্লাহর বাণী, আল্লাহ্‌র কেতাব। অথচ অপর সূর্যের গ্রহ-উপগ্রহের উল্লেখও তাতে নেই, তবে সে কেমন আল্লাহ্‌র বাণী, আল্লাহ্‌র কেতাব—ঐ রকম ভ্রান্ত বোকা বোকা হাদিছ তফসির শুনে' এবং পড়ে' যদি কারো মনে এ প্রশ্ন জাগে, তবে তাকে দোষ দিতে পারেন কি? পারেন না। অতএব হাদিছ তফসির হওয়া উচিত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত, দর্শন-দুরস্ত, শিল্প-সুষমা-সংগত; তার আগে জমীনেরও সাত তালা, সাত তবক দেখুন:

والله الذی خلق سبع سموٰات ومن الارض مثلهن

আল্লাহ্‌ই বানিয়েছেন সাত আছমান এবং জমীনেও তার অনুরূপ (সাত তবক, তালা)।—তালাক ১২।

জমীনের অর্থাৎ মৃত্তিকা-পিণ্ড পৃথিবীর সাত তবক আবার কী? কোন জমানায় সেই সময়কার জমীন জরীপ করে' সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, সাত আক্‌লিম নামে যা পরিচিত, সেই সাত ভাগ ধর্‌লে আল্‌ কোরআনের আয়াতকে নেহাৎ খেলো করা হয় কিনা দেখুন; কারণ, সাত আছমান তৈরী করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, আর জমীনের ঐপ্রকার অবৈজ্ঞানিক মোটামুটি ভাগ

ছিলো মানুষের তৈরী; অথচ বলা হচ্ছে আছমানের অনুরূপ আল্লাহ্‌রই করা ভাগ; এ রকম গোঁজামিল আল্লাহ্‌র বাণীতে থাক্‌তে পারেনা, নেইও। বিশেষতঃ ও-হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আবিস্কারের পূর্ববর্তী কথা; তখন জমীন ছিলো অতি সংকীর্ণ; ঐ আবিস্কার গুলোর পরেও মাত্র মোটা মুটি পাঁচ ভাগ, কি (উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দুই ধরে') ছয় ভাগ হয়; সুতরাং ঐ সাত ভাগ আল্লাহ্‌র করা মান্‌লে ঐ তখনকার অনাবিস্কৃত অঞ্চলাদি সম্পর্কে আল্লাহ লা-ওয়াকেব-হাল (অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ) ছিলেন মনে করতে হয় (নাউজুবিল্লাহ্‌ মেন্‌হা—আল্লাহ্‌র পানাহ্‌ চাই এ থেকে)। বিশেষতঃ আল্‌-কোরআন-কালামে আছে আল-আর্দ অর্থাৎ পৃথিবী, শুধু জমীন বা মাটি নয়; আর আল্‌ আর্দ বল্‌তে মাটি ও পানি উভয়ই বোঝায়; অথচ প্রাচীন ঐ সাত ভাগ মান্‌লে পানির কথা আল্লাহ বেমালুম ভুলে গেছ্‌লেন মনে করতে হয় (নাউজুবিল্লাহ্‌)। আবার, পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা, আগ্নেয় শিলা ইত্যাকার স্তর ধরে'ও পৃথিবীর বহিস্তর থেকে ক্রম নিম্নস্তর কোন দিনই সাত হবেনা।

তবে কী? তবেই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা ছাড়া এ-ধরনের আয়াতের যে কোন ব্যাখ্যাই হতে পারেনা, তাকি আরো বুঝিয়ে বল্‌তে হবে? হবে; কারণ, সেই অধ্যাত্ম ব্যাখ্যাই বা কী? আমরা ইতি পূর্বে দুই দিন, চার দিন, ছয় দিনে মহাবিশ্ব পয়দায়েশের ক্ষেত্রে দেখেছি যে আসলে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে দিন রাত্রির কোন অস্তিত্বই ছিলোনা, সুতরাং ও-হচ্ছে যথাক্রমে জড় ও চেতন, জড়ের পার্থিব চারিপর্যায় এই ছয় পর্যায়ে রূপ লাভ; কিন্তু ওর অন্ত-স্থলে বয়ে চলেছে চির মৌল চেতন-লোক, তা-ই ধরে সাত পর্যায় বা সাত আছমান। আবার পার্থিব জীবনও ঐ ছয় পর্যায় সংগে আত্মা ধরে সাত জমীন; এম্‌নি জীবনের আবির্ভাব, ক্রম বিকাশ ও ক্রম-পরিনতি মূলতঃ সাত আছমান ও সাত জমীন।

ঐ আয়তের বাকী অংশও তা-ই প্রতিপন্ন করে ঃ

يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما -

এদের (আছমান জমীনের) ভিতর দিয়ে নাজেল হয় আমর (কার্যকলাপ) * যেনো তোমরা জান্‌তে পারো যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ঘিরে আছেন সব পদার্থ তাঁর জ্ঞান-যোগে *ঐ

কাজেই, জীব এবং জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত নাজেল যেমন আল্লাহ্‌র 'আমর' ঐ আছমান হিসাবে তেম্‌নি ঐ জড়-জমীন জীবনের ক্রম-বিকাশ, ক্রম-পরিনতি অর্থাৎ যথাকার থেকে জমীনে পতন তথাকার দিকে পুনরুত্থানও ঐ আছমান-জমীন-লীলা ; আর তার ক্রম সাত সাত মূলতঃ চৌদ্দ পর্যায়—চৌদ্দ ভূবন হিসাবে এবং নামে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাসাউফ তথা এল্‌মে মারেফাতের গ্রন্থাদিতে। সুতরাং এল্‌মে মারেফাত তথা অধ্যাত্ম দর্শন ছাড়া এ-ধরনের আয়াতের, কি ছুরার আসল অকাট্য তরজমা-তফসিরই হয় না ; সংগতও নয় ; কেননা তাতে করে' সীমাবদ্ধ শুধু শরিয়ত (শুরু-সূচনার) জ্ঞান-মাফিক কল্পনায় কেবল ভুলের পর ভুলের পাহাড় জমা হতে থাকে ; প্রসংগ-ক্রমে বল্‌তে হয় যে কোন জড়পদার্থের মৌল পরমানুর অতিপরমানু লোকে মূল সাত রঙ (একটু পরেই আকাশের তরজমায় দেখুন) ; সে সর্বব্যাপী সচেতনতারই বৈদ্যুত স্থূলতা—সাত জমীন ; আবার, প্রতি জীবনে চেতনারও অমনি মূল সাত স্তর অনুরূপ রঙ-রস-রূপে—সাত আছমান বৈকি ; এ সবই, অভিজ্ঞতার ব্যাপার ; অনভিজ্ঞের

---

* * আল্লাহ্‌র 'আমর'এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র যে-ইচ্ছা বা প্রকল্প অনুসারে সব সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয় চল্‌ছে তা-ই ; আল্লাহ্‌র আমর অর্থাৎ আদেশ এম্‌নি তাৎপর্যপূর্ণ ; নতুবা 'আছমান-জমীনের ভিতর দিয়ে আল্লাহ্‌র (শুধোশুধি) আমর (আদেশ) নাজেল হয়' কথার কোন অর্থই হয় কি ? হয় না।

কাছে কিস্‌সার মতন শুনাবে। অথচ একটু কোশেশ করলেই এ সম্পর্কীয় অধি-জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়।—'পরমানবিক তথ্য' ও 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক-বিবর্তনবাদ' দেখুন।

ইরানের সুফী (মরমী) সাধক কবি ফরিদ উদ্দীন আত্তার (১১১৯-১২১৯ খৃঃ) হয়তো আর একভাবে এই সপ্ত স্তর-পতন থেকে সপ্ত-স্তর উরুজের (ঊর্ধগতি) বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর মশহুর মন্‌তেকুৎ তায়ের (পাখীর প্রকল্প) নামক মরমী (তাসাউফ) কাব্য গ্রন্থে।

ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে দাঁড়ায় এইঃ তেরো রকমের পাখী নানা ওজর আপত্তির পর অবশেষে তাদের নেতা হুদহুদ পাখীর নেতৃত্বে তাদের রাজা সী-মোর্‌গ্‌ দেখ্‌তে চললো। সপ্ত উপত্যকা পার হয়ে তারা চল্‌লো। প্রথম উপত্যকা প্রেম, দ্বিতীয় জ্ঞান, তৃতীয় বৈরাগ্য, চতুর্থ যোগ; তার ভিতর দিয়েই অভিজ্ঞতা হয় তাদের চরম পরম বিস্ময়ের, আর তাই পঞ্চম উপত্যকা, তখন আর পৃথিবী দেখা যায় না; ষষ্ঠ স্তরই পূর্ণ ত্যাগ···দুনিয়াবী কোন রকম আকর্ষণ-বিকর্ষণই আর রলোনা এবং সপ্তম উপত্যকা অর্থাৎ স্তরই হলো আত্ম বিনাশ। তখনই তারা সকলে সেই অপূর্ব সী-মোর্‌গের দেখা পেলো; কিন্তু তারপর! নিজেদের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে যে সী-মোর্‌গ্‌ শুধু সামনেই নেই, চারিদিকে, সকলে।

আত্তার সুফীদের সপ্তস্তর ভেদ করে' আত্মবিনাশ অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ্‌র স্তরে যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে একাকার হয়ে তাঁকে পাওয়া যায়, পাখী এবং সী-মোর্‌গের রূপকে তা-ই বুঝাচ্ছেন। তখন সী-মোর্‌গ্‌ শুধু সম্মুখেই থাকেনা, সর্বত্র; সকলের ভিতর দিয়েই তারই প্রকাশ। আর ঐ স্তরে স্থায়িত্ব অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বেই একমাত্র নিজের অস্তিত্ব কায়েম দায়েম হলেই হয় বাকাবিল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌তে স্থিতিবান হাল-হকিকত)।

এখন সপ্ত স্তরের সংগে আমাদের ব্যাখ্যাত সপ্ত আছমান-জমীন মিলিয়ে দেখুন, মিল এবং গরমিল আর কতোটুকু পান।

এ-কারনেই আর এক মরমী কবি জালাল উদ্দীন রুমী (১২০৭—১২৭৩ খৃঃ) তাঁর সুবিখ্যাত মারেফাতী মসনভি কাব্য গ্রন্থের ভনিতায় অতি বিনীতভাবে লিখেছেনঃ

হাফ্ত শহরে এশ্ক্ রা আত্তার গাশ্ত,
মা হনুয আন্দর গমাকে কু চা'য়েম।

আত্তার সাধনার সপ্ত রাজ্য (সপ্ত আছমান) প্রেমে পার হয়ে গেছেন; আর আমি এখনো আঁধার গলিতে ঘুরে মর্ছি।

বিজ্ঞান—বিশ্ব গোলক

(i) الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء

যিনি তোমাদের জন্য জমীন বানিয়েছেন ফরাস (বিছানা তুল্য) আর আকাশ (যেন) ছাদ। বাকারা ২২।

(ii) الشمس والقمر بحسبان

সূর্য ও চন্দ্র ঘুরছে।—রহমান ৫।

(iii) والشمس تجری لمستقر لها

এবং সূর্য ঘোরে তার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।—ইয়াছিন ৩৮।

(vi) لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولااللیل سابق النهار - و کل فی فلک یسبحون -

সূর্যের সাধ্য নেই যে চাঁদকে ধরে (চাঁদ ও সূর্যের সীমায় গিয়ে পড়তে পারেনা) এবং রাত্রিও দিনকে পার হয়ে যেতে পারে না; সব-কিছু শূন্য মণ্ডলে (যার যার পথে নিয়ম-নিগড়ে) সাঁতরে বেড়াচ্ছে।—ইয়াছিন ৪০।

মানুষ এখন শূন্যে উঠে গিয়ে পুরোপুরিই জান্তে পেরেছে যে পৃথিবীও মোটামুটি গোল, ফরাসের মতো চ্যাপ্টা নয় (পৃথিবীর চার দিকেই তো রকেটের ক্যাপসুলে চড়ে ঘুরেছে; এবং মোটা মুটি গোলাকার বস্তুরই চারি দিকে বৃত্ত কি উপবৃত্ত পথে ঘোরা যায়) এবং আকাশও ছাদ নয়, আর পৃথিবীই ঘোরে, পৃথিবীর সংশ্রবে সূর্য ঘোরেনা, চাঁদ অবশ্য পৃথিবীর উপগ্রহ ও পৃথিবীর চারদিকে

ঘোরে; সূর্যও ঘোরে, কিন্তু সে সকল গ্রহ-উপগ্রহ-শুদ্ধ অন্য কেন্দ্র-চারি দিকে বিরাট বিপুল অঞ্চলে ঘোরে, তা আমাদের পৃথিবী, কি অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে মালুম হবার কথা নয়, সম্পূর্ণ মহাজাগতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাপার ।

কিন্তু 'সূর্য ঘোরে' 'পৃথিবী স্থির' অর্থাৎ ঘোরে না ই'ত্যাকার মত-বাদ ধর্মের নামে ও মোহে প্রচারনার অভাব নেই, কারণ কি ? কারণ, ধর্মীয় ঐ সকল কথা যে ধর্মগ্রন্থে নেহাং ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ; সূর্যকে ঘুরতে দেখছি, সেই হিসাবে দুনিয়াবী ও ধর্মীয় কাযকর্ম করে যাচ্ছি, সেই চোখে দেখা দৃশ্যই ধর্মগ্রন্থাদিতেও বর্ণনা করা হয়েছে ; আকাশকে ছাদের মতো দেখছি আর পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে ফরাসের মতো পেয়ে কাযে খাটাচ্ছি—সেই সাধারণ বর্ণনাই ধর্ম গ্রন্থের লক্ষ্য। এই সব প্রাথমিক ব্যবহারিক সাধারণ জ্ঞান গুলোকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মনে করে' বিষম ভুল করা হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! এইসব সাধারণ বুদ্ধির ব্যবহারিক জ্ঞানগুলো বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিস্কৃত সত্য হবে কী করে ? হবেই না ; তথাপি ওগুলোকে বৈজ্ঞানিক বিশেষ জ্ঞানের সংগে তালগোল পাকিয়ে নতুন এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ খাড়া করবার কসরত করা হচ্ছে, বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞানের সত্য হিসাবে গ্রহণ করে অনেক স্বচ্ছ পানি ঘোলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, নিজেদের এ সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতার পরিচয় তো দেয়া হচ্ছেই, অনর্থক অকারণ প্রচারণার মারফত সাধারণ মানুষকেও কী রকম ঠকানটা ঠকানো হচ্ছে, আর এ সম্পর্কে তাদের কারো কারো আহরিত স্বল্প জ্ঞানকেও নস্যাৎ করে দিয়ে সকলকেই নিরর্থক নির্বোধ গোমরাহ্ বানানোর কোশিশ করা হচ্ছে, তা ক্রমে ক্রমেই মাত্র পরিস্কার পরিপূর্ণ বুঝতে পারবেন।

কিংবা মহাজাগতিক অর্থে সূর্যও তো ঘোরে, অপর অসংখ্য তারকার সংশ্রবে পরস্পর বিস্তর দূরত্ব বাঁচিয়ে মহাকর্ষে ঘোরে ;

ধর্ম গ্রন্থের 'সূর্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘোরে' আয়াত হয়তো সেই মহা ইসারাইংগিতই দিচ্ছে; সেটা বুঝতে না পেরে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যকে, তারকাগুলোকে কাল্পনিক ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে। ঐ চোখে দেখা সাধারণ বুদ্ধির ব্যবহারিক জ্ঞান গুলোকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে ঠাওরিয়ে কতো বড়ো মারাত্মক ভুল করা হচ্ছে, তা একে একে দেখে যান।

(১) চোখে দেখা ঐ নীলাঞ্চল কী? সূর্য রশ্মির প্রধান সাত রঙের আকাশী ও নীলের সমাহার, ঊর্ধস্তরের বায়ুমণ্ডল তা ধরে রাখে; বাকী রঙগুলো যথাক্রমে সবুজ, হলদে, বেগুনী, কমলা ও লাল বায়ু মণ্ডলে মিলিয়ে যায় (সংক্ষেপে ঐ সাত রঙ আ-স-হ-বে-নী-ক-লা)। ঐ সাত রঙ মিলেমিশেই হয় আবার সাদা। কোন কোন রকেট তো লাখলাখ, কি কোটি কোটি মাইল পার হয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে, কোথায় তবে সাত আছমানের পহেলা আছমান! এ বৈজ্ঞানিক জমানায়ও অসীম শূন্য মণ্ডলের রহস্য না জেনে, জানবার কিছুমাত্র কোশেশ না করে' কী তাজ্জব ব্যাপার করা হচ্ছে: ঐ চোখে দেখা দিনের নীল অঞ্চলকে মহাকাশের পহেলা আছমান ধরে' সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব সেই ছাদে খচিত, কি ঝুলানো মনে করা হচ্ছে। কী মারাত্মক গোমরাহী! কিন্তু রাত্রে তো আর নীল আকাশী রঙ থাকেনা, ক্রমে ক্রমে ফিকে, বেগুণী, অবশেষে কালো অর্থাৎ রঙহীন হয়ে যায়, সে দিকে লক্ষ্য নেই আদৌ, কী বুদ্ধি! আর অছমানের আসল রহস্য তো একটু আগেই দেখেছেন। পৃষ্ঠা... ৬—৯।

(২) পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুর্‌ছে কল্পনা করলে কী সাংঘাতিক মারাত্মক ভুলের সৃষ্টি হয় এবং প্রশ্রয় পায়, তা পুরোপরি বুঝতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব জান্‌তে হবে সর্ব প্রথম; আলোর গতি, পূর্বেই জেনেছেন, সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬২৮৪ মাইল; তাহলে মিনিটে ওর ৬০ গুণ, এবং পৃথিবীতে

সূর্যের আলো পৌঁছে প্রায় ৮⅓ মিনিটে অর্থাৎ ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে ; তাহলে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ঃ ১৮৬২৮৪ × ৬০ × ৮⅓ = ঐ প্রায়, ৯,৩০,০০,০০০ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ) মাইল ; সাধারণ অংকের ব্যাপার যা পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীরাও পারে।

এখন, ঐ প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরবর্তী সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরলে কী দাঁড়ায় তাই দেখুন ঃ

$$২ \Pi ব\ (ব্যাসার্ধ) = ২ \times \frac{২২}{৭} \times ৯,৩০,০০,০০০ = \frac{৪০৯২০০০০০০}{৭}$$

= ৫৮৪৫৭১৪২৮. প্রায় ৫৯ কোটি মাইল। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দূরত্বের তুলনায় নিতান্ত সামান্য অর্থাৎ মাত্র ৪০০০ মাইল বলে' এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি, কিন্তু বুঝবার সুবিধার জন্য প্রায় ৬০ কোটি মাইল ধরলে তাও আর হিসাবের বাইরে থাকেনা ; মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও এ অংক কষতে পারে।

পৃথিবী স্থির আর সূর্য ঘুরছে, তা হলে তাকে ঐ দূরত্ব বজায় রেখে দৈনিক ২৪ ঘণ্টায় ঐ প্রায় ৬০ কোটি মাইল উদয় অস্ত এবং পুনরুদয় পর্যন্ত ঘুরে আসতে হচ্ছে ; তারকা দল, ছায়াপথ এবং ছায়াপথের ওপারে চোখে দেখা যায় এমন তারকালোক যথা এনেড্রোমিডা, ম্যাগেলন প্রভৃতিকেও দৈনিক ঐ বিরাট বিপুল পথ প্রতি রাত্রে উদয় হতে ঘুরে' আসতে হচ্ছে ; গ্রহগুলোকে তো ঐ হারে ঘুরতে হচ্ছেই ; পৃথিবীর মতো ওদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড বসে' বসে' তামাক খাচ্ছে, আর অসংখ্য তারকাপুঞ্জ সহ বিরাট বিপুল ছায়াপথ ঘুরছে, সূর্য এবং গ্রহপুঞ্জ তো ঘুরছেই, এও কি সম্ভবপর ? না, দৈনিক ২৪ ঘণ্টায় আহ্নিক গতিতে প্রায় ১৬ লক্ষ মাইল করে' এগোতে এগোতে ষড়ঋতু চক্রে বারো মাসে বার্ষিক গতিতে পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঐ প্রায়

৬০ কোটি মাইল ঘুরে আসছে, তাই তার দৈনিক আহ্নিকগতিতে ঐ সূর্য, তারকাপুঞ্জময় ছায়াপথ, গ্রহপুঞ্জ, ছায়াপথের ওপারে দেখা হাজার হাজার ছায়ালোক (এন্‌ড্রোমিডা, ম্যাগেলন) প্রভৃতি সকলকে ঘুরে আসতে দেখছি, কোনটা সম্ভবপর এবং সত্য, বিচার করুন।

তবেই দেখুন, প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ গুণ বড়ো যে-সূর্য পৃথিবী, অপর গ্রহ সমুহ এবং উপগ্রহ গুলোকে পর্যায় ক্রমে এবং কখনো কখনো এক সংগে অফুরন্ত আলো ও তাপ দিচ্ছে, গরমে জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে এবং বাঁচাচ্ছে, সে যে ঐ চোখে-দেখা-মতো অতো টুকু ক্ষুদ্র নয়, হতে পারেনা, এতো টুকু বুদ্ধি বিবেচনায়ও আজো আমাদের কোন কোন শিক্ষিত লোকেরই হচ্ছেনা। আরো ঃ ঐ সূর্য গ্রহ-উপগ্রহ-সমুহের সংশ্রবে মহাকাশে মহাকর্ষে পরস্পর বিপুল দূরত্বে থেকে যে-তারকারাশি মিটি মিটি জ্বল্‌ছে, ক্ষীণ আলোক দিচ্ছে, তারাও আর অতোটুকু ছোট নয়; হতে পারেনা; বরং সূর্যের সমান, কি তার চেয়ে আকারে-প্রকারে বড়ো, কি কিছু ছোট, মোটেই ধারে ধারে নয়, কিংবা ছাদে খচিত নয়, কি ঝুলানো নয়, বরং অতি সুদূরের বস্তু-পিণ্ড বলে' অতো ক্ষুদ্র দেখায়; কাজেই, পৃথিবীর চার দিকে ঘুরতে পারে না, ঘুরছে না, বরং তাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র পৃথিবী তার পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে ঘুরে আস্‌ছে বলেই দূরত্ব আনুপাতিক ছোট আকৃতিরও তারতম্যে সূর্যের একই সমতলে তাদের দেখ্‌ছি এবং সূর্যের মতো ঐ প্রায় ৬০ কোটি মাইল দৈনিক ঘুরে আস্‌ছে বলে' মালুম হচ্ছে; তা পৃথিবীর দৈনিক ঐ প্রায় ১৬ লক্ষ মাইল করে' চলে' বার্ষিক ঐ প্রায় ৬০ কোটি মাইলের সমান, কিংবা তাদের এক একটির আলোক বর্ষের আসল দূরত্ব ধরলে দৈনিক কতো লাখ্‌লাখ কোটি, কি কোটি কোটি কোটি মাইল ঘুরে আস্‌তে হতো, তাও ঐ উপরের বৃত্ত, কি উপবৃত্ত-পরিধি বের করার ফরমুলা-মারফতই মাত্র আভাস

দেয়া যায়, অংকে কষা দূরুহ ; প্রাথমিক, মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রী তো দূরের কথা, কলেজ কি ইউনিভারসিটির অংকের ছাত্র-ছাত্রী, কি শিক্ষক-শিক্ষিকাকেও হিমসিম খেতে হবে ; কারণ, সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারকাই প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। আর এই চাঁদ কী ? পৃথিবীর একটি উপগ্রহ, পৃথিবীর প্রায় ৪৯ ভাগের এক ভাগ ; তাই, পৃথিবীর অভিকর্ষে (gravitation) তার চার দিকে ঘোরে, চোখে-দেখা-মতো অতোটুকু ক্ষুদ্র নয় নিশ্চয়ই—এই সব প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের অভাবও যে, কী মারাত্মক ভুলত্রুটি ঘটাতে পারে, তার এক জ্বল জ্বল নজির দেখুন জনাব অধ্যাপক মোহাম্মদ ছালামতুল্লাহ খান বি. এ. (অন্স), বি. এড্. এম. এ. (ডবল) সাহেবের উদ্ভট সব আবিস্কার-ভরা 'পৃথিবী স্থির' গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য, اقتربت الساعة وانشق لقمر —সময় এসে গেলো আর চাঁদ দুভাগ হয়ে গেল [ছুরা কমর]—আল্ কোর-আনের এ-ধরনের মোজেজা-মুলক আয়াত দেখিয়ে চাঁদকে অতি ক্ষুদ্র ঐ চোখে-দেখা-মতো ঠাহর করা হয়। ছালামতুল্লাহ সাহেব তাঁর থিউরি খাড়া করে' তা ঠিক রাখতে কোরআনের আরো অনেক আয়াত পেশ করেছেন। সে সব আয়াতের কতকের আসল তাৎপর্য এই গ্রন্থে এবং বাকী সকলের তাৎপর্য আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষ করে, সত্য দর্শন' গ্রন্থে দিয়েছি।

ঐ চাঁদ দুভাগ হওয়াটাই ধরুন। রছুলুল্লাহর (সঃ) জমানায়ও সেই জামানা-আনুপাতিক জোতির্বিজ্ঞান ছিলো. কিন্তু সাধারণ লোক ছিলো সকল বিষয়ে মোটামুটি অজ্ঞ ; রছুল (সঃ) ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞান গননায় ঐ রাত্রের অর্ধ চন্দ্রগ্রহণের বিষয় জেনেছিলেন, আগেই তা ঘোষনা করে' দিয়েছিলেন। কিংবা ঐরকম উন্নত-স্তরের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের থাকে কাশ্‌ফ্—অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তর্চক্ষে দর্শন (intuition); রছুল মকবুল (সঃ) সেই উপায়েই ঐ অর্ধচন্দ্র গ্রহণের বিষয় জেনেছিলেন, তা-ই বলে'

দিয়েছিলেন, এবং ঐ দিন-তারিখ-মতো তা দেখিয়েছিলেন। সকল মোজেজা কেরামতই যে এই রকম স্বাভাবিক সম্ভবপর পর্যায়ের তা আমরা এ প্রবন্ধে 'বিজ্ঞান বিবর্তন' প্রসংগে বিশেষভাবে বুঝিয়েছি, 'সত্য দর্শন' গ্রন্থে তো দিয়েছিই। দেখ্‌তে পারেন মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের ঐ মোজেজা-কেরামত-মূলক আয়াতের তরজমা তফসির বাংলায়, আর ইংরেজীতে দেখ্‌তে পারেন মরহুম মৌলানা মোহাম্মদ আলী এল. এল. বি সাহেবের কোরআন অনুবাদে।

তারকাগুলোর দূরত্ব, পূর্বেই বলেছি, অনেক বেশী; সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা আলফা সেণ্টরীই ২৫ লক্ষ কোটি মাইল দূরে, প্রায় ৪$\frac{১}{৪}$ আলোক বর্ষ; তার অর্থ আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল, তা হলে ঐ মিনিটে ওর ৬০ গুণ, ঘণ্টায় তার ৬০ গুণ, দিনে তার ২৪ গুণ, মাসে তার ৩০ গুণ এবং বৎসরে তার ১২ গুণ, এই হিসাবে ৪$\frac{১}{৪}$ আলোকবর্ষ লাগে ঐ সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকার আলোই আমাদের এই সৌরলোকে পৌঁছতে; এবং যে সব তারকা আমরা অন্ধকার রাত্রিতে দূরবীণহীন খালি-চোখেই দেখি তাদের আকারও তো সূর্যের মতো অতি প্রকাণ্ড কিংবা কোন কোনটা তার চেয়েও বড়ো; তাই অতি দূরে হলেও আমরা খালি চোখেই দেখি। এখন, সূর্যকে যদি প্রত্যহ তার প্রায় নির্দিষ্ট স্থানে পূর্ব আকাশে উদিত হতে দৈনিক প্রায় ঐ ৬০ কোটি মাইল ঘুরে আসতে হয়—তার অর্থ ঘণ্টায় প্রায় ২$\frac{১}{২}$ (আড়াই) কোটি মাইল পথ চলতে হয়—তা হলে সূর্যের মতো প্রকাণ্ড তারকাগুলোকে ঘণ্টায় কতো কোটি মাইল বেগে এবং দৈনিক কী হারে দৌড়লে প্রতি সন্ধ্যায়, কি রাতের কোন এক সময়ে প্রত্যহ আমরা আকাশের প্রায় একই স্থানে পেতে পারি, চিন্তা করুন; তারপর, যেগুলি সূর্যের চেয়েও প্রকাণ্ড তাদের গতি-বেগ কতো প্রচণ্ড হলে আমরা ঐভাবে প্রত্যহ প্রায় নির্দিষ্ট স্থানে তাদের আকাশে দেখ্‌তে পারি সেও

চিন্তা করুণ। আর ছায়পথ? তারকাদের সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে বিরাট বিপুল ছায়াপথ, বরং জানা অজানা সকল তারকাই স্ব স্ব মহিমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার অভ্যন্তরে, আর সে শাহান শাহের মতো জ্যোতিষ্ক, গ্যাস-ধূলি-মেঘ প্রভৃতি ভরা; আমাদের এই তারার সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ব্যাস প্রায় ১,২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) আলোক বর্ষ; এবং সব চেয়ে ছোট ব্যাস প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) আলোক বর্ষ; তা হলে প্রত্যহ কি হারে দৌড়লে প্রতি অন্ধকার মেঘ-মুক্ত রাত্রে কোন এক সময়ে তাকে আকাশের প্রায় একই জায়গায় পেতে পারি, অঙ্ক কষে' বের করুণ তো!

ছালামতুল্লাহ সাহেব এ-সব সমস্যার বাড়ীর ধার দিয়েও যান নি, বরং তাঁর সৃষ্ট উদ্ভট গোঁজামিল দূর করতে, তারকাদের, মনে পড়ে সূর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশী দৌড় খাইয়ে সেরেছেন; কিন্তু তারা কি অতোটুকু? এবং কোন্ কোন্ আছমানে তাদের কোন্ কোন্‌টা—যদি তাঁর কথিত মতে আছমানের পর আছমান—এবং সপ্ত আছমান থেকেই থাকে?—কিন্তু তারপর? ছায়াপথ? সে আবার কোন আছমানে? পৃথিবীর তুলনায় যে সে বিরাট বিপুল, সেতো চোখেও দেখা যায়, কিভাবে তা হ'লে তাকে নিত্য অন্ধকার মেঘ-বিহীন রাত্রে আকাশের ঐ প্রায় একই স্থানে পাওয়া যাবে? পৃথিবী যদি স্থির হয় তবে তা কি সম্ভবপর?

কোন গোঁজামিলের নিরসন করতে না পেরে তিনি শেষমেশ আশ্রয় নিয়েছেন আল্লাহর কুদরতের পক্ষপুটে; এবং তাতে করেই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাতে করে বিজ্ঞান যে ঐ নস্যাৎ হচ্ছে না, বরং আল্লার কুদরতই যে বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলোরও মূল, তা তো ঐ উপরেই দেখলেন।

ধ্রুব এই সৌরলোক থেকে প্রায় ৪৭ আলোক বর্ষ দূরে, দেখি তাই অতি ক্ষুদ্র; অথচ সে আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়ো; কিন্তু ধ্রুব একটি নয়, অনেক; এ-সম্পর্কে আমাদের দেশের

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ জনাব আবদুল জব্বার এম, এস, সি সাহেব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর সুবিখ্যাত আকাশ বিজ্ঞানের বই 'খগোল পরিচয়ে' ৭ম পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা-ই তুলে দেই :

"বর্তমানে যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি সেটি অতি সাধারণ একটি মাত্র তারা ছিল। সেও ড্রাগনের লেজের সেইতারা আলফা ড্রাকোনিসের চারদিকে ঘুরতো। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ এই তারাটিকে বল্‌তেন কংস এবং আরবীয়গণ এর নাম দিয়েছিলেন থুবআন ثعبان ; এই নাম থেকে বর্তমানে এর পাশ্চাত্য নাম হয়েছে থুবান (Thuban)। এই তারাটি যখন আকাশের ধ্রুব তারা ছিল, তখন মিশরের ফেরাউন রাজাগণ পিরামিড তৈরী করেছেন, চীনের সম্রাটগণ ড্রাগন পূজায় মত্ত আছেন। আবার এখন থেকে পাঁচ হাজার বৎসর পরে যে-তারাটি ধ্রুবতারা হবে, বর্তমানে সেটি অন্যান্য তারার মতই ঘুরছে (এবং পৃথিবীর ঘুর্ণনেও তাদের ঘুরে আসতে দেখছি)। সেটি শেফালী (Cepheus) মণ্ডলের দ্বিতীয় তারা বিটাসিফি। বারো হাজার বৎসর পরে বীণা (lyra) মণ্ডলের অভিজিত (vega) আকাশে ধ্রুব তারা হয়ে দেখা দেবে। * * * * * প্রায় ২৬০০০ হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর অক্ষ পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসে এবং আকাশের মেরুবিন্দুও ঐ সময় একটি সম্পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করে। সে জন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন তারাকে ধ্রুব তারা রূপে দেখা যায়।"

আমাদের এই সৌরলোক এবং দেখা-না-দেখা সকল সৌর লোকই ঘুরছে ; ধ্রুবও যুগে যুগে অপর তারকালোকের চারদিকে ঘোরে ; সৌরলোকগুলোর অবস্থানই এই রকম যে, তার কোন গ্রহ উপগ্রহ থেকেই তাদের সূর্যের ঘুর্ণন বুঝা যাবে না ; (বলা বাহুল্য, পূর্বেই বলেছি, সব তারকাই এক একটি সূর্য এবং আমাদের সূর্য একটি মাঝারি তারকা মাত্র)। আমাদের পৃথিবীর অবস্থান আবার এই রকম যে, তার অক্ষের উপর আবর্তনে পূব পশ্চিম

উত্তর দক্ষিণের সকল তারকা পুঞ্জকে, কি বিচ্ছিন্ন তারকাকে পৃথিবীর পূবদিক দিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে আসতে দেখছি * কারণ, পৃথিবী ঘোরে পশ্চিমদিক থেকে পূবে ; অবশ্য, পৃথিবীর প্রত্যহ ১৬লক্ষ মাইল করে' অগ্রগমনের ফলে সকল তারকারই অবস্থান পশ্চিম দিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে কিঞ্চিৎ এগোয় ; তাই, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে তাদের দেখি, এবং একেবারে পশ্চিম প্রান্তে সরে' গিয়ে এক সময় অনেক দিনের জন্য অস্তমিত হতে দেখি ; আবার, ঐ ঘূর্ণনের ফলেই পূর্ব দিকে নূতন তারকারা দৃষ্টিপথে এসে যায় ; কিন্তু ধ্রুবের এই সূর্যের তুলনায় অতি প্রকাণ্ডতা, প্রচণ্ডতা ও প্রতাপশালিতার কারণে এবং পৃথিবীর অবস্থান উত্তর মেরু অঞ্চলে ধ্রুবের ঠিক নীচে এবং ধ্রুব পৃখিবীর থেকে ঠিক মাথার উপরে হওয়ায় পৃথিবীর মেরুদণ্ড আবর্তনে ধ্রুব কখনো পৃথিবীর উত্তরের পূব দিকে সরে', কখনো উত্তরের পশ্চিম দিকে সরে' উদয় হয় ; এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরলেও ধ্রুব থেকে অতি দূরত্বের কারণে (ঐ প্রায় ৪৭ আলোক বর্ষ) এবং তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় (মাত্র একটি ক্ষুদ্র সুপারি-দানা-তুল্য) তার বার্ষিক আবর্তনে মাত্র ঐটুকু হেরফেরই ধ্রুবের সংশ্রবে দেখছি ; জনাব সালামতুল্লাহ্ সাহেব এই সহজ অঙ্কের ব্যাপারটাও বুঝতে না পেরে পৃথিবী ঘুরলে সে সব সময়ে ধ্রুবের থেকে ঐ একই দিকে

---

*মহাশূন্যে আসলে দিক বলেও কিছু নেই, দিবা রাত্রি বলেও কিছু নেই, কেবল গ্রহদের সূর্যের চারদিকে এক এক প্রকার ঘূর্ণনের ফলে এক এক গ্রহে এক এক রকম দিগদর্শন, দিবা রাত্রি ; আবার গ্রহদের চারদিকে উপগ্রহদের ঘূর্ণনের ফলে উপগ্রহের ঐ রকম বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন, দিবা রাত্রি। পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে সূর্যের উদয় অস্ত ধরে' যথাক্রমে পূব পশ্চিম ; এবং ডান হাতের দিক দক্ষিণ, বাম হাতের দিক উত্তর। মাথার উপর দিক ধরছি উর্ধ, পায়ের নীচের দিক অধঃ, এবং উত্তর-পূব, পূব-দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম কোণ যথক্রমে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ু।

থাকে কী করে' ইত্যাদি বলে' চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন বলেই—ধ্রুবের সম্পর্কে এতগুলি কথা বলতে হলো।

যা হোক অপর তারকালোককে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারনেই দৈনিক এবং বাৎসরিক ঘুরে আস্‌তে দেখছি, অবশ্য স্থান পরিবর্তন করে' করে'। কিন্তু ধ্রুবের আকর্ষণে (১) পৃথিবীর প্রায় ৬৬½ ডিগ্রী কোণ করে' প্রায় ২৩½ ডিগ্রী কাৎ হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে সূর্যের আলো কখনো সোজাসুজি পেয়ে পাচ্ছি গ্রীষ্মকাল; কখনো তের্‌ছা পেয়ে পাচ্ছি শীতকাল—আর অন্যান্য আনুপাতিক ঋতু—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—যে অঞ্চলে যখন যেমন পড়ছে সূর্যালোক। আরো: পৃথিবীর ঐ কাৎ হয়ে সূর্য ও ধ্রুবের যুগপৎ আকর্ষণে তুলনায় অতি নিকটবর্তী (মাত্র ৮⅓ মিনিট) সূর্যের চারিদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার ফলেই পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উপরও যথেষ্ঠ প্রভাব পড়েছে; হাজার হাজার বৎসর পরে অন্য ধ্রুব নক্ষত্রের ঐ রকম আকর্ষণে পৃথিবীর কী কী হাল হাকিকত হবে, কি এই রকম হাজার হাজার বৎসর আগে অন্য ধ্রুবনক্ষত্রের অনুরূপ আকর্ষণে কী কী হাল হাকিকত ছিলো, এখন প্রায় সঠিক তা বলেই দেয়া যায়। অতএব এ-সকলই বিজ্ঞানের অংকের হিসাব নিকাশ ও মাপজোপের ব্যাপার। অবিজ্ঞানীর অংক সম্বন্ধীয়

---

(১) সপ্তর্ষিকে ঘুরতে দেখছি একবার ধ্রুবের এপাশে আর একবার ওপাশে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারনেও এপার্শ্ব পরিবর্তন দেখা যেতে পারে, কিন্তু প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো সপ্তর্ষির ঐ চোখেদেখা সাতটি তারার মাথার দিকের দুটি তারা যদি ধ্রুবের অন্তর্ভেদী টানে না হয় তা হ'লে কেন যে সব সময়ে আর সবাইকে নিয়ে ধ্রুবের প্রায় এক্ই সরল রেখায় শোয়া, বসা, খাড়া, মাথা উপর দিকে, নীচে প্রভৃতি বিভিন্ন কায়দায় সারা বৎসর ঘুরপাক খাচ্ছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় কি? যায় না।

এ-হিসাব-নিকাশের মাপজোপের ব্যাপারে নাক গলাতে আসায় আসলে হয় হাস্যকর প্রলাপোক্তি, কি কিস্‌সা-কাহিনী তৈয়ার।

ধরুন, সূর্যকে যে আমরা দৃশ্যতঃ ঐ ঘুরে আস্‌তে দেখ্‌ছি তা-ই সত্য, তাহলে তাকে যে প্রতি ঘণ্টায় ঐ প্রায় ২½ আড়াই কোটি মাইল করে' ঐ প্রায় ৬০ কোটি মাইল ঘুরে আসতে হচ্ছে তাওতো সত্য; সূর্যকে ঠিক অতোটুকুই মনে করে' এবং সে যে পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহকে আলো দিচ্ছে, গ্রীষ্মে জালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে এবং বাঁচাচ্ছে, এসব দিকে আল্লাহর কুদরতি অবদান চক্ষুদুটোকে এবং বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনার অপর সকল দুয়ারগুলোকে বন্ধ করে' রেখে' আল্লাহ্‌র কুদরত ঠাওড়িয়ে না হয় সবই স্বীকার করে নিলুম; কিন্তু তারপর? গ্রহগুলোকেও ঠিক অতোটুকুই এবং চন্দ্রকেও দৃশ্যতঃ অতোটুকুই মনে করতে হবে এবং সবই আল্লাহর কুদরত? (২)

সূর্য প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২½ আড়াই কোটি মাইল করে' দৈনিক প্রায় ৬০ কোটি মাইল ঘুরলো, কিন্তু চন্দ্র? সেত তো ঘণ্টায় প্রায় ২৫২০০ মাইল করে ঘুরছে (সেকেণ্ডে প্রায় ৭ মাইল × ৬০ গুণ মিনিটে × ৬০ গুণ ঘণ্টায় = ২৫২০০ মাইল)। চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল।

---

(২) কিন্তু বিরাটত্ব এবং বিশাল এলাকা নিয়ে সূর্য, তারকা, গ্রহ-উপগ্রহের বিভিন্ন রকম ঘুর্ণন তো আরো বেশী কুদরত! বৈজ্ঞানিকেরা কেবল আল্লাহ্‌র সেই কুদরত আবিষ্কার করে চলেছেন, আর তাতে করে আসলে আল্লাহরই অনন্ত অসীম মহিমা গরিমা কিছু কিছু প্রকাশ করে' দিতে পারছেন, পৃথিবীর অন্য কোন জীবের নয়, কেবল মানুষের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সেই বিরাট বিপুল রহস্য বুঝবার শক্তি সেও তো সেই অনাদি অনন্তের দান এবং তাঁরি কুদরত! সেদিকে জ্ঞানের সব অলিগলি বন্ধ করে' থুয়ে মিছেমিছি কাল্পনিক অতি ক্ষুদ্র কুদরত কুদরত করছেন এ সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অপোগণ্ড কিছু কিছু লোক।

( ) তা হলে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয় কী করে’? চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি আসলে কী? সূর্যের আলোতে গোলাকার চাঁদের আলোকিত অর্ধেকের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, তা ই হলো চাঁদের কলা। এখন, পৃথিবী যখন ঘোরেনা, সূর্য এবং চন্দ্রই যখন ঐ যথাক্রম হারে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তখন চন্দ্রের পৃথিবীর চারদিকে এবং পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘোরার ফলে পৃথিবীর দিকে ফিরানো চাঁদের পিঠের যেদিন যেটুকু সূর্য-আলোক-পাওয়া অর্ধাংশের দেখতাম, তাইতো ছিলো চাঁদের কলা, তাতো আর দেখিনা, কারণ পৃথিবীর ঐ আড়াল আবডাল অর্থাৎ বাধাদান তাতো আর নেই; তা হলে একটু একটু করে প্রতিদিন পৃথিবীর সরে যাওয়ায় অর্থাৎ আড়াল আবডাল কমে যাওয়ায় চাঁদের কলার যে ক্রমবৃদ্ধি তা আর হয় না; আবার ঐ একই কারণে চাঁদের এই পিঠের একটু একটু করে’ পৃথিবীর আড়ালে আবডালে চলে যাওয়ার ফলে সূর্য-আলোক-পাওয়া অর্ধাংশের আলো দেখতে যে অসুবিধা ছিল অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ চাঁদের কলার হ্রাস হচ্ছে তাও আর হয় না; তার অর্থ চন্দ্রকলার পুরো বৃদ্ধিতে প্রতি ১৪ দিন পর পূর্ণিমাও আর হয় না। আবার প্রতি ১৪ দিন পর পৃথিবীর আড়ালে আবডালে পৃথিবীর দিকে ফিরানো চাঁদের পিঠ সম্পুর্ণ চলে যাওয়ার ফলে অমাবস্যাও আর হয় না; কিন্তু এ সবই যে হচ্ছে; আবার, চন্দ্র ও পৃথিবীর ঐ আলাদা ঘূর্ণনের ফলে কোন কোন পূর্ণিমায় সূর্যের একই সরল রেখায় অর্থাৎ সমান্তরালে—মাঝখানে—পৃথিবী এসে পড়ায় সূর্য কিরণ পেতে সাময়িক বাধা হওয়ায় যে চন্দ্রগ্রহণ এবং অমাবস্যায় পৃথিবী ও সূর্যের একই সরল রেখায় অর্থাৎ সমান্ত-রালে—মাঝখানে—চন্দ্র এসে পড়ায় তার ছায়াপাতে যে সাময়িক সূর্য-আলোক পেতে বাধা হয় অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ হয়, তাও চন্দ্র ও সূর্যের পৃথিবীর চারদিকে ঘুর্ণনের ফলে আর হয় না; কিন্তু চন্দ্র

গ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এ দুইই যে হচ্ছে। আর তা পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্রের পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে।
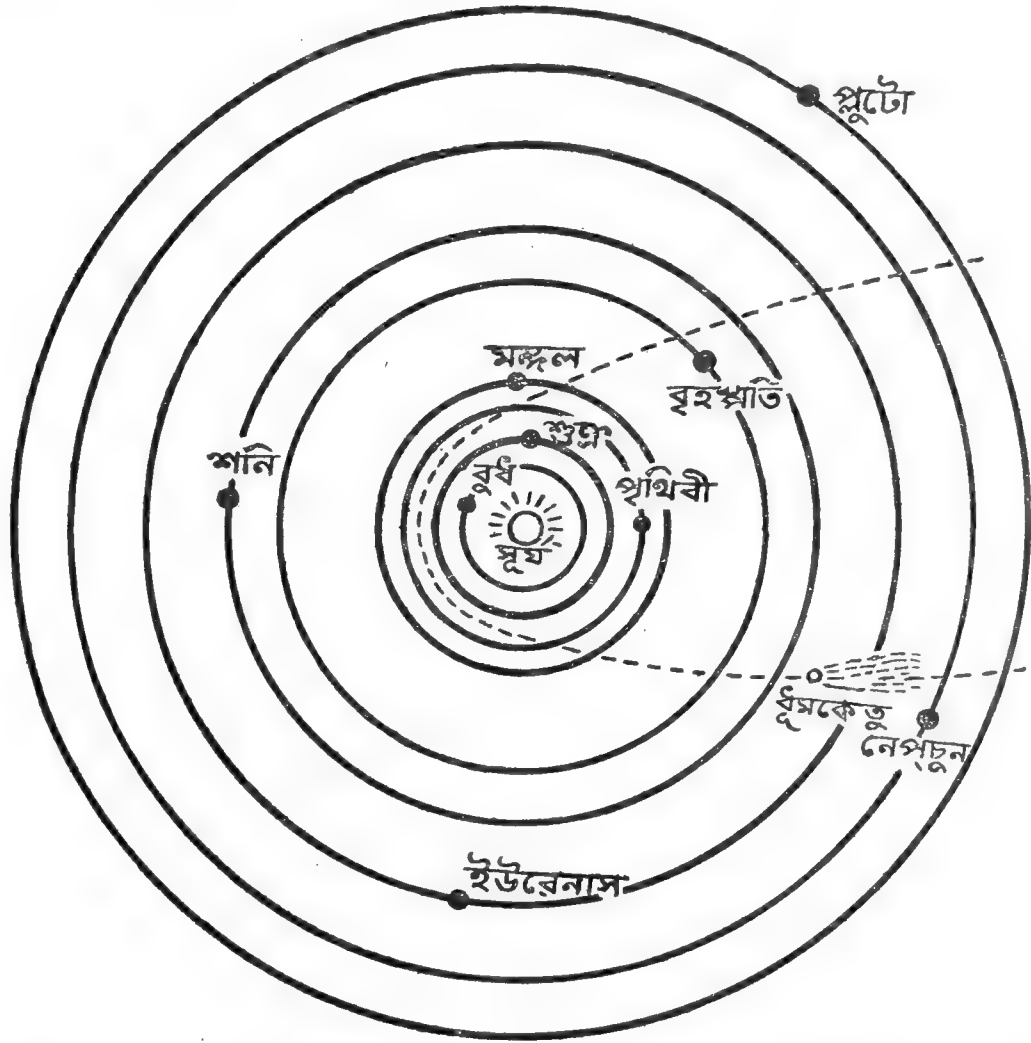
আরো: এটা তো সত্য যে প্রায় ২৯½ দিনে চান্দ্রমাস, আর প্রায় ৩০।৩১ দিনে সৌর মাস; চান্দ্র বৎসর প্রায় ৩৫৫ দিনে, সৌর বৎসর প্রায় ৩৬৫ দিনে, প্রায় ১০ দিনের তফাৎ। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই যদি পৃথিবীর চারদিকে ঘুর্তো, তা'হলে সূর্যকে দৌড়তে হতো ঘণ্টায় প্রায় ঐ ২৫০০০০০০ (২½ আড়াই কোটি) মাইল করে', আর চাঁদ তো দৌড়চ্ছেই প্রায় ২৫২০০ মাইল করে ঘণ্টায়; এখন, ঐ ঘূর্ণন যদি অমাবস্যার থেকে অর্থাৎ সূর্য, তারপর চন্দ্র, তারপর পৃথিবী—পরস্পর দূরত্ব রেখে এই অবস্থান থেকে—শুরু হতো, তাহলে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থানে মাসিক ঐ যথাক্রমে প্রায় ঐ ২৯½ (চান্দ্র মাস), আর ৩০।৩১ দিন সৌর মাসের

মধ্যবর্তী সময়ের অর্থাৎ কখনো ৩০ − ২৯½ = ½ অর্ধ দিন, কখনো ৩১ − ২৯½ = ১½ দেড় দিনের মাত্র তফাতে যতোটুকু সূর্য-কিরণ-প্রতিফলন চন্দ্রে দেখার ততোটুকুই মাত্র প্রত্যহ দেখা যেতো; তার অর্থ অমানিশার পর চন্দ্রে প্রতিফলিত সূর্য কিরণ কিছুটা মাত্র ক্রমশঃ বাড়তো। আবার, পূর্ণিমার থেকে অর্থাৎ চন্দ্র, তারপর পৃথিবী, তারপর সূর্য—পরস্পর দূরত্ব রেখে এই অবস্থান থেকে—দৌড় শুরু হলে চান্দ্র ও সৌর দিনের ঐ কিছুটা তারতম্যে পূর্ণিমার চেয়ে কিছুটা কম কম সূর্য কিরণ-প্রতিফলন প্রত্যহ চন্দ্রে দেখা যেতো, সামান্যই মাত্র ক্রমশঃ কমতো; আর চন্দ্র তো সূর্যের আলোকেই আলোকিত হয়, তার নিজস্ব কোন আলোক নেই, তাতে করে' ১৫ দিনে পুনরায় ঐ অমানিশা, কি পুনরায় ১৫ দিনে ঐ পূর্ণিমা হবে কী
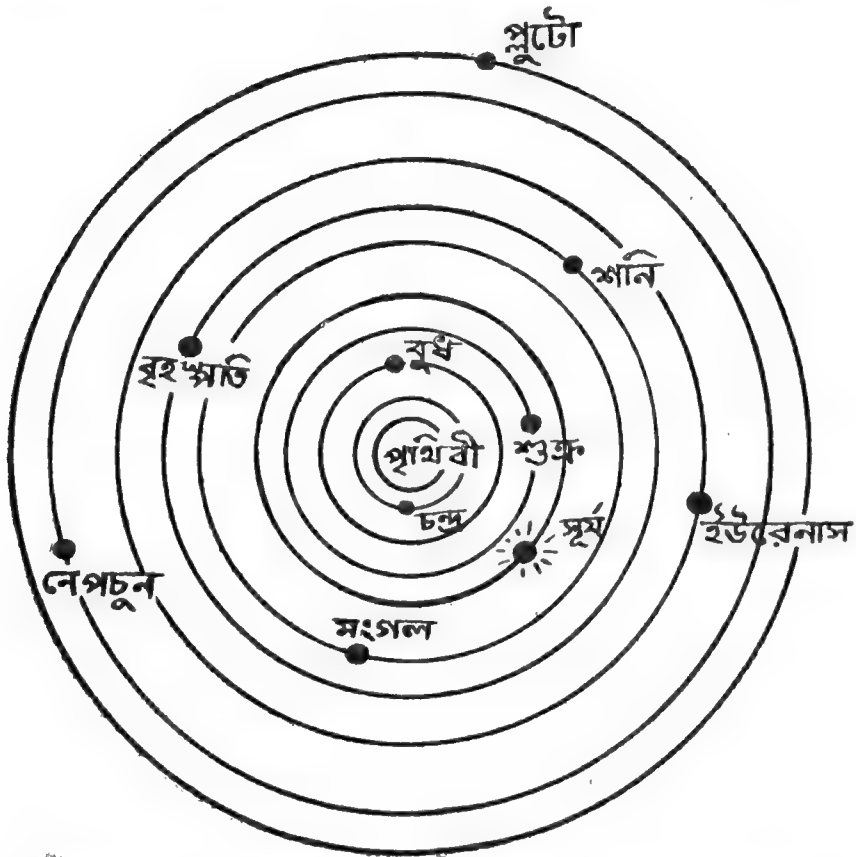
করে? হতোই না। বর্তমানে প্রায় ১০ দিনে আমরা চন্দ্রকলার যে পরির্তন দেখতে পাই, সারা বৎসর মাত্র ততোটুকুই দেখা যেতো; পাক্ষিক অর্থাৎ ১৫ দিনের পরিবর্তন হতো তা'হলে প্রায় দেড় বৎসরে; তার অর্থ ঐ পূর্ণিমা থেকে ঘুর্ণন শুরু হলে প্রায়

তিন বৎসর পরে হতে পারতো ফের পূর্ণিমা এবং অমাবস্থার থেকে ঘূর্ণন শুরু হলে প্রায় তিন বৎসর পরে হতে পারতো পুনঃ অমাবস্থা।

কাজেই পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে বন বন করে লাটিমের মতো ঘুরছে, চন্দ্র আবার পৃথিবীর চারদিকে ভো ভো করে ঘুর্ছে, তাতে করেই চন্দ্রের ঐ নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করি; আর তাতে করেই আমরা সূর্যসহ অপর সকল জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে দেখ্ছি; চলন্ত ট্রেনে বসে যেমন আমরা বাইরের গাছ-পালাকেই ট্রেনের উল্‌টো দিকে দৌড়তে দেখি, ট্রেনটিকে অচল মা'লুম হয় এও তেম্‌নি।

চাঁদ এক পিঠ দেখিয়ে দেখিয়ে প্রায় ২৯½ দিনে এক সংগে তার অক্ষ আর কক্ষ আবর্তন করে। এর মধ্যেই চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে একবার হয় অমাবস্থা, আর একবার হয় পূর্ণিমা; অমাবস্থায় চাঁদ—সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে থাকে; চাঁদের অপর পিঠে পুরো সূর্যের আলো পড়ে অর্থাৎ সে পিঠে পূর্ণিমা; আবার, পৃথিবীর থেকে দেখা পূর্ণিমার সময়ে পৃথিবী থাকে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে, পৃথিবীর দিকে ফিরানো চাঁদের পিঠে পুরো সূর্যের আলো পড়ে, কিন্তু অপর পিঠে আদৌ আলো পড়ে না বলে' সেখানে অমাবস্থা। আসলে প্রায় ১৪ দিন ধরে' প্রায় গোলাকার চাঁদের তুই পিঠই ক্রমান্বয়ে সূর্যালোক পায়, আবার প্রায় ১৪ দিন ধরে' তুই পিঠই ক্রমান্বয়ে সূর্যালোক পায় না; চাঁদের দিন রাত এইভাবে প্রায় ১৪ দিন করে' করে'। প্রতিপক্ষেই অন্ততঃ একবার করে' ত্র্যহস্পর্শ অর্থাৎ তিন তিথির একত্র সমাবেশ হয়ে পড়ে, তাতে করেই দিন-রাত্রি ঐ প্রায় ১৫ দিন করে না হয়ে প্রায় ১৪ দিন করে' হয়। চাঁদ ও পৃথিবীর পৃথক ঘূর্ণনের ফলেই পৃথিবীর দিকে ফিরানো চাঁদের পিঠে তিন তিথির কিছু কিছু যোগাযোগ হয়ে যায়, হয় ত্র্যহস্পর্শ; আবার, ঐ পৃথক ঘূর্ণনের ফলেই পৃথিবীর থেকে চাঁদের

ঐ পূর্ণ দিন পূর্ণিমা ছাড়া দেখা যায় না ; শুক্লপক্ষে আড়াল আবডাল কাটিয়ে কাটিয়ে চাঁদের এ পিঠ একদিন সূর্যালোকে ভেসে ধরা দেয়, হয় পূর্ণিমা। কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের সূর্যালোক আড়ালে আবডালে চলে যেতে যেতে এক দিন পুরো চলে যায়, হয় অমানিশা।

চন্দ্র সেকেণ্ডে প্রায় ৭ মাইল, আর পৃথিবী সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল করে' ঘুরে ; বর্তমান রকেটের গতিও সেকেণ্ডে ঐ প্রায় ৭ মাইল ; তার ফলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে সে চন্দ্রে নাম্‌তে পারে ; উভয় পৃথিবী ও চাঁদের ঐ বিভিন্ন দিকে ও কায়দায় ঘোরাফিরার ফলে ঐ নামবার প্রায় সঠিক দিন, তারিখ সময় ও স্থান বিজ্ঞানীরা আগেই বলে দিতে পারেন, বলে দেন। রকেটের ঐ প্রায় ৭ মাইল করে' সেকেণ্ডে গতি বাড়ানো সম্ভবপর হওয়ায় অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ২৫০০০ মাইল গতি হওয়ায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে এবং ছাড়িয়ে শুধু চাঁদে কেন, মংগল, শুক্র, বুধ, শনি, বৃহস্পতি প্রভৃতি যে কোন গ্রহে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে এবং পৃথিবী ও অপর গ্রহগুলোও সবাই ঘুরে বলে তার অবস্থান ও কাল নির্ণয় সম্ভবপর হয় ; আগেই কতকটা বলে দেয়া সম্ভবপর হয়। আর ঐ কারণেই সূর্যের আর এক ক্ষুদে গ্রহ হয়ে কতক রকেট তো সূর্যের চারদিকে ঘুরছেই। ভেঙেচূরে শূন্যে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুরবেই।—'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধ দেখুন।

(২) গ্রহরাও ঐ অতোটুকু এবং পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে (?)। তাহলে তারাও তো সূর্যের থেকে এবং পৃথিবীর থেকে যার যার দূরত্ব বজায় রেখে ঐ একই হাল-হকিকতে অবস্থান করতো ; কিন্তু তা করে কি? করে না ; এখন যে সূর্যের উদয়-অস্তের সংগে সমতা বজায় রেখে পৃথিবী ও তাদের ঘূর্ণনের ফলে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যালোক পেয়ে উদয় হয়, দেখা দেয় অর্থাৎ আমরা দেখ্‌ছি এবং অস্ত যায় অর্থাৎ দেখ্‌ছি না, তা আর হতো না ; কিন্তু তাইতো হয়।
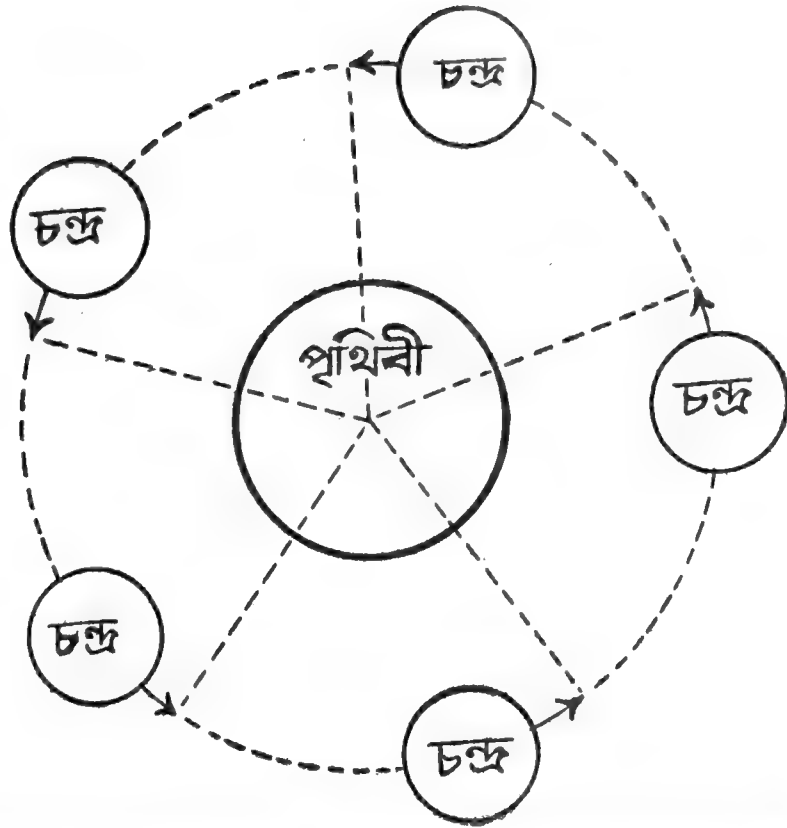
পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধারণায় এরূপে বিজ্ঞানের আবিস্কৃত কোন সত্যই মিল্‌বে না ; চোখে দেখা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র কারো সারা বছরের কার্যকলাপের কোন ব্যাখ্যাই আর পাওয়া যাবে না।

ঐ সব বিজ্ঞানী অংকের হিসাব-নিকাশ না জানার দরুণ না হয় অতি আজে-বাজে বলা সম্ভবপর হয় এবং সূর্যের চোখে-দেখা ভ্রম-উৎপাদক ঘূর্ণন দেখে ভুল করাও স্বাভাবিক ; কিন্তু গ্রহরাও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে এবং পৃথিবী একটি গ্রহ নয় ছালামতুল্লাহ সাহেব এ সব কি বলছেন ? পৃথিবীটা গ্রহ নয়, তবে কি ? সকল বস্তুপিণ্ডেরই মূল উপাদান পরমাণু এবং তার অতীত অতিপরমাণু—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ; সূর্যের চারদিকে গ্রহদের ঘূর্ণনের মতো নিউট্রন-প্রোটনের চারদিকে ইলেকট্রন ঘুরছে, এবং পৃথিবীর ঐ শেষ পরিণতি ও সূর্যের নিজের প্রকৃতি বা প্রাপ্ত অবস্থা ঐ-ই ; পৃথিবী জুরিয়ে বর্তমান অবস্থা পেয়েছে। গ্রহরাও তো জুরিয়ে কম-বেশী তা-ই হয়েছে, কি হচ্ছে ; পদার্থ এবং পদার্থ-মূল যখন একই, তখন তারাও পৃথিবীর মতো বস্তুপিণ্ড

ছাড়া আর কী ? এবং পৃথিবীও যখন তাদের একই পদার্থ পদার্থাতীত অতিপরমাণুর ক্রম স্থূলতা-প্রাপ্তি, তখন সেও তাদের মতো গ্রহ ছাড়া আর কী ? এবং গ্রহরা যখন সবাই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন পৃথিবীও ঘুরছে। এও সত্য—সূর্য যখন গ্রহগুলোর তুলনায় বিরাট বিপুল, তখন তার বিপুল আকর্ষণে তারাই তো ঘুরবে, সূর্য তাদের চারদিকে ঘুরবে কি প্রকারে ? আর এসেছে তো সবাই সূর্য থেকে। গ্রহরা সবাই সূর্যের আলোক পায় বলে' উজ্জ্বল দেখায় এবং পৃথিবী আর তাদের ঘূর্ণনের ফলেই বৎসরের কোন কোন সময় খালি চোখেই তাদের কোন কোনটিকেই দেখা যায় ; তারকাসমুহের ভিতরে অনুক্ষণ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে তাদের দেখি অতি মিট মিট করে জ্বলতে, আর গ্রহদের মধ্যে অনুরূপ বিস্ফোরণ নাই বলে দেখি স্থির জ্বলতে, তাতে করেই তাদের চেনা যায় এবং বুঝা যায় তারা সূর্যালোক পেয়ে তা-ই আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে, যেমন পৃথিবী সূর্যালোক পেয়ে তাই তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে ; এখন, পৃথিবীও যখন গ্রহদের মতোই সূর্যালোক পাচ্ছে, তখন পৃথিবীও তো তাদেরই মতো একটি গ্রহ ; আরো ঃ তারা পয়দায়েশ সূর্য থেকে, আলো পায় সূর্যের, আর মাথা-তামাক খায় পৃথিবীর অর্থাৎ ঘুরে পৃথিবীর চারদিকে ? কী আশ্চর্য গবেষণা !

আর কতো হাস্‌বো ! এবারও কি যুক্তি সঙ্গত জবাব না পেয়ে আল্লাহর কুদরতের পক্ষ পুটে আশ্রয় নেবেন ? কিন্তু তাতে করেও কি ভবী শেষ রক্ষা পাবে ? আদৌ নয়। কারণ, এ হচ্ছে দুই আর চার যে অংক শাস্ত্রের, বিজ্ঞানের সেই শাখারই নিখুঁত হিসাব, মাপজোপ অর্থাৎ জ্যামিতি, পরিমিতি, গণিত—বীজ গণিত ; একটুও এদিক ওদিক হবার নয়, হয়ই না। এবং তাই আসলে আল্লার কুদরত !

যা হোক, ঐ (iv) কুল্লু ফি ফালাকে ইয়াছবাহুন—সব কিছু শূন্য মণ্ডলে সাঁতরাচ্ছে—অর্থাৎ ঘুরছে (ইয়াছিন ৪০) আয়াতই প্রমাণ

করে' দিচ্ছে যে, পৃথিবীও সব কিছুর বাইরে নয়, শূন্যমণ্ডলে এবং ঘুরছে ; কারণ, শূন্যমণ্ডলে সাঁতার কাটা মানেই ঘূর্ণন ; কেননা, মহাকাশের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্যের পারস্পারিক মহাকর্ষ-জাত আয়তক্ষেত্রে না ঘুরে কারো উপায় নেই, তা দেখুন, 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধেও পরিপূর্ণভাবে। অতএব মহাকাশও ছাদ-টাদ কিছুই নয়, মহাশূন্য মণ্ডল, এবং সূর্য, নক্ষত্র, সবই পরস্পর অভিকর্ষে (gravitation) সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়িয়ে এক এক আপেক্ষিকতায় ঘুরপাক খাচ্ছে, চল্‌ছে ; পৃথিবী, কি অপর কোন গ্রহ-উপগ্রহের সংশ্রবে তারা ঘুরছে না, গ্রহরা এক এক সূর্যের চারদিকে ঘুরছে বটে, চন্দ্ররা (উপগ্রহরা) যার যার গ্রহের চারদিকে ঘুরছে।

ছালামতুল্লাহ্ সাহেবের ঐ 'পৃথিবী স্থির' গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে লিখেছিলাম 'পৃথিবী ঘোরে' শীর্ষক একখানি পূর্ণাংগ গ্রন্থ। পাণ্ডুলিপিটি—ভূমিকার জন্য—দেখতে দিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের জনৈক প্রোফেসর সাহেবকে ; তিনি লিখ্‌লেন এই :

"সালামতুল্লা সাহেবের লেখার প্রতি উত্তরে আপনি কষ্ট করে' যে সব দলিল-প্রমাণ হাজির করেছেন তা' তাঁরাই মূল্যবান মনে করবেন যাঁরা পৃথিবী ঘোরার ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য চান।

তবে বিজ্ঞানের দিক থেকে বল্‌তে গেলে,—অত কথার প্রয়োজন পড়ে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তার স্বপক্ষে সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য দিতে পারাটাই বড় কথা। আপনারা তথ্যের জন্য অন্য দরজায় ধন্না দিলে আমাদের কিছু বলার থাকেনা। বৈজ্ঞানিক সত্য বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সত্যই থাকে ; কোরআন, বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে সে বিষয়ে যে-ভাবেই বলা হোক না কেন।"

বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে, কি মান মন্দিরে বসে সমস্যাটা এড়িয়ে থাকা যায় এবং সেভাবে তাঁদের পক্ষেই এড়িয়ে থাকা শ্রেয় এবং প্রেয় যাঁরা সমাজের বাইরে বিজ্ঞান ও ধর্ম এর যে কোন একটি দিকেরই মাত্র ধারক এবং বাহক, প্রচারক নন্। কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের কথা যেখানে পরস্পর বিপরীত এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়কেই যখন পাঠ্য অন্তর্গত রাখছি তখন ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক সামাজিক মানুষ হিসাবে এ-সকলের মনেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এর কোনটা সত্য। এখন দিন, রাত্রি, মেঘলা, বৃষ্টি কি কুয়াসা এর যে কোন একটা সত্য হবে, সবটা আর সত্য হতে পারে না; এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়কেই আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করি, অন্ততঃ সত্য নিয়েই এদের কারবার প্রকাশ প্রচার করে' আস্‌ছি, এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের কোনটাকেই আমরা স্কুল, কলেজ, কি ইউনিভারসিটি থেকে বাদ দিতে পারছিনে, জীবন থেকে তো নয়ই; তাহলে ইউনিভারসিটির প্রফেসার সাহেব যে ভাবে বলেছেন সত্য মিথ্যার পরখ না করে যার যার পথে সেভাবে বসে থাকা, কি চালিয়ে যাওয়া কি সম্ভবপর? তা হলে ধর্ম বাহ্যতঃ যা বলে আসছে তা মেনে গেলাম অথচ তা যদি সত্য না হয়ে থাকে তা হলে ধর্মের নামে মিথ্যার প্রশ্রয় দিচ্ছি, মিথ্যাকে বাঁচিয়ে রাখছি, তা হলে সত্য সনাতন ধর্ম আর রইলো কই? ওদিকে, যদি বিজ্ঞানের কথা মিথ্যে হয় তা হলে মিছেমিছি ধর্মের সত্যের মোকাবিলা বৈজ্ঞানিক অসত্য মানছি, প্রশ্রয় দিচ্ছি, স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটিতে মিছেমিছি বিজ্ঞান পড়াচ্ছি, শিখাচ্ছি, সমাজ ও ধর্মকে অর্থাৎ মানব সাধারণ ও মানবতাকে ভুল পথে নিচ্ছি, গোমরাহ বানাচ্ছি। সুতরাং জনাব বিজ্ঞান প্রফেসর সাহেব যে সহজে সমস্যা এড়িয়ে যাবার ও থাকার পরামর্শ দিয়েছেন (ও কথাগুলি আমি পরামর্শ হিসেবেই গ্রহণ করেছি)

তাকি সম্ভবপর হচ্ছে, কি হবে? অতএব সমাধান অন্য ভাবেই খুঁজতে হবে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই যখন প্রয়োজন তখন ধর্মের কষ্টি পাথরে বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে ধর্মকে যাচাই বাছাই করে' নিয়ে সঠিক সত্য আবিষ্কার করে উভয়ের সমন্বয় (Synthesis) সাধন করে' উভয়কে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে, নতুবা মানব সভ্যতা শুধুমাত্র বিজ্ঞান প্রভাবে হবে শুষ্কং কাষ্ঠং—হৃদয়হীন, তেমনি শুধুমাত্র ধর্ম-প্রভাবে হবে বুদ্ধিহীন হৃদয়-সর্বস্ব মিথ্যা কিস্‌সা কাহিনীর আকর। বিষয়টা—উপরোক্ত দুই প্রফেসর সাহেবের মতো নয়—অতি গভীর গবেষনা (চিন্তা, অনুশীলন) ও সংগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষন-সাপেক্ষ।

বিজ্ঞান—বিবর্তন

(৫) বিজ্ঞান ফসিল (জীবাশ্ম) আবিস্কার করে' গবেষনা করে' দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষও আসলে ক্রম-বিবর্তনের ফল। প্যালিয়োজয়ীক, মোসোজয়ীক, টারসিয়ারী প্রভৃতি হলো পৃথিবীর ভৌগলিক ক্রম-বিকাশের জমানা। এ সব জমানায় পৃথিবীতে হরদম ভাঙচুর চলেছে, নানা প্রকার শিলাস্তর গঠিত হয়েছে; তারি কতকগুলোর নাম হচ্ছে ক্যাম্‌ব্রিয়ান, অড্রোভিসিয়ান, ডেভোনিয়ান, ট্রায়সিক, জুরেসিক, ক্রেটাসিয়াস প্রভৃতি। এই বিভিন্ন ভৌগলিক জামানায় বিভিন্ন শিলাস্তর বিন্যাস কালে বিভিন্ন ধরণের জীব-জন্তুর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের বৈজ্ঞানিক বিভাগ করা যায় ও চিহ্নিত করা যায়: অমেরুদণ্ডী, মেরুদণ্ডী, অণ্ডজ, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি রূপে। এই সবের মধ্যে অনেক বিলুপ্ত জীব-জন্তুর ফসিল পাওয়া গেছে। এই সব ফসিল এবং সিনানথ্রোপাস (চীনের প্রাগৈতিহাসিক পিকিং গুহা-মানব), জাভামানুষ আফ্রিকার রোড়েশিয়ান, পূর্ব ইউরোপ-এশিয়ার নিয়াণ্ডারথ্যাল

পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্সের ক্রোমাগন্যান, লাসকক্স, স্পেনের আলটামীরা, ফন্ট্-ডি-গম প্রভৃতি গুহা সমুহে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে সব ফসিল্স পাওয়া গেছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে তা বিভিন্ন স্থান কাল পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন রকম বিবর্তন। লাখ লাখ, কি হাজার হাজার বৎসর পূর্বের গুহামানবদের ফসিল, তাদের তৈরী বিভিন্ন ধরনের পাথুরে যন্ত্রপাতি (প্রাচীন ও নূতন প্রস্তর যুগ), গুহা গাত্রে, কি তাদের ব্যবহৃত কোন কোন যন্ত্রপাতিতে তাদের আঁকা, কি খোদাই-করা সেই সব জমানার নিজেদের ছবির পাশাপাশি হারানো জীব-জানোয়ারের অদ্ভুত সুন্দর ছবি কী প্রমান পেশ করে? আবার আফ্রিকার ট্যাংগা-নিকার কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বের আফ্রিকান প্রাগৈতিহাসিক গুহা মানব জিঞ্জানথ্রোপাসের যে-ফসিল পাওয়া গেছে তা-ই বা কী প্রমাণ হাজির করে? বলে নাকি যে ঐ হারানো এবং আজো-বেঁচে-থাকা জীব-জানোয়ারের যেমন যুগে যুগে ক্রম-বিকাশ হয়েছে, মানুষেরও তেম্‌নি ক্রম বিকাশ হয়েছে। মাঝখানে কোন কোন ক্রম-বিবর্তন-সূত্র হয়তো মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে (missing links) এই মাত্র।

তাহলেই মানুষ এলো কোত্থেকে তা বুঝতে হবে। বিজ্ঞানীরা অতি প্রাচীন বানর-গোষ্টির যে-ফসিল সমূহ ও অতি প্রাচীন উপরোক্ত মানব গোষ্টির যে ফসিল সমূহ পেয়েছেন তা পরীক্ষা করে' সঠিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে ঐ সব বানর ও মানব মূল একস্তর থেকেই এসেছে। বর্তমান কালের গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং প্রভৃতির কংকালেও ঐ ক্রমবিবর্তনের চিহ্নিত পরিবর্তন ছাড়া জীব হিসাবে অন্য বিশেষ তফাৎ নেই। আদিতে 'দ্রিওপিথেক' নামক এক দল বৃক্ষ-শাখা-বাসী বানর জাতীয় জীব ছিলো। খাদ্যের খোঁজে তারা সময়ে সময়ে মাটিতে নেমে আস্‌তো এবং দুপায়ে চলতেও চেষ্টা কর্‌তো। এদের

থেকেই ক্রমবিবর্তিত মানুষের প্রায়-কাছাকাছি দুপেয়ে জীব দক্ষিণ আফ্রিকার বহু লক্ষ বৎসর পুর্বের অস্ত্রালোপিথেক—দক্ষিনী বানর মানুষ—Apeman—হয়েছে। তাদের থেকেই পুরোপুরি মাটিতে বসবাস কারী দুহাত ব্যবহারে পুরো সক্ষম, দুপায়ে পুরো চলতে অভ্যস্থ না-বানর না-মানব (বন-মানুষ, অথচ কতকটা বানর-আকৃতি প্রকৃতির বানর-মানুষ) পিথেক্যানথ্রোপাসের

উৎপত্তি। এদেরই নানা শাখা প্রশাখা পরবর্তী নানা স্থান কাল-পরিবেশে উপরোক্ত নানা শ্রেণীর গুহামানব, যাযাবর শিকারী

মানুষে পরিনত হয়েছে। তাদের ভিতর দিয়েই নানা কাল ও ক্রমবিকাশের নানাগণ্ডি পার হয়ে এসে বর্তমান জমানার পৃথিবীর নানা স্থানের নানা প্রকার সভ্যতা সংস্কৃতির মানব মানবী হয়েছে। আর যারা এরূপ মানবীয় বিকাশের অভাবে আজো সেই যার যার পৌরাণিক আদি উদ্বর্তন-স্তরে রয়ে গেছে, তাদের কতক শাখা প্রশাখার কথা ঐ উপরে শুনলেন—গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং—আরো কতো শাখা প্রশাখা এক কথায় বাঁদর নামে পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে তারা কেন গুহামানব, যাযাবর শিকারীমানব ও পরিশেষে বর্তমান জমানার পূর্ণ মানবে বিবর্তিত হতে পারলোনা, সে আলাদা ব্যাপার। সে হিম্মত-হেকমত (Properties) ওদের ছিল না। কেন ছিলো না সে 'কেন'র কোন উত্তর নেই। সব কেনরই যে উত্তর থাকবে তাও সত্য নয়। তবু, ওরা যে মানব হয়নি, কোনদিক হবেনা এতো সত্য, এতে তো আর অসত্যের, অবিশ্বাসের কিছু নেই, যেমন নেই এই ক্রম বিবর্তিত মানবীয় আকৃতি প্রকৃতিতে।

বানর ছিলেন শুনেই ভ্রূকুঁচকে তাকালেন? কিন্তু মাতৃগর্ভে ক্রমবিবর্তন ঠিক বানরের মতোই। ভূমিষ্ট হয়েও তো ঐ বানরের মতোই ক্রমবিবর্তন; চার হাত পায়ে চলা আর দুষ্টোমী গুলো মনে করুন। ব্যাঙাচি দেখেছেন? যেনো মাগুর মাছের বাচ্চা, কিন্তু ক্রমবিবর্তনে সে সম্পূর্ণ চারপাওয়ালা ব্যাঙ হয়ে যায়, লেজ যায় খসে, চেহারা এমন কি বর্ণ পর্যন্ত বিবর্তিত। এক জীবনেই যখন এই, তখন লাখ লাখ, কি হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী জাতীয় (Species) বিবর্তনে যে কী বিপুল পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে, চিন্তা করুণ। সুতরাং ভ্রূকুঁচকানোর কী কারণ আছে? এ আল্লাহরই অমোঘ বিধান ও নিয়ম-নিগড়, এই মনে করে' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেন এবং কিস্‌সা কাহিনীর ব দৌলত

বেহেশত হতে পতিত কোন মানব-মানবীর বংশধর হওয়ার মিথ্যা দেমাগ ফের বেহেশতেই পাঠিয়ে দিন, সে বৃথা অহমিকা আর অনর্থক জিইয়ে রেখে কী ফল ! বরং সত্য জেনে এবং মেনে সুস্থ প্রাজ্ঞ হন। নির্বুদ্ধিতা আর কতো ! আর কেন ? আর নয়।

কারণ, এ হলো বিজ্ঞান আবিষ্কৃত নৃতাত্ত্বিক সত্য (Anthropological truth)। কিন্তু তথাকথিত ধর্ম সেখানে বেহেশত হতে আদম-হাওয়ার অর্থাৎ আদি মানব-মানবীর পৃথিবীতে পতনের গল্প খাড়া করে রেখেছে। আর বিজ্ঞানী অবিজ্ঞানী প্রভৃতি সকলের মুখপাত্র (মাধ্যম) রেডিয়ো-টেলিভিশান-মারফতও ঐ কিস্‌সা কাহিনীই এক তরফা মাঝেমাঝে প্রচার করছে। মরহুম ইকবালের মতো মহাকবি, কি মরহুম গোলাম মোস্তফার মতো কবি ঐ কিস্‌সা কাহিনী কাব্যের মারফত প্রচার করে' জনসাধারণ তো বটেই, জাতির ভবিষ্যৎ স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটির ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত এসব বিষয়ে মুর্খ বানাবার কোশিশ করে গেছেন। দেখুন 'পায়াম-ই-মাশরিক'এর 'তাসখির ই-ফিতরত' প্রভৃতি এবং 'জাবিদ-নামার' 'ইবলিস কি মজলিসেশুরা' ও 'ইবলিস ওয়া জেব্রাইল' এবং গোলাম মোস্তফার 'বনি আদম' কাব্যগ্রন্থের 'অবতরণ' কবিতা * কিন্তু কী আশ্চর্য !

---

* অমনি ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর মহাকবি মিলটনের 'প্যারাডাইজ লষ্ট' (বেহেশত বিচ্যুতি) ও 'প্যারাডাইজ রিগেন্‌ড' (বেহেশত পুনঃ প্রাপ্তি) মহাকাব্য-দ্বয়ের কথা তোলা হবে, কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য তখনও চার্লস ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২), ল্যামার্ক, উইজম্যানের এবং হিউগো ডি ভ্রাইজের (১৮৪৮—১৯৩৫) আবির্ভাব ঘটেনি, এবং উপরোক্ত বিবর্তনের সত্যেরও (বিবর্তন বাদের) আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং মিলটনের পক্ষে ঐ ধর্মীয় কিস্‌সাই ছিলো সত্য, আর এ জমানায়ও ঐ মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়ে নষ্ট করা হবে ? না, এ সব ব্যাপারে কাব্য হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক, চিন্তা করুন। আমার 'খৈয়াম-খবর' কাব্য-খণ্ডের এস্তেজার করুন। বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ—'প্রবন্ধের এ সম্পর্কীয় টীকাগুলিও দেখুন।

ঐ একই আদম হাওয়ার বংশধর হলে তাদের ফসিলের আকৃতি নানাপ্রকার হয় কী করে? নৃতাত্বিক গবেষনায় যে নানা স্থানের হাজার হাজার কি লাখ লাখ বৎসর পূর্বের গুহা মানবের নানা মুখাকৃতির ফসিল পাওয়া গেলো কী করে' তারা একই আদম হাওয়ার বংশধর হয়? আবার, অষ্ট্রিচ (কোল, ভিল, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য), আর্য, সেমেটিক, মংগোলীয়, নিগ্রো, দ্রাবিড় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সংস্কৃতির, আকৃতি-প্রকৃতির মানুষ কী করে' একই আদম হাওয়ার বংশধর হয়? পুনঃ দেখুন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, অপরাপর দূর দ্বীপপুঞ্জে, কি আফ্রিকার ঘন বন জংগলে যে-সব অসভ্য মানব গোষ্টি পাওয়া গেলো, তারাই বা কী করে' একই মানব গোষ্টি হয়? আবার, কাঁচা মাংস-ভোজী, এমন কি মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ভোজী অসভ্য মানুষরা? তারাও একই মানব গোষ্টির? আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া না হয় প্রাচীন এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার ভূখণ্ডের সংগে কোন এক সময়ে সংযুক্ত ছিলো, তাই পদব্রজে ঐ সব জায়গায় গেলো। শেষে প্রবল সমুদ্র স্রোত ও ঢেউয়ে ভূখণ্ড ভেঙে চূরে আলাদা হয়ে গেল, তাই সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বিস্তর প্রভেদ হয়ে গেল; মূল থেকে বিচ্ছিন্নরা ক্রমশঃ অসভ্য হয়ে গেল—যদিও তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি, যদিও তা সম্ভবপরই নয়—কিন্তু জলযান সৃষ্টি হবার অনেক আগে কী করে' ঐ সুদূর সমুদ্র-দ্বীপপুঞ্জে মানুষ গেলো? আফ্রিকার বন জংগলেই বা পৌঁছ্‌লো কোন্ কোন্ স্থলযানে চড়ে? আর কেন? হিংস্র জানোয়ার সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতি, গণ্ডার, গোরিলা আর বিষধর মেম্বা সাপ প্রভৃতি সরীসৃপের সংগে যুদ্ধ করে বাঁচবার জীবনই বা তারা বেছে নিল কেন? সভ্য জনপদ মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ ছেড়ে তারা অসভ্য জানোয়ারের মতো জীবন জাপন করতেই বা গেল কোন্

দুঃখে? কেন? বানানো কিস্‌সা ছাড়া এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। সুতরাং আসল সত্যের ও সঠিক ধর্মের সন্ধান হবে কোন্ পথে, কী পন্থায়?

ধরলাম, আদম হাওয়া দোষ করেছেন, তাই বেহেশত হতে তাদের ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং দুনিয়ার সকল মানুষই একই আদম-হাওয়ার বংশধর, আর তারা বিভিন্ন জায়গায় পরবর্তীকালে ছড়িয়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন চেহারা ও প্রকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, উট, কুত্তা, বিড়াল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ও পাখী কোথা থেকে প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন আকারে প্রকারে তাদের সংগে এলো? তাদেরও কি বেহেশত থেকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো? তা না হলে বেহেশতী মানব-মানবীদ্বয় হালচাষ করতে, বোঝা বহন করাতে সেই প্রাচীন কালে সভ্য জনপদে (মধ্য এশিয়ার মরু-জনপদ মক্কা মদিনায় প্রধানতঃ) গরু, ঘোড়া, উট, গাধা, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা পেলেন কোত্থেকে? কুত্তা, বেড়াল, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি পেলেন কোথায়, কি ভাবে? আর বনে তো এখনও ঐ সব পশু পাখীর বংশধররা বসবাস করছে; তাদের যদি আদম-হাওয়া সংগে করেই নিয়ে আসবেন, তবে বনে আবার তাদের বংশধররা হিংস্র বন্য অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম থাকে কী করে? না, আধা সভ্য গুহা মানব, যাযাবর মানবরাই বন থেকে ওদের জোড়া জোড়া বাচ্চা টাচ্চা ধরে' এনে লালন পালন করেছে, বড়ো করেছে, নানা কাজে খাটিয়েছে, যেমন কুত্তাকে খাটিয়েছে গুহামুখে, কি বাহিরে পাহাড়ায় (বলা বাহুল্য কুত্তাই মানুষের প্রথম পোষমানা জানোয়ার ও খেদমতগার), বিড়ালকে খাটিয়েছে সেই জমানার গৃহ শত্রু ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি মারবার এবং তাড়ানোর কাজে। এই কুত্তার বংশধর খেঁকশিয়াল

ঘেৎরা, আর বিড়ালের বংশধর বনবিড়াল (খাটাশ), নেকড়ে বাঘ, বাঘ আজো তো আমরা বন বাদাড়ে দেখতে পাই। বিড়ালের মুখাকৃতি দেখতেও অনেকটা বাঘের মতো। মানুষের ঘরে থেকে সভ্য হলেও শিকার ধরার ভংগী টংগী (প্রকৃতি) ঠিক বাঘের মতো; বিড়ালকে তাই বলা হয় বাঘের খালা, বাঘের মাসী—যদিও মেরে মেরে মানুষ প্রায় সাবাড় করে' এনেছে বাঘ, নেকড়ে বাঘ, খাটাশ প্রভৃতি। গরু, ছাগল, দুম্বা, উট, ঘোড়া, গাধা, মোষ প্রভৃতির মাংস মানুষ খেয়েছে· দুধ খেয়েছে (আজো কারো কারো মাংস, দুধ খায়)। আবার কাউকে কাউকে যেমন ঘোড়া, গরু, উট, গাধা, মোষ, আর ঘোড়া ও গাধার মিলনে পয়দা খচ্চর প্রভৃতিকে ভার বহন কাজে, কি হাল চাষ করার মতো কঠিনতর কাজে খাটিয়েছে, আজো খাটায়। বুনো হাঁস মুরগী পালন করে তাদের মাংস খেয়েছে, ডিম খেয়েছে, আজো খায়। এই ভাবে বন্য মানুষ, গুহা মানুষ নিজেরা ক্রমশঃ সভ্য হয়েছে, ঐ সব গৃহ পালিত বন্য জীব·জানোয়ারও তাদের সংগে থেকে থেকে ক্রমান্বয়ে অনেকটা নিরীহ প্রকৃতির হয়ে গেছে, আকারে প্রকারে তাদের বংশধর বন্যদের তুলনায় মানুষের সংগে সংগে খর্ব হয়েছে, দুর্বল হয়েছে, প্রায় সম্পূর্ণ মানুষের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, রয়েছে। সেই প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের ঐ সব কাজ-কর্মে খাটছে, কেউ কেউ অজো আহার যোগাচ্ছে, যদিও কাঁচা মাছ মাংস, কিংবা আগুনে সেঁকা, কি অর্ধ পোড়া মাছ মাংস আর নয়, দস্তুর মতো রাঁধা ভাজা, বিজ্ঞানের রসায়ন পন্থায় আবিস্কৃত কত রকম পরিমিত মসলা যোগে পাকানো রসনার স্বাদে মজাদার খানা—চর্ব্য, চূষ্য লেহ্য। পেয় অর্থাৎ পিনাও আর নদী খাল সরোবর থেকে ঘোলা পানি উবুড় হয়ে পশুর মতো মুখে চোঁ চোঁ করে' পান করা নয়, বরং কতো কায়দার পেয়ালায় কি গেলাসে পানি পান

তো আছেই, আরো আবিষ্কৃত হয়েছে দুধ, দই, ঘোল, চিনি সিরাপ, ফলের রস প্রভৃতির রকমারি পানীয়—শরবত শারাব! কাঁচা দুধ শুধু পাকানোই হয়না; ঘি, মাখন, পনীর, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা কতো কিছু হচ্ছে, আরো হয়তো হবে।

এখন, মানুষেরই কারণে মানুষেরই মুখাপেক্ষী এই সব জীবের প্রতি মানুষেরা—বিশেষ করে' এ দেশের মানুষেরা—কি রকম নির্দয় ব্যবহার করছে প্রসংগক্রমে তা-ও দেখুন।

কুকুর বিড়ালকে রীতিমত আহার দেওয়া হয় না যদিও নিজেরা চর্ব, চূষ্য, লেহ্য, পেয় খাচ্ছে। কোন গৃহপালিত পশু পাখী মরলে, ছুচো, ইঁদুর মারা হলে তা পানিতেই ভাসিয়ে দেয়া হয়, কিংবা মাটি চাপা দেয়া হয়, কুকুরকে দেয়া হয় না। বিড়ালের খানা মাছের কাঁটা, মাংসের ঝুটা, উদবৃত্ত ভাত-তরকারী বাইরেই ফেলে দেয়া হয়। বিড়ালকে বড়ো একটা দেয়া হয় না। রীতিমত খানা পিনা না পেয়ে এই সব ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত গৃহপালিত জীবেরা চুরি করে' কিছু খেলে তখন কিন্তু তাদের উপর জবর মার চালানো হয়, কখনো কখনো মেরেই ফেলা হয়।

গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা, মোষ, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতিকে রীতিমত খাওয়ানো হয় না। অথচ নিজেরা পেট পুরে খাওয়া হয়। হজ্বের মওছুমে গরু, ছাগল, উট, দুম্বা অকারণ অতিমাত্রা হত্যা করে, ভোজনে তা না লাগায় মীনা বাজারের নিকটবর্তী পাহাড়ের খন্দকে ঢালা হয়, অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাটাভরা খাদ্য বানিয়ে কিন্তু বিদেশে চালান দেয়া যেতো। দেশে দেশে অকারণ অতিরিক্ত ভোজোৎসব লেগেই আছে। পুণ্যের মোহে, ভোজ খাওয়ার লোভে নির্বিচার হত্যায় যে এ-সব জীবের বংশ একদা প্রাগৈতিহাসিক গুহাযুগের বন্য মোষ বাইসনের মতো লোপ পেয়ে যেতে পারে সেদিকে কারো খেয়াল নেই।

রীতিমত খানা পিনা না দিয়ে অতিরিক্ত খাটিয়ে ঘোড়া, গাধা, মোষ, গরু দিন দিন অস্থিচর্মকংকালসার করা হচ্ছে; অনেক সময়ে অকালে মহা যাত্রা করতে তারা বাধ্য হচ্ছে।

গোরু, ছাগল, দুম্বা, উট, মোষের বাচ্চাদের তাদের মায়ের দুধ রীতিমত পরিমিত মাত্রায় খেতে নাদিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, অথচ দুধ তো আসলে তাদের জন্যই। ঘাস, খড়, কুটো, ফেন, খৈল, ভুষি খাইয়ে বাচ্চাদের মায়েদের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর বিশেষ তদ্বির নেই; অথচ সামান্য কিছু খেয়ে টেয়ে যে টুকু দুধ পালানে হয় তা প্রায় সম্পূর্ণ টেনে নিয়ে নিজেরা নিজেদের বাচ্চাদের নিয়ে মজা মেরে' মানুষ খাচ্ছে, কি বেচে পয়সা করছে, আর যাদের জন্য দুধ—সেই গৃহ পালিত তৃণভোজী পশুর বাচ্চারা—নিজেদের মায়ের দুধ খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। আরো কি বেলেল্লা পনা! সারা রাত দুধ খেতে না দিয়ে দুধ বেশী হবে আশায় বাছুর দিনের প্রায় দুপুর নাগাদ বেঁধে রাখা হয়। বাচ্চারা ট্যাঁ ট্যাঁ করে একদিকে মা হাম্বা হাম্বা করে কি চেঁচায় আর একদিকে; মাঠে-ছাড়া গরু ছাগল মেষ বাচ্চার মায়ায় ঘাসও বেশী করে খেতে পারেনা, বার বার ফিরে আসে উঠোনে কি গোয়ালে। সব শেষ হয় যেদিন নাখেতে নাখেতে দুর্বল বাচ্চা একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে' জ্বালা যন্ত্রনার অবসান করে।

ধর্ম কোথায়? এ সকল পাপ কিনা? এর বিচার হবে কিনা—যদি পরকাল ও মানুষের ভালোমন্দ পাপ পুণ্য কার্যের প্রতিফল দেনেওয়ালা কেউ থেকে থাকেন—তা আপনারাই এখন বিচার করুণ।

আর কী রকম কিস্‌সা বানিয়ে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে তাও দেখুন।

আদম হাওয়ার চাষ-আবাদের জন্যই বেহেশত থেকে এক

জোড়া গরু তাদের দিয়ে দেয়া হয় (বেহেশতে যেন কেবল কত গরুই আছে আর কী, আর সব গৃহপালিত পশু পাখী মাটি ফুঁড়ে আদম হাওয়ার সংগী সাথী হয়েছে)। সেই গরু দুটোও জোয়াল কাঁধে লাঙল টেনে হাটতে চায়না, বলে: 'তোমরা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে গোনাহ্ করেছ তার ফলে বেহেশতের আরাম-আনন্দ-বাগ থেকে ভূপতিত হয়েছ, আমাদের দোষ কী? আমরা যে তোমাদের লাঙল বাইবো?'—আদম হাওয়া গরুদ্বয়ের কথায় হালচাষ ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ জেব্রাইলকে পাঠিয়ে দিলেন, জেব্রাইল গরুদ্বয়কে কতো বুঝালেন, গোযুগল কিছুতেই কথা শোনেনা, ঐ এক কথা বলে—আদম হাওয়া পাপ করেছে, সে পাপে তারা ভুগবে কেন? আর কথাও তো ন্যায্য। জেব্রাইল যুক্তিতে না পেরে করলেন কী? না, রাগান্বিত হয়ে এয়সা হাঁক ছাড়লেন যে গরু যুগল বোবা ও আহমক হয়ে গেল; আদম-হাওয়া এখন যেদিকে চালান সেই দিকে চলে, যা করান তা-ই করে। কিন্তু তাদের ন্যায়-বিচার পাওনা যে এই ভাবে গেল রসাতলে তলিয়ে আর এতে করে যে জেব্রাইল আর তাঁর এবং আদম হাওয়ার প্রভু স্বয়ং আল্লাহতালা আর ন্যায়-বিচারক নিরপেক্ষ থাকেন না, কিস্সার জৌলুসে কে তা লক্ষ্য করে!

আরো কী মজা! সকালে চাষ-আবাদ করে বীজ বপন করলে বিকালে গাছ ও শস্য হয়েটয়ে পেকে থাকে। আর সেই ফসল তুলে আনার সময়ে পৃথিবী অর্থাৎ মাটি আবার কী বলে? বলে:' এসেছ আমার বুড়ো কালে, যোয়ান কালে এলে যখন বীজ বুনতে তখন তখনি পাকা ফসল পেতে?' কেমন সব মজার কিস্সা।

যুক্তির বহর ন্যায় শাস্ত্রের (লজিক) বিচারে টেকসই, অখণ্ডনীয়, অকাট্য না করে' না রেখে বৃথা এক দিকের কতকগুলো কিস্সা

বিশ্বাস কর্‌লেন, বল্‌লেন, আর দিকে ঠেক্‌লেই নেহাৎ খেলো অযুক্তি কুযুক্তি খাঁড়া কর্‌লেন নিজেদের পাপ ঢাকবার জন্য, অজ্ঞতা লুকোবার জন্য ; কিংবা তাতে না কুলোলে তথাকথিত সুন্নতি লাঠি উঁচিয়ে এলেন, এতে করে' জিতেও কি আসলে পাপ ঢাকা পড়লো, অজ্ঞতা লুকালো ? না, তামাসার এক অজ্ঞান অন্ধকার গোনাহ্‌র রাজ্যে গোমরাহীর মুলুকে বাস করলেন তা' নিজেরাই এখন খুঁজে দেখুন, বুঝে দেখুন, আমি আর কতো কাঁহাতক বল্‌বো ! আর এ সবের কোন মানে হয় এই দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য শিল্প-কলায় পাওয়া সত্যের জমানায়, তার তথ্য ও তত্ত্বের মোকাবিলায় ?

বিবর্তন—মানব

বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করে' দিতে পারেন না এক কথায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরনের উলটো পাল্‌টা মনে করে' অথচ বিজ্ঞানকে মেনে নিতেও পারেন না চোখ বুজে' ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণকে এক্ষেত্রে এবং এই রকম সবক্ষেত্রে উদ্ভট কাল্পনিক বলে' উড়িয়ে দিয়ে ; সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞানে মূলতঃ কোন বৈপরীত্য নেই, বিরোধ নেই, একে অপরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয় ইত্যাকার গালভরা কথা ঐ রকম অবৈজ্ঞানিক অসত্য ব্যাখ্যা অনুসারে বল্‌তে পারেন কি ? পারেন না। বরং ঐ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব (সত্য) আবিস্কারের প্রতি আল্লাহর দেয়া চোখ দুটি বন্ধ করে' রেখেই বল্‌তে পারেন ; তাতে করে' কি আসল সত্য ধর্ম-বিশ্বাস ও আচরণ রক্ষিত হয়, কিংবা হবে কোন দিন ? কোন দিনও না।

কাজেই আদম হাওয়ার কাহিনীর সঠিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই রকম :

আদম হাওয়া কোন চিরন্তন একই মানব গোষ্ঠীর আদি মানব-

মানবী নন, বরং বিভিন্ন স্থলের ক্রম-বিকশিত সভ্য মানব মানবীই আদম হাওয়া, আর সব অসভ্যরা তাঁদের জ্ঞাতি গোষ্টি হলেও ঐ রকম আকস্মিক (mutation) সভ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও জীবন-যাপন-উপযোগী আত্মিক ও দৈহিক বিবর্তন লাভ কর্‌তে পারে নি বলে' তাদের আর মানব না বলে' জীন বলা হয়েছে, কেননা : والجان خلقنه من قبل من نار السموم

এবং এর আগে জীনদের আমি বায়ুর আগুন দিয়ে বানিয়েছি। —হিজর ২৭। তাৎপর্য হলো : বায়ুর প্রকোপে যেমন আগুন বাড়ে, ঘরবাড়ী পোড়ায় এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তু দগ্ধ করে' মারে, তেম্‌নি জীনেরা অর্থাৎ অসভ্য মানুষেরা রিপুর উত্তেজনা-বশে যা-তা করে' বেড়াতো, তাই ঐ মেছাল।

কাজেই দেখুন :

واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة - قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء - ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك - قال انى اعلم ما لا تعلمون -

'আর যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের [পূর্ব প্রত্যাগত পাক রুহুদের (১)] বল্‌লেন : আমি দুনিয়ায় এক প্রতিনিধি বানাবো, তাঁরা [পাক রুহুল কোদছ অর্থাৎ পবিত্র আত্মারা (২)] বল্‌লেন : তুমি কি দুনিয়ায় এমন খলিফা (প্রতিনিধি) বানাবে যারা সেখানে ফসাদ করবে, রক্তপাত ঘটাবে। আর আমরাইতো তোমার গুন-গান করছি ; তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি ; তিনি বল্‌লেন : আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।—বাকারা ৩০—৩১।

অতএব আদম-হাওয়ার আবির্ভাবের সময়ে তাঁদের জমানায় এবং তারও পূর্বেকার জমানায় ফসাদী, রক্ত-পাতকারী অসভ্য

(১). (২), পরিশিষ্ট চারি কলেমা ও ঈমান মোযমাল মোফাচ্ছলের উদাহরণে জিব্রাইল (আঃ) বিষয়ক টীকায় উল্লেখিত পুস্তকের ইনতেখার করুন।

বন-মানুষ, গুহা-মানব (জেন-পরী) না থাকলে কি উপরোক্ত কাইজা-ফসাদ ও রক্তপাতের কথা উঠ্‌তো ? উঠ্‌তোই না।

মানে এক স্তর থেকে এলেও আদম-হাওয়া এখন সভ্য। সুতরাং আগুনে পোড়ানোর মতো রিপুর অতো উত্তেজনা অসভ্যদের মতো তাদের নেই, কিংবা কম; তাই মাটির মতো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মন মেজাজ শরীফের কারণে তাঁরা মাটির মানুষ; আবার, প্রাণ যা-ই হৌক, জীবের জড় দেহের মুল উপাদান মাটির সার :

لقد خلقنا الانسان من سللة من طين - ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين-
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا
العظم لحما - ق ثم انشانه خلقا اخر ط فتبرك الله احسن الخلقين -

মানুষকে আমরা (আল্লাহ্) মাটির সার (ছোলালাতেমমিন তিন) থেকে বানিয়েছি। তার পর তাকে রাখি শুক্র (ডিম্ব) বিন্দু-রূপে এক নিরাপদ স্থানে (মাতৃগর্ভে); তারপর ঐ শুক্র-ডিম্ব-বিন্দুকে করি জমাট রক্তপিণ্ড, জমাট রক্তপিণ্ডকে মাংস-পিণ্ড, সে মাংসপিণ্ডে দেই অস্থি (মেদ-মজ্জা), তাতে পরাই ঐ মাংস; তখন তাকে (প্রাণ সঞ্চার করে') করি নবতর সৃষ্টি (মানব-দেহ ও আত্মা)। অতএব বড়ো মহিমাময় আল্লাহ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।— মোমেনুন ১২-১৪।

বিজ্ঞানও বলে : মৃত্তিকা-সার প্লোটো প্লাজম দিয়েই আসলে জড়দেহের বিবর্তন ; আল্‌-কোরান কালামও যে মূলতঃ তাই বলে তা ঐ আয়তের তাৎপর্যেই বোঝা যায়; রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা ক্রমশঃ কিভাবে প্রকাশ পায় সে-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জন্মবৃত্তান্ত (Biology) ও কোরাণিক তথ্যে বিশেষ তফাৎ নেই, গরমিল নেই, কেবল বিজ্ঞান যেখানে অনেক সময়ে প্রাণকে মনে করে ঐ প্লোটোপ্লাজমের (মৃত্তিকা-সার) যোগসাজস মেসিনের মতো, কোরআন-কালাম সেখানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব থেকেই— মূলতঃ তার উদ্‌গম ও উদভব ঘোষণা করে তা আমরা "বৈজ্ঞানিক

ও কোরাণিক বিবর্তন বাদ ” প্রবন্ধে 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' ও 'মাজমা-উল-বাহরায়েন' প্রসংগ দ্বয়ে বুঝিয়েছি।

সুতরাং আদম-হাওয়া কি কোরআন উক্ত ও বিজ্ঞান বর্ণিত বিবর্তনের বাইরে ছিলেন যে খামাখা তাকে বেহেশত থেকে বিচ্যুত কল্পনা করা হচ্ছে? মাটির দেহ-ধারী জীব যে সূক্ষ্ম চেতন লোক মৃত্যুর পরপারের স্বর্গে (বেহেশতে) কি নরকেও (দোযখে) থাকতে পারেনা, এতোটুকু বুদ্ধি বিবেচনাও কি আমাদের হবে না? বলা হবে আদম-হাওয়াকে নিয়মের ব্যতিক্রম কিন্তু কোরআন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম বল্‌ছেন কোথায়? আদম হাওয়া কি ঐ এন্‌ছান (মানব) মণ্ডলীর বাইরে? কী করে হয়? অতএব আদম হাওয়ার স্বর্গবাস, তার থেকে বিচ্যুতির কিস্‌সা-কাহিনী রূপক; তার আসল তাৎপর্য আমরা 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়েছি, এখানে নিন তার আভাস আর এ প্রবন্ধেও পরে দেখুন এর আরো বিশদ।

কোরআনে বর্ণিত সেমিটিক-ইরাণীয় আদম-হাওয়া ছিলেন আসলে বর্তমান জমানার আদন-অঞ্চলের এক বাগানে (জান্নাতে), ফলমূলাহারী; অসভ্যদের মতো আর কাঁচামাংসাদি খেতেন না। সেই আলাদা বাগানকেই সে ক্ষেত্রে জান্নাতে আদম বলা হয়েছে। জান্নাত অর্থই বাগান। মনে করা অসংগত, তাসমীচিন নয় যে তারা ঐ অসভ্যদের থেকে সভ্যতার কারণে সরে' এসে আলাদা সুখ-স্বাচ্ছন্দময় এক বাগানে বসবাস করতে শুরু করেন। তা বর্তমান জমানার আদন-অঞ্চলই। এ সকল কারনেই তারা ঐ মাটির মানুষ। এবং আল্লাহও যে বিবর্তন-নিয়মেই সব-কিছু করেছিলেন, করছেন ও করবেন। কোনরূপ অসম্ভব, অস্বাভাবিক কারবার যে কোনদিন হয়নি, হচ্ছেনা, কিংবা হবেনা, তাও এখন ভালো করে বুঝুন।

অমনি আল্‌কোরআনের এ-ধরনের আয়ত টেনে' আনা হবে:

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

নিশ্চয়ই তাঁর কার্যকলাপ, যখন তিনি কোন-কিছু ইচ্ছা করেন, বলেন হও আর তা হয়।—ইয়াছিন ৮২।

وهو الذى خلق السموات والارض بالحق - ويوم يقول كن فيكون

তিনিই আছমান-জমীন বানিয়েছেন সঠিকভাবে, এবং একদিন তিনি বলেন 'হও' আর তা হয়।—আন্‌আম ৭৩।

আসলে আল্লাহ্ কী? সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিল্পী ('শিল্প-সংস্কৃতি-কথা'-প্রবন্ধের 'প্রকৃতি, পরম প্রজ্ঞাবান প্রভু, শিল্পী' প্রসংগ দেখুন)। দুনিয়ার সকল গুণ ও জ্ঞান-কর্ম তাঁরি থেকে এসেছে, তাঁরি প্রতিচ্ছবি বহন কর্‌ছে। এখন দুনিয়ার গুণ ও জ্ঞান কর্ম-ব্যাপারে ঐ গুণী ও জ্ঞানীর মনে প্রথম জাগে সৃষ্টির ইচ্ছা, সৃষ্টির বেদনাও তাকে বলা যেতে পারে। তার ফলে জন্মে প্রথম মানসিক প্রকল্প, তার থেকেই ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে জন্ম নেয় কোন গুণকর্ম, কি জ্ঞান-কর্ম। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কেও ঠিক ঐ কথা খাটে। মূলতঃ মানুষে ঐ ক্রম অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি স্তর সমূহ তো এসেছে তাঁর থেকেই। সুতরাং বিশ্বের যে কোন সৃষ্টি বা কার্য কলাপের পূর্বে বিশ্ব-স্রষ্টার ঐ সৃষ্টি-বাসনা জাগে, তাকে আর মানুষের বেলা যে সৃষ্টির বেদনা বলেছি তা বলা যেতে পারেনা, কারণ তিনি সর্ব রকম সুখ দুঃখের অতীত, নিরাকার, নির্বিকার। কিন্তু সেখানেও ঐ ইচ্ছা বা বাসনা জাগে, ফলে তিনি বলেন হও, আর তা হয়। তাৎপর্য হলো ঐ প্রকল্প ক্রমে ক্রমে সৃষ্টিরূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর তার এই প্রকল্প-গুলোকেই এক কথায় বলে আইয়ানে ছাবেতা....সৃষ্টির মূলসূত্র সমূহ....লাওহে মাহফুজ। কাজেই আছমান জমীনও তিনি অমনি তাঁর অদৃশ্য প্রকল্প অনুসারে একটা নিয়ম পদ্ধতি বা শৃংখলা অনুসারে বানিয়েছেন, এখনও কতোকিছু

বানাচ্ছেন, বানাবেন। অতএব বানাবার ঐ বাসনা বা প্রকল্প যখনি জাগে তখনি তাঁর পক্ষে—আমাদের দিবারাত্রির মতো—একটা সময়। 'বলেন' কথায় সেই প্রকল্প অনুসারে কার্যকলাপ হওয়ার পর্যায় শুরু হয় বোঝা যায়। আর 'তা হয়' অর্থ একদিন তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং হঠাৎ কোন-কিছু কোন দিন হয়নি, হচ্ছেনা বা হবেনা। হঠাৎ যদি কিছু হতেও দেখি তার অন্তরালে থাকে অনেক দিনের অনেক কারণ বা প্রকল্প সমূহ। কোথায় যাবেন? বিবর্তন নিয়মের ব্যতিক্রম—কিবা স্রষ্টার বেলা, কিবা মানুষ, কি অপর জীব-জন্তু, গাছ লতা পাতা, তৃণ-গুল্ম—এমন কি যে কোন জড়-পদার্থ—কারো বেলায়ই কোথাও ছিলোনা কোনদিন, নেই, থাক্‌বেনা কোনদিন। আর সৃষ্টির নিয়মের বাইরে অসম্ভব, অস্বাভাবিক কোন-কিছু কোনদিন হয়নি, হচ্ছেনা, কি হবেনা। কেবল হিপনোটিজম-মেসমেরিজম—সম্মোহন পর্যায়ের প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে—যা করা যায়, করান যায়, দেখা যায়, দেখান যায় তাকেই মাত্র অলৌকিক কায (মোজেজা-কেরামত) বলা যেতে পারে, তা-ও ঐ সৃষ্টির বিবর্তন নিয়মের বাইরে নয় আদৌ, তা অন্যত্রও বুঝিয়েছি। মরহুম মনীষি আমীর আলী তাঁর জগৎ-বিখ্যাত পুস্তক 'স্পিরিট অব ইস্‌লামে' এ সম্পর্কে যে যুক্তিপুর্ণ তথ্য লিখে রেখেছেন তার থেকেও এ বহু বিতর্কিত বিষয়টা সম্পর্কে আপনাদের সঠিক ধারণা হতে পারে।

These wonders are called 'Karamat' performed as they are by virtue of the power gifted to them—(sufis) by God. In these days they would probably be attributed to what is called "psychic Influence." Hypnotism and mesmerism, under the name of 'Tasirul Anzar' and 'Telepathy'

have long been known in the East. Some of the acts might be due to unconscious hypnotism.

এই অলৌকিক কাণ্ডগুলোকে (ছুফির পরিভাষায়) কারামত বলে। আল্লাহ্‌র দেয়া ক্ষমতায় তাঁরা তা করে' থাকেন। আজকালকার যুগে এগুলোকে হয়তো বলা যাবে আত্ম-শক্তির প্রভাব [ইচ্ছাশক্তি]। 'তাছিরুল আনজার' নামে হিপনোটিজম-মেসমেরিজম এবং 'টেলিপ্যাথী' প্রাচ্যে বহুকাল পূর্ব থেকেই বেশ জানাশোনা। কতক কার্যকলাপ অবচেতন মনের ক্রিয়া।—স্পিরিট অব ইস্‌লাম ৪৭০ পৃঃ।

হিপনোটিজম মেসমেরিজম বাংলা সম্মোহন বিদ্যা। তার কথা আগেও উল্লেখ করেছি। প্রবল ইচ্ছা শক্তি অপর মনের উপর চালিয়ে তাকে বেহুঁশ করে, পুনঃ আধা বেহুঁশ আধা হুঁশে এনে তাকে যা দেখান যাবে তা-ই দেখ্‌বে, সম্ভবপর যা করতে বলা হবে হয়তো তা-ই করবে। প্রাচ্যে বহুকাল থেকে এসব ক্রিয়া তাছিরুল আনজার বা দৃষ্টি-প্রভাব নামে পরিচিত হয়ে আস্‌ছে। আর টেলিপ্যাথী হচ্ছে এক মন থেকে আর এক মনে ধার কি দূর থেকে প্রভাব বিস্তার করা। এটার গুরুত্বই বেশী, এবং আমরা যাদের পয়গম্বর, কি ওলিউল্লাহ্‌ বলি তাঁদেরই বিশেষ করে এই ক্ষমতা থাকে। কেবল পৃথিবীর সুদূর থেকে সুদূরে নয়, এমনকি ইহলোক থেকে পরলোকে, কি পরলোক থেকে ইহ-লোকে ঐ রকম বিশিষ্ট আত্মার সংবাদ আদান প্রদান, কি সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ চল্‌তে পারে। ঐ রকম অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই মাত্র তার সম্যক ধারণা করতে পারেন, অনভিজ্ঞের কাছে মনে হবে কিস্‌সা-কাহিনী। কিন্তু এ-ও স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। তা ছাড়া মরামানুষও কেউ বাঁচাতে পারেন না, পানির উপর দিয়েও কেউ হাট্‌তে পারেন না। শুধু সশরীর শূন্যের উপব দিয়াও চল্‌তে পারেন না। আর স্বামী বিবেকানন্দ যে চন্দ্র সূর্যের গতি রোধ বা রদ করতে পারেন বলে'

হঠাৎ উক্তি করেছিলেন মনেয় জোরে তাও সত্য হতে পারেনা [দেখুন তাঁর গ্রন্থাবলী, স্মরণ করুন তার অকাল মৃত্যু, মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, কাজেই এই অকাল মৃত্যুই যে মানুষ রোধ বা রদ করতে পারে না, কী করে' সে চন্দ্র সূর্যের গতি রোধ কি রদ করবে, কিংবা উপরোক্ত রূপ যে কোন অসম্ভব কায করবে]। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে ঐ পানির উপর দিয়ে হাটা কি শূন্যে উড়া, কি মরা মানুষের ছবিও সম্মোহিত অবস্থায় দেখান যেতে পারে। কিন্তু তাতো সত্য নয়, সম্মোহিতের কল্পিত ছবির এক মাত্র তারি সম্মোহিত নজরে পড়া মাত্র। অজ্ঞ লোকে ঐ সম্মোহিত অবস্থায় দেখা ব্যাপারগুলোকে, কি স্বপ্নেদেখা ঐ প্রকার বোজর্গীগুলোকে মহাপুরুষদের বেলা সত্য বলে' চর্মচক্ষে সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা বলে' প্রচার করে প্রাধান্য দিয়ে ঐ রকম খাঁটি মহাপুরুষদের প্রাকৃত জীবনও অস্বাভাবিক অপ্রাকৃত অসম্ভব অলৌকিকতায় বিকৃত করে' আস্‌ছে যুগে যুগে। ফলে, এখন কদাচিৎ সত্যিকার ঐ রকম খাঁটি বোজর্গের আবির্ভাব হলেও সাধারণ মানুষ ঐ শোনা ও অতি-বিশ্বাস-করা অস্বাভাবিক অসম্ভব বোজর্গী তাঁদের জীবনে না দেখে আর বিশ্বাস করতে, কি মান্‌তে চায়না। কিংবা বিশ্বাস করলেও, মান্‌লেও পূর্ববর্তী বোজর্গদের মতো অসাধারণ বোজর্গ আর মনে করে না।

মরা মানুষ বাঁচানো নয়, তবে আধিব্যাধি ঐ আত্মশক্তি, ইচ্ছা শক্তি (will force) চালিয়ে ক্রমে ক্রমে—যে ক্ষেত্রে যতোটুকু সময় ও শক্তি প্রয়োজন—তা দিয়ে- সারিয়ে তুল্‌তে পারেন বটে।—অতিভক্তরা—ঐ রোগী যদি মরনাপন্ন থেকে থাকে—তবে তার রোগ মুক্তিকে মরামানুষ বাঁচানোর রূপ দিয়ে থাকে, উদ্দেশ্য অবশ্য তাদের পীর বোজর্গের মাহাত্ম্য বাড়ানো।

আবার, কৃত্রিম পীর ফকির দরবেশ মৌলবী মৌলানার বার্ষিক সভায় কি মহফিলে কেউ চোর সেজে নিজেদের জানাশোনা

পরামর্শ করা ব্যক্তির, কিংবা অজানা ব্যক্তিরও কখনো কখনো মাল চুরি করে, কৃত্রিম চুরি যাওয়া মালের ব্যক্তি, কি অজ্ঞাত ব্যক্তি হুজুর কেবলাকে গিয়ে চুরির খবর দেয়। হুজুর দু'হাত তুলে' মোনাজাত করেন, অম্‌নি কৃত্রিম চোর আপনা-আপনিই বোবা হয়ে হাত বিকল অবস্থায় এসে হুজুর কেবলার পায়ে পড়ে। মাল দিয়ে দেয়, হুজুর কেবলা আবার দোয়া করেন। সে পুনরায় স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে যায়। সবই হুজুর কেবলার কেরামতি বোজর্গী দেখাবার জন্য, বাড়াবার জন্য বানাউটি ঘটনা। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।—খাঁটি পীর মোর্শেদের উরসে অবশ্য কখনো ও-রকম বানানো অস্বাভাবিক অসম্ভব ব্যাপার স্যাপার ঘটেইনা। যা কিছু ঐ উপরের কারো কারো ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। অজ্ঞ লোকে তাকে বাড়িয়ে বলুক সেজন্য তিনি দায়ী নন।

আর হাত ছাফাই-টাফাইতো ম্যাজিশিয়ানদের ম্যাজিক, ঐ যাদুকরদের তথাকথিত যাদুটোনা, ভেল্‌কি, ভান, ফাঁকিবাজি। জন্মগত বিকলাংগ আদি যা কিছু বিকৃতি আমরা দেখি, তা-ও পিতামাতা অর্থাৎ ঐ স্রষ্টাদ্বয়ের ভিতরের নিজস্ব বিকৃতির প্রকাশ, আদৌ সৃষ্টির বিবর্তন নিয়মের বাইরে অসম্ভব অস্বাভাবিক নয় কিছু। জীববিদ্যা অর্থাৎ বায়োলজি (biology) গ্রন্থে ঐ নিয়মের মধ্যে অনিয়ম দেখার, খুঁজে পাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ বোঝানো আছে। বিনা বাপে যে কেউ কোন দিন পয়দা-টয়দা হয়নি এবং কোরআনের অন্য তামাম তথাকথিত অলৌকিকতার আসল রহস্য, লৌকিকতা আমাদের 'সত্য দর্শন' গ্রন্থে বিশেষ করে বোঝানো হয়েছে।

কাজেই, আদম হাওয়াকে বাগানের সব গাছের নিকটে যেতে বলা ও তার ফল আহরণ করে' জীবিকা নির্বাহ করতে বলার তাৎপর্য বোঝা যায়; আর 'ঐ গাছের নিকটে' যেতে নিষেধ করার তাৎপর্য্যও বোঝা যায়; সে গাছ জীবন বৃক্ষ;

বাইবেল (ইঞ্জিল) তৌরাত তো পুরো মাত্রায় তাকে The tree of life বলেছে (genesis 2:9)। মানে কি? মানে সভ্য জীবনে ঐ অসভ্য জনোচিত অতি জৈব আচরণ না করা। কিন্তু রক্তে যে আজতক অসভ্যতা মিশে রয়েছে। ফলে আদম হাওয়ার আধ্যাত্মিক পদস্খলন হলো অতি যৌনাচারে অবিবাহিত অবস্থায়। অবশ্য বিবাহের কথা ঐ আদিম জামানায় কী করে উঠে যখন যৌন মিলনে উভয়ের সম্মতি ছিলো? উঠে। কারণ আল্লাহ্ চাননি এবং এখনও চান্ না যে সভ্য মানব-মানবী অসভ্যদের মতো, পশুর মতো নির্বিচারে পুনঃ পুনঃ যেখানে সেখানে যখন তখন যৌন ক্রিয়া করে যাবে, সংযম শালীনতাও চেয়েছিলেন, তা-ই আদিম জমানার বিবাহ এবং বিবাহিত জীবনে স্নেহ প্রেম-ভালোবাসার উৎস। এখনও আল্লাহ তা-ই চান। আদম-হাওয়া সেই আদিম জমানায় তা প্রথমতঃ রাখ্তে পারেন নি, এখনও হয়তো বিবাহিত জীবনে অনেকে তা রাখ্তে পারেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলা যা-ই হোক, আদম হাওয়ার মতো পয়গম্বর, কি অলিউল্লা (আল্লাহর বন্ধু) হবার মানুষের বেলা ঐ অতি যৌনাচার এবং অপর যে কোন রিপুর তাবেদারী করা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহা ক্ষতিকর তো বটেই, পতন ডেকে আনে। অথচ আদম-হাওয়া সেই মহা ক্ষতিজনক কায করে' যেতে লাগলেন। ফল হলো কী? ফল হলো সেই আদিম সভ্য পয়গম্বর, কি অলিউল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) হবার মানব-মানবীর অধ্যাত্ম পতন। সম্বিত ফিরে পেয়ে অতি অনুতাপ ও উদ্‌ভ্রান্ত হালহাক্কিকতে কিছুকাল তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক সেদিক ঘুরলেন। বলা যেতে পারে ঐ আদন অঞ্চল ছেড়ে হাওয়া চলে গেলেন বর্তমান জমানার জেদ্দায় (বলা হয়ে থাকে আরবী ভাষায় জাদ্দাতুন অর্থ দাদী আম্মা; হাওয়া সেমিটিক ইরানীয় বংশীয়দের দাদী আম্মার মতো, তাই পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলের নাম করণ করা

হয় জেদ্দা)। আদম ইরাণ তুরাণ ভারত পার হয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন কিনা তারও কোন দলিল প্রমান নেই। কিন্তু বলা হয় তখন সিংহল (লংকা) ছিলো ভারতের কতকগুলো দ্বীপমালা দিয়ে যুক্ত; নাম ছিলো সরন্দ্বীপ; আর আদমের ঐ দ্বীপমালা পার হয়ে ঐ সরন্দ্বীপে পেঁৗছার কারণেই ঐ দ্বীপমালার একত্রে নাম করণ করা হয় আদম সেতু (Adam Bridge); সিংহলের যে পাহাড়ের চূড়ায় তিনি উঠেছিলেন, কিছুকাল ছিলেন, তাকে বলা হয় আদম-চূড়া (Adam peak)। বলা হয় স্বর্গ থেকে ঐখানে তাকে ফেলে দেয়া হয়. সেটা যে গাঁজাখুরী গল্প তা' বোঝাই যায়; ঐ দুই নাম ইংরেজীতে আজো আছে, অন্য ভাষায় হয়তো হারিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে রাম রাবনের সংগে যুদ্ধে জিতে গিয়ে লংকায় ঐ দ্বীপমালা পার হয়ে পৌছেছিলেন বলে নাম করণ করা হয় রামেশ্বর সেতু বন্ধ! দু-ই দিকেই গাঁজাখুরী কিস্‌সা আছে; এবং কোনটারই আসল দলিল প্রমাণ কিছু নেই। ইরানী (আর্য) সেমিটিক ধারার আদিম মানবের পক্ষে সেই দুরুহ জমানায় অতোদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তা যাক্।

ঐ অতি যৌনাচারে পদস্খলনের কারণে, অধ্যাত্ম পতনের কারণে আত্ম অনুশোচনায় তিনিও হাওয়ার মতো বহুদুর, এমন কি পুরুষ বলে' বেশী দূর ভ্রমণ করেছেন, তা বোঝা যায়। এখন, ঐ অধ্যাত্ম সাময়িক পতনকেই বলা হয়েছে স্বর্গ-বিচ্যুতি (Paradiselost), কারণ মনের যে সুখশান্তি মৃত্যুর পরপারের সুখশান্তি—অর্থাৎ স্বর্গের প্রতীক, তাকে তাঁরা সাময়িক হারিয়ে ফেলেছেন; পরে অবশ্য পরস্পর পুনঃ দেখাশুনা হয় এবং আল্লাহর তরফী পরস্পর প্রেম-পথ পেয়ে সংযম-স্বালীনতার ভিতর দিয়ে আল্লাহর জেকের (গুণ কর্ম) ফেকের (জ্ঞান কর্ম) করে' আল্লাহর দীদারে (দর্শনে) মিলনে (মে'রাজে) পৌছেন। ঐ স্বর্গীয় শান্তি-

লাভ, চির স্বস্তি লাভ করেন, তা-ই পুন স্বর্গ প্রাপ্তি (Paradise Regained)।

আর শয়তান ঐ ষড়রিপু—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য— যে কোন একটির, কি একাধিকের, কি সবগুলোর তাবেদারী; ফেরেশতা তেম্‌নি এ-রকম ক্ষেত্রে সু-প্রবৃত্তি; স্থূল আকৃতি প্রকৃতি দিয়ে (Personified করে') সব বোঝানো হয়েছে ধর্মগ্রন্থসমূহে বিশেষ করে তৌরাত, ইঞ্জিল (বাইবেল) ও ফোর্কানে (আল্‌-কোরআনে)। এ না ধরলে, না মান্‌লে, বিজ্ঞানের সংগে ঠক্কর অনিবার্য এবং বিজ্ঞান সেখানে জিতবে; কারণ, তার সত্য পরীক্ষিত, প্রমাণিত; আর ধর্মের হাতে ঐ প্রাচীন, অতি প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক, অশৈল্পিক পন্থী ব্যাখ্যায় কোন প্রমাণ পঞ্জী নেই, আছে ধর্মগ্রন্থের দোহাই আর কল্পনা, কিন্তু নেহায়েৎ দোহাই আর কল্প-কিস্‌সা যে পরীক্ষিত প্রমাণিত বাস্তব সত্যের মোকাবিলা টিক্‌তে পারেনা, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। তবু এ জ্ঞান, অধিজ্ঞান আমাদের কবে হবে।

এখন, আশা করি, এও বুঝলেন যে যৌনক্রিয়া ও সন্তান লাভ স্বেচ্ছাধীন সংযম-শালীনতা পর্যায়ে সম্ভবপর। সেই প্রাজ্ঞ, পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় হাল-হাকিকত-হাছিলের পন্থাগুলো দোসরা বইতে লিখবার ইচ্ছা রইল * কেবল আজীবন মূজার্‌রদ (চির-কুমার, চির-কুমারী) থাকা ঐ অধ্যাত্ম উরুজের (প্রগতির) পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবার প্রতিপালন-উপযোগী স্বচ্ছলতার অভাবহেতু, কিংবা পৃথিবীরই খাদ্য সংস্থানের অতীত পর্যায়ে বিপুল জন সংখ্যার চাপ থেকে মানব-সমাজকে কিছুটা বাঁচাতে উচিত কিনা, দুরস্ত কিনা এই হচ্ছে ছওয়াল, আমরা বল্‌বো: এর জবাব হচ্ছে, হাঁ উচিত, দুরস্ত, এবং তার সমর্থন, শুধু সমর্থন কেন ফর্‌মান নিন নিম্ন আয়াতের থেকে।

*'যুগল শক্তি সাধা' ও 'আল্‌ কোরআনে নরনারী'।

و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

যাদের বিয়ের তওফিক নেই তারা যেন বিয়ে না করে যাবৎ না আল্লাহ তাদের আপন ফজল থেকে সচ্ছল করেন।—নূর ৩৩।

ঐ তওফিক এক ব্যাপক বিশ্লেষণ যোগ্য শব্দ; ওতে করে যেমন শরীরিক মানসিক নৈতিক আধ্যাত্মিক তওফিক অর্থাৎ স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ বোঝায়, তেম্‌নি পরিবার প্রতিপালনের মতো পর্যাপ্ত জীবিকার সংস্থানও বোঝায়, আর তার সংগে জাগতিক জন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই হিসাবে পরিমিত জীবিকা অর্থাৎ জীবন-ধারন-উপযোগী খাদ্য সংস্থানের অর্থাৎ তওফিকের অভাবও তো ওতপ্রোত জড়িত।

আবার আল্লাহর ফজল অর্থ আল্লাহর অনুগ্রহ। তারও ব্যাপকতা না না রকম। হু হু করে' পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, সংগে সংগে খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যুহার বাড়ছে, অশিক্ষা কুশিক্ষা বাড়্‌ছে অভাবে স্বভাব নষ্ট হচ্ছে, যেমন চাকরি বাকরি জীবনে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বাড়ছে, তেমনি চাকরি বাকরি কি অপর কর্ম সংস্থানের অভাবে চুরি ডাকাতি, রাহজানি, কালোবাজারি প্রভৃতি দিন দিন বাড়ছে; এমত অবস্থায় আল্লাহর ফজল—প্রেম, দয়া, দাক্ষিন্যাদি থেকে—যে সব নর নারী ঐ শারীরিক মানসিক নৈতিক আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক—যে কোন একটি, একাধিক, কি সর্বরকম তওফিক পাওনা থেকে হচ্ছেন বঞ্চিত, তারা আজীবন চিরকুমার, চিরকুমারী, কি যার পক্ষে যতোদিন দরকার কুমার, কুমারী থাক্‌লে তা ধর্মের দিক দিয়ে সমাজের দিক দিয়ে এবং রাষ্ট্রের দিক দিয়ে কেন দোষনীয় কায হবে? বরং ন্যায় সংগত সময়োপযোগী কায হবে। এবং যারা ঐ তওফিক কিছু পাচ্ছেন বলে' বিবাহিত জীবন যাপন করছেন, কি করবেন তাদের পক্ষেও পরিবার পরিকল্পনা আইন-অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে' সুখী সুস্থ সুশিক্ষিত পরিবার গড়ে তুল্‌লে তা-ই বা দোষনীয় কায

হবে কেন? বরং ধর্ম-সম্মত, দেশ-রাষ্ট্র ও সময়-সংগত কায হবে। কেন না, অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে যদি তাদের সুচারু লালন পালন করা না যায়, অস্বাস্থ্যে-কুস্বাস্থ্যে সন্তান ও প্রসূতি উভয়ই ভোগে, উভয়দিকেরই মৃত্যুহার যায় বেড়ে, ওদিকে পর্যাপ্ত ভরণ পোষনের অভাবে অসৎপথে অর্থ উপার্জনের মওকা খুঁজতে হয়, অশিক্ষা কুশিক্ষাই সন্তানরা পেতে থাকে, তাতে করে ধর্মতঃ ন্যায়তঃ কেন পিতামাতা দায়ী হবেন না? সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছেই বা কেন জবাবদিহী হবেন না? পাপপুন্য—পরকাল—ইত্যাদি কথা না হয় না-ই তুল্‌লাম।

সাধনার কথা আর কী বল্‌বো! অধ্যাত্ম সাধনা ক্ষেত্রে যদি অতি যৌনাচারের আশংকা থাকে, আদম-হাওয়ার মতো অধ্যাত্ম পতনের সম্ভাবনা থাকে তেমন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকের (মোর্শেদের) নির্দেশে, পরিচালনাধীনে—সাময়িক, কি চির-জীবন—যার পক্ষে যা প্রয়োজন—কুমার, কুমারী থাকায় কোন গোনাহ খ'তা তো নেইই, বরং অধ্যাত্ম উরুজের (উন্নতির) সম্ভাবনা থাকলে উন্নতি হলে তেমন সাধক-সাধিকার পক্ষে ওতে করে হয় পুন্য এবং পরিনামে অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় [ঐ পুন্যফল—ছওয়াব; দেখুন 'পরিশিষ্টে' 'পাপপুণ্য দর্শন' প্রসংগ]।—দৃষ্টান্ত আছহাবে কাহফ, খাজা খিজির, আছহাবে ছুফ্‌ফা, রাবেয়া বসরী, শাহজালাল, হাজি মহসীন প্রভৃতি বোজর্গানের অনুপম জীবন-দর্শন।

আদম-হাওয়া, সম্পর্কে সংক্ষেপতঃ আর যা যা জানবার তা একটু পরেই 'ইস্‌লামিয়াৎ শিক্ষা' পুস্তকের সমালোচনা প্রসংগে এবং এ-পুস্তকের 'বৈজ্ঞানিক ও কোরাণিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে পুরোপুরি দেখ্‌তে পাবেন; তা পূর্বেও বহুবার বলেছি। আর এও দেখ্‌তে পাবেন কোন ধর্ম গ্রন্থের আল্লাহর বানীত্ব এবং সত্য প্রমানের উপায় ঐ প্রাচীন, অতি প্রাচীন কাল হতে প্রচারিত

প্রকাশিত প্রচলিত শাব্দিক অর্থে আর তফসিরে নয়, কারণ, কোরাণিক শব্দ-সম্ভার বাক্য-বিন্যাস বহু ক্রম-বিকশিত ক্রম-বিবর্তিত তাৎপর্যে ভরপুর আর ঐ সকল প্রাচীন অতি প্রাচীন তরজমা তফসিরে কতো যে প্রচলিত অপ্রচলিত য়িহুদী ও খৃষ্ঠীয় কিসসা-কাহিনী ও স্বকপোল কল্পনা ঢুকানো হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই; বরং ঐ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক গুণ ও জ্ঞান-গবেষনায়ই পাওয়া যেতে পারে আল্-কোরআনের সঠিক তাৎপর্য-তাবিল—মননশীল সাহিত্য এবং মতবাদ – দর্শন বিজ্ঞান শিল্প—সংস্কৃতি।

ان للقران ظاهرا و باطنا و لباطنه باطنا و الى سبعة باطنا

ইন্না লিল কোরআনে জাহেরান অ বাতেনান অ লেবাতনেহি বাতেনান অ এলা ছাবআতে বাতেনান

নিশ্চয়ই কোরআনের জাহের (প্রকাশ্য) বাতেন (গোপন অর্থ, তাৎপর্য) আছে, এবং সেই বাতেনের জন্য আর এক বাতেন আছে—এমনি সাত বাতেন পর্যন্ত [সপ্ত স্তরে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পিক অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সকল তাৎপর্য তাবীল তথা গুণ, জ্ঞান, শান হাছেলের ক্রম-বিকাশ, প্রগতি-প্রকাশ, পরিণতি—বিবর্তন শেষ]—হাদিছ।

انزد القران على سبعة احراف و لكل اية منها ظاهرا و باطنا و لكل هد مطلون

উনজিলাল কোরআনো আলা ছাবআতে আহরাফে অ লেকুল্লে আয়াতেন মেনহা জাহেরান অ বাতেনান অ লেকুল্লে হাদেন মাতলুউন

কোরআন সাত হরফ অর্থাৎ স্তরে নাজেল এবং প্রত্যেক আয়াতের জাহের বাতেন (প্রকাশ্য ও গোপন) অর্থ আছে, এবং প্রত্যেক সীমায় পূর্ণ প্রকাশ আছে।—হাদিছ।

পূর্বোক্ত হাদিছেরই প্রতিধ্বনি। এর দ্বারা শরিয়ত (শুরু) অর্থাৎ সামাজিক, কখনো কখনো রাষ্ট্রিক-ব্যবহারিক পর্যায়াদি, তরিকত অর্থাৎ ঐ গুণ-কর্ম, জ্ঞান-কর্ম মূলক পন্থা সমূহ অর্থাৎ

ক্রমবিকাশ, হাকিকত অর্থাৎ অধ্যাত্ম প্রগতি-প্রকাশ বা অভিজ্ঞতা-অভিব্যক্তি, এবং মারেফাত অর্থাৎ অধ্যাত্ম পরিণতি, পূর্ণতা, কামালিয়াতও সাব্যস্ত হয়, বোঝা যায়।—এ সম্পর্কে ৬ নং এ পরবর্তী ছহি হাদিছ, 'পরিশিষ্ট' 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তন বাদ' পুরোপুরি এবং 'শিল্প সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের উপসংহার ও পরিশীলন দেখুন।

ইস্‌লামিয়াৎ

এখনই 'ইসলামিয়াৎ শিক্ষা' নামক প্রচলিত এক পাঠ পুস্তকের শিক্ষার সমালোচনা কর্‌লে এই দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক সংস্কৃতির জমানায় আমরা যা শিক্ষা দিচ্ছি তার সব ধারণা কতোদূর দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত, শিল্প-শৈলী-সংগত সত্য, কতোদূর এ প্রগতি ও বিবর্তন-বিরোধী, সুতরাং গোমরাহীর পথ, ধর্মের নামে অপোগণ্ড, অবিজ্ঞানী, অদার্শনিক অজ্ঞান অশিল্পী তৈরীর শিক্ষা ও পন্থা তা একে একে বোঝা যাবে।

(১) নবম, দশম শ্রেণীর 'ইস্‌লামিয়াৎ শিক্ষার' প্রথম ছবকই হলো: 'আল্লাহ্‌ তাঁহার বিশাল সৃষ্টিতে জীন ও এনসানকে মহা শক্তিশালী করিয়া পয়দা করিয়াছেন।' কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখিয়েছি যে জীন আলাদা কোন জীব নয়, সভ্য মানুষেরই অসভ্য জাতি গোষ্ঠি জীন, আর কুপ্রবৃত্তি শয়তানও জীন; জীনের আরো তাৎপর্য অন্য পুস্তকে বলেছি। তা না হলে বুদ্ধিজীবি মানুষের মাটির রাজ্যে 'আগুনের তৈরী' আর এক অশরীরি বুদ্ধিজীবি জীব আসে কোথা থেকে? 'আগুনে তৈরী' কথাটারই বা মানে কী? ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি অতি পরমাণু বিদ্যুৎকণিকার তৈরী সব বস্তু, মানব-দেহও; সুতরাং আলাদা কোন্‌ আগুনে কী করে' তৈরী হতে পারে

জীব—জীন? * আর আল্লাহ তাঁর দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সম্মত ক্রম উৎকর্ষ বিবর্তন-নিয়ম ভংগ করে' মাঝখানে আলাদা জীন ও ফেরেশতা বানালেন? আর, কেন? না, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করতে তার কার্য কলাপের কর্মচারী নিয়োগ করতে। এতে করে যে তাঁর ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়, দ্বৈত বাদ এমন কি ত্রিত্ববাদ হয়ে যায়, একি তিনি বুঝতে পারছিলেন না? (নাউজুবিল্লাহ মেনহা)। দ্বৈতবাদই ধরুণ আগে। ঐ জীনের সর্দার আজাজীল তাঁর হুকুম মানলোনা, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মানুষকে কুপথে নিচ্ছে একি দ্বৈতবাদ নয়, আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় আর এক শক্তি নয়? কারণ, সে কুমন্ত্রনা দেয়, তা-ই মানুষ কুপথে যায়, কিন্তু সে যখন আল্লাহর হুকুম মান্‌লোনা অতএব কুপথে গেলো তখন কি আর একটা শয়তান ছিলো? আল্লাহর মতো আলাদা আর এক শক্তিমান পুরুষ না হলে (নাউজুবিল্লাহ মেনহা) কী করে সে আল্লাহর বিপক্ষে দাঁড়ালো? কে তাকে কুমন্ত্রনা দিল? আর কী আশ্চর্য! সর্বশক্তিমান আল্লাহ এতো তার পয়রুবী করা সত্ত্বেও তাকে শয়তান মরদুদ (অভিশপ্ত) হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলেননা! ছয়লক্ষ বৎসর নাকি আজাজীল আল্লাহর পয়রুবী করেছিল এবং দুনিয়ার এমন কোন জায়গা ছিলোনা যেখান থেকে সে নাকি আল্লাহকে সেজদা দেয়নি, এমনি প্রচলিত কিতাবী কিসসা, অথচ ফেরেশতার বানানো মাটির পুতুল আদম-হাওয়াকে সেজদা দিলোনা, আর অমনি শয়তান হয়ে গেলো? কী লজিক্যাল যুক্তি! কিন্তু বুঝলাম, সে আল্লাহর নাফরমানী করলো, তাই সে বেহেশ্‌ত হতে বিতারিত হলো; কিন্তু সেই নাপাক নাদান শয়তান কী করে আবার পাশপোর্ট পায় পাক-

---

* ঐ আগুন দিয়ে জীন তৈরীর মূল তাৎপর্য 'বিবর্তন মানব' প্রসংগে একটু আগে ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখেছেন, বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধেও দেখবেন।

ছাফ ভূমি বেহেশতে পুনঃ প্রবেশের, আর আদম হাওয়াকে কুমন্ত্রনা (ওয়াছ ওয়াছা) দেয় বেহেশত-চ্যুত করতে? এ সব গোঁজামিলের কোন উত্তর আছে কি? এখন ত্রিত্ব বিশ্বাস কেমন তাও দেখুন। আল্লাহ যেনো অসহায়, তাঁর সব কায কর্ম একা কুলিয়ে উঠ্‌তে পারছিলেননা তাই তাঁর কার্য নির্বাহক (মোদাব্বেরাতে আমর) বানিয়েছেন, কর্মচারী রেখেছেন অশরীরি ফেরেশতা। এ ত্রিত্ব বিশ্বাস নয়? সর্বশক্তিমান অদ্বৈত একাকী আল্লাহর সর্বে সর্বা হওয়ার অর্থাৎ নিরংকুশ তওহীদ একমেবা-দ্বিতীয়ম বাদের অস্তিত্ব আর থাকে কি? শয়তান প্রতিদ্বন্দ্বী, ফেরেশতা কর্মচারী, তওহীদ বাদের বিপরীত এরকম আকিদা পোষণ করা শেরকী, কুফরি কিনা, তা-ই আমরা একেশ্বর বাদ ইস্‌লামের নামে শিক্ষা দিয়ে ঈমানদার মানুষ তৈরী করার নামে আসলে অনৈছলামিক মতবাদী অমুছলিম অবৈজ্ঞানিক, অশিল্পী মানুষ তৈরী কর্‌ছি কিনা, তা-ই বিচার করুণ। বল্‌তে পারেন তবে কি জীন ও ফেরেশতা নেই? হাঁ, যে ভাবে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও মৌলিক কার্য-কারক কল্পনা করা হয়, ফলে দ্বিত্ব ও ত্রিত্ববাদের সৃষ্টি হয় সেভাবে নেই, থাক্‌তে পারেনা। কিভাবে আছে—এবং থাকা সম্ভবপর তা আমরা আমাদের 'মালায়েকা (ফেরেশতা) ও মানব দর্শন' পুস্তকে বিস্তারিত্ত বিশ্লেষণ করেছি। এ পুস্তকে প্রসংগক্রমে সত্য মিথ্যা যাচাই বাচাই করতে এ সম্পর্কে শুধু জিজ্ঞাসা।

(২) 'আসমানী কিতাব ফেরেশতা হযরত জেব্রাইলের (আঃ) মারফত কোন কোন সময়ে সুবৃহৎ গ্রন্থাকারে—আবার কখনো কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিফা বা পুস্তিকাকারে নাযেল হইতো' (পৃঃ ৬)। কিন্তু এরকম ধারনায় ঐ কেতাব তাহলে আলাদা বস্তু; আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে, আছমানে লাওহে মাহফুজে ছিলো [লাওহে মাহফুজের আসল অর্থ যে আল্লাহ্‌র 'আয়ানে ছাবেতা' অর্থাৎ

কার্য প্রণালীর 'প্রকল্প' তা একটু আগেই দেখেছেন] তাহ'লে লাওহে মাহফুজ থেকে আস্ত কিতাব অশরীরি এক ফেরেশতা মারফত কোন কোন পয়গম্বরের কাছে পাঠান হতো কথার কী অর্থ হয়? কিংবা চিন্তা করিনা এতে করেও আল্লাহ্‌র ক্ষুদ্রত্বই প্রমাণিত হয়; তাঁকে মানবের মতো সীমাবদ্ধ কল্পনা করা হয়, তাঁর অনাদিত্ব, অসীমত্ব আর থাকে কি? থাকে না। কারণ, তিনি তো আর একা নন, কতকগুলো কথাও তাঁর অংশীদার, আর কথাতো কখনো অনন্ত-অনাদি হতে পারেনা, সীমাবদ্ধ, কাজেই তার সমপর্যায়িক হওয়ায় তিনিও সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ সাব্যস্ত হয়ে যান (নাউজুবিল্লাহ্ মেনহা)। আর তিনি যেন নিজে তার অতুল প্রভাব বিস্তার করে' কথাগুলো মহামানব-সমীপে পাঠাতে পারেন না, তাই কর্ম-কর্তা রেখেছেন। এম্‌নি অপারগ খোদায় বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেয়ায় ধর্ম কিভাবে রক্ষা পায়, বোঝা যায় কি? যায় না। অথচ এতে করে' যে ঐ রকম ধারনাই হয়, তাঁকে সীমাবদ্ধ মানবের মতো কল্পনা করা হয়, যেনো তিনি আছমানের কোন এক কোণে আরশে (সিংহাসনে) বসে আছেন, আর সেখান থেকে তার কর্মচারী ফেরেশতা মারফত হুকুম আহকম জারী করছেন— তা-ই যেনো কারো মাথায় ঢুক্‌ছেনা।

আবার, কোন ধর্মগ্রন্থ আস্ত—সে ছোট আকারে হোক, বড় আকারে হোক—নাযেল হয়েছে। এমন বিবৃতি কোন দেশে পাওয়া গেল? বরং আল্‌কোরআন তো প্রয়োজনে আদেশ নিষেধ, আবার পূর্বে নাযেল কোন কোন মতবাদ খণ্ডন ইত্যাদি রূপে নাযেল হয়েছে, জমানার জমানার বাতিল এবং এক জমানারও কতক আদেশের বিপরীত পুনরাদেশ সমূহ সব আল্লাহর আছমানে লাওহে মাহফুজে ঘিঞ্জি পাকিয়েছিল—এম্‌নি বিশ্বাস ঐ সব বিবরণ পড়ে কারো কারো হয়, হয়ে রয়েছে; আর পূর্বেকার ফেরেশতার কর্ম-কর্তৃত্বে হলো ত্রিত্বে বিশ্বাস, শয়তানের আল্লাহর

প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি-সামর্থ-বিশ্বাসে হলো চতুর্থ বাদ···কোথায় আমরা মানুষকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি ইস্‌লামের নামে চিন্ত' ব রুণ, আর তাও কিনা স্কুল কলেজ ইউনিভারসিটির পাঠ্য পুস্তক মারফত। আর হাদিছের দোহাই দিতে গেলে তো ঐ সকল কারণেই এর সমর্থনে তৈরী হাদিছগুলোও বানাওটি, গায়ের ছহি, জাল (মাউজু), তা বোঝাই যায়।

(৩) 'আছমানী কিতাব মোট একশত চারিখানা (পৃঃ ঐ ৩),। যেনো আল্লাহ্ গুনে গুনে হিসাব ঠিক করে পাঠিয়েছেন। অথচ পয়গম্বর বলা হয় একলক্ষ চব্বিশ হাজার, কি তুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। তা হলে পুন প্রশ্ন জাগে এবং তা স্বাভাবিক: ঐ মাত্র একশত চারিখানা কেতাবধারী বাদে আর সব পয়গম্বর কি নাবালেগ ছিলেন? না, নিজেদের কল্পনা মতো ধর্ম জারী করেছেন? বলা হয়, তারা পূর্ববর্তী পয়গম্বরের কেতাব অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু পয়গম্বর নাজেল হতেন জমানার চাহিদা মিটাতে। তা হলে ঐ সব পয়গম্বরের জমানার চাহিদা মিটাতেন অর্থাৎ সমস্যার সমাধান দিতেন কেতাব অনুসারে নয়, কারণ পূর্বেকার কেতাবে তো পরবর্তী জমানার সব চাহিদা ও সমস্যা থ কৃতে পারেনা, ছিলোওনা; কাজেই তাঁরা ঐ চাহিদা মিটাতেন, সমাধান দিতেন তাদের বিবেক-বিজ্ঞান মতে, দার্শনিক চিন্তা মারফত উদ্ভাবন করে, শিল্প-সুন্দর তা-ই প্রকাশ করে। তাহলে ধর্মগ্রন্থেরই অদৌ প্রয়োজন থাকে কি? থাকেনা। আর ঐ সোয়ালক্ষ, সোয়া তুই লক্ষ—যা-ই হোক—পয়গম্বরদের জমানাগুলো কতো বিরাট, বিপুল; তার মধ্যে মাত্র একশত চারি খানা স্বর্গীয় গ্রন্থ সমুদ্র মধ্যে বারিবিন্দুর মতো নয় কি? এরূপ সংকীর্ণ গোনা-বাছার কি ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? না, আনুমানিক কথা? হাদিছ বল্‌লে তা কে শুন্‌বে? কেননা এরকম অযৌক্তিক ব্যাপারের সমর্থনে হাদিছ পেশ করলে সে হাদিছও তো হবে

অযৌক্তিক, সুতরাং গায়ের ছহি (অশুদ্ধ, অসিদ্ধ)।

(৪) ২২ পৃষ্ঠায় কিয়ামতের ধারণা দিতে গিয়ে পৃথিবীকে সূর্য ও অপরাপর নক্ষত্রের মতো বিরাট বিপুলই কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 'মহান আল্লাহ্ এই বিরাট পৃথিবী এবং সমুদয় সৃষ্টি একদিন ধ্বংস করিয়া দিবেন। সেই মহা ধ্বংসের পর তিনি সকল জীবকে পুনরায় জীবন দান করিয়া জীন, মানব ইত্যাদির ভালমন্দ কার্য কলাপের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন।'

ঐ পৃথিবী ধ্বংসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞানের ধারনা হলো যার শুরু আছে তার পরিনতি আছে। পৃথিবীর বেলা সেই পরিনতি হলো চাঁদ, কি অপর কোন কোন গ্রহ উপগ্রহের মতো শুষ্ক, শূন্য হওয়া, জীবন ধারনে আর সক্ষম না থাকা। এই অনুমান সত্য, না, ঐ অবৈজ্ঞানিক পৃথিবী ধ্বংসের কাহিনী সত্য? সমর্থনে কোরআনের এই ধরনের আয়াত তুলে নজির স্থাপনের চেষ্টা করা হয়ঃ

كل من عليها فان و يبقىٰ وجه ربى ذو الجلل و الاكرم -

কুল্লু মান আলাইহা ফানিন অ ইয়াব্‌কা অজহু রাব্বেকা জুল জালাল অল আকরম—

এর (পৃথিবীর) উপর যা আছে তা সব ফানা (ধ্বংস) হয়ে যায় এবং যাবে (এ চিরন্তন ব্যাপার) থাকে এবং থাকবে কেবল তোমার প্রভুর অস্তিত্ব।—রহমান ২৬।

এই আয়ত মোতাবেক কি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে বোঝা যায়? না, বিজ্ঞানের ঐ পৃথিবীর উপরস্থ তামাম বস্তু জীব-জন্তু নাশের কথা বোঝা যায়? কোনটা সত্য? বিজ্ঞানের ধারনার সংগেই বরং কোরআনের ঐ আয়তের ঐক্য হয়।

অবশ্য ঐ ধ্বংসের সাপক্ষে আরও অনেক আয়াতের বরাত তোলা হবে, কিন্তু সেই সকল আয়াতের সুযুক্তি পূর্ণ দার্শনিক

বৈজ্ঞানিক কী কী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (তফসির, তাবীল) হতে পারে, তা এর পরবর্তী 'সৃষ্টি রহস্য' ও অপরাপর প্রবন্ধে ও পুস্তকে দেখ্‌তে পাবেন।

আর এ প্রসংগেই উল্লেখ্য ঐ 'ইসলামিয়াৎ শিক্ষা' পুস্তকে ৬৪ পৃষ্ঠায় উদধৃত কোরআনের এ আয়াতও :

و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون -

অ মেন ওরায়েহিম বরযখুন এলা ইয়াওমেন ইয়াবয়ছুন—

এবং তাদের সম্মুখে একটি মধ্যবর্তী জীবন আছে তা পুনরুত্থান দিবস (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিলম্বিত)।—মোমেনুন ১০০

আমরা 'বিজ্ঞান—বিবর্তন' এবং 'বিবর্তন—মানব' প্রসংগে বুঝিয়েছি কি ভাবে সভ্য মানবের উৎপত্তি এবং আদম-হাওয়ার জীবনে পতন উত্থানের মাধ্যমে শেষ পুনরুত্থান (কিয়ামত) বা যথাকার আত্মা তথাকার পরমাত্মায় গিয়ে একাকার—তৌহিদ (একত্ব) বিশ্বাসের কার্যে পরিণতি—কিবা ইহকালে কিবা পরকালে (যার পক্ষে যে জীবনে সম্ভবপর),—সেই শেষ পরিণতির আগ পর্যন্ত জীবনই ঐ বরযখ বা মধ্যবর্তী জীবন। কোন জীবনই সে ক্রম বিবর্তন ও পরিণতির বাইরে নয়, থাক্‌তে পারে না।

আর এই প্রসংগেই বুঝুন এবাদত—যা জীবনের ঐ তরক্কীর (প্রগতির) এবং পরিণতির জন্য চির প্রয়োজন,—তা কেবল ইহ জীবনের এই পৃথিবীরই মাত্র কোন কোন আঞ্চলিক অবস্থান উপযোগী হতে পারে কি ? পারে না। সে হতে পারে শুরু বা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি ব্যবস্থা। আসল এবাদত বন্দেগী সকল স্থান কালের উপযোগী, কিংবা স্থান কালের অতীত পরবর্তী জীবনেও, পরলোকেও ; সে-ই অবস্থাই ঐ বরযখ বা মধ্যবর্তী জীবন-ব্যবস্থা বা আত্মার ঐ তরক্কীর চিরন্তন এবাদত বন্দেগী।

তা হলে এই পৃথিবীরই চার মাস, কি ছয় মাস এক কালীন দিন, কি রাত্রির অঞ্চলে যা অচল, অকেজো তা কী করে' সর্ব দেশকাল

পাত্রের সার্ব জনীন, বিশ্ব জনীন এবাদত বন্দেগী বা সমাজ ব্যবস্থা হতে পারে? সে সব অঞ্চলে কি ধর্ম জারী করবেন না? বলবেন ঘড়ি ধরে ঠিক করে নেয়া যাবে। কিন্তু চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত ধরে ব্যবস্থা কোরআনের, কি অন্য ধর্ম গ্রন্থের; সেখানে কি করে' তার বিপরীত কায হবে? আর এই ঘড়ি ধরে-টরেও কি সুষ্ঠু সময় সর্বত্র পাবেন? পাবেন না।

তার পরে দেখুন, স্থান কাল পাত্র ভেদে যা পালটায় যেমন হজ্জ জাকাত, কছর নামাজ, সফরে রোজা মাফ, কি বদলা যোগে কোন কোন ব্যবস্থা প্রতিপালন, যেমন বার্ধক্যে, কি রোগাক্রান্ত অবস্থায়, তা কী করে' চিরন্তন আত্মার চিরন্তন তরক্কির, মুক্তির ধর্ম-ব্যবস্থা হতে পারে? চিন্তা করে দেখুন এবং বলুন।

কিংবা চল্‌লেন এরোপ্লেনে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে, তখন নামাজ রোজার নির্ধারিত কোন ওক্ত-টোক্ত পাবেন কি? পাওয়া সম্ভবপর কি? সূর্যোদয় থেকে রওয়ানা দিলে পূর্ব দিকে এগোলে গিয়ে পড়বেন রাত্রির দেশে, পশ্চিম দিকে এগোলে দিন আর ফুরায় না। উত্তর দক্ষিণেও এমনি সূর্যের বিভিন্ন উদয় অস্ত অনুসারে বিভিন্ন দিনের সময় কিংবা রাত্রির সময়। সূর্যাস্তের পরও পূব দিক থেকে পশ্চিমে এগোলে দিন, পশ্চিম থেকে পূবে এগোলে রাত্রি প্রভৃতি—ওয়াক্তের নির্দিষ্ট কোন বালাই নেই। রকেটে ১২ মাইল উপরে উঠ্‌লেই ক্রমশ: ধূসর বেগনি হতে হতে ২০ মাইল উর্ধে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারে জ্বল্‌ছে ছোট বড়ো আকারে চির রাত্রির মশালচিরা। চাঁদে গেলে একক্রমে প্রায় ১৪ দিন দিবা, আর এক ক্রমে প্রায় ১৪ দিন রাত্রি। মংগল কি অন্যান্য গ্রহে দিবস রাত্রি আমাদের পৃথিবী গ্রহের দিবস-রাত্রির চেয়ে আকারে অনেক বড়ো, কি অনেক ছোট। সুতরাং পৃথিবী-গ্রহের নামাজ রোজার নির্ধারিত সময় বা ওয়াকৃত পাওয়া যাবে না। হজ্জেরই বা তখন অর্থ হবে কী?

জাকাতেরই বা কী? 'কলেমা'র দ্বিতীয় অংশ হযরত মোহম্মদের (সঃ) প্রতি ঈমান আনারই বা অর্থ হবে কী? ঈমান মোযমালের আহকাম-আরকান—ঐ নিয়ম-পদ্ধতির উপর—ঈমান আনার এবং ঈমান মোফাচ্ছলের কেতাব-সমূহের উপর, রছুলগণের উপর, আখের দিবস উপর ঈমান-আনারই বা কী অর্থ হবে? বলা বাহুল্য যা বিশ্বের সর্বত্র—ইহ-পর-জীবনে চালু করা এবং রাখা যাবে না তা বিশ্ব-ধর্ম-বিশ্বাস ও ব্যবস্থা হয় কী করে? জবাব আপাততঃ খুঁজুন প্রবন্ধ সমূহের পরিশিষ্ট সমূহ থেকে; বিশেষ করে, বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ প্রবন্ধের 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' "মাজ্‌মা-উল-বাহরায়েন', 'বেলায়ত-নবুয়ত' ও 'পরিশিষ্ট' দেখুন। মুখবন্ধে উল্লিখিত পুস্তকমালায় বিস্তারিত জবাব দিবার এরাদা থাকলো।

এখন, কিয়ামতের ধারনায় (পৃষ্ঠা ২২) যে পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, এমন কি নক্ষত্রাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হবার কথা বলা হয়, তার অর্থ কী? 'বিজ্ঞান—বিশ্ব-গোলক' প্রসংগে দেখিয়েছি যে পহেলা, দোসরা ইত্যাদি ধরে' সাত আছমান বলে' কিচ্ছু নেই,। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্ররাও পহেলা আছমানের ছাদে খচিত বা ঝুলন্ত নয়। নক্ষত্রদের এক থেকে আরেক দূরত্বের হিসাব কর্‌তে হয় আলোক বর্ষে (ঐ প্রসংগ আবার দেখুন)। তা হলে প্রাচীন পহেলা আছমানের ধারণায় এদের সব এক আছমানে ঠাওড়িয়ে কেয়ামতে যে চূরমারের জল্পনা কল্পনা করে' রাখা হয়েছে তার অর্থ হয় কী? তা কি সম্ভবপর? অসংখ্য ছায়াপথ পূর্ণ যে বিশ্ব-গোলকের সীমা পাওয়া যায় না, সরহদ্দ পাওয়া যায় না, সেই বিরাট বিপুল বিশ্ব গোলকের তুলনায় পৃথিবী কতটুকু! পৃথিবীর কাছে একটা বালুকণা যতো ক্ষুদ্র, বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী তো তার চেয়েও ক্ষুদ্র। অথচ, এই পৃথিবী চূরমারের বেলা বিশ্ব চুরমারের কল্পনা করা হয়, কী তাজ্জব ব্যাপার।—দেখুন 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধে 'হাদিসে কিয়ামত' প্রসংগও।

সুতরাং বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত আকিদায় কিয়ামতে বিশ্বাস সম্ভবপর সত্য, না, আল কোরআনের ঐ ধরণের আয়াতের, ছুরার সঠিক মর্ম বুঝতে না পারার দরুন ভ্রান্ত তরজমা তফসির, ফলে মিথ্যা বিশ্বাস চলছে, কে তার জবাব দিবে? কিন্তু জবাব একটু পরেও দিয়েছি। অন্যান্য গ্রন্থাদিতে তো আছেই, এখানেও সংক্ষেপে পুনঃ শুনুন—শুধু পৃথিবীর ঐ জীবন ধারণের অনুপযোগী অতি শীতল আবহাওয়া, কি শুষ্ক শূন্য অবস্থা হওয়াই শেষ কিয়ামত। চাঁদ কি অপর কোন কোন গ্রহ উপগ্রহও তা-ই হয়ে আছে। —'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধ পুরো দেখুন।

(৫) আবার, বরযখ, বেহেশত, দোযখ (পৃঃ ৬৩—৬৬) ইত্যাদির ধারণায় মাঝখানে মানব-আত্মা বিচার অপেক্ষায় থাকবে কোটি কোটি বৎসর, কারণ, ঐ পৃথিবী ধ্বংসের পর তো বিচার হবে, সে কোটি কোটি বৎসরের পাল্লা—এ রকম বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়, তাতে করে' যে-সব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি জাগে তা অখণ্ডনীয়। একে তো ঐ বিজ্ঞানী এভ্যুলুশন (ক্রম-বিবর্তন) না মেনে আমরা মানবকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা জীব ঠাওড়িয়ে ফসিল-বিচারে পাওয়া সত্য বিশ্বাসের বিপরীত অসত্য আকীদা পোষণ করতে বাধ্য করছি, দ্বিতীয়তঃ ঐ রকম পুনরুত্থান মানে কিন্তু মরনের আগপিছ অনুযায়ী কারো হাজতবাস সুতরাং শাস্তি হবে বেশী, কারো বেলা হবে কম, তার মানে স্রষ্টা আর সমদর্শী সুবিচারক থাকছেন না। আর মাঝখানের ঐ কবর-আজাব মান্‌লে আরেক গোঁজামিলের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। তা হচ্ছে যাদের কবর দেয়া হয় না, পুড়িয়ে ফেলা হয়, বাঘে, কুমীরে, মাছে, চিল, শকুন, কাকে খায় তাদের বেলা? সুতরাং তখনকার কবর নিশ্চয়ই দেহ পচে গলে যায় যে কবরে তা নয়, রুহ (আত্মা) যেখানে থাকতে পারে সেখানে। সে বিজ্ঞান-সম্মত, শিল্প-সংগত, দর্শন-দুরস্ত বিচার আমাদের 'আত্ম দর্শন', 'তত্ত্ব দর্শন' পুস্তকেই

বিশেষ করে পাবেন। ছবুর। অপরপক্ষে যা ধ্বংস হবে স্বাভাবিক কারণে বিচারের জন্য যদি তার—সেই পৃথিবী ও মানব-দেহের—পুন বানানোই সত্য হয়, তবে ঐ ধ্বংসের যে কী দরকার ছিলো স্রষ্টা তার সঠিক কৈফিয়ৎ দিতে পারেন না; তা হলে তাকে বানালাম কী? আবার, পাপ পুণ্য মাপের জন্য স্থূল কোন মীজান বা পরিমাপ যন্ত্র আছে (পৃঃ ২৩) বিশ্বাস করায় আল্লাহকে পুনঃ মানবাকার দিলাম (Anthropomorphism)। তিনি যেনো জানেন না, বুঝতে পারছেন না। তাই দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে মেপে জান্‌ছেন, বুঝছেন। আর পাপ পুণ্য কি স্থূল কিছু যে তাকে ঐ ভাবে মাপা যাবে? বল্‌বেন আল্লাহ্‌র কুদরতের কথা—যেমন ঐ আগ-পিছ হাজত-বাসে আল্লাহর অপক্ষপাতিত্ব সমদর্শিতা সুবিচার বজায় রাখতে আল্লাহর দেয়া বিবেকের জান কবজ করে' বলা হয়। তার চাইতে সর্ব শক্তিমান সর্বব্যাপী আল্লাহ তাঁর ব্যাপক শিল্প-বিজ্ঞান-যোগে যে সূক্ষ্ম ভাবে সদা-সর্বদা সকলের পাপ পুণ্য জানছেন, দার্শনিকতার দিক দিয়ে তা-ই তার পরিমাপ যন্ত্র, বুঝাবার জন্য মাত্র 'মীজান' রূপকে বলা হয়েছে, এ বিজ্ঞজনোচিত বিশ্বাসে দোষ কী? [মীজানের মূল তাৎপর্য বুঝ্‌তে এ পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ শিল্প-সংস্কৃতি-কথা দেখুন।] আর ঠেক্‌লেই কেবল জনাব ছালামতুল্লাহ্‌ সাহেবের মতো 'কুদরত' কল্পনা করে ঐ রকম ভুল ও মিথ্যা ধারণা দিয়ে তাঁর ক্ষুদ্রত্ব ঢাক্‌বার চেষ্টায় আসলে কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রত্ব ঢাকা পড়ে না। আল্লাহর দেয়া দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্পকলার (Arts) কষ্টি পাথরের বিচারে চিন্তার ঐ দৈন্য, অযৌক্তিকতা ও সেরূপ বিশ্বাস পোষন করে' আত্ম পর ঠকাবার চেষ্টা ধরা পড়ে যায়।

(৬) ২৬ পৃষ্ঠায় ইছ্‌লামকে 'আকীদা', ইবাদত', 'মুআমালা' ও 'আখলাক্‌' এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা তো ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক সেই রছুলের (সঃ)

আমল থেকে জেনে আস্‌ছি ইস্‌লাম শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারেফাত এই চারিভাগে বিভক্ত। যথা—

الشريعت اقوالى و الطريقة افعالى و الحقيقت احوالى و المعرفت اسرارى -

আশ্‌ শারিয়াতো আকওয়ালী অত্তারিকাতো আফ্‌আলী আল হাকিকাতো আহ্‌ওয়ালী অল মারেফাতো এসরারি—শরিয়ত হচ্ছে আমার কওল (কথা) সমূহ—যার দ্বারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে। তরিকত হচ্ছে আমার কার্যাবলী (পন্থা)—হেরার গুহা থেকে যার শুরু এবং অন্তর সাধনায় যা বাতেন কর্মাবলী নামে অভিহিত, পরিচিত। হাকিকত হচ্ছে আমার হালসমূহ—ঐ কর্ম করতে করতে এক এক অভিজ্ঞতা ও সেই আনুপাতিক অভিব্যক্তি। আর মারফত হচ্ছে আমার এস্‌রার—রহস্যাবলী—আত্মাপরমাত্মার সম্যক মিলন মহব্বত ও সেই মাফিক অফুরন্ত গুণ, জ্ঞান, শান—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, বিজ্ঞান। হাদিছ।—এ প্রবন্ধের 'পরিশিষ্ট' ও 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তন বাদের' 'অধ্যাত্ম বিবর্তন', মাজ্‌মা-উল-বাহ্‌রায়েন, 'বেলায়ত নবুয়ত' 'পরিশিষ্ট' এবং শেষ প্রবন্ধের 'উপসংহার' ও 'পরিশীলন' প্রভৃতি দেখুন।

(৭) 'চুরি করিলে হস্তচ্ছেদন করিতে হইবে (পৃঃ ৩০)'। এছিলো সেই সাময়িক বিধান। কেননা তখন মানবের অপরাধ-জনক কাযগুলোর পিছনে যে বংশ-ধারার (Hereditary) চরিত্র-দোষ এবং স্থান কাল অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব দায়ী ছিলো, আর ছিলো অভাব-বোধ, এসকল তথ্য সে অবৈজ্ঞানিক জমানায় ছিলো অজানা; এবং সংশোধনের জন্য জেল, নির্যাতন কি সংশোধনাগার (Reformatory) প্রতিষ্ঠা হয়নি, সম্ভবপরই ছিলো না। এই বৈজ্ঞানিক জমানায়ও তা-ই করতে হবে, এই কি ইসলামিক বিধান হবে? না, তুরস্ক, ইরান, মিশর,

ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্বর্তনশীল কতক আইনের মতো আইন কোরআনের সর্ব আইন ক্ষেত্রে ইজ্‌তেহাদ মারফত গঠন করে' নিতে হবে? কোনটা ঠিক? জিজ্ঞাস্য। প্রথমটা অর্থাৎ হস্তচ্ছেদন করা ঠিক হলে পাকিস্তান এবং অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রেও তা-ই করা কর্তব্য। একা আরব রাষ্ট্র তা করবে কেন? নতুবা আরব রাষ্ট্রকেও ঐ ইজ্‌তেহাদ-মারফত এই বৈজ্ঞানিক যুগে সংশোধনাগারাদি বানিয়ে নিয়ে মানুষকে চিরতরে ঐ পংগু করে' রাখার দায় থেকে কিংবা অপরাপর ঐ রকম আইনের বেলা সেই আনুপাতিক অমানুষিক অত্যাচার করা থেকে (যেমন ব্যাভিচারের বেলা এক শত দোররা মেরে মেরেফেলা থেকে) বাঁচাতে হয়, উদ্বর্তিত মানব-অধিকার-আইনই প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক জমানার সর্ব আইন ক্ষেত্রে প্রচলন করতে হয়, প্রয়োগ করতে হয়॥

(৮) 'ইদানীং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কোন কোন জীব-জন্তুর মাংসে ও চর্মে এমন কতকগুলি জীবাণু আবিস্কৃত হইয়াছে যাহা মানব দেহের পক্ষে মারাত্মক বিষ (পৃঃ ৩৮)।"—কোন কোন পশু পাখীর মাংস হালাল করা হয়নি, তার কারণ ঐ রকম জীবাণু দুষ্ট বিষ আছে এমনি অবৈজ্ঞানিক কল্প-কথা বিজ্ঞানের নামে চালানো হচ্ছে, উদ্দেশ্য অবশ্য কোরআনের ঐ হারাম হালাল খাদ্য বাছাই যে বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে তা-ই প্রমান করা। কিন্তু ভ্রান্তভাবে বিজ্ঞানকে যেখানে সেখানে টেনে এনে ছেলেমেয়েদের যে অবিজ্ঞান উদ্ভট কল্পনা শিক্ষা দিয়ে ক্ষতি করা হচ্ছে সে দিকে পাঠ-পুস্তক ও সিলেবাস অনুমোদনের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জীব দেহ ক্রম-অভিব্যক্তির ফল। তাতে বিভিন্ন প্রোটো-প্লাজাম দিয়ে মাংস-পেশী ও চর্ম, রক্ত, মেদ, মজ্জা প্রভৃতি

গড়া। তাতে রোগ হলেই মাত্র সেই রোগের জীবাণু এবং চর্ম রোগ হলেই চর্মে সেই রোগ জীবাণু থাক্‌বে। কী করে' ঐ অভিব্যক্তির বাইরের জীবাণু তাতে আসলেই আদপেই থাক্‌বে? আবার, হিংস্র পশু পাখীর মাংসে হিংস্রতা নেই যে তা খেলেই মানুষ হিংস্র হবে। বাঘের, কি ঈগলের হিংস্রতা তারা কাঁচা মাংস খায় বলে', না, তারা হিংস্র বলে' কাঁচা মাংস খায়, কোনটা সত্য? বনে জংগলের অসভ্য মানুষ আদি কালে কাঁচা মাংস খেতো ঐ হিংস্রতার কারনে, অসভ্যতার কারনে। এখনও কিছু কিছু তার নজির দূর সমুদ্র-দ্বীপ-বাসীদের মধ্যে রয়েছে বলে' শোনা যায়।—আসলে হিংস্র পশু পাখীর মাংস মানব-দেহের বর্তমান দুর্বল পাক-যন্ত্রের পক্ষে যেমন বিষম গুরুপাক তেমনি দেহের পক্ষে এখনকার এই মৃদু স্বাস্থ্যে উপাদেয় উপকারক অর্থাৎ পুষ্টিকর তেমন আর নেই, যেমন ছিলো তাদের আরণ্যক আব্‌হাওয়ায় ও জীবনে। শুকরও অম্‌নি হিংস্র, পোষ মানানো হয় বলেই যে সে হালাল হয়ে যাবে এমন কোন মানে নেই, তাহলে বাঘ, ঈগল, এমন কি কুকুর বিড়ালও তা-ই হতে পারতো। ফল কথা, মানুষ অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে পদার্পন করার থেকে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার কুরুচির থেকে দূরে সরে গিয়ে সুসভ্যতা সুরুচির ক্রমশঃ এবং সর্বশেষ সম্পুর্ণ পরিচয় দেবে এই-ই তো স্বাভাবিক। কোরআনেও শূকর মাংস খাওয়া হারাম করা প্রসংগে বলা হয়েছে فانه رجس، কারণ, ও (শূকর মাংস) হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন (৬ঃ ১৪৬)। এর থেকেও ঐ সুসভ্যতা সুরুচির পরিচয়ই প্রমাণিত হয়, পাওয়া যায়।

৯। 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপুর্বক আল্লাহ্‌র উপাসনা (ছালাত) ত্যাগ করিল সে কুফর করিল (পৃঃ ৪০)'। এই হাদিছ সত্য হলে এই হাদিছের কী?—"স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টা

ধ্যান হাজার বৎসরের এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'' হয় পূর্বে কথিত ঐ ছালাত ও এবাদত (উপাসনা) এক মনে কর্‌তে হবে, না হয় পরস্পর বিরোধী বলে এর যে কোন একটি বাতেল ঘোষণা করতে হবে, কোনটা সত্য ? কোন্‌টা করবেন ? এরূপ হাজার হাজার হাদিছ মিল্‌বে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলার বিচারে যা হাস্যকর, যেমন সাত আছমান আর তার প্রতি আছমান নাকি ৫০০ বৎসরের রাহ্‌। যেমন অশরীরি জেব্রাইলকে নাকি কোন কোন আছহাব চর্মচক্ষে দেখেছেন, রসুলই(সঃ) চর্মচক্ষে দেখে নাকি কাউকে কাউকে দেখিয়েছেন। যেমন মে'রাজে গিয়ে ফিরে এসে মুছার (আ) পরামর্শ মতো পুনঃ পুনঃ আল্লাহর কাছে গিয়ে দর কসাকসি করতে করতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজকে পাঁচ ওয়াক্তে নামিয়ে আনা, বারোমাস রোজাকে একমাসে নিয়ে আসা (দেখুন অতীন্দ্রিয় রকেট প্রবন্ধের পরিশিষ্ট) ইত্যাদি। কতক হাদিছ বিভিন্ন রাবীর বিভিন্ন রওয়ায়েৎ, কতকের আগাগোড়া সমাঞ্জস্য নেই, অর্থ নেই । বোঝাই যায় যে বানানো। কতক হাদিছ ছহি (শুদ্ধ), গায়ের ছহি (অশুদ্ধ) মাউজু (জাল), হাছান, (সংগত), মুছাক (প্রবল), জয়িফ (দুর্বল) প্রভৃতি বাচনিক বিভিন্ন হাদিছ গ্রন্থে বিভিন্ন রকম, সুতরাং আসল সত্য উদ্‌ধার একরকম অসম্ভব ব্যাপার ['সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধে 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগ দেখুন, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর জীবন দর্শন' গ্রন্থে 'হাদিছ দর্শন' প্রসংগে পুরো বিবরণ আছে]। তাহ'লে পানের থেকে চূণ খস্‌লেই হাদিছের দোহাই দিয়ে যেখানে সেখানে কুফর বলা, যাকে তাকে কাফের কহা কতোদুর সংগত ? এমন কি আল্‌ কোরআনের আয়াতেরও বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা, এক মযহাবে যা সত্য, অন্য মযহাবে তা সত্য সাব্যস্ত হয় না। এমন কি কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ জাকাতের ধারনা ও আচরনও বিভিন্ন মযহাবে বিভিন্ন রকম। যথা ঃ

"ইছলামের পাঁচটি রুকন বা খুঁটি দিয়েও সব মুসলমানকে একত্রিত করা এবং রাখা যায় না? নামায পড়ার পদ্ধতিতে হানাফী ও লা-মযহাবীর তফাৎ আছে, শিয়াদের নামাষ আলাদা। ইছমাইলীদের নাযায বলে' কিছু নেই—পাঁচ ওয়াক্তের বালাইও নেই, হজ্জও তারা করেনা। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের আচার অনুষ্ঠানেও বিস্তর প্রভেদ আছে—ঐক্য আছে কেবল মাত্র কবর দেওয়ায়।"—মুসলিম মনীষা—ভূমিকা পৃঃ ১০।

এ কেন? কারণ, কোরআনেই আসলে পাঁচ ওয়াকতের নির্ধারিত কোন নামাজ—নেই, যা আছে তাকে আর যা-ই বলা যাক যে কায়দায় আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি তার যে আদেশ নয়, তা সেই সেই সময়ের আয়াতগুলো থেকেই পরিস্কার বোঝা যাবে :

فسبحن الله حين تمسون و حين تصبحون -

সুতরাং আল্লাহর মহিমা ঘোষিত হোক যখন সাঁঝ নামে এবং যখন প্রভাত আসে।—রুম ১৭।

وله الحمد فى السموات والارض و عشيا و حين تظهرون -

এবং তাঁরি প্রশংসা আছমান-জমীনে এবং বিকেলে ও মধ্যাহ্নে।—রুম ১৮।

ঐ মহিমা ঘোষনা, প্রশংসা কীর্তন দ্বারা কি নামাজ বোঝায়? না, সাঁঝ নামা থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে কারো কারো পক্ষে জ্ঞান-গবেষনা করে আল্লাহর এবং তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বোঝাবার প্রয়াস বোঝায়, তা আপনারাই বিচার করুন।

و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها - و من انائ ليل فسبح و اطراف النهار لعلك ترضى -

আর প্রশংসা কীর্তন করো তোমার প্রভুর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও ওর অস্ত যাওয়ার পুর্বে, এবং কীর্তন করো রাত্রির কিছু সময়েও

আর করো দিনের আশে পাশে যাতে করে আনন্দ পেতে পারো। তো-হা—১৩০।

অপর এক আয়াতে আছে—و ادبار السجود এবং সেজদার পরেও (প্রশংসা কীর্তন করো)। কা'ফ ৪০।

সেজদার উল্লেখের কারণ হচ্ছে সেই জামানায় শুধু নিজ হস্তে তৈরী পুতুল দিগকেই নয়, চন্দ্র সূর্যকেও মানুষে সেজদা কর্‌তো। তাই এই নিষেধ আজ্ঞা:

لا تسجدوا الشمس ولا لاتمر اسجدوا لله الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون -

সূর্যকে সেজদা (ষাষ্টাংগ প্রণিপাত) কোরো না, চন্দ্রকেও না, বরং সেজদা করো আল্লাহওয়াস্তে যিনি ওদের পয়দা করেছেন, যদি তোমরা তাকেই পূজা করতে চাও।—হা-মীম ৩৭।

কাজেই বোঝা যায় ঐ পুতুলকে এবং চন্দ্রসূর্যের মতো প্রাকৃতিক পদার্থকে ষাষ্টাংগে প্রণিপাত অর্থাৎ সেজদা করা থেকে সদ্য ইস্‌লাম-অবলম্বী মানুষকে অর্থাৎ মুসলিমদের ফিরানোর জন্যই সেজদার প্রচলন করা হয়েছিল। কিন্তু তা ঐ নির্ধারিত পাঁচ ওয়াকতে কি কোরআন দ্বারা ছাবেত হয়? বরং সেজদার পরেও 'প্রশংসা কীর্তন করো' কথা দ্বারা বোঝা যায় জেকের ফেকেরই আসল এবাদত-বন্দেগী, আর তা যে কোন সময়ে কতো উপায়েই না সম্ভবপর! যদিও ফেকেরের কথা এই সব আয়াতের সংগে উল্লেখ নেই, কিন্তু অন্যত্র আছে:

ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و انهار لايت لاولی الباب الذین یذکرون الله قیما و تعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق الشموات والارض -

আছমান জমীন সৃষ্টিতে এবং দিন রাত্রি পরিবর্তনে নিশ্চয়ই তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানীদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন-মালা। যাঁরা আল্লাহর জেকের করেন (ঐ যে কোন রূপ প্রশংসা কীর্তন) দাঁড়িয়ে, বসে

শুয়ে, (যে কোন সুযোগ সুবিধে মতো অবস্থায় ও কালে) এবং ফেকের (গবেষনা) করেন আছমান-জমীন-সৃষ্টি (কৃষ্টি-প্রলয়) সম্পর্কে।—আলে ইমরান ১৮৯, ১৯০।—বলা বাহুল্য, সৃষ্টির সংগে কৃষ্টি (কালচার—সংস্কৃতি) ও প্রলয় সমজড়িত ও পরস্পর পরিপূরক।

এর আরো গভীর, গভীরতর ও গভীরতম পর্যায়ে রয়েছে 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধের শেষ দিকে এবং 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তন বাদ' প্রবন্ধের 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' 'মাজমা-উল-বাহরায়েন', 'বেলায়ত-নবুয়ত' ও 'পরিশিষ্ট' প্রসংগে, তা'ও দেখুন।

অবশ্য টেনে আনা হবে নিম্ন ধরনের আয়ত :

اقم الصلوات اللوكـ الشمس الى غسق الايل و قران الفجر -
ان قران الفجر كان مشهودا -

কায়েম করো ছালাত সূর্য ঢলা থেকে রাত্রির আঁধার পর্যন্ত আর ফযরে কোরআন, নিশ্চয়ই ফযরে কোরআন দেখা যায়।—বনি-এছরাইল ৭৮।

ছালাত এক ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক শব্দ। ওর লোগাতি (আভিধানিক) অর্থ হলো দয়া করা, দোয়া করা। ধাতুগত অর্থ কোমল হওয়া, নমিত হওয়া, মিলন হাসেল করা (রাবেতার পূর্ণতা)। ভাবার্থে ইছতিগফার (মাফ চাওয়া), তসবিহ তেলাওত ও দরুদ শরীফ পাঠ, কতো কী। কাজেই ওর দ্বারাও পাঁচ ওয়াকত নামাজই বোঝায় না, ছাবেত হয় না। আর সূর্য ঢলা থেকে রাত্রির আঁধার পর্যন্ত কথা দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায় উপরোক্ত যে কোন সময়ে যে কোন রূপ গুণ ও জ্ঞান (জেকের-ফেকের) আহরণ—আল্লাহর যে কোন রূপ প্রশংসা কীর্তনই তার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। 'আর কোরআনাল ফাজরে' কথা দ্বারা বোঝা যায় ফজরে কোরআন তেলাওত। তাও কোন আম (সর্ব সাধারণ মুসলিমের জন্য) হুকুম নয়। কারণ পরক্ষনেই আছে ফজরে

কোরআন (তেলাওত) দেখা যায়। পরিস্কার বোঝা যায় সেই জমানার সদ্য ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীরা যে কাফেরদের অত্যাচার আশংকায় চুপে চুপে কোর্‌আন তেলাওত করতো, কাফেরদের পরাজয়ে সে আশংকা আর না থাকায় তাঁরা যে প্রকাশ্যে কোর্‌আন ফজরে তেলাওত ও মুখস্থ করতে পারছিল তা-ই। দেখা যায় কথায় সেই প্রকাশ্য তেলাওতই বোঝায়। সম্পূর্ণ সেই জামানার ব্যাপার। চিরন্তন কোন ব্যবস্থা নয়। অবশ্য ঐ অনুকরনে সকালে কোরআন পাঠ করুন কোন দোষ নেই; বরং ভালো। কিন্তু বুঝে শুনে পাঠ করুণ, আর তা জীবনগঠনে সচ্চরিত্র গঠনে কাযে খাটান। নতুবা তোতাপাখীর মতো না বুঝে শুনে কোরআন পাঠে কী ফায়দা! পড়লেই ছওয়াব হবে এ-সব কথার কোন অর্থ হয় না! পাপ পুন্য, ছওয়াব (পুন্যফল) আসলে কী কেন তা এ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে দেখুন।

কিন্তু পাঁচ ওয়াকত নামাজ এলো কোত্থেকে এই হলো প্রশ্ন; জবাব আছে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার ১নং হাদিছে।

উমর ইব্‌নে আবদুল আজিজ একদিন নামাজে দেরী করেন। উরওয়া এব্‌নে আস জুবায়ের তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন: ইব্‌নে শুবাহ্‌র ছেলে আলমুগীরা কুফাতে থাকা কালে একদিন নামাযে দেরী করেছিলেন। তাতে মাস্‌উদ আল আন-সারি তাঁর কাছে এসে বলেন: ওকি করছো মুগীরা? তুমি কি জানো না যে জেব্রাইল (আ) নীচে নেমে এসে নামাজ পড়লেন এবং রছুলও (সঃ) তার সংগে নামাজ পড়লেন; তারপর (আবার) জেব্রাইল (আ) পরবর্তী নামাজ পড়লেন এবং রছুলও তাঁর সংগে নামাজ পড়লেন, তার পরে আবার নামাজ পড়লেন (৩য় নামাজ) এবং রছুলও তা-ই করলেন। তার পর জেব্রাইল (আ) আবার নামাজ পড়লেন (৪র্থ নামাজ) এবং রছুলও তাই করলেন। তার পর জেব্রাইল

(আ) আবার নামাজ পড়লেন (৫ম নামাজ) ও রছুলও তা-ই করলেন। তার পরে রছুল (সঃ) বলেন, 'এটা কি আমার উপর আদিষ্ট হয়েছে ?'

(এ-কথা শোনার পর) উমর ইব্‌নে আবদুল আজিজ বলে উঠলেন "ওহে উরওয়া, যা তুমি বলছো সে সম্বন্ধে ভেবে দেখো। এতে কি প্রমাণ হয় যে রছুলের (সঃ) জন্য জেব্রাইলই (আ) নামাজের সময় (ওয়াক্ত) নির্দিষ্ট করেছিলেন ?" তার উত্তরে উরওয়া বলেন, "এভাবেই আবু মাসউদ্ আল্ আন-সারীর ছেলে বসির তার পিতার কাছে শুনে বর্ণনা করতেন।" তার পর থেকেই হাদিছে নামাযের উপর গুরুত্ব আরোপ করা কালে ছালাহ্‌ব (নামাজ) সংগে আল মিকাতিহা (ঠিক নির্ধারিত সময় মতো) বাক্যটি জুড়ে দেয়া হতো।

নামাজ পারশী শব্দ। কোরআনে আছে ছালাত। আর তা পড়ো নেই কোথাও, আছে আদায় করো, কায়েম করো, আর তা যে ছালাতের উপরোক্ত বিভিন্ন অর্থ মোতাবেক বিভিন্ন রকমে হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রছুলুল্লাহর (সঃ) জেব্রাইলের (আ) সংগে মিলনে (ছালাতে) মিলেজুলে একবার ঐ পাঁচবার আদায় এবং কায়েম হয়েছিল তা ঐ হাদিছের মর্মমূলে বোঝা যায়। আর আমরা—'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে 'মাজমা-উল-বাহরায়েন' প্রসংগে আর এক ছহি হাদিছ তুলে দিয়ে বুঝিয়েছি যে রছুলুল্লাহর (সঃ) পথ প্রদর্শক (পীর মোর্শেদ) জেব্রাইল (আ) যোগাযোগে কি ভাবে রছুলুল্লাহর (সঃ) আল্লাহর দীদার-মিলন (মোশাহেদা রাবেতার পূর্ণতায়—মে'রাজ) জামাল-জালাল হাল-হাকিকত হাছেল হয়েছিল, খোদেজার (রা) থেকে শোনা আয়েশা ছিদ্দিকার রওয়ায়েত সেই হাদিছটি পুরো দেখুন। কাজেই রছুলের (সঃ) উপরোক্ত নামাজের তাৎপর্য বোঝা যায়।

কিন্তু এও সত্য যে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া-প্রণালী (form) না থাক্‌লে সাধারণ মানুষ সে ধর্ম অনুশীলন কর্‌তে পারেনা, সুতরাং রছুলুল্লাহই (সঃ) ঐ জেব্রাইলি তালীম তাওয়াজ্জোহ্‌র গভীরতা জেকের ফেকের থেকে সাধারনের উপযোগী একটি সহজ প্রক্রিয়া-প্রণালী (form) দিয়ে গিয়েছিলেন, কোরআনের থেকে তার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়ঃ

فاذا قضيتم الصلوات فاذكروا الله قيما و قعولا و على جنوبكم - فاذا اطما ننتم فاقيموا الصلواة ان الصلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا-

আর যখন তোমরা ছালাত আদায় শেষ করো—(কিভাবে?) তখন আল্লাহর জেকের (ফেকের) করো দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে (যখন যেরূপ সুবিধে সুযোগ—সুতরাং ঐ জেকের ফেকেরেরও যে নিগূঢ় প্রক্রিয়া প্রণালী আছে তা বোঝা যায়) এবং যখন নিরাপদ হও (যেমন সেই জমানার যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে তেমনি সর্বকালীন সর্বজনীন সাংসারিক ঝামেলা মামেলা থেকে) তখন ছালাত কায়েম করো, নিশ্চয়ই এই ছালাত (নামায) বিশ্বাসীদের জন্য সাময়িক নির্ধারিত করা হলো।—নেছা ১০৩।

একাধারে আল্লাহর প্রার্থনা ও সেই জমানার জেহাদ করার প্রয়োজনে এক আদেশে দাঁড়ানো, বসা, সেজদা দেয়া ও উঠার জন্য অর্থাৎ এক সাময়িক সামরিক ট্রেনিং হিসাবেও ঐ নামাজের প্রক্রিয়া প্রনালী (form) দেয়া হয়েছিল। কারণ সেই সব জমানায় তো অন্য প্রকার সামরিক কুচকাওয়াজ আবিস্কৃতই হয় নি।

কিন্তু রছুলুল্লাহ্‌র (স) জমানা থেকেই যদি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত থাকবে তবে তা কোন কোন মযহাবী—যেমন ইসমাইলীরা—কী করে' অগ্রাহ্য করবে? আর উপরোক্ত কোর-আন-আয়ত, কি হাদিছ থেকেও তা পুরোপুরি ছাবেত হয়

না। ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় সেই জমানার ঐ সাময়িক সামরিক প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্সের।—বরং বোঝা যায় রছুলুল্লাহর (স) পরবর্তী জমানায় সকল মুসলমানকে এক ভ্রাতৃত্ববোধে এক জমাতের নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে আবদ্ধ করা ও রাখার জন্য এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ফলে রছুলের (স) জমানার ঐ প্রক্রিয়া প্রনালী (form) ক্রমে ক্রমে পাঁচ ওয়াক্তে পর্যবসিত হয়, আর উন্নত স্তরের ঐ জেকের ফেকের প্রণালী বিশেষজ্ঞদের জন্য নির্ধারিত থাকে, বিশেষ ঐ প্রক্রিয়া-প্রনালী জানা মহাজনদের থেকে তালিম-তাওয়াজ্জোহ্‌ সাপেক্ষ।

কিন্তু ভুলে গেছি আমরা ছালাতের অর্থ ঐ জেকের ফেকেরও আল্ কোরআনে যার ঐ সুস্পষ্ট আদেশ। আবার ওরই মারফত জেব্রাইলের (আ) এবং রছুলের (স) একদা ঐ পাঁচ বার যোগাযোগের মাধ্যমে আল্লাহর হাকিকত ও মারেফাত হাছিল হয়। তারি থেকে সাধারনের উপযোগী احمد (আলিফ, হে, মীম, দাল অক্ষর) প্রতীক হিসাবে নিয়ে ঐ নির্ধারিত ছালাত (নামাজ) করা হয়। কিভাবে? নামাজে দাঁড়ান ঠিক আরবী 'আলিফ' অক্ষরের মতো। রুকু দেয়া ঠিক 'হে'র মতো, সেজদা ঠিক 'মীমের' মতো এবং বসা ঠিক 'দালের' মতো। হয় ঐ احمد। (আহমদ)। তাৎপর্য হলো ঐ আকায়েদ অনুকরণ করে' ওর মূল হাকিকত মারেফাত যে রাবেতা অর্থাৎ ঐ আহমদকে ধরে আহাদের (এক আল্লাহর) সংগে সম্পর্ক স্থাপন—তা-ই হাছিল করার তাকিদ অনুভব করা।—কিন্তু এসব না জানলে, না শুনলে না মানলে কী তাছির হবে, কী তাকিদ হবে, কী হাছিল হবে! 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ, প্রবন্ধের 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' 'মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন' 'বেলায়ত-নবুয়ত' ও 'পরিশিষ্ট' দেখুন। আর জাহের ঐ ছালাতের (নামাজ) মতো, জাহের ছিয়াম (রোজা) হজ্জ

জাকাত কোন কোন মযহাবীদের দলিলে না-ই কেন, আদায় করেনা কেন তা-ও ক্রমে ক্রমে সব প্রবন্ধগুলো পড়ে পুরোপুরি বুঝুন।

আরো : ইস্‌লাম কি শুধু এই দেশে? ইরাক, ইরান, লেবানন, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের বিচিত্র ইস্‌লামী জীবন-ব্যবস্থার কথা শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবেন। তুরস্কের কথাই ধরুন!

আনকারায় ছোট হতে বড়ো যে কোন প্রকার হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে গিয়ে বসা মাত্র বেয়ারা এসে প্রশ্ন করে 'কোন প্রকার শরাব চান' এবং এইটেই যেন হচ্ছে তাদের পহেলা প্রশ্ন। রেষ্টুরেন্ট বা হোটেলে বসে আশেপাশে তাকালে দেখা যাবে প্রত্যেক ছেলে মেয়েই খাবার খাচ্ছে ও শরাব পান করছে। শুধু কি তাই? আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সাথে সাথে তস্‌বিহ্‌ও জপছে। একদিকে রেকর্ডের গান শুনছে আর শরাব পান কর্‌ছে, আর অন্যদিকে খটখট করে' তস্‌বিহ্‌ও জপছে।—আনকারার পথে, অধ্যাপক শরাফত আলী সিকদার। নরনারী প্রসংগে আরো দেখুন।

বলি না যে ঐ তুর্কী মুসলিমদের অনুকরণ করুন, শরাব টরাব পান করুন, ওদিকে তসবিহও টিপুন, সংগে সংগে রেকর্ডের গান বাজনাও শুনুন। আমাদের এ সব উদ্‌ধৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বোঝানো যে দেশে দেশে বিচিত্র মুসলিম-জীবন। আর কী ভালো কী মন্দো, কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য বিচার বড়ো দুরুহ ব্যাপার। সে সংকীর্ণতা অচল।

সুতরাং কাফের, ফাসেক সহসা কাউকে বলা যায় কি? যায় না। উচিত কি? উচিত নয়? বরং সে বিচার-ভার স্বয়ং বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি যিনি বানিয়েছেন, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ইস্‌লামী আকিদা ও আচরণ যার ধর্মগ্রন্থ থেকেই নেয়া, সেই বৈচিত্র-বিলাসী মহাপ্রভুর উপর ছেড়ে দিয়ে মানুষ হিসাবে সবাইকে সমান বিবেচনা কর্‌লেই তো লেঠা চুকে বুকে যায়; গোলমাল,

গোঁজামিলের শিকস্তি (শেষ) হয়।—'বৈজ্ঞানিক ও কোরাণিক বিবর্তনবাদের বেলারত-নবুয়ত' এবং শেষ প্রবন্ধের উপসংহার ও পরিশীলন দেখুন।

(১০) ৪৪ পৃষ্ঠায় 'শির্‌ক্' সম্পর্কে বলা হয়েছে: "কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে মানুষের ভাগ্যের মংগলের স্রষ্টা একজন এবং অমংগলের স্রষ্টা অপর জন।" কিন্তু ঐ শির্‌ক্ (অংশীবাদ) কি উপরে ঘোষিত শয়তান, ফেরেশতার ঐ তথাকথিত অমংগল, মংগল করার ধারনায় করে' রাখা হয়নি? বিচার করুন।

(১১) ৬৩ পৃষ্ঠায় আখেরাত সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে 'বরযখ' সম্পর্কে এই আয়ত তুলে দেয়া হয়েছে:

و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون -

'এবং তাদের সম্মুখে একটি মধ্যবর্তী জীবন আছে, তা তাদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাক্‌বে'।—মোমেনুন ১০০।

কিন্তু আগেই বলেছি কোনরূপ 'বরযখ' অর্থাৎ 'মধ্যবর্তী সময়' পর্যন্ত রুহ্ টাঙানো থাক্‌তে পারে না, তা অর্বাচীন, অবিশ্বাস্য মতবাদ। কিন্তু এখানে যে বল্‌লো? কিন্তু আর একটু মনোযোগ দিয়ে আয়াতের মর্মমূলে পৌঁছতে পারলে বোঝা যাবে যে আদম হাওয়ার (আ) অধ্যাত্ম পতন পর যে আত্মিক উদ্‌বর্তন হয়েছিল, এখানে এবং এরূপ সবখানেই সেই আত্মিক পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী হাল-হাকিকত ও ঐ উত্থানের কথা বলা হয়েছে। আবার পৃথিবী জীব ধারনের উপযোগী না থাকলে সেই সময়কার শেষ মানব-গোষ্ঠি যারা এন্তেকাল ফর্মাবেন আখেরাতেই (পরকাল) তাদের ঐ প্রকার ক্রম আত্মিক বিবর্তন চল্‌তে থাক্‌বে এবং একদা পুনরুত্থান হবে। তার আগেও অম্‌নি হতে পারে। ইহ পরকালে প্রয়োজন মতো তা-ই চল্‌ছে। এরূপ ধারনাই সম্পুর্ণ বিজ্ঞান সম্মত, শিল্প-দর্শন-সংগত। আল্ কোরআনও তাই বলে:

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام -

এর (অর্থাৎ পৃথিবীর) উপর যা আছে তা ফানা (ধ্বংস) হয়ে যায় (এবং একদিন পৃথিবী পৃষ্ঠের সব জীবই যাবে, তাও ঐ আয়াত থেকে বোঝা যায়) থাকে (এবং থাকবে) কেবল তোমার মহীয়ান গরীয়ান প্রভুর আনন (অস্তিত্ব) ।—রহমান ২৬।

বিজ্ঞানও তো বলে যে পৃথিবী ক্রমশঃ শুষ্ক শূন্য হয়ে চাঁদ, কি মংগল গ্রহের মতো হয়ে থাকবে, জীবন ধারণের মতো অবস্থায় একদা আর থাকবে না।

এ রকম সর্ব আয়াতের সংগত ব্যাখ্যা দিন। ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প সব দিক বজায় থাক্‌বে। নতুবা ধর্মের নামে হবে গোঁজামিল, ধর্মের মোহে হবে কুসংস্কার। তাতে করে' ইহকালেও ফায়দা নেই, পরকালেও নেই।

শিল্প সংস্কৃতি

নিছক ধর্মীয় আচরণগুলোর চেয়ে বড়ো এবং সত্য তার ঐ সাংস্কৃতিক দিকটা অর্থাৎ ও সম্পর্কে মনীষির—গতানুগতিক নয়—দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা অর্থাৎ দার্শনিক সাহিত্য এবং কবির অবদান সংগীত, কাব্য, শিল্পীর শিল্পকলা প্রভৃতি। ভারতে মুসলমানদের এই কৃষ্টির মৃত্যু, কি মৃত প্রায় অবস্থা লক্ষ্য করেও আমরা বুঝতে পারি কায়েদে আজম কতো বড়ো দূরদর্শী ছিলেন। তাই সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার, তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে গেছেন পাকিস্তান সৃষ্টি করে'। আর সাহিত্য, শিল্প-কলা, দর্শন বিজ্ঞানে এমনি বৈশিষ্টই তো আসলে এক এক সংস্কৃতি এবং সব মিলেমিশেই এক এক সভ্যতা। ঐ ভিত্তিমূলে প্রকৃত প্রতিভাবান ব্যক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক সাহিত্য, শিল্প-কলা, দর্শন-বিজ্ঞানাদি সৃষ্টিও সম্ভবপর। পাকিস্তানের কৃষ্টি হবে এমনি বৈশিষ্টপূর্ণ, আবার তদূর্ধে সর্ব মানবিক ঐশ্বর্যে ভরপূর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও এই কৃষ্টির কোন কোনটির বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া দিতে পাকিস্তানী ধর্মীয় (আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-হীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন) পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির অভাব হয় না। স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটিই হচ্ছে দেশের খোদাদাদ—এই প্রতিভাসমূহ বিকাশেরও পীঠস্থান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য যেমন শরীর চর্চার—ব্যায়াম ও খেলাধুলার —দরকার আছে, যেমন হাতে কলমে ডাক্তারী, কৃষিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কারিগরি বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি মনের স্বাভাবিক সুষ্ঠু সুন্দর বিকাশের জন্যও দর্শন, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য —কাব্য, সংগীত, নভেল, নাটক (অভিনয় ও সিনেমা-শিল্পাদি সহ) প্রভৃতি, সুকুমার শিল্প-কলা (Fine Arts)—নৃত্য-কলা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সূচীশিল্প প্রভৃতি—ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচনে —যার ভিতরে খোদাদাদ যে প্রতিভা রয়েছে সুপ্ত—তাদের অনুশীলনেরও রয়েছে জরুরাত, এবং তা আত্মার ধর্ম। কারণ, ধর্মের যিনি স্রষ্টা ও লক্ষ্য সেই বিশ্ব প্রভুই তো জনে জনে ঐ প্রতিভা, প্রজ্ঞা, প্রকৃতি দিয়ে থাকেন। যাদের কোনটাই দেন নি তারাও তো ঐ অবদান থেকে হয় উপকৃত, সেই ঝোঁকটাও তো বিশ্ব-স্রষ্টার দান। সুতরাং এই মননশীলতা ও মানসিকতা বিকাশের অন্তরায় হওয়া সেই বিশ্ব-দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা—সর্ববিধ গুণ ও জ্ঞানের আকর—বিশ্ব-স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করা কিনা, চিন্তা করুন ['শিল্প-সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ দেখুন]। আর তাঁকে জানবার চিন্‌বার, বুঝবার প্রধান উপায় ঐ কি না, তাও ভাবুন। প্রধানতম উপায় হচ্ছে, অবশ্য, সত্যিকার অধ্যাত্ম পন্থা, তার কথা এক্ষেত্রে নয়, অন্যত্র। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ দেখুন।

আমরা বিশেষ মর্মাহত হই যখন শুনি যে কোন প্রাদেশিক সরকারও এর বিরুদ্ধে ফরমান জারী করেন, এর উপর হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু সংগীত, নৃত্য কলা, নাটক, সিনেমা শিল্পাদি ছাড়া

কি এ-জমানায় কোন দেশ চলতে পারে এবং চলবে? কোন জমানাই কি প্রকৃত পক্ষে চলেছিল? ইস্‌লামিক কালচারের ইতিহাস পড়লেই তা জানা যায়। আর স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি ছাড়া এগুলোর সুষ্ঠু শিক্ষা আয়তন, অনুশীলন ও বিকাশস্থল আর কোথায়? অবশ্য ছেলেমেয়েদের একত্রে সংগীত শিল্প, নাচ-গান নাটক-অভিনয়াদিতে অংশ গ্রহণে পদস্খলনের ভয় থাকে এই ওজুহাত তোলা হবে। কিন্তু শিশু হাটতে গেলে আছাড় খাবে সেই ভয়ে তার হাটা বন্ধ ক'রে' রাখার কথা কেউ কল্পনা করতে পারেন কি? পারেন না। তা হলে সে হাটা শিখবে কী করে? কিংবা সাঁতার শিখতে গেলে ডুবে মরার ভয় আছে, সে জন্য কি সাঁতার শিক্ষা কর্‌তে পানিতে নাম্‌তে দেবেন না? আসলে ঐ দুই ক্ষেত্রে আমরা করি কী? চোখ রাখি যাতে করে গুরুতর আছাড় খেয়ে শিশু হাত পা না ভাঙে, যাতে করে নতুন সাঁতার শিক্ষা-নবীশ ডুবে গিয়ে প্রাণ না হারায়। তেমনি সকল শ্লীল সাহিত্য, শিল্পকলা চর্চার বেলায়ও অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সুতীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে যাতে করে' ছেলেমেয়েরা পথভ্রষ্ট, সুন্দর যুথ-ভ্রষ্ট না হয়। কাল্পনিক ভয়ে এবং নিজেদের তত্ত্বাবধান-ত্রুটির দোষে দু'একটি পদস্খলন দেখেও ছেলেমেয়েদের প্রকৃত আত্মধর্ম অনুশীলনের, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় হতে পারেন না। মধ্য যুগীয় মছলা-মছায়েল এ সম্পর্ক শিকেয় তুলে থুইবার দিন এসে গেছে। অকেজো, অবাস্তব ফতোয়ার জোর খাটানোর অর্থ হবে মানবিক ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা—যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের জন্মগত অধিকার, যা আল্লাহর অবদান —অবশ্য আমি উচ্ছৃংখলতার কথা বলছি না তা বুঝতেই পারছেন। তেমন ক্ষেত্রে অনৈছলামিক পণ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি অহেতুক অনাবশ্যক প্রাতিবন্ধকতা বাদ দিয়ে, বর্জন করে উপযুক্ত বয়সী পরস্পুর আসক্ত ছেলেমেয়েদের বিবাহিত জীবন যাপনের

ব্যবস্থা করে' দেয়াই হবে সব দিক দিয়ে সংগত—স্বাস্থ্য সম্মত, শাস্ত্রানুমোদিত ('আল্ কোরআনে নরনারী' গ্রন্থের ইনতেজার করুন)। তবুও আল্লাহর দেয়া ঐ ব্যক্তিত্ব বিকাশের ও প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, দাঁড়ালে একদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আদায় করে নিতে এগিয়ে আস্‌বে ; বস্তা-পচা, অকেজো, অনাবশ্যক, অহেতুক অন্যায় ফতোয়া ফরমান তারা একদিন আত্ম-তত্ত্ব ও সত্যের সন্ধান পেয়ে ছিড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। কারণ, যে আত্ম-তত্ত্ব জেনেছে সে-ই তো স্রষ্টা-তত্ত্ব জেনেছে من عرف نفسه فقد عرف ربه যিনি নিজকে (নিজের অন্তর্নিহিত গুন, জ্ঞান, শান) জেনেছেন তিনি (ঐ সবের মূল, আকর) স্বীয় বিশ্ব-প্রভু-সত্তাকে জেনেছেন।—হাদিছ। এ সত্য জ্ঞান যে দিনই যার পুরো মাত্রায় জাগে, সেদিনই সে ঐ হাদিছের প্রকৃত মর্ম না বুঝে যে অজ্ঞানতা, আর তার ফলে যে বিরুদ্ধাচরণ, তা বরদাস্ত করতে পারে না। তার আগেই তাদের সঠিক সত্য কৃষ্টি ও সৃষ্টি-মুখর করে তুলবেন কি না সুষ্ঠ সুপরিচালনাধীনে সুশিক্ষা-দীক্ষা-মারফত, তাও আজ জিজ্ঞাস্য।

নর-নারী—

বলা বাহুল্য, দেশের ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল সুনাগরিক নর-নারী গড়ে উঠবে কিভাবে যদি ছেলেমেয়েদের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার-সিটির সুস্থ সুন্দর পরিবেশে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সে রকম দায়িত্ব বিকাশের, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ সুবিধে এবং ট্রেনিং দেয়া না হয় ? তবে দেশই বা উন্নত হবে কাদের দ্বারা ?

অধিক আরো : মেয়েদের সুবিমল সাহচর্য সংশ্রব-হীনতায় ছেলেরা এবং ছেলেদের সুবিমল সাহচর্য সংশ্রব হীনতায় মেয়েরা সাধারণতঃ অস্বাভাবিক হয়ে গড়ে উঠে অর্থাৎ আত্মরতি (স্ব

মেহনাদি), সমকামিতা, মনুষ্যেতর কামিতা প্রভৃতি নানা জটিল যৌন বিকৃতি (Sex Complex) দেখা দেয়, যে কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই ভুগ্‌ছে এবং শারীরিক, মানসিক ভারসাম্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, স্বস্তি হারাচ্ছে। পরস্পর সহযোগিতায় যে সৌন্দর্য বুদ্ধি (aesthetic sense), শালীনতা, সভ্যতা, ভব্যতা জন্মে তার থেকে তো বঞ্চিত হচ্ছেই। ফলে উন্নত রুচি বিকশিত হতে পারছেনা, সাহিত্য—কাব্য, নাটক, নভেল, চারু ও কারুশিল্প—প্রভৃতির তো অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছেই। ওদিকে তুরস্ক, মিশর, ইরান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান প্রভৃতি আফ্রো-এশীয় অপর দেশ সমূহ নর-নারীর পরস্পর মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে কায করার ফলে দিন দিন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির চরম শিখরে সব দিক দিয়ে উঠে যাচ্ছে। নর-নারী নিয়েই সংসার, সমাজ। সুতরাং এককে বাদ দিয়ে অপর চল্‌তে পারে না। তাতে করে কোনদিনই কারো উপকার হয় না, হতে পারে না, দেশের ও না, রাষ্ট্রের ও না, এ কথা গুলো এখন ভেবে দেখবার দিন এসে গেছে। কারণ, নর-নারীকে আল্লাহ্‌তালা পরস্পর পরিপূরক করেই পাঠিয়েছেন। তারা যেমন সুযোগ্য বয়সে সুযোগ্য ক্ষেত্রে পরস্পর বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত সুশিক্ষিতা সুযোগ্য সুযোগ্যা পিতামাতাও হবে, তেম্‌নি দুনিয়ার অপর সৃষ্টি-ক্ষেত্রেও তাদের সুযোগ্যতার সুশিক্ষার সু-প্রশিক্ষনের সুপরিচয় দিতে হবে, সুপ্রমাণ দিতে হবে, তবেই দেশ, জাতি, সমাজ, ফলে দুনিয়া হবে ক্রমে ক্রমে সব দিক দিয়ে সমুন্নত, সুসভ্য।—এই বিজ্ঞানের যুগে—যৌন বিজ্ঞান যার সুবিদিত অংগ—আমরা নর-নারীকে শুধু মাত্র সন্তান জন্মদানের যন্ত্র (child producing machine) হিসাবে বিবেচনা কর্‌তে পারিনে, বিশেষ করে' নারীদের। সুষ্ঠু যৌন-বিজ্ঞান পাঠ্য তালিকার মাধ্যমে সুযোগ্য বয়সে ক্রমে ক্রমে তাদের নিজেদের জীবনটার অপর সকল দিকের সংগে সংগে যৌন দিকটাও ভালো রকমে জান্‌তে হবে। তাতে

করেই সম্ভবপর ছাত্র-ছাত্রী জীবন-শেষে সুশিক্ষিত গৃহী, সুশিক্ষিতা গৃহিনী, পিতা মাতা হিসাবে কর্তব্য পালন ও সাধন। ওদিকে বিশ্ব-বিধাতাই হয়তো সকলকেই যৌন-জীবনের ঐ যোগ্যতা দেননি। দিয়েছেন হয়তো অপর দিক দিয়ে নিছক গুণ, জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি কৃষ্টির প্রবনতা, প্রাবল্য। কিংবা শারীরিক কারিগরী কর্মক্ষমতা, কিংবা ঐ সকলই কারো কারো মধ্যে রয়েছে ওত প্রোত জড়িত। এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে' ভেবে চিন্তে জীবনের কর্তব্য করণীয় বাচনিক করে নেয়া দরকার, নিতে হবে। প্রাচীন কাল—যখন যৌন বিজ্ঞান আবিষ্কৃতই হয় নি, কি সুষ্ঠুভাবে গড়েই উঠেনি—সেই সব যুগের কেবল স্থূল-জীবন ব্যবস্থা এ বিবর্তিত জমানায় অচল, তা বোঝবার দিন, পরিত্যাগের কিংবা সংস্কারের দিন এসে গেছে।

সমাজে অনেক যৌন দুষ্কৃতি ঘটে যৌন বিকৃতির কারণে। ছাত্র ছাত্রী জীবনেই যাতে করে যৌন বিকৃতি না জন্মে মাঝে মাঝে যৌন বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখ্‌তে হবে। জন্মিলে সুচিকিৎসা করে' তা সারিয়ে দিতে হবে। যাদের কিছুতেই সারবেনা অর্থাৎ নিজেদের অতি অনাচার অপকর্ম দোষে, কি জন্মগত যারা অস্বাভাবিক (abnormal), তাদের এ পরীক্ষা নিরীক্ষা মারফত যৌন ক্রিয়া ক্ষমতা বিরহিত (sterile নির্বীজন প্রভৃতি) করে' দেয়াই হবে সব দিক দিয়ে সংগত, যাতে করে' তাদের দ্বারা কোন রকম যৌন কেলেংকারী ঘট্‌তে না পারে, বিয়ে শাদী করে' আবার ঐ রকম অস্বাভাবিক (অথর্ব, পংগু, রোগাক্রান্ত) ছেলেমেয়ে জন্ম দিতে না পারে।

এই সভ্য জমানায়ও পৃথিবী যৌন-অংগ-বিক্রয় ব্যবসার মতো অভিশাপ হতে, অতি জঘন্য পশুজনোচিত নীচতা হতে রক্ষা পায়নি। ফলে শুধু পাপ এবং অপব্যবহার নয়, জটিল রতিজ রোগ নিয়ে পৃথিবীর সব দেশই কম বেশী সমস্যা-গ্রস্ত। এর

কতকগুলো রোগ আবার বংশ-ধারায় বহমান—মৃত, পংগু, বিকলাংগ সন্তান জন্মদানের জন্য দায়ী। বংশগত অনেক উন্মাদ রোগের কারণও ঐ। এ সব অভিশাপ থেকে দেশ, জাতি ও পৃথিবীকে বাঁচানোর কোশেশ অবশ্য করতে হবে।

কতো কিছু করবার আছে এই বিজ্ঞান-যুগে। কিছুই করবেন না, মাঝখানে আল্লাহর দেয়া গুণ, জ্ঞান, শান যা সুষ্ঠুরূপে বিকশিত হতে পারে, হয়ে থাকে ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক সুবিমল সাহচর্যে সহযোগিতায় সমঝোতায় তা'—অস্বাভাবিক, অচল আয়তনী অবিজ্ঞ সমাজ-ব্যবস্থার ভাবালুতায় ভেসে গিয়ে—বন্ধ করতে আসবেন। বলি হারি বদ্ধ বুদ্ধি ও স্থূল যুক্তির বহর! কিন্তু আল্লাহ্‌র দেয়া গুণ, জ্ঞান, শান বিকাশে ও প্রকাশে বাধা দান কি গোনাহ্‌ কবিরা নয়? ভেবে দেখ্‌তে অনুরোধ করি এবং জিজ্ঞাস্য—এ অজ্ঞানতা, অন্যায় ও অপরাধ আর কতোকাল!

যে যৌন কেলেংকারীর ভয়ে আমরা এতো ভীত, আর সে রোগের মূল ও নিদান কোথায় তা না ভেবে পর্দার নামে অতি অবরোধ মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়েছি তার কতোদূর প্রয়োজন ও বিজ্ঞান-সম্মত তারও সঠিক বিচার ও পুনঃ ব্যবস্থা দান এ জমানায় অতি আবশ্যক।

অবরোধের যে ব্যবহারিক অসিদ্ধতা, অনুপযোগিতা ও প্রায়শ্চিত্ত তার বহু নজির উল্লেখ করেছেন মহীয়সী নারী মরহুম আর, এস, হোসেন (রোকেয়া বেগম) তাঁর 'অবরোধ-বাসিনী' গ্রন্থে।—তা পুনঃ পুনঃ দেখুন। আর এই বৈজ্ঞানিক কলকারখানা, বাষ্পীয় শকট, এরোপ্লেন, রকেটের যুগে অর্থাৎ এই দুরন্ত চলমান দুনিয়ায় আর বোরকা পরে, কি অপর অতিরিক্ত পোষাক-আশাক পরে নারীদের জবুথবু হয়ে চলার দিন আছে কি? তাতে করে যে এই প্রগতি-মুখী দেশে—যেখানে নরনারী সবাইকে যখন অন্ততঃ পেটের টানেও কাজ করতে হচ্ছে—সে দেশে পদে পদে পথে পথে নারীদের সংগে সংগে যে তার অর্ধাংগ পুরুষদেরও বিড়ম্বনা, বেদনা সহ্য করতে

হচ্ছে, পিছু হট্‌তে হচ্ছে, তাও কি আর অবিশ্বাস্য, অস্বীকার্য? আলো বাতাসের অভাবে অবরোধ বাসিনীদের রোগ ব্যাধি, মৃত্যু, শিশু মৃত্যুর হারের কথা না হয় না-ই তুল্‌লাম।—বোরকার অভ্যন্তরে ঘর্মাক্ত কলেবরদের পথ-চলার কষ্টের সংগে সংগে অতি আবৃত থাকার কারণে নানা রোগাক্রমণের কথা না-ই বল্‌লাম। সূর্য কিরণ ও নির্মল বাতাস শরীরে রোগ ব্যাধি প্রতিষেধক। বোরকা পরিয়ে তা বন্ধ করে আমরা নারীদের সে সুযোগ সুফল থেকে বঞ্চিত করে' আসলে ধর্মের নামে অধর্ম করছি কি না তারও বিচার করুন। আর পোষাক? পুরুষ মুসলিমদের পোষাক যদি হয় পায়জামা. পাঞ্জাবী, শার্ট, শেরওয়ানী, টুপী কি শীত মওছুমে শেরওয়ানী, পায়জামা, টুপী, পেণ্ট, শার্ট, সোয়েটার, কোট (দরকারে আলোয়ান, শাল, ওভারকোট) ইত্যাদি,—তবে মুসলিম মেয়েদের বেলা কেন যে শাড়ি, চাদর, কুর্তা হবে, বলতে পারেন কি? ওতো হিন্দু মেয়েদের পোষাক। মুসলিম মেয়েদেরও ইস্‌লামী পোষাক পায়জামা, কি শালওয়ার, কামিজ, ওড়না; শীত মওছুমে অতিরিক্ত সোয়েটার, দরকারে আলোয়ান, কি অলষ্টার (ওভারকোট) ইত্যাদি।

অবশ্য তুরস্কের মুসলিম পুরুষরা অনেকটা ইউরোপীয় পোষাক পেণ্ট, শার্ট, কোট, কি ওভারকোট (শীত মওছুমে) পরেন এবং মেয়েরা অনেক সময়ে হাটুর উপর স্কার্ট পরেন, গায়ে গেঞ্জী, হাওয়াই শার্ট, কি কামিজ পরেন, শীত মওছুমে ওভারকোট চাপান।

তুরস্ক মুসলিম নরনারীর ঐ অনুকরণ করতে আমরা বলি না।—কিন্তু আমাদের দেশে নারীদের এতো রাখা-ঢাকার মধ্যেও যে মাঝে মাঝে চাঞ্চল্যকর নারী হরণ, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি শুন্‌তে পাই ও দেশের মেয়েরা ঐ রকম অর্ধ উন্মুক্ত পোষাক আশাক পরে দিনরাত রাস্তায় চলাফেরা করে, নানা অফিসেও কায করে, কিন্তু অনুরূপ যৌন কেলেংকারী নেই। সুতরাং রোগের মূল ও নিদান কোথায়, প্রতিকার কী, জিজ্ঞাস্য।—একজন প্রত্যক্ষদর্শীরই বিবরণ শুনুন।

মনে হয় (আনকারায়) অফিস কর্মচারীদের শতকরা ৩০ জনই মেয়ে। কিন্তু বড়োই সুখের বিষয় এই যে কোথায় একটা অঘটন ঘটেছে বলে' আজ পর্যন্ত শুনতে পাইনি। তাই বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি তাদের জাতীয়তাবোধ ও নৈতিক চরিত্র দুটোই বেশ উন্নত ধরনের। এ দেশের (তুরস্কের) ছেলেরা মেয়েদের বেশ সম্মান করে, অন্য দিকে মেয়েরাও ছেলেদিগকে বেশ সম্মানের চক্ষে দেখে। Conservative (রক্ষনশীল, পর্দানশীন শব্দটা) এদেশে প্রযোজ্য নয়, কারণ মেয়েরা যেখানে সেখানে সর্বদাই স্বাধীনভাবে চলাফিরা করে।—আনকারার পথে, অধ্যাপক শরাফত আলী সিকদার; ইতিপূর্বে ইছলামিয়াৎ ৯নং প্রসংগে আরো দেখছেন।

ঐ দেশের ঐ ছেলেমেয়েরা কি মুসলিম নয়?

কাজেই বিজ্ঞানকে (যৌন বিজ্ঞান সহ) এবং দর্শনকে (সকল রকম সুশ্লীল সুশীল সাহিত্য-শিল্প-কর্ম-সহ) সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও তুরস্কের মতো জাতীয়তা বোধ, নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতে সর্বত্র খাটাবেন কিনা, না বাষ্পীয় শকট, এরোপ্লেন রকেট, এটমিক এনার্জির জমানায়ও সেই শুধু মাত্র পায়দল, উট, ঘোড়ার জমানার স্বপ্নই দেখ্‌বেন, তা-ই ব্যবহার-যোগ্য সর্বত্র এখনো ঘোষনা করবেন, জিজ্ঞাস্য।—'শিল্প সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধও পাঠ করুন।

উপসংহার

বলা বাহুল্য, সেকেণ্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট (পূর্বেকার হাই স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষার ইস্‌লামিয়াৎ শিক্ষায় যখন এরূপ দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-চর্চা বিরোধী বিষয়-বস্তু, তখন মাদ্রাসা শিক্ষায় যে কতো গলদ তা সহজেই অনুমান করা যায়। অধিক কি, ঐ বিষয়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত এবং অধিকতর আই. এ., বি., এ.,

এম. এ. এমন কি ডক্টরেট পর্যন্ত ঐ বিষয়ে যে পাঠ্য তালিকা (সিলেবাস) তা তো এর চেয়েও বেশী দর্শন বিজ্ঞান শিল্প সংস্কৃতি বিরোধী শিক্ষা, কারণ বৃক্ষের মূলই যখন এতো পোকায় খাওয়া তখন তার কাণ্ড শাখা প্রশাখা তো তারি প্রতিক্রিয়া প্রতিচ্ছবি আরো বেশী বহন কর্‌ছে; সে সিলেবাস সমূহ না দেখেশুনে না পড়েশুনেও অনুমান করা যায়! প্রকৃত গোমরাহীর কারণ ও ব্যাপার সম্পূর্ণ আঁচ করা যায় (দেখুন পূর্বেই ১৪-৩৪—পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এক অনুরূপ পণ্ডিত প্রবরের কীর্তি কাণ্ড)। সুতরাং ইস্‌লামিক একাডেমী কি ইস্‌লামিক ইডিয়োলজিক্যাল (আদর্শ সংস্থাপক) কাউন্সিল মারফত সুষ্ঠু সুবিজ্ঞ ইস্‌লামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুল্‌তে এ সকলেরই সংশোধন, সংস্কার করা কি সম্ভবপর নয়, অচিরাৎ উচিত নয়? জিজ্ঞাস্য।

এরূপ অপর সকল ধর্মবিশ্বাস ও আচরনেরই অসিদ্ধতা ও এ-দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প-কলা সংস্কৃতির জমানায় অসারতা অচলতা প্রমাণ করে' দেখিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তার কী প্রয়োজন আছে? প্রসংগত যেটুকু উল্লেখ না করলে নয় মাত্র ততো টুকুই করা গেলো (দ্রঃ 'প্রস্তাবনা' ও 'দর্শন বিজ্ঞান' প্রসংগ) তাদের সকল কুরীতি নীতি, কুসংস্কারের সংশোধন সংস্কার সেই সেই ধার্মাবলম্বীদেরই করা উচিত এবং অচিরাৎ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি, তা-হলেই প্রকৃত প্রাজ্ঞ পাকিস্তানী মানব সমাজ গড়ে উঠ্‌তে পারে। কেননা আমরাও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শুরু করে' আমাদের মুস্‌লিম সমাজের সবখানে সচল ও ডালপালা-মেলে-বসা সকল কুসংস্কার, কুরীতি নীতির মূলোৎপাটন দাবী করছি এবং প্রকৃত গুণ ও জ্ঞানের প্রসার প্রভাব কামনা করছি এবং সেই কোশেশ করছি যাতে করে সুস্থ সচ্চরিত্র—সব দিক দিয়ে সার্থক সুন্দর—গুণী জ্ঞানী মানব-সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

তা হলেই. আমরা মনে করি, আমাদের তামাম পুস্তকে যুগানুপাতিক সকল জিজ্ঞাসার জবাব যে ভাবে আমরা দিয়েছি তাতে করেই মাত্র প্রমাণিত হতে পারে যে ইস্‌লাম সত্যই Dynamic Religion and Culture—চির-চলিষ্ণু ধর্ম ও দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক সংস্কৃতি—যুগে যুগে জাগ্রত যে কোন দেশ কাল পাত্রের সকল সমস্যার সমাধান সে দিতে পারে ও চিরকাল পারবে—সুতরাং এক মাত্র জীবন্ত বিশ্ব-ধর্ম, বিশ্ব-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প—সংস্কৃতি। নচেৎ কিস্‌সা কাহিনী হিসাবে অদার্শনিক, অবৈজ্ঞানিক, অশৈল্পিক পর্যায়ে যা কিছু আমরা বিশ্বাস করি এবং আচরণে প্রকাশ করি তাতে করে' নিত্য নব নব দেশ কাল পাত্রের, এমন কি ঊর্ধলোকের যেখানে দিন নেই রাত্রি নেই, স্থান নেই, কাল নেই, কিংবা থাক্‌লেও তা পার্থিব ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে একেবারেই অচল, এবং এ-পৃথিবীরও চিরবিবর্তন মুখর সত্য-শিব (মংগলময়) সুন্দর দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতির—কোন সমস্যার সমাধান তথা জিজ্ঞাসার জবাব সে দিতে পারবেনা, সুতরাং টিকে থাক্‌বে সে কিসের জোরে ? টিকে থাক্‌বেই বা কেন ? থাক্‌বেই না একদিন !

সুতরাং আনুমানিক কল্প-কথা, কিস্‌সা কাহিনী কোন্‌গুলি ? আমরা যা দেখালাম—যে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শৈল্পিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিলাম, তা-ই ? না, প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক, অদার্শনিক অশৈল্পিক তর্‌জমা-তফসিরগুলো ? তারও পরখ করে সত্যিকার ফায়ছালা বের কর্‌তে পারবেন কারা ? যারা ধর্মেরও 'কী ও কেন'র উত্তর চির-হারাম, গোনাহ্‌ কবিরা, ছগিরা ঘোষনা করে রেখেছেন, তক্‌লিদ অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণ অনুসরণ করে চলেছেন, তারা ? না. যারা আল্লাহ্‌র দেয়া মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির (মনতিক-মোনাযরা) কষ্টি পাথরে সত্যি মিথ্যা যাচাই বাছাই করে' নিতে প্রস্তুত ও নিচ্ছেন, তারা ? তা হলে আসল ধর্ম,

দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি খুঁজছেন কারা? ফলকথা, সত্য ধর্ম-বিশ্বাস, সেই আচরণ, দার্শনিকতা, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য—এক কথায় সংস্কৃতি—সভ্যতা—কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে? 'আপছে আপ' যে জিজ্ঞাসা সমূহ মনে জাগে তার সঠিক জবাবে, খাঁটি তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধানে, অনুশীলনে? না, জিজ্ঞাসা নেই, জরুরাত নেই, পৌরানিক অসত্য, অবাক-করা কিস্‌সা-কাহিনী বিশ্বাস করে চলেছেন এবং সেই মোতাবেক অন্ধ কুসংস্কার পোষন করে চলেছেন, আর সেই রকম আচরণ কর্‌ছেন, অনুষ্ঠান পালন কর্‌ছেন - সেই মানুষগুলোর কাছে? সেই পথে?

শেষ মেষ: এ-হচ্ছে প্রজ্ঞা ও প্রাণবন্ত প্রশ্ন—বাইরে থেকে চাপানো প্রানহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-অনুশীলন করে' যারা চলেছেন, এবং আর একদল অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ফিরছেন পাচ্ছেন না, আর একদল গুণীজ্ঞানী, কিন্তু তথাকথিত ধর্মের সমর্থন সেখানে পাচ্ছেন না, তাই ধর্মকে নেহাৎ অযৌক্তিক মধ্যযুগীয়—এজমানায় অকেজো অচল ঠাওড়িয়ে—মুখ ফিরিয়ে চলেছেন—প্রভৃতি—সকলের সাম্‌নে পেশ করলাম আসল জবাব সমূহের প্রস্তুতি-পর্ব এ 'জিজ্ঞাসা'। আর ঐ সকল জবাবের এই প্রাণপুষ্প অঞ্জলি দিচ্ছি কার চরণে? তাঁরি উদ্দেশ্যে যিনি সত্যিকার ইহপরকালীন সকল সমস্যা সমাধানের মালীক, সকল জিজ্ঞাসার সঠিক জবাবদেনেওয়ালা এবং ভুলচুক মার্জনার গাফ্‌ফার (মহান মার্জনাকারী), গাফুরোর রাহিম (মার্জনাশীল দয়াল)।

পরিশিষ্ট

মুজাদ্দিদ

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমরা ভুলে যাই যে ধর্মসমূহও আসলে স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাবের বাইরে নয় আদৌ। কাজেই যে দেশে যে কালে যে পরিবেশে নাজেল সেই দেশকাল পরিবেশের ভাব ভাষা ওতপ্রোত ওতে জড়িত; আবার,— সেই দেশকাল পরিবেশে আবিস্কৃত, পল্লবিত, প্রসারিত দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলার প্রভাবাধীনও বটে। যুগে যুগে তাই নানা দেশকাল পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে' নিয়ে বিবর্তিত দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলা ও ধর্মের সমঝোতার সুপ্রয়োজন রয়েছে, এবং তারি নাম ইজতেহাদ—গবেষনা করে ধর্ম ও দর্শন-বিজ্ঞান সাহিত্য-শিল্পকলার (সংস্কৃতির) সমন্বয় সাধন। এ জন্যই আঁ হযরত বলেছিলেন: 'তোমরা গবেষনা (ইজতেহাদ) করো, যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছো তবে তোমাদের জন্য দুই ছওয়াব, যদি ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছো তথাপি এক ছওয়াব।' অবশ্য ছওয়াব অর্থ পুন্যফল; টাকা পয়সার মতো গোনা বাছার জিনিস নয়; সুতরাং ঐ এক, দুই, কি দশ ইত্যাদি ঠিক শাব্দিক অর্থে ধরলে তার কোন মানে মতলব হয় না। বুঝ্‌তে হবে ভাবার্থে। ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও সেই প্রচেষ্টার পুন্যফল এক কল্পনা কর্‌লে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে তার পুন্যফল হয় দুই (ডবল—দ্বিগুন), সে হিসাবে ভাবার্থে এক, দুই বলা।

প্রয়োজনে জমানায় জমানায় এ-রকম ইজতেহাদের পূর্ণাংগ হুকুম পাওয়া যায় নিম্নের ছহি হাদিছটিতে:

ان الله عز و جل يبعث لهذه الامة على رأس كل مياة سنة من يجدد لها دينها -

ইন্নাল্লাহা আজ্জা অ জাল্লা ইয়াবআছো লেহাজিহিল উম্মতে আলা রাছে কুল্লে মে'য়াতে ছানাতেন মাঁ ইয়ুজাদ্দেদো লাহা দীনাহা—মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ নিশ্চয়ই এই উম্মত মণ্ডলীর জন্য শতাব্দীতে শতাব্দীতে এমন কাউকে কাউকে পাঠাবেন যাঁরা তাঁদের (ঐ উম্মত মণ্ডলীর) জন্য তাঁদের ধর্মকে (দীন ইছলামকে) নূতন করে' যাবেন (ইয়ুজাদ্দেদো)।—আবুদাউদ। ঐ ইয়ুজাদ্দেদো থেকেই মুযাদ্দিদ—নূতনকারক, সঞ্জীবক,-তাজাকরণেওয়ালা, সংস্কারক!

এই কথাগুলিই শেখে আকবর (শ্রেষ্ঠপীর তথা মুজাদ্দিদ) মহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (১১৬৫—১২৪০ খৃঃ) বলেছেন এভাবে:

"নবুয়ত রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কেতাব দেয়া নবুয়তের একটি বিশিষ্ট কার্য। এটা অসম্ভব যে আল্লাহ্‌র সংবাদ ও সৃষ্টি-লোকের জন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। যদি তা বন্ধ হয়ে যায় তা হলে সৃষ্টি-লোক বেঁচে থাকবার শক্তি ও আহার পাবেনা।

দুনিয়াবী রেছালত (নব শরিয়ত দান) বন্ধ হয়েছে সত্যি। কারণ, আমাদের রছুল (স) তা বলে' গেছেন। কিন্তু তার কায চল্‌বে এই দুনিয়ায় ও পর দুনিয়ায়। এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই। যদি তা হতো তা হলে ওহীর মালীক (আল্লাহ) ও রছুল (স) অন্যের প্রত্যাদেশ (এলহাম) ও অন্তর্দৃষ্টির (কাশফের) কথা বল্‌তেন না। মৌমাছিরা রোজ-কেয়ামত-তক তাদের বাসা বাঁধবার ও মধু আহরনের জন্য ওহী পাবেই।

হযরত মোহাম্মদ (স) বলেছেন নবুয়ত ও রেছালাত বন্ধ হয়ে গেলো। তার অর্থ এই যে নবী ও রছুল পদবীগুলো শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু মুবাশ শিরিন বা সুসংবাদ দাতা ও মুজতাহেদীন, কি নব ব্যবস্থাদাতার (মুজাদ্দিদের) আগমন শেষ হয় নি। প্রত্যেক মুস্তাহেদের কেতাব আছে। শাফেয়ী কোডে যা নিষিদ্ধ, হানাফী

কোডে তা প্রচলিত। আবু হানিফা (র) যা নিষেধ করেছেন, আহমদ ইব্‌নে হাম্বল তা অনুমোদন করেছেন। তাঁরা নানা বিষয়ে এক মত হয়েছেন. নানা বিষয়ে দ্বিমত হয়েছেন, তবু আমরা জানি তাঁরা কেউ নবী বা রছুল ছিলেন না।

মোহাম্মদের (স) পরে আর নবী হবেন না—এর অর্থ হলো আর কোন নবী আস্‌বেন না (আল্লাহর) কেতাব নিয়ে। আর তার প্রকৃত তাৎপর্য হলো ঃ কিস্‌রা মরলে আর কিস্‌রা হবেন না, কিংবা কাইজার মরলে আর কাইজার হবেন না, কিন্তু তবু ইরানে ও রোমে এখনও সম্রাটেরা রাজত্ব করছেন।”—মুসলিম মনীষা ১২০ পৃঃ, ‘Ebnul Arabi, Ashraf publications ; Lahore.

এখন, ওহী মুলতঃ কী—এ সম্পর্কে আল্ কোরআন থেকে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা দিতে পারলে আশা করা যায় আপনারা ব্যাপারটা অনেকটা বুঝ্‌তে পারবেন।

وما كان لبسران يكلمه الله الا و حيا او من و رائى حجاب او
يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء - انه على حكيم -

—মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় যে আল্লাহ তার সহিত কথা বলেন ওহি ব্যতীত, অথবা অন্তরাল থেকে ভিন্ন, কিংবা (আল্লাহ) রছুল পাঠান, তিনি তাঁর (আল্লাহর) হুকুমে যা ইচ্ছে ওহি করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুমহান, পরম জ্ঞানী।—শুরা ৫১।

কাযেই চর্মচক্ষে আল্লাহর দীদার (দর্শন) মোলাকাত, মানব-মানবীর মতো দৈহিক প্রণয়-মিলন, মধু-যামিনী যাপন, বিরহ-মিলন, বাতচিত সম্ভবপর নয়। কী ভাবে সম্ভবপর তা আল্লাহই ঐ বলে’ দিচ্ছেন।

(১) আল্লাহর অপরিসীম শক্তিশালী (শাদীদুল কুওয়া) অছিলা জেব্রাইলের (আঃ) প্রেম-প্রেরণা আলিংগনে কী ভাবে ওহিসমূহ নাযেল হতো, কোরআন শরীফ ক্রমশঃ নাযেল হলো, তা আমরা ‘বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ’ প্রবন্ধের ‘মাজমা-উল্‌-

বাহরায়েন,' 'বেলায়েত নবুয়ত' ও 'পরিশিষ্ট' প্রসংঙ্গে পুরোপুরি বলেছি, তা' দেখুন।

(২) পর্দার অন্তরাল থেকে ভিন্ন নহে—অর্থ কী? অর্থ হলো রেডিয়ো-টেলিভিশনে বিদ্যুৎ চার্জড্ হওয়ার মতো আত্ম নূরে আহমদ অর্থাৎ আত্ম-প্রকৃতিস্থ আব আতশ খাক বাদ-বিদ্যুৎ উজ্জীবন, উদ্ভাসন করা, তা-ই পর্দার অন্তরাল। কারণ দেহের অন্তরালেই গোস্ত, পোস্ত, লহু, লোম, হাড়, রগ, মনি মগজে নিহিত সেই বিদ্যুৎ (নূরে আহমদ)। গোস্ত, লহু (রক্ত) লোম চিনেন। পোস্ত হলো চর্ম। এই আত্ম-নূর আহমদ উদ্বোধন, উজ্জীবন, উদ্ভাসনেই সম্ভবপর আত্মনূরে আহাদ অর্থাৎ পরম পুরুষের উদ্বোধন, উজ্জীবন, উদ্ভাসন। তাতে করেই অতি সহজে হয়ে যায় বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাতীত নূরে আহাদের (পরম পুরুষের) সংগে ঐ পরমা প্রকৃতির (নূরে আহমদের) একীভূত হওন, একাত্ম হওন—তওহীদ অর্থাৎ একত্ব-বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা; কাজেই সাধারণের চর্মচক্ষের অন্তরালেই অর্থাৎ তাদের হেজাব বা পর্দার অন্তরালেই এসব অতীন্দ্রিয় দর্শন (দীদার—মোশাহেদা) ও মিলন (মে'রাজ, রাবেতা অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপনের সম্পূর্ণতা) ঘটে। 'ইস্‌লামিয়াৎ' প্রসংগের ৯নং এ আহমদ হাকিকত (রহস্য) থেকে আহাদ-হাকিকতের কথা বলেছি, তা-ও এ দর্শন বিজ্ঞানের সংগে ওতপ্রোত জড়িত। রকেটের রহস্য প্রবন্ধে 'অতিঅভিজ্ঞতা' প্রসংগে এর বিলকুল ব্যাপকতা বুঝ্‌তে পারবেন।

কোরআন-কালামে উল্লিখিত আর পাঁচ প্রকার ওহী এই:—

(i) সাধারণ মানুষের মনে কোন কিছু জাগা (ইল্‌কা):

و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه - فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رادوه اليك و جاعلوه من المرسلين -

: আর আমরা মুছার (আঃ) আম্মাকে ওহি করলাম (তার মনে জাগিয়ে দিলাম) স্তন্য দাও ওকে (সদ্যোজাত মুছাকে), কিন্তু যখন তোমার মনে ভয় হয় ওঁর সম্বন্ধে তখন নদীতে ভাসিয়ে দাও! কিন্তু

ভয় করোনা বা দুঃখ করোনা ! কেননা আমি ওকে ফিরিয়ে দিব তোমার কাছে আর ওঁকে করবো একজন রছুল"।—কছছ ৭।

বলা বাহুল্য, ইব্রাহিম-ইছহাক-ইয়াকুব-ইউছুফ-দাউদ-ছোলায়মান (আঃ) প্রভৃতি কোন কোন পূর্ববর্তী পয়গম্বরের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো যে বনি এছরাইল—অর্থাৎ ঐ ইছহাক-ইয়াকুব বংশেই—কোন এক বৎসরের মধ্যে ফেরাউনের বিনাশকারী পুত্রের জন্ম হবে। তাই ফেরাউন ঐ বৎসরের মধ্যে পয়দা সব পুত্র-সন্তান বধ করতে হুকুম দিয়েছিলো। অথচ আল্লাহর কী অনন্ত মহিমা ! সিন্দুকে ভাসমান মুছা ফেরাউনের ঘাটে গিয়ে লাগেন। ফেরাউনের সাধ্বী পত্নী আছিয়ার আব্দার-আখটে স্নেহ-মায়া মমতায় তাঁর ঘরে লালিত-পালিত হয়ে মানুষ হন ! স্তন্য দান করেন ধাইমা রূপে তারি ঐ আম্মা !

(ii) সাধারণ রোজর্গানকে ওহি :

و اذ اوحيت الى الحوارين ان امنوابى و برسولى - قالوا امنا و اشهد باننا مسلمون -

—'আর যখন আমি ইছার (আঃ) শিষ্যদের প্রতি ওহি করলাম—বিশ্বাস করো আমাতে আর আমার রছুলে, তাঁরা বললেন—আমরা বিশ্বাস করলাম ! তুমি সাক্ষী থাকো (হে আল্লাহ) যে আমরা মুসলিম (সেই চিরন্তন মুসলিম)"—মাইদা-১১১। বলাবাহুল্য, এ ওহি উপরোক্ত রছুল ইছার (আঃ) প্রতি বিশ্বাস পোষণের মধ্যবর্তিতায় স্বপ্ন কি কাশফ (জাগ্রত-স্বপ্ন)-যোগেও হ'তে পারে।

(iii) মানুষেতর জীবের প্রতি ওহি :

و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون -

আর তোমার প্রভু মৌমাছিদের ওহি করলেন, (যাও) বাসা বাঁধো পাহাড়ে, গাছে, এবং (মানুষ) যে ঘর তোলে তাতেও !"

নহল-৬৮। এ হচ্ছে পশু-পাখী পতংগের মধ্যে আল্লাহর দেয়া সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), সহজবুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞানের ইশারা, ইংগিত।

(iv) অচেতন পদার্থের প্রতি ওহি ঃ—

فقضهن سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل سماء امرها -

"তারপর তিনি সাজালেন সাত আকাশ দুইদিনে (জাহের-বাতেন দু'পর্যায়ে) আর প্রত্যেক আছমানে তার কাজের ওহি করলেন।—হা-মিম-১২। এ ওহি ঐ কার্য আনজাম হবার মত ব্যবস্থা।

یومئذ تحدث اخبارها - بان ربک اوحی لها -

"সেদিন সে (পৃথিবী) ব্যক্ত করে তার খবর (অবস্থা) যা তোমার (রছুলের এবং সর্বমানবের) প্রভু তার প্রতি ওহি করেছেন তার জন্য"।—যিলযাল—৪, ৫। অর্থ—ভূ-কম্পনাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভাস্রোত বের হয়, কি ভূ-গর্ভ ফেটে গরম পানি ইত্যাদি বের হয়, সবই আল্লাহর ওহি বা ইচ্ছায় মুলতঃ ঘটে থাকে।

(v) আর ফেরেশতা বা পাক রুহের প্রতি ওহি ঃ— ঐ আদি উন্নত স্তরের (১)(২)

و اذ یوحی ربک الی الملئکة انی معکم فثبتوا الذین امنوا -

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের ওহি করলেন আমি তোমাদের সংগে আছি (মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ) সুতরাং (যোগা-যোগে রাবেতায়) বল দাও তাদের যারা বিশ্বাস করে।"—আনফাল-১২।

انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده -

"হে মোহাম্মদ (সঃ) ঐ ভাবে তোমার নিকট ওহি পাঠিয়েছি যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি আর তার পরবর্তী পয়গম্বরদের প্রতি।"—নিছা ১৬৩।

ঐ শেখে আকবর মহীউদ্দীন ইবনুল আরবীর কথিত মতেও হযরত মোহাম্মদের (সঃ) আবির্ভাবের ফলে নবুয়ত খতম হলেও বেলায়েত অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধুত্ব পর্যায়ে অশরীরি প্রেম-প্রেরণা-প্রবাহ-যোগেও যে অধ্যাত্ম শক্তিশালী করা, প্রকৃত মহামানব, অতি মানবের অর্থাৎ মুজাদ্দিদের আবির্ভাব পরবর্তী কোন জমানায়ই ফুরোয়নি, ফুরোতে পারে না তা কোরআনের নিম্ন ধরণের আয়াত থেকেও পরিস্কার পরিপূর্ণ বোঝা যায়। বুঝুন।

لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانو ا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم - اولئك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه - و يدخلهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها رضى الله عنهم و رضوا عنه - اولئك حزب الله - الا ان حزب الله هم المفلحون -

লা তুজেদো কাওমাঁ ইয়ুমেনুনা বিল্লাহে অল ইয়াওমেল আখেরে ইয়ুওয়াদ্দূনা মান হাদ্দাল্লাহা অ রাছুলাহু আ লাও কানু আবায়াহুম আও আব্নায়াহুম আও এখওয়ানাহুম আও ইয়াশিরাতাহুম—উলায়েকা কাতাবা ফি কুলুবেহিম ইমানা আ আইয়াদাহুম বেরুহেন মেনহু—অইয়ুদখেলুহুম জান্নাতে তাজরি মেন তাহতেহাল আনহারো খালেদীনা ফিহা—রাজিআল্লাহু আনহুম অ রাজু আনহু—উলায়েকা হেজবুল্লাহ—আ লা ইন্না হেজবাল্লাহে হুমুল মোফ্লেহুন –

তুমি পাবে না এমন লোক যাঁরা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে (প্রকৃত) বিশ্বাস করে তাঁরা ভালোবাসে তাদের যারা আল্লাহ ও রছুলের বিরোধিতা করে যদিও তারা তাঁদের পিতা পুত্র ভ্রাতা, কি অপর আত্মীয় স্বজন হয়। তাঁদের অন্তরে তিনি লিখে দিয়েছেন (প্রকৃত) ঈমান এবং তাঁদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর (আল্লাহর) তরফ থেকে রুহ-যোগে। আর তাঁদিগকে তিনি দাখেল করেন বেহেশতে যার নিম্নদেশ দিয়ে বহু নাহর বয়ে যাচ্ছে (অছিলা-বরাবরে আল্লাহর প্রেম-প্রেরণা প্রবাহের রূপক, প্রতীক)। তথায়

(সেই হাল হাকিকত মারেফাতে) তাঁরা থাক্‌বেন চিরকাল। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁরা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট, তাঁরা হেজ্‌বুল্লাহ্‌—আল্লাহর দল, আর নিশ্চিত জেনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌রদলই (যুগে যুগে) হন সফলকাম।—মোয়াদিলা ২২

ঐ পাক রুহ-যোগে (নবীদের বেলা রুহুলকোদছ-পবিত্র-আত্মা-যোগে) আল্লাহ্‌র সাহায্য শক্তি তথা মিলিত কারবার দরবারের আরো মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত দেখুন আরো পুরো প্রবুদ্ধির জন্য ঃ

و اتينا عيسى ابن مريم البينت و ايدنه بروح القدس -

আমরা (আল্লাহ) মরিয়ম পুত্র ইছাকে (আ) দেই আল বাইয়েনা (জীবন্ত আদর্শ) ও তাঁকে রুহুল কোদছ (পবিত্র আত্মা)-যোগে (অধ্যাত্ম) শক্তিশালী করি (সাহায্য করি যার ফলে হয় ঐ যোগ-সাধন)।—বাকারা ৮৭।

قل نزله روح القدس من ربك بالحق -

বলে দাও (হে মোহাম্মদ সঃ) এ-কে (আল কোরআন অর্থাৎ তার ভিতরকার সব সংগুন জ্ঞানাবলি) রুহুল কোদছ (পবিত্র আত্মা) তোমার প্রভুর তরফ থেকে নাজেল করেছেন সত্য সহকারে।—নহল ১০২।

ঐ যোগাযোগেই হয় আসলে সত্য গুণ, জ্ঞান সঠিক চর্চা ও তার সত্যিকার সুপ্রকাশ (শান) ইহ-পর দুনিয়ায়।—বিস্তারিত আছে মুখবন্ধে উল্লিখিত 'মালায়েকা (ফেরেশাতা) ও মানবদর্শন' গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য, যাঁরা সত্যিই আল্লাহ্‌র সংগে যুক্ত হয়ে অর্থাৎ রাবেতা বা সম্পর্ক স্থাপনের পূর্ণতায় প্রকৃত ওলি, আবদাল, গাউছ, কুতব হতে পেরেছেন, তাঁরাই তো হবেন প্রকৃত মুজার্দ্দিদ। অন্ত অপূর্ণ মানব হবে কী করে? শতাব্দিতে শতাব্দিতে এ রকম মহা-মানব, অতিমানব দু'চার জনের বেশী হতে পারেন না, তবে তাঁদের প্রকৃত পদাংক-অনুসারী হতে পারেন অনেক। তাঁরা সবাই মিলে

ঐ হেজবুল্লাহ্—আল্লাহর দল (প্রকৃত ভক্ত ও সৎ কর্মবীর)।

অবশ্য নামে অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু কাযে আসলে ক'জন এই হলো ছওয়াল। জবাব 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে, 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের "অধ্যাত্ম বিবর্তন' প্রসংগ থেকে পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত, 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধের 'ধর্ম মোহের বাড়াবাড়ি, অভিজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা,' থেকে শেষ প্রসংগ পর্যন্ত, অতীন্দ্রিয়রকেট এবং শিল্প-সংস্কৃতি (কালচার) কথা'র আগাগোড়া যেমন পাবেন, তেমনি এ-'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধেও ঐ তো পেয়ে গেলেন, এর পরবর্তী' চারি কলেমা—'ঈমান' 'পাপ পুণ্য দর্শন' প্রসংগে আরো পাবেন। কারণ পুরাতন গতানুগতিক অবিজ্ঞানী, অদার্শনিক, অশৈল্পীক—এক কথায় সর্ব রকম অযৌক্তিক পন্থায়—যুগে যুগে স্থান কাল পরিবেশের প্রভাবে জমানো ও লালিত পালিত যুগ-ধর্ম-বিরোধী কুসংস্কার ও অপর অপ্রাকৃত সমস্যার সমাধানের নামে যারা গোঁজামিল দিয়ে নিজেরা চলেন, অপরকে তথাকথিত ধর্মের দোহাই দিয়ে চল্‌তে বাধ্য করেন, তাঁরা কী করে' আসল আদত ধর্ম ও সংস্কৃতি সভ্যতার উদ্গাতা, সঞ্জীবক, সংস্কারক, নূতন-কারক, তাজা করনেওয়ালা—মুজাদ্দিদে জমান (যুগ প্রবর্ত্তক ঐ প্রতিভা)—হবেন, হতেই পারেন না, তা এতো কথার পর সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পেরেছেন, আশা করি।

আর শতাব্দীতে তাঁরা ক'জন হবেন, তারও নির্ধারিত কোন সংখ্যা সাব্যস্ত নেই। মুজাদ্দিদ সম্পর্কীয় ঐ হাদিছটি সাধারণ অর্থেই ধরতে হবে, অর্থাৎ শতাব্দিতে শতাব্দিতে সম্ভবতঃ মুজাদ্দিদ নাযেল হবেন প্রয়োজনের তাকিদে। কিন্তু সব শতাব্দিতে যে হতেই হবে, এমনও কোন কথা নেই। কোন কোন শতাব্দীতে কোন মুজাদ্দিদ নাও থাক্‌তে পারেন। আর এই শতাব্দি কী হিসাবে? অবশ্য বলা হবে ইস্‌লামী সাল গণনা হিজরি হিসাবে। কিন্তু বিপুল বিরাট দুনিয়ার অপর সকল মানব-সমাজ সম্পর্কে যে আল্লাহ্

একেবারে চোখ বুজে থাক্‌বেন, সত্য পথ দেখাবেনইনা এমনই বা হয় কী করে? তা হলে সে সব ধর্ম দুনিয়ায় আজো কিরূপে কার ইচ্ছায় টিকে আছে, প্রভৃতি অনেক এ রকম সমস্যা আছে, তার বিচারের স্থান এ নয়। অন্যত্র, বিশেষ করে 'সর্ব ধর্ম দর্শন' গ্রন্থে বলেছি।

আরোঃ মুজাদ্দিদরা যে কেবল এ সকল জমানায়ও লাফালাফি দাপাদাপি করে বেড়াবেন, তাও সত্য নয়। এখন শারীরিক জেহাদের (ধর্ম যুদ্ধের) জমানাই আর বর্তমান নেই। কাজেই তাঁরা যে তাঁদের অধ্যাত্ম জেহাদ অর্থাৎ প্রেম-প্রেরণা-প্রভাব-প্রয়োগেই বিশেষ করে ধর্ম ও উপরোক্ত সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত সংস্কৃত, তাজা এবং নবতম যুগোপযোগী দেশোপযোগী, কি কখনও কখনও পাত্র-উপযোগী করতে প্রয়াস পাবেন, তা বলাই বাহুল্য। কদাচিৎ বহু পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনা মারফ্‌তও তা হতে পারে, উপরোক্ত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্প ভিত্তিক ওয়াজ-নসিহত মারফত তো হতেই পারে। কিন্তু কখনও তথাকথিত ধর্মীয় ওয়াজ মহফিলের নামে অযৌক্তিক কিস্‌সা-কাহিনী মারফত নয়।

চারি কলেমা—ইমান

চারি কলেমা এবং ইমান মোজমাল মোফাচ্ছলও আর তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক, অশৈল্পিক ধারণা-মোতাবেক সত্য নয়, কি ভাবে সত্য ও আচরনীয় তার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক শিল্প-সাংস্কৃতিক পুস্তক সমূহ পড়েই পুরোপুরি জান্‌তে হবে, এখানে সংক্ষেপে সেই ইরফান (অধিজ্ঞান) তরজমা তফসির এবং উপমা-উদাহরণ-মারফত এরশাদ করছি, আভাস নিন্।

আউয়াল কলেমা তৈয়ব (শুচি-শুভ-বাণী)

লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ

তরজমা—আল্লাহ্ ব্যতীত বন্দেগীর উপযুক্ত (উপাস্য) কেউই নেই, (আর) হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রছুল (প্রেরিত পুরুষ)।

দুয়ম কলেমা শাহাদত (সাক্ষী হয়ে সাক্ষ্য বাক্য)

আশহাদো আল লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু অ আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ রাছুলুহু।

তরজমা—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ মাবুদ (বন্দেগীর উপযুক্ত) নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক (অংশীদার) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রছুল।

ছুয়ম কলেমা তৌহিদ (একত্ব-অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তি)

লা-এলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহেদাল্ লা ছানীয়া লাকা, মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ইমামোল মোত্তাকীনা অ রাছুলো রাব্বেল আলামীন।

তরজমা—(সামনা সামনি দেখে, পেয়ে) তুমি ছাড়া (দ্বিতীয়) এলাহি (উপাস্য মাবুদ) নেই। তুমি এক, তোমার সমকক্ষ নেই; আল্লাহ্‌র রছুল হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মোত্তাকীন (ধর্ম-প্রাণদিগের) ইমাম (নেতা, পরিচালক) এবং বিশ্ব-সমূহ-সম্রাটের রছুল।

চাহরম কলেমা তামজিদ (সম্ভবপর সর্ব বোজর্গী হাছেলে সেই অভিব্যক্তি)

লা-এলাহা ইল্লা আন্তা নুরাঁই ইয়াহ্‌দে ইয়াল্লাহু লেনুু-রেহি মাঁ ইয়াশায়ু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহে ইমামোল মোর্‌ছালিনা অ খাতেমুন্ নাবিয়িন।

তরজমা—তুমি ছাড়া উপাস্য নাই (কেহ নেই, কিছু নেই)। (কেননা) তুমি জোতির্ময় (নুরাঁই)। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর হক-নূর দিয়ে হেদায়েত করেন। (হক নূরে নূর মিশিয়ে পূর্ণ হক-নূর-অভিজ্ঞতা— হাকিকত-মারফত-অভিব্যক্তি— দান করেন)।

আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (সঃ) সকল রছুলের ইমান ও সর্বশেষ (সর্বশ্রেষ্ঠ) নবী।

ইমাম মোয্‌মাল—(ইমানের বিষয়-বস্তু-সমূহের মোখতসর)

আমানতো বিল্লাহে কামা হুয়া বেআছ্‌মায়েহি অ ছেফাতেহি অ কাবেলতো জামীয়া আহ্‌কামেহি অ আরকানিহ্‌।

তরজ্জমা—আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম (বিশ্বাস স্থাপন করলাম) আর তাঁর যাবতীয় গুণবাচক নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর যাবতীয় আহ্‌কাম আরকার মেনে নিলাম।

ঈমান মোফাচ্ছাল—(ঈমানের বিষয়-বস্তু-সমূহের বিশদ) আমানতো বিল্লাহে অ মালায়েকাতেহি অ কুতুবেহি অ রাছুলেহি অল্‌ইয়াওমেল আখেরে অল্‌কাদ্‌রে খায়রেহি আশাররেহি মিনাল্লাহে তায়ালা অলবায়াছে বায়াদাল মাওত।

তরজ্জমা—আল্লাহ, তাঁর সব ফেরেশতা, কেতাব-সমূহ, রছুলগণ ও আখের দিবস-উপর আমি ঈমান আন্‌লাম। আর সব ভালো-মন্দ আল্লাহতায়ালা থেকে হয়—এই তাকদীর ও মওত পর পুনর্জীবনের উপর ঈমান আনলাম।

উদাহরণ দেই। এক ব্যক্তি বল্‌লেন ঐ গ্রামে আগুন লেগেছে। ঐ ব্যক্তি সত্যবাদী সুতরাং আপনি শুনে বিশ্বাস করলেন—শরিয়তের ঈমান-বিল-গায়ব—কলেমা তৈয়ব—। কাজেই অগ্রসর হয়ে দূর থেকে ঐ আগুনের ধোঁয়া দেখা আপনার পক্ষে সোজা হলো, সম্ভব হলো। ঐ প্রামাণিক জ্ঞানবিশ্বাসই এলমূল একীন, তরিকতের কলেমা শাহাদত—সাক্ষ্যদান কলেমা, আপনি ঐ আগুন লাগার সাক্ষী হলেন। অতঃপর ঐ আগুনের সামনা সামনি হয়ে আগুনের সম্পূর্ণ স্বরূপ দেখেই আপনার হলো গিয়ে আইনুল একীন—হাকিকতের দৃষ্টজ্ঞান বিশ্বাস—কলেমা তৌহিদ। আর ঐ আগুনে মিলেমিশে একাকার হতে

পারলেই আপনার পক্ষে সম্ভবপর ঐ আগুন লাগার পূর্ণ অভিজ্ঞতা, পূর্ণ অভিব্যক্তি, আর তা-ই হচ্ছে মারফতের হক্কোল একীন—প্রকৃত পূর্ণ জ্ঞান-বিশ্বাস—কলেমা তামযিদ। এখন ঐ আগুনস্থলে আল্লাহ মনে করে' নিন, ঐ সত্যবাদী মানুষটিই রসুল আর জেব্রাইল (আঃ) * অছিলায় তাঁরি ঐ শ্রুত বিশ্বাস ক্রমশঃ প্রামাণ্য (সাক্ষ্যদানের), পরে মোকাবেলা দেখাশুনা, আর সব শেষে আহমদ থেকে আহাদে মে'রাজ-মিলনের পূর্ণ পরা গুণ-জ্ঞান শান। এই ভাবেই এক কলেমা তৈয়ব ক্রমশঃ চার কলেমায়ে তৈয়ব, দুই ঈমান মোযমাল-মোফাচ্ছল ও আনুসংগিক সব সংস্থষ্টি-কৃষ্টি-কালচার—তাহযিব-তামদ্দুনে—দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়ায়, ছাবেত হয়েছিল, হয়।

বলা হয় এক কলেমারই চারি রকম ব্যাখ্যা, এক ইমানেরই দুই রকম বিশ্লেষন। কিন্তু বস্তু না থাক্‌লে এবং তার অভিজ্ঞতা কখনও কারো না হয়ে থাক্‌লে, কারো পক্ষেই হওয়া সম্ভবপর না হলে খালি খালি এরূপ দুই, তিন, চারি প্রভৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ হবে কেন? আর এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোথা? প্রত্যেক কলেমা থেকে প্রত্যেক কলেমার আরো অভিনব অভিজ্ঞতা, সুতরাং নূতন বিষয় বস্তু সুস্পষ্ট। তেমনি এক ইমান থেকে আর এক ইমানের আরো নূতন অভিজ্ঞতা, অতএব বিষয় বস্তু। কাজেই এযে কোরআন হাদিছের উপরোক্ত ইমান একীনের শুরু, ক্রমবিকাশ, প্রগতি, পরিণতি তা' বোঝা যায়। না বুঝবার ফলে, কিংবা বুঝেও কখনও কখনও না বুঝবার ভান করে' দুই চারি প্রভৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কল্পনা করা হয় কোরআন-হাদিছের আকিদা আচরনের সুস্পষ্ট বৈরিতা বৈপরীত্য

* জেব্রাইল, মেকাইল, এসরাফিল, আজরাইল প্রভৃতি ফেরেশতা মূলত: কী, তা বুঝতে পড়তে হবে আমারেদ 'মালয়েকা (ফেরেশতা) এবং মানব দর্শন' গ্রন্থ। ইনতেজার করুণ।

ঘটিয়ে, এবং এইভাবে গোঁজামিল দেয়া হয়, তাও স্পষ্টতঃ বোঝা যায়। ফলতঃ কলেমা চারি, ইমান দুই হবার সংগত কারণ ঐ ক্রম অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি, ; নতুবা কলেমা চার হবার ইমান দুই হবার কোন সংগত কারণ কোনদিন ছিলোনা, এখনও নেই, প্রয়োজন ছিলো না, এখনও নেই। ঐ অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি হাছেলের কোশেশ না করে' মাত্র মুখস্থ করে আওড়ানোয় মূল্যমানও বিশেষ কিছু থাকে কি? থাকে না। তোতা পাখীর মতো না বুঝেশুনে উদেশ্যহীন শব্দ উচ্চারণ ও ধরাবাঁধা গতানুগতিক অর্থ কখনো কখনো নিজে গিলন, অপরকে গিলানো মাত্র। কী ফল? ছওয়াব? ছওয়াব অর্থ পুণ্যফল। না বুঝে শুনে, কি, যে-অর্থ জানলাম তার সত্যাসত্য যাচাই বাছাই না করে নির্বোধের মতো মাথা নীচু করে' মেনে যাওয়া, তাতে করে পুণ্যই হলেনা, তার আবার ফল? পাপ পুণ্য, ছওয়াব কী কেন তার আভাস নিন, অন্য বইতে বিস্তারিত লিখবার ইচ্ছা রইলো।

পাপ-পুণ্য-দর্শন

পাপ আসলে অন্তর কলুষিত হবার, কি অপরের অনিষ্ট হবার বিষয়-বস্তু। পুণ্য তেম্‌নি অন্তর পবিত্র হবার, কি অপরের উপকার হবার বিষয়-বস্তু। এতে করেই পাপ পুণ্যের প্রকৃত সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা পাওয়া যায়। তা হচ্ছে এই: শারীরিক, মানসিক, নৈতিক (আধ্যাত্মিক) এমন কতকগুলি কাজ আছে যাতে করে' শুধু নিজেরই অপকার হয়, অপরের তাতে করে' কিছুই যায় আসে না, তা হচ্ছে আত্ম পাপ; তা স্রেফ মানসিক কায কুচিন্তাও হতে পারে, কিংবা শারীরিক মানসিক নৈতিক (আধ্যাত্মিক) স্ব-মেহনাদিও হতে পারে, আত্মঘাতও হতে পারে। আবার এমন

কতকগুলি অপকর্ম আছে যাতে করে আত্ম পর উভয় দিকেরই অপকার হয় তাই উভয়তঃ পাপ। এতো আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি, পরের অপকারের যে কোন কায আত্ম অপকার অর্থাৎ মানসিক, নৈতিক (আধ্যাত্মিক) পতনও ঘটায়, অপবিত্রতা সাধন করে। তেমনি যে কার্যে শুধু আত্ম উপকার হয়, তা-ই আত্ম ধর্ম, কি আত্ম পুণ্য-কর্ম। আর ঐ আত্ম উপকারটাই হলো তার ফল অর্থাৎ ছওয়াব। যেমন সৎচিন্তা, সৎসাহিত্য শিল্প-কলা-চর্চা (সৎ-নাটক অভিনয়াদি এবং সৎ ছায়াছবি সৃষ্টি ও দর্শনও যার অন্তর্গত হতে পারে)। ওদিকে সদা সত্য কথা কহা, সদাচরণ, প্রভৃতি। ওর গভীরতর, গভীরতম স্তরই আবার অধ্যাত্ম চর্চা। আবার যাতে করে মাত্র পরের উপকারই হয়, নিজের কিছু উপকার হৌক কি না হৌক সেই পরের প্রতি প্রতিপাল্য কর্তব্যই পর উপকারক ধর্ম, কি পরকীয় পুণ্যকায, পরেই মাত্র তার ছওয়াব বা পুণ্য ফল ভোগ করে যেমন কোন সৎ প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে দেয়া ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখা কর্তব্য এমন পরোপকারের কার্যে বাহ্যতঃ নিজের কোন উপকার অর্থাৎ পুণ্যফল ছওয়াব দেখা না গেলেও অন্তরের দিক দিয়া তাতেও করে উপকার বা পূন্যফল অর্থাৎ ছওয়াব হয়। আর যাতে করে' আত্ম পর উভয়েরই উপকার হয় তাইতো উভয়ত ধর্ম, কি পুণ্য কর্ম। ঐ ছওয়াব আত্ম পর উভয়েরই হয় — যেমন যে কোন জনহিতকর কা৷—সুশিক্ষা দান, পূর্ত কার্যাদি যাতে আ৺ন ও পর উ৹য়েরই প্রয়োজন মেটে, উপকার হয়, ফলে উভয়ত পুণ্যফল বা ছওয়াব হাছিল হয়। আধ্যাত্মিক-পন্থা বাৎলানো, কি অধ্যাত্ম জ্ঞান দানও এরই অন্তর্গত; কারণ তাতে করে উভয়দিকের আত্মার তরক্কি (উন্নতি) অর্থাৎ ঐ ছওয়াব হাছেল হয়। সংক্ষেপতঃ এই। এ ছাড়া পাপ পুণ্যের আর কোনরূপ সত্যিকার সংজ্ঞা ও প্রজ্ঞা হতে পারে কি? বিচক্ষণতার সহিত বিচার করে রায় দিন।

তাহলে কতকগুলো আচার অনুষ্ঠান পালনে যে আমরা পুণ্য ফলের অর্থাৎ ছওয়াবের নির্দেশ করে থাকি............এই আচরণ করলে এই ছওয়াব, কি গোনা বাছা ছওয়াব বলে থাকি, না করলে এতোগুলো পাপ বলে থাকি তার অস্তিত্ব কোথায়? তবে হাঁ, আন্তরিক অনুশীলনে যদি কোন প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মার উপকার অর্থাৎ ঐ তরক্কী (উন্নতি) হয় তা পুণ্যকার্য ও তার ঐ ছওয়াব (পুণ্যফল) তরক্কী হাছেল হয়। কিন্তু তা না করলে যে পাপ হবে এ-কথা পেলেন কোথায়? বরং ঐ তরক্কী বা ছওয়াব হবে না, বাদ যাবে। তা কি পাপ—গোনাহ ছগিরা—ছোট পাপ, কি গোনাহ কবিরা—বড়ো পাপ—এর কোনটা বলা যাবে? চিন্তা করে কথা বলুন। কিস্‌সা কাহিনী শুনে বিভ্রান্ত হয়ে কী চিন্তা করবেন, কী বিচার করবেন আর রায় দিবেন?

আরো ভেবে দেখতে হবে। Habit is the second nature—অভ্যাস হচ্ছে মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি। সুতরাং যে আচরণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি—ভালো হৌক মন্দ হৌক—তা না করতে পারলে আমরা অনেক সময়ে অস্বস্তি বোধ করি, তা কিন্তু পাপের প্রতিক্রিয়া বিবেক-দংশন নয়। কিংবা ঐ আদায়ে যে স্বস্তি পাই, তা-ও কিন্তু পুণ্যের প্রসাদ, কি লক্ষণ অর্থাৎ ছওয়াবের অনুভূতি নয়। অপর পক্ষে ঐ অতি অভ্যাসের ফলে আমরা যে আবার গতানুগতিক অভ্যাসের দাসানুদাস হয়ে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলেছি. তাতে করে কিন্তু আমাদের দেহ মন-প্রাণ আসলে ও-সম্পর্কে সুচিন্তা ভাবনা, গুণ, জ্ঞান-গবেষনা হারিয়ে কলের পুতুলের মতো হয়ে পড়ছে, তাতে কতো দূর উপকার অর্থাৎ পুণ্যফল ঐ ছওয়াব, কি ফায়দা হচ্ছে, না হচ্ছে, কি পরকালে হবে না হবে, তা' বিশেষজ্ঞগণকে ভালো করে' ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য, আসল আদত ধর্ম কী? বাইরে থেকে চাপানো আচার অনুষ্ঠান—কলের পুতুলের মতো

করে যাওয়ায় কি আসল আদত ধর্ম হবে? না, ধর্ম হবে অন্তর থেকে আপছেআপ সৎকর্ম, স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, তা কোন কোন আচার অনুষ্ঠানও হতে পারে, কি অন্তরেরই মাত্র অনুভূতি, উপলব্ধি হতে পারে, বিচার করুন।

আরো একদিক দিয়ে বিচার্য। যা স্থান কাল পাত্র ভেদে কম-সম, কি অপর সময়ে আদায়, কি অপরের বদলা-যোগে আদায়, কি কোন কোন স্থান কালে আদায় করাই যাবেনা (যেমন মহাশূন্যে) তা কি করে আসল আদত আত্ম-ধর্ম হবে? কোন কোন স্থান কালের উপযোগী—সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা, কি ধার্মিকতার শুরু-সূচনা হিসাবে ট্রেনিং (প্রশিক্ষণ), কি ব্রত হিসাবে সাময়িক প্রতিপালন হতে অবশ্য কোন বাধা নেই, দোষ নেই।—ইছলামিয়াৎ প্রসংগ ৪নং দেখুন।

তা হলেই ছওয়াব ভালো করে' চিনুন। ছওয়াব অর্থ একটু আগেই দেখেছেন—পুন্যফল—। তা সৎকর্মের সংগেই জড়িত এবং সংগে সংগেই ফিরে ও লাভ হয়—যেমন পাপের প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল পাপ-ক্রিয়ার সংগেই জড়িত এবং সংগে সংগেই ভুগতে হয়। অবশ্য বাহ্যতঃ ঐ দুর্ভোগ সব সময়ে দেখা না গেলেও অন্তরের দিক দিয়ে বিবেকের বৃশ্চিক দংশনাদি প্রকারেই তা প্রাপ্ত হয়, প্রকাশ পায়। পুন্যের ফল ঐ ছওয়াবও অম্‌নি বাইরে থেকে সব সময়ে দেখা না গেলেও অন্তরের বিমল শান্তি স্বস্তিরূপে লাভ হয়, প্রকাশ পায়। তা কোন কিছু কম-সম আদায়ে, পরে আদায়ে, কি অপরের দ্বারা আদায়ে কী করে লাভ হবে? তবে নামাজ মোছাফির হালে চার রাকাত ফরজ স্থলে দু রাকাত কছর করার কথা আল্ কোরআনে আল্লাহ কেন বল্লেন এই হচ্ছে ছওয়াল (প্রশ্ন)। জবাব হচ্ছেঃ তাতে করেই প্রমাণিত হয় যে এ সবই সেই সম-সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র, যখন পায়ে দলে, কি উট, ঘোড়া

ছাড়া চলবার কোন উপায়ই ছিলো না; ট্রেন, বাস, ট্রাম, ষ্টিমার, লঞ্চ, কি এরোপ্লেন: রকেট আবিষ্কারের কথা মানুষ তখন ভাবতেও পারেনি।—আবার, ছওয়াব টাকা পয়সার মতো স্থূল কোন-কিছু নয় যে অপরকে বখ্‌শে দেয়া যাবে (পেলাম একজনের থেকে, দিলাম আর একজনকে. এই রকম আরকি)। বরং পুণ্যকর্ম করে আত্মা কিছুটা পাক-ছাফ হলে তার দোয়া আল্লাহ্‌ কবুল করতে পারেন। ছওয়াব বখ্‌শে দেবার আসল তাৎপর্য তা-ই!

সুতরাং পুন্যপাপ, ধর্ম অধর্ম ও তার ফল (ছওয়াব) যা মানুষের একান্ত অন্তরের জিনিস এবং বাইরে কিছু কিছু প্রকাশ পেলেও সে চিরন্তন আত্মার চির উপকার (ছওয়াব) কি সাময়িক অপকারের (গোনাহ্‌র) সহিত সম-জড়িত, তা অম্‌নি ভাসাভাসা ইহ-কালীন কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান পালন অপালন বিচারেই পাওয়া যাবে না। তার মাপকাঠি (আল্‌ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন 'মীজান') ইহ-পরকাল-ব্যাপী আত্মার ভালো মন্দ প্রকৃতি ও তার প্রকাশের (অভিব্যক্তির) মধ্যেই রয়েছে নিহিত। আল্লাহ অর্থাৎ পরমাত্মা আন্তবিশ্বের আন্তর্জাতিক, তার প্রতি এগোনোর আত্মার ধর্মও তেম্‌নি আন্তবিশ্বের আন্ত-র্জাতিক; তা-ই আসল আদত ধর্ম; আর যাতে করে' তার থেকে পিছিয়ে ফেলে পরাঙ্মুখ করে তা-ই আসল আদত অধর্ম।—প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ, বিশেষ করে তার পরিশিষ্টগুলি এবং খাস করে 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের অধ্যাত্ম বিবর্তন 'মাজমা-উস-বাহরায়েন, ও 'বেলায়ত নবুয়ত' 'প্রজ্ঞার বিবর্তন' ও পরিশিষ্ট পড়ে এবিষয়ে মোটামুটি প্রজ্ঞা হাছেল করুন।

---

[১]
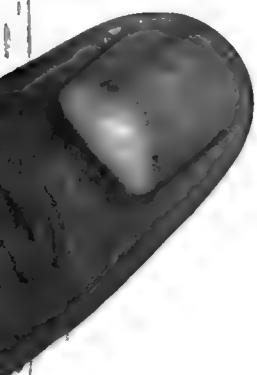
সৃষ্টি-রহস্য

প্রথম মত।—সুদূর অতীতে মহাবিশ্বের সকল বস্তু মিলে মহাশূন্যের এক কোণে জমাট বেঁধেছিল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় ঐ জমাট বাঁধা বস্তুপিণ্ডের মধ্যে হলো এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। অচলায়তন গেলো ভেঙে, টুকরো টুকরো হয়ে তারা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো বিপুল বেগে আলোর গতিতে, জন্ম নিলো অসংখ্য আলোকপিণ্ড—নক্ষত্র রাশি।

দ্বিতীয় মত।—মহাশূন্য আসলে শূন্য নয়, সর্বত্র অপরিমেয় গ্যাসপুঞ্জ ভরা। তাতে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি গ্যাসের সংমিশ্রন। বিজ্ঞানের আবিস্কৃত ১০৮টি—কি তার চেয়ে কম বেশী যা-ই হোক—মূল উপাদানও এরি বিভিন্ন রূপান্তর বই আর কিছুই নয়। আর আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি এবং অন্যান্য শিলাস্তর), বাদের (বাতাস) মত যৌগিক পদার্থও যে ঐ গ্যাস সমূহেরই নানা রকম সংমিশ্রনের ফল, সে সত্যও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। যাহোক শূন্যমণ্ডলে অপরিসীম অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে প্রচণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসীয় আকারে ঐ সব-রকম পদার্থ। তা জোট বেঁধে, জমাট হয়েই এক এক ঐ তীব্র জ্বলন্ত নক্ষত্র সৃষ্টি। এইরূপ অসংখ্য নক্ষত্রমালা, আশ্‌পাশের স্রেফ গ্যাসীয় হাল-হাকিকত, ঐ ধূলিজাল, মেঘপুঞ্জ প্রভৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট এক এক বিরাট বিপুল অঞ্চলই নীহারিকা বা ছায়াপথ। এভাবে অগন্‌তি নক্ষত্র-মালা নিয়ে অসংখ্য ছায়াপথের সৃষ্টি। এই সব নীহারিকা বা ছায়ালোকেই আবার সব নীহারিকা বা ছায়ালোকের কাছ থেকে যেন ক্রমশঃ দূরে সরে' যাচ্ছে। কি ভাবে?

একটা বেলুন যেন আমাদের বিশ্ব। আর তার গায়ে এক একটা ফোটা যেন এক একটি নীহারিকা, এরূপ অসংখ্য

নীহারিকা। এখন এই বেলুনটাকে ফুঁ দিয়ে ফুলালে মনে হবে ঐ এক এক আঞ্চলিক ফোটাগুলি অর্থাৎ কল্পিত এক একটি নীহারিকা যেন এক একটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিশ্বে অহরহ এম্‌নি ঘটছে, আর মনে হয় বিশ্ব এমনি ক্রমশঃ ফুলে' ফেঁপে' উঠ্‌ছে, মহাবিশ্ব হচ্ছে।

আমাদের এই ছায়ালোক বা নীহারিকার অন্তর্গত অসংখ্য সৌর-লোকের মধ্যে আমাদের এই সৌর-লোকের একটি গ্রহ থেকে অপর অসংখ্য সৌর-লোক-পরিপূর্ণ ছায়ালোক বা নীহারিকাকে যেমন প্যাচানো দুধের সর-তুল্য লম্বাটে ডিম্বাকার, কি স্রেফ গোলাকার দেখা যায়, আমাদের নীহারিকা-লোককেও ঐরূপ অপর নীহারিকা বা ছায়া-লোকের কোন গ্রহ কি উপগ্রহ-

লোকে আমাদের মতো বুদ্ধিমান জীব থেকে থাক্‌লে তাদের চক্ষে, কি দূরবীণে ঐ একইরূপ দেখায়।
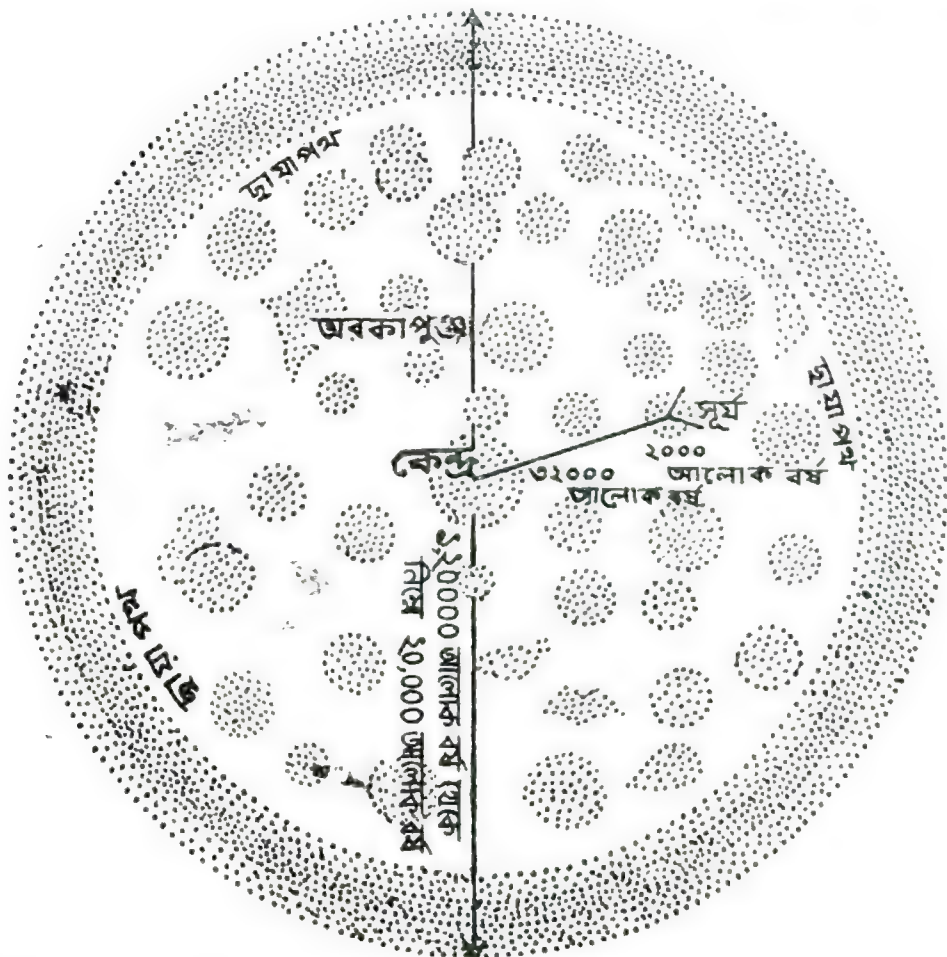
এখন, এর কোন্ অনুমান সত্য? আমরা বল্‌বো উভয়ই আংশিক সত্য। প্রথম অনুমানের বিস্ফোরণ সত্য। কিন্তু 'মহাশূন্যের এক কোণে মহাবিশ্বের সকল বস্তু মিলে' জমাট বেঁধেছিল' এ সত্য মনে হয় না, বরং দ্বিতীয় অনুমানের "মহাশূন্য আসলে শূন্য নয়, সর্বত্র অপরিমেয় গ্যাস-পুঞ্জভরা" এ-কথাই সত্য মনে হয়। আর তা উপরোক্ত বিভিন্ন রকমের গ্যাস, জমাট বেঁধে বেঁধে এক এক নক্ষত্র হয়েছে (মহাসাগরে যে রকম চরপড়ে, দ্বীপ সৃষ্টি হয়)। আর অসংখ্য নক্ষত্র বহু দূরে দূরে, আর জোট বেঁধেইতো রাশি-চক্র, আর এই বহু দূরের দূরের নক্ষত্র, তার অগনতি রাশি-চক্র নিয়েই তো এক এক ছায়াপথ বা নীহারিকা অঞ্চল। অনেক-কালের রূপান্তরের ভিতর দিয়েই এ সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু এই রূপান্তর হয় কিসে? স্বাভাবিক বিস্ফোরণে। যেমন সূর্যের ভিতরে এখনও সেই আদিকালের বিস্ফোরণ অহরহ ঘটেই চলেছে। যেমন পরমাণবিক, কি হাইড্রোজেন বোমায় ঘটে সেই ভীষণ বিস্ফোরণ, কিন্তু সেটা কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ মানুষের ঐ বিস্ফোরক পদার্থের বিস্ফোরণের রহস্য কিছুটা জেনে যোগ-সাজসে সে তৈয়ার ও আপসেআপ নয়, কৃত্রিম উপায়ে ঘটানো হয়।

আল্-কোরআনে ঐ দুই মতবাদের সমর্থন কি ভাবে আছে না আছে তা জানা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখা দরকার আল্-কোরআন নাযেল হয়েছিল একটি ধর্ম, এক সমাজ ব্যবস্থা ও এক নবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। তা ছিলো পুর্বেকার সকল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার। সুতরাং নিছক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা হিসাবে আল্-কোরআনের আবির্ভাব নয়, এবং নিছক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা আল-কোরআনে খুঁজতে যাওয়া কখনো সঠিক কোরআন-কালাম বোঝা নয়। তথাপি প্রসংগ

ক্রমে দেখ্‌তে পাবেন দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলাও কোরআনে রয়েছে। অপর কোন ধর্মগ্রন্থও নিছক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা হিসাবে বিচার্য নয়। কিন্তু কোরআনের আগের ধর্মগ্রন্থ কালক্রমে অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। কোরআন এমন জমানায় নাযেল হয়েছে যখন চীন মুলুকে কাগজ আবিস্কৃত হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে আরবে এবং পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং হালাল পশুর চামড়া, হাড্ডি প্রভৃতিতে কোরআন প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ হলেও হযরত মোহাম্মদের (স) ওফাত শরীফের সংগে সংগে কাগজে তা তুলে নেয়া হয়, এবং অসংখ্য হাফিজ কোরআন মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাদের মুখস্থ বুলির সংগে পরতাল করে সঠিক লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু অন্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এ কথা খাটেনা। কাজেই সেই সব ধর্ম-গ্রন্থে প্রকৃত কী ছিলো না ছিলো সঠিক বুঝ্‌তে না পারলেও সেই সব ধর্মগ্রন্থের সর্ব-কনিষ্ঠ (সর্বশেষ) সার সংকলন বা মূল-সূত্র-সমূহ আলকোরআন থেকে আমরা দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা সম্পর্কে অনুপম ইশারা ইংগিত ধর্ম প্রবর্তনা-প্রচারনার ফাঁকে ফাঁকে প্রসংগ ক্রমে পাচ্ছি। অপর কোন ধর্ম গ্রন্থেই তা হয়তো পুরোপুরি, কি আংশিক অনুপস্থিত।

ثم استوى الى السماء و هى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا
او كرها قالتا اتينا طائعين -

ছুম্মা আছতাওয়া এলাচ্ছামায়ে অ হিয়া দোখানুন—ফাকালা লাহা অলেল আরদে আতিয়া তাওয়ঁা অ কারহাঁ—কালাতা আতায়না তোয়ায়েয়িন।

এরপর তিনি (আল্লাহ্‌তালা) মনোযোগ দেন আছমানের দিকে; 'ও' ছিলো বাষ্প অর্থাৎ গ্যাস। তিনি ওকে আর দুনিয়াকে বল্‌লেন তোমরা উভয়ই এসো ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায়। ওরা বললো আমরা খুশীতেই আস্‌চি।—হা-মীম ১১।

মোট কথা, বিশ্ব তখনো পয়দা হয় নি, কিন্তু এ যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ঐ গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ক্রম-বিবর্তনে, কখনো কখনো বিস্ফোরণে সৃষ্টি তারি আভাস দিচ্ছে ঐ আয়াত এবং এরূপ আরো অনেক আয়াত।

و زينا بالسماء الدنيا بمصابح وحفظا - ذلك تقدير العزيز العليم -

অ জাইয়ান্নাচ্ছামায়াদ্দ্‌ুনিয়া বে-মাছাবিহা অ হেফজা—জালেকা তাকদীরেল আজীজেল আলীম

আর আমরা ছুনিয়ার আছমানকে সুশোভিত কর্‌লাম (তারকা রাজির) প্রদীপ মালায়, আর তার হেফাজত-ব্যবস্থা করলাম। এ হচ্ছে মহা পরাক্রান্ত জ্ঞান-ময় (আল্লাহর) নির্ধারণ (তাকদীর)। —হা-মীম ১২।

পরিস্কার বোঝা যায় এক এক ছায়াপথ বা নীহারিকা মণ্ডল পরিবেষ্টিত সূর্য, তারকা-ক্ষেত্র, নীহারিকা-মেঘ (গ্যাস পুঞ্জ বা পুঞ্জীভুত গ্যাস-কুণ্ডলী), ঐ ধুলিজাল নিহিত বিরাট-ব্যাপক-বিস্তৃত অঞ্চলই আছমায়ুদ্দ্‌ুনিয়া বা ছুনিয়ার আকাশ। তাৎপর্য হলো: ওর কোন কোন সূর্যের কোন কোন গ্রহ, কি কোন কোন গ্রহের কোন কোন উপগ্রহই জীব-বাসোপযোগী ছুনিয়া—আর তাদের আশ্‌পাশের আকাশের সূর্য, তারকা-ক্ষেত্রই তো চর্মচক্ষে, কি দূরবীণে দেখা যায় যেনো অসংখ্য প্রদীপ মালা, আর তা সব মিলে মিশেই তো ঐ ছায়াপথ বা আছমায়ুদ্দ্‌ুনিয়া।

এ সম্পর্কে আর যা-যা বলা হয়েছে—'সাত আছমান ছুই, চার, কি ছয় দিনে পয়দা,' কি 'শয়তানকে মারবার উপায়' ইত্যাদি কথা বিজ্ঞান-বিষয়ক নয়, দার্শনিক তথ্য ও তত্বপূর্ণ তা ইতিপূর্বে 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে কিছু কিছু দেখেছেন, পরে 'পরমাণবিক তথ্য' 'রকেটের রহস্য' 'অতীন্দ্রিয় রকেট' এবং 'শিল্প-সংস্কৃতি (কালচার) কথা' প্রবন্ধেও দেখ্‌তে পাবেন, এর পরবর্তী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক গ্রন্থ-সমূহে তো দেখ্‌তে পাবেনই ; এ প্রবন্ধেও একটু পরে 'ঐ শয়তানকে

মারবার উপায় স্বরূপ জলন্ত অংগার খণ্ডের' বিশদ ব্যাখ্যা অনুরূপ আয়াত-বিশ্লেষনে দেখে নিন।

কিন্ত এর আরো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও শৈল্পিক বিশ্লেষনের পূর্বে গ্রহ-উপগ্রহ পয়দায়েশের বৈজ্ঞানিক বিবরণ জানা দরকার। কারণ আল্‌কোরআনে আল্লাহ অনেক সময়ে একত্রেই সকল প্রকার জ্যোতিষ্ক—জ্বলন্ত (নক্ষত্রাদি) ও নিভন্ত (নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহাদি)—পয়দায়েশের কথা বয়ান করেছেন।

এক মত।—এক এক নক্ষত্রের কাছ দিয়ে তার চেয়েও বিরাট কোন নক্ষত্র ছুটে যাওয়ার সময়ে ঐ বিরাট নক্ষত্র বা সূর্য প্রচণ্ড আলোড়ণে ফুলে' 'ফেঁপে' ওঠে। ঐ অপর সূর্য সুদূরে চলে যাওয়ার পর এই ফুলে-ফেঁপে-ওঠা অংশ-সমূহ ভার-সাম্য ঠিক রাখতে না পেরে সূর্য থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে, তাই গ্রহ, আর ঐ একই সময়ে জ্বলন্ত গ্রহগুলির অতি মাত্রা স্বাভাবিক ঘুর্ণনে ছিটকে ছিটকে পড়া অংশগুলিই এক এক গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ। গ্রহ-উপগ্রহ সবই কালক্রমে কম বেশী জুরিরে গিয়েছে।

আর এক মত।—'ঐ স্রেফ গ্যাসীয় অবস্থায় এই সূর্য শেষ গ্রহ প্লুটো পর্যন্ত ছিলো বিস্তৃত, কালক্রমে জমাট হতে গিয়ে বিরাট বিরাট ফাঁক হয়ে যায়, আর সূর্যের আশপাশের জমাট বাঁধা কম বেশী জুরানো অংশগুলিই গ্রহ উপগ্রহ।—

এর যে মতবাদই সত্য হোক্, আল্‌কোরআনে তার প্রচুর সমর্থন মিলে। কেবল আছমান বুঝ্‌তে এখন আমাদের সূর্য এবং নক্ষত্র-নিলয় শূন্যমণ্ডল বুঝ্‌তে হবে এবং আর্‌দ্ বুঝ্‌তে যেমন গ্রহ তেম্‌নি উপগ্রহও বুঝ্‌তে হবে। কারণ, উভয়ই মূলতঃ একই পদার্থ এবং একই প্রক্রিয়া-প্রণালীতে প্রস্তুত।

او لم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کا نتا رتقان ففتقنهما -

আওয়া লাম ইয়ারা আল্লাজিনা কাফারু আন্নাচ্ছামাওয়াতে অল আরদা কানাতা রাত্কান--ফাফাতাকনাহুমা—

(১ম আয়াত) ঃ অবিশ্বাসীরা কি দেখেনা যে আছমান (সূর্য তারকা নিলয় শূণ্য মণ্ডল) এবং আরদ্ (গ্রহ-উপগ্রহ বাষ্প অবস্থায়) ছিলো যুক্ত (একাকার), পরে আমরা বিচ্ছিন্ন করেছি।—আম্বিয়া ৩০।

এক্ষেত্রে 'দেখেনা' শব্দ 'চিন্তা করেনা' অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা, এটা কোরআন নাযেল সময়ের ব্যাপার নয় মোটেই, বরং অনেক শত কোটি বৎসর আগেকার ঘটনা। সুতরাং চিন্তা করে', গবেষনা করে' এরূপ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক জ্ঞান আবিস্কার করতে হয়, আহরণ করতে হয়, শিল্প জনোচিত সেই সত্য প্রকাশ করে দিতে হয়, সেই দিকেই এ ধরণের আয়াত ইংগিত দিচ্ছে।

এখন আল্কোরআন-থেকে দর্শন বিজ্ঞান শিল্প ভিত্তিক সৃষ্টি রহস্য বুঝ্তে আমাদের একটি মৌলিক দৃষ্টিভংগীর দিকে আপনাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করচি।

আমাদের সুদৃঢ় ধারনা ও বিশ্বাস আল্কোরআনে আল্লাহ যে কিয়ামত-হাশরের কথা বল্ছেন তা দর্শন বিজ্ঞান শিল্প-জ্ঞান-ভিত্তিক এক চিরন্তন ব্যাপার। ওর দার্শনিক দিকের শৈল্পিক-শৈলীজাত প্রকাশ হলোঃ আল্লাহ্ কিয়ামত হাশর বর্ণনার বিশেষ বিশেষ আয়াতে একাদিক্রমে মানুষের তিন রকম মৃত্যু ও মৃত্যু-অন্তে বিচার-ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কিয়ামত-হাশরের কথা বলেছেন।

(i) ব্যক্তিগত মৃত্যু ও মৃত্যু-অন্তে আত্মার বিচার-ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত কিয়ামত-হাশর।

(ii) দৈব-দুর্ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারী প্রভৃতিতে এক কালীন বহু মানুষের মৃত্যু এবং মৃত্যু অন্তে বিচার ব্যবস্থাপনা সমষ্টিগত কিয়ামত হাশর।

(iii) মানুষ ও অপরাপর জীবের পৃথিবী, কি মনুষ্য তুল্য বুদ্ধিমান, বিবেকবান যে কোন জীবের বাসস্থান অপর যে কোন গ্রহ উপগ্রহের শক্তি ফুঁকতে ফুঁকতে ফুঁকে দিয়ে শেষ সময়ে জীব-ধারণের উপযোগী আর না থাকা এবং সে সময়ের জীবের শেষ মৃত্যু-লীলা ও সেই সব আত্মার বিচার-ব্যবস্থাপনা শেষ কিরামত-হাশর। বলা বাহুল্য, জীবের মানব পর্যন্ত বিকাশ হবার পূর্বেও কোন কোন গ্রহ কি উপগ্রহ ঐ শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। অবিকশিত বিবেকহীন থাকার কারণে তাদের জীবের পাপ পুন্য না থাক, বিচার না থাক, কিন্তু ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই রয়েছে।—'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধ ও তার পরবর্তী সব প্রবন্ধই এ মতবাদ পুরোপুরি বুঝতে ভালো করে' পড়ুন। আমার 'আত্ম দর্শন' 'তত্ত্ব দর্শন' গ্রন্থে 'বেহেশত দোযখ' অধ্যায়ে পেতে পারেন পুরো তার প্রজ্ঞা।

হাদিছে কিয়ামত

রছুলুল্লাহর (সঃ) এন্তেকালের প্রায় ২৫০—৩০০ বৎসর পরে টোকানো হাদিছের সংগে কোরআনের কথার ঐক্য না হলে রছুলুল্লাহই (সঃ) তা' নাকচ ঘোষনা করে গেছেন, তা যেমন 'শিল্প-সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে দেখ্‌বেন, এখানেও দেখুন ঃ

যদি আমার নামে প্রচলিত প্রচারিত কোন হাদিছের—পরবর্তী কালে—কোরআন-কালামের সংগে ঐক্য না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ও কথা আমার নয়, কিংবা আমার কথার বিকৃতি মাত্র, সে ক্ষেত্রে কোরআনের বাণীই গ্রহণ করতে হবে, আমার কথা নামে কথিত মিথ্যা কিংবা আমার কথার বিকৃতি বর্জন করতে হবে।—ইব্‌নে আছাকার, ইব্‌নে ওমর।

এখন, বোখারী শরীফ (২৫০ হিজরীতে টোকানো) মোছলেম শরীফ (২৬১ হিজরীতে টোকানো), মাজাহ্‌ শরীফ (২৭৩ হিজরীতে

টোকানো), সাজি শরীফ (এবনে দাউদ, ২৭৫ হিজরীতে টোকানো), তিরমিজি শরীফ (২৭৯ হিজরীতে টোকানো) এবং নেছাই শরীফ (৩০৩ হিজরীতে টোকানো)—প্রামান্য এই ছেহায়ে ছেত্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ বলিয়া কথিত ও গৃহিত ছয় খণ্ড হাদিছে কেয়ামত সম্পর্কে যতো হাদিছ টোকানো হয়েছে তা' কতো দূর সত্য তা পাঠক-পাঠিকারা নিজেরা একটু কোশিশ করে ওর বাংলা তরজমা পড়লেও বুঝ্‌তে পার্‌বেন। মাত্র একটি হাদিছেরই মাত্র যা কিছু অর্থ-টর্থ হয়, তা আমরা নিম্নে তুলে দিচ্ছি। তাতেই প্রমাণিত হয় যে রছুলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত যে কোন রকম মৃত্যুকেই আসলে মহা প্রলয় বা কেয়ামত মনে করেছেন, বলেছেন, যদি ঐ হাদিছ সত্যিই রছুলুল্লারই (সঃ) কথা হয়ে থাকে।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন আরব-বাসী হজরতের নিকট এসে মহা প্রলয় (কেয়ামত) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তার মধ্যে এক অল্প বয়স্ক লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করে' বল্‌লেন—যদি সে জীবিত থাকে, তবে সে বৃদ্ধ না হতেই তার মহাপ্রলয় (কেয়ামত) তাকে গ্রেপ্তার করবে।—বোখারী, মোছলেম।

আরো কয়েকটি হাদিছ তুলে দিচ্ছি ঃ

১। হযরত শো'বাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলেছেন—আমি এবং মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এই দুই অঙ্গুলীর ন্যায় উত্থিত হয়েছি।—বোখারী, মোছলেম।

২। হযরত জাবের হতে বর্ণিত আছে—আমি রছুল করিমকে তাঁর মৃত্যুর একমাস পূর্বে বল্‌তে শুনেছি—তোমরা মহাপ্রলয় (কেয়ামত) সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস কর্‌ছ। তার জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি যার একশত বছর বয়স হয়েছে এরূপ একজন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কারী দুনিয়াতে তখন জীবিত থাক্‌বেনা।—মোছলেম।

৩। হযরত আবু ছইদ হতে বর্ণিত আছে রছুল করিম বলেছেন—আজ যারা জীবিত আছে এক শত বৎসর পর তারা পৃথিবীতে জীবিত থাকবেনা।—মোছলেম।

৪। হযরত মোছ্তাওরেদ বিন শাদ্দাদ হতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলেছেন—মহাপ্রলয়ের প্রথম নিশ্বাসের সময় প্রেরিত হয়েছি। এ যেরূপ একে অতিক্রম করেছে আমিও ওকে অতিক্রম করেছি। তিনি তাঁর মধ্যম ও তর্জনী অঙ্গুলী দিয়ে ইংগিত কর্লেন।—তিরমিজি।

৫। হযরত ছইদ বিন আবু ওয়াক্কাছ হতে বর্ণিত আছে যে, রছুল করিম বলেছেন—আমি আশা করি যে আমার ওম্মতগণের অর্ধেক দিনের জন্যও তাদের প্রভুর নিকট যেন অপেক্ষা করতে না হয়। ছায়াদকে জিজ্ঞেস করা হলো অর্ধেক দিনে কত সময়? তিনি বল্লেন—৫০০ বছর।—আবু দাউদ।

এখন প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আপনারা নিজেরাই বিচার করুন ঐ সব হাদিছ কতোদূর সত্যিকার রছুলের বাণী:

কারণ: (১) আমি এবং মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এই দুই অঙ্গুলীর ন্যায় উত্থিত হয়েছি ছেহায়ে ছেত্তার প্রধান হাদিছ-সংগ্রহ বোখারী ও মোছলেমের এ হাদিছের অর্থ কী!

(২) এই মাত্র রছুল করিম বল্লেন যে, মহাপ্রলয়ের জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট। পরক্ষনেই শপথ করে বল্ছেন বার এক শত বছর হয়েছে এরূপ একজন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-কারী দুনিয়াতে তখন জীবিত থাকবেনা।—মোছলেমে বর্ণিত ও-হাদিছ সত্য হলে রছুলের কথার কোন সংগতি প্রমান হয় কি? এই আল্লাহ্র উপর জ্ঞান চাপিয়ে দিয়ে পরক্ষনেই আবার নিজেই বল্ছেন, আর কী রকম? শপথ করে, তা-ও আল্লাহ্র নামে, এবং যার এক শত বছর হয়েছে এরূপ একজন নিশ্বাস

প্রশ্বাসকারী দুনিয়াতে তখন অর্থাৎ কেয়ামত (মহাপ্রলয়) সময়ে জীবিত থাকবে না—কথার অর্থ কী।

(৩) ঐ আজ যারা জীবিত এক শত বৎসর পর তারা জীবিত থাকবে না কথার অর্থ কী!—ঐ এক শত বৎসর পরে কেয়ামত হবে? কিন্তু তাকি হয়েছে?

(৪) মহাপ্রলয়ের (কিয়ামতের) প্রথম নিশ্বাসের সময়ে প্রেরিত হওয়ার এবং 'এ' যেমন 'এ'কে অতিক্রম করেছে, আমিও 'ও'কে অতিক্রম করেছি ইত্যাকার কথার, আর মধ্যম ও তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা দেওয়ার 'তাৎপর্য' আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে দাবী কর্‌ছি।

(৫) আমার উম্মতগণের অর্ধেক দিনের জন্যও তাদের প্রভুর নিকট যেন অপেক্ষা করতে না হয়, আর ঐ অর্ধদিন ৫০০ বৎসর—এসব কথার তাৎপর্য কী, বিনীতভাবে জান্‌তে বাসনা জাগে, ইচ্ছা করে, কেউ বলে দিবেন কী!

বোখারী মোছলেম থেকে হাদিছ তুলে প্রমাণ করার কষ্ট-কল্পনা করা হয় যে দুষ্ট লোকদের কার্যের ফলেই কেয়ামত হবে (দেখুন আল্‌হাজ্জ মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব কৃত 'মেশকাত শরীফের' বংগানুবাদ ৪র্থ খণ্ড ১৬৫৪ পৃঃ ২৩৬৭ নং হাদিছ সমূহ)।

ঐ ২৩৭০ নং কেয়ামত ও শিংগায় ফুঁক সংক্রান্ত হাদিছে আছে—দুটি শিংগা ফুঁকের মধ্যখানে ৪০ হবে। এই '৪০' দিন, না, বৎসর, তার কোন সঠিক জ্ঞান আবার সেই রছুল যিনি ঐ ৪০ বলেছেন তারই নেই, কী মজার হাদিছ।—আবার ঐ ১৬ নং এ বর্ণিত আছে রছুল করিম বলেছেন—কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ দুনিয়াকে মুষ্টির ভিতর লয়ে এবং আছমানকে তার ডান হাতে নিয়ে বল্‌বেন, আমি রাজা।—দুনিয়ার রাজাগণ কোথায়?—আল্লাহ্‌ যেন মানুষ আর কী! তাঁর হাতপা আছে—ডান হাত বাম হাত ইত্যাদি,—আর ঈর্ষা

আছে, নতুবা দুনিয়ার রাজাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হলে কেয়ামতের দিন তাদের ঐভাবে ডাকবেন কেন? আর আছমান যেন ঐ নীল এলাকা, শক্ত কঠিন কিছু, তাই হাতে-টাতেও লওয়া যায়। আরো আছে ঐ ১৭ নং এ আকাশ সমূহকে ঐ দিন ঘুরাবেনও।—

আল্লাহ্‌কে মানবরূপে কল্পনা করে' মানুষের দুষ্কর্মের ফলেই প্রতিশোধ দেবার নিমিত্ত তার কিয়ামত অর্থাৎ মহাপ্রলয় ঘটানোর কষ্ট-কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু যে-স্রষ্টার কোন সীমা নেই, সংকীর্ণতা নেই, মানুষের মতো মোটেই যিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুর বশীভূত নন, নিরাকার নির্বিকার —[দেখুন 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' প্রসংগাদি] তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্যই কিয়ামত ঘটাবেন এ কেমন কথা! আবার যে-সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয়ের কোন সীমা নেই, সরহদ্দ নেই, ক্ষুদ্র একটি পৃথিবীর সৃষ্টি, কি প্রলয়-সংগে সেই সব অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, গ্যাস প্রভৃতি কতো-কিছু-ভরা বিরাট বিপুল ছায়াপথ সমূহের কী সম্পর্ক? তার অসংখ্য অফুরন্ত তারকা সাম্রাজ্য ও তাদের বিশালতা বিপুলতা না জানার, না বোঝার দরুণই তাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক বালুকা-কণা-তুল্য পৃথিবীর কিয়ামতের কল্পনায় অনর্থক অকারণ তাদেরও টেনে আনা হয়। কী হাস্যকর ব্যাপার! —'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'ইস্‌লামিয়াৎ' প্রসংগের ৪নংও দেখুন।

ঐ সব হাদিছের মতো অসংখ্য অসংলগ্ন শিশুসুলভ হাদিছ ছড়িয়ে রয়েছে ছেহায়েছেত্তা হাদিছ সগ্রংহের পাতায় পাতায়, 'মেশকাত শরীফ' সংগ্রহে সৃষ্টি-কৃষ্টি প্রলয় পুনরুত্থান প্রভৃতি জটিল জটিল বৈজ্ঞানিক দার্শনিক রহস্য সম্পর্কে। তা সব সত্য মনে করে মান্‌লে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধির অবশেষ আর বিশেষ কিছু

থাকেনা এবং রছুল করিম (স) আর স্বয়ং আল্লাহ্ তালার মাহাত্ম্য মর্যাদাও তাতে করে' আদৌ বাড়েনা। এবং ধর্ম-কর্ম-সমূহ নেহাৎ খেলো জিনিস হয়ে যায় ঐ অহংকারী অত্যাচারী প্রতিহিংসাপরায়ন (নাউজুবিল্লাহ মেন্‌হা) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ রকম শিশুসুলভ হাদিছ-বেত্তার কথা মতো সেজ্‌দা-টেজ্‌দায়। অতএব ওর কোন হাদিছই আসল অকৃত্রিম হাদিছ নয়, আল্-কোরআন-কালামের সংগেও ঐ হাদিছগুলি মাত্রই ঐক্য রাখেনা। কাজেই সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয়, পূনরুত্থান প্রভৃতি গুরুতর রহস্য বিষয়ে সঠিক সত্য জ্ঞান আহরণ করতে হলে ঐ প্রায় ২৫০—৩০০ বৎসর পরে টোকানো হাদিছের দোহাইতে আদৌ কায হবে না। তাকাতে হবে আল্‌কোরআনের ঐ সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের মূল দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কখনো কখনো শৈল্পিক তাৎপর্যের দিকে। আর যদি কদাচিৎ কোন কোন হাদিছের ওর সংগে ঐক্য হয় তবেই মাত্র সেই সেই হাদিছের উদ্‌ধৃতি দেয়া যেতে পারে ঐ সামঞ্জস্য সমর্থন দেখানোর জন্য, যেমন আমরা দিয়েছি, দেখিয়েছি।

ঐ ১ম আয়াতের গবেষনা করে সৃষ্টি রহস্য বুঝবার দার্শনিক তাৎপর্য আমরা বিভিন্ন পুস্তকে বুঝিয়েছি, কিয়ামত ও পূনরুত্থান অর্থাৎ মৃত্যুলীলা ও বিচার ব্যবস্থাপনার দার্শনিক জ্ঞানও আমরা ঐ উপরে দিয়েছি। এখন দেখুন ঐ আয়াত এবং আরো অনুরূপ আয়াতের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য।

কোরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী

ঐ আয়াতের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হচ্ছে যেমন এই সৌর লোকের গ্রহ উপগ্রহে, তেম্‌নি যে-কোন নীহারিকা জগতে অহরহ বিপর্যয় কাণ্ড যথাক্রমে বিস্ফোরণ ও বিস্ফারণ ঘটেই চলেছে। আর তা ই স্বাভাবিক। তাতে করেই ঐ সব আঞ্চলিক

অভিব্যক্তি, কি ক্রম-বিবর্তন—সে দিকে আমাদের অর্থাৎ মানুষদের ঐ রকম আয়াত-মারফত দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্য ও কুদরত সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করা।

এখন, বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্য বুঝ্তে ঐ কিয়ামত উপলক্ষে বর্ণিত কতিপয় আয়াতের অনুরূপ বৈজ্ঞানিক, কখনও কখনও কিছুটা দার্শনিক বিশ্লেষণ দেখে যান [ফলতঃ, দর্শন-বিজ্ঞান পরস্পর পরিপূরক, সুতরাং এক রকম বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রসংগত অন্য রকম বিশ্লেষণও কতকটা অন্ততঃ এসেই পড়ে।]

و الذريت ذروا - فالحملت وقرا - فالجريت يسرا - فالمقسمت امرا -
انما توعدون لصادق - و ان الذين لواقع - و السماء ذات الحبک -

অয্‌যারিয়াতে যারওয়া—ফালহামেলাতে ভেক্‌রা—ফালজরেইয়াতে ইয়ুছরা—ফাল মুক্কাচ্ছেমাতে আম্‌রা—ইন্নামা তুআদুনা লা ছাদেক্‌-অইন্নাল্লাজিনা লাওয়াকেয়্‌—অচ্ছামায়ে যাতেল হুবুক

(২য় আয়াত) : বিবেচ্য বিস্ফোরণকারী (গ্যাস) যা (দ্রুত) গ্যাস ধূলীমেঘ উড়ায়, আর তার মধ্যে (বিভিন্ন তরল, বায়বীয়, কঠিন) ভার-বাহী সমূহের যারা ভার বহন করে। আর বিবেচ্য (তার মধ্যে) মৃদু বিস্ফোরকদের (সম্ভবতঃ যে সব জোতিষ্ক অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তাদের কথা বলা হচ্ছে)। এর পর ব্যাপার ভাগ বাটোয়ারা কারকদের [সেই কেবল বিস্ফোরনে ক্রম-বিস্ফারনের কথা বলা হচ্ছে]। নিশ্চয়ই যা নিয়ম-নিগড়-বদ্ধ তা সত্য, আর এরূপ বিন্যাস-ব্যবস্থাপনা অবশ্যই ঘটে থাকে, ঘটবে, (কারণ) বিবেচ্য সেই আছমান (যা এই ভাবে) ক্রমে বহু বর্ম্ম-বিশিষ্ট হয়ে চল্‌ছে :—যারিয়া ১—৭।

تكاد السوت يتفطرن من فوقهن -

তাকাদোচ্ছামাওয়াতো ইয়াতাফাত্‌তারনা মেন ফাওকেহিন্না

(৩য় আয়াত) : আছমান সমূহ তাদের উর্ধলোকে প্রায় চরমার হয়, আর কী ?—শূরা ৫। একেবারে তো আর চরমার

হয় না, বরং বিস্ফোরিত হয় নব বিবর্তন কারণে, তাই 'প্রায় চূরমার হয় আর কী' বলা হয়েছে।

فا ذا برق البصر - وخسف القمر - وجمع الشمس و القمر - يقول الانسان يومئذ اين المفر -

ফা এজা বারেকাল বাছারো—খাছাফাল কামারো—অ জুমেয়াশ্‌শামছো অল কামার—ইয়াক্‌ুলুল এনছানো ইয়াওমায়েজেন আয়নাল মাফার—

(৪র্থ আয়াত) : আর যখন দৃষ্টি হয়ে যায় বিহ্বল (ঘোলাটে), চন্দ্র হয়ে যায় (যেন) আঁধারে আবৃত, আর চন্দ্র, সূর্য হয়ে যায় (যেন) জমায়েৎ, মানুষ সেদিন বলে : কোথায় আমরা পালাই।—কিয়ামত ৭—১০।

স্পষ্টতঃ পৃথিবীস্থ ভীষন ঝড়-বন্যা, কি আগ্নেয়গিরির উৎপাতে যে সমষ্টিগত কিয়ামত-হাশর কখনও কখনও ঘটে সেই সময়কার হাল-হাকিকতের কথা বলা হয়েছে। আরো—ব্যক্তিগত মৃতু-বরণের সময়েও সাধারণ মানুষের কাছে চন্দ্র-সূর্য অন্তর্নিহিত, কি একাকার হয়ে যাচ্ছে, কি পর্বত সকল ধুনিত লোমবৎ উড়ে যাচ্ছে বলে' মা'লুম হয় ভয়ে কাতর, মরণ-যাতনায় নিভে-যাওয়া দুচোখের চাহনিতে।

فاذا النجم طمست واذا السماء فرجت -

ফাএজান্নূজুমো তুমেছাত অ এজাচ্ছামায়ো ফুরেজাত

(৫ম আয়াত) : যখন তারকাপুঞ্জ অন্তর্হিত হয়, (কারণ) আছমান বিস্ফোরিত হয়।—মুরছালাত ৮, ৯।—এর আগ্‌-পিছ আয়াত পৃথিবীস্থ ঐ কিয়ামত সম্পর্কে।

ان يوم الفصل كان ميقاتا - يوم ينفخ فى الصور فتتون افواجا-وفتحت السماء فكانت ابوابا - وسيرت الجبال فكانت سرابا -

ইন্না ইয়াওমাল ফাছলে কানা মিক্বাতা—ইয়াওমা ইয়ুনফাখো ফিচ্ছূরে ফাতাতুনা আফ্‌ওয়াজা—অ ফুতেহাতেচ্ছামায়ো ফাকানাত আবওয়াবা—অ ছুইয়েরাতেল জেবালো ফাকানাত ছারাবা—

(৬ষ্ঠ আয়াত): ব্যবস্থাপনার দিন বা সময় নির্ধারিত আছে। সে দিন ভেরী বাজে এবং দলে দলে সবে ছুটে আসে, আর আছমান বিস্ফোরিত হয়ে বহু দরোজায় বিস্ফারিত হয়, আর পর্বত সকল অপসারিত হয়, থাকে শুধু মরীচিকা (তুল্য কংকর ধূলিরাশি)।—নাবা ১৭—২০।

পৃথিবীর ঝড় বন্যা, ভূমিকম্পাদির আওয়াজই ভেরী বাজা, আর সে সময়ে মানুষের ও অন্যান্য জীবের মৃত্যু বরণ করে' দলে দলে পরলোকে ছুটে যাওয়া, কি পর্বতাদির অম্‌নি ভূমিকম্পে ধ্বসে চূরমার হয়ে পড়া, কি কতক পার্বত্যভূমিসহ কতক সমতল অঞ্চলের হ্রদে পরিণত হওয়া ইত্যাদি বোঝা যায়। সে বৈজ্ঞানিক, তৎসংগে কিছুটা দার্শনিক তথ্য ও সেই মোতাবিক তত্ত্ব। এর নিছক বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হচ্ছে মহাশূণ্যে অনুরূপ বিস্ফোরণ, তার আওয়াজ (যে অঞ্চলে গ্যাস বায়বীয় অবস্থায় পৌছেচে সেখানকার কথা, কারণ বাতাস ছাড়া আওয়াজ হয় না), আর গ্যাসীয় ছুটাছুটি, নক্ষত্র মালার, কি গ্রহ-উপগ্রহের আকার প্রকার পরিবর্তন অর্থাৎ ক্রম-বিবর্তন অহরহই চল্‌ছে, এ-ভাবে বিস্ফারিত বিকশিত হয়েই চলেছে বিশ্ব, আর উল্কাপিণ্ডে, কি ধূমকেতুর মধ্যেও আমরা পাই পর্বতের প্রমাণ ও নিদর্শন; তারো অপসারণ, কি ক্রম-বিবর্তন অনুরূপ বিস্ফোরণে ঘটেই চলেছে। অনুরূপ সৃষ্টিও হচ্ছে।

يوم ترجف الراجفة - تتبعها الرادفة - قلوب يومئذ واجفة - ابصارها
خاشعة - يقولون ءانا لمردودون فى الحافرة - ءاذا كنا عظاما نخرة -
قالوا تلك اذا كرة خاسرة - فانما هى زجرة واحدة - فاذاهم بالساهرة -

ইয়াওমা তারযুফোর রাযেফাহ্‌—তাত্‌বায়ুহার রাদেফাহ্‌—কুলুবোঁ ইয়াওমায়েযেঁ অযেফাহ্‌— আবছারুহা খাশেয়াহ্‌—ইয়াকূলুনা আ ইন্না লামার্‌দুদূনা ফিল হাফেরাহ্‌—আ ইজা কুন্না এজামান নাখেরাহ্‌—কালু তিল্‌কা এজা কার্‌রাতুন খাছেরাহ্‌—ফাইন্নামা হিআ জায্‌রাতোঁ ওআহেদোহ্‌-ফা্‌ইজা হুম বেচ্ছাহেরাহ্‌.

(৭ম আয়াত): সে দিন ভীষন অনুভূত হয় ভূকম্পন, যা ঘটে পরবর্তী তার অনুসরন করে [অর্থাৎ একের পর এক ঘটনা ঘটে — কখনো পর্বত সহ মৃত্তিকা ধ্বসে গিয়ে হয় হ্রদের সৃষ্টি, কখনো সমুদ্র-গর্ভ থেকে উত্থিত হয় পর্বত শ্রেণী], (মানব) হৃদয় সেদিন হয় ভয়ে কাতর, কম্পিত, চক্ষু হয় বিনত (বিনষ্ট)। তারা বলে—আমরা কি পূর্ব অবস্থায় বিতাড়িত হবো? কী! যখন আমরা হয়ে গেছি (মৃত্যু অন্তে) পচা হাড় (চূর্ণ বিচূর্ণ)। তারা আরো বলে: তা হলে এতো এক ক্ষতি-জনক প্রত্যাবর্তন!—কিন্তু কেবল (আর একবার) প্রলয়ংকর ধ্বনি, তখন দেখো, তারা সব জাগ্রত [পুনঃ ভীষণ বিস্ফোরণে পুনর্গঠিত হয়ে গেছে]।—নাযিয়াত ৬—১৪।

তাৎপর্য হলো: যেমন মানুষের মৃত্যু অন্তে পুনর্জাগরণ, পুনর্জীবন (ঈমান মোফাচ্ছলের বায়াছ বায়াদাল মওত) আছে [দেখুন' 'জিজ্ঞাসা' 'পরিশিষ্ট' 'চারি কলেমা', ঈমান'], তেমনি অপর প্রতি জীবের, কি পদার্থের যথাক্রমে পুনর্গঠন রয়েছে। এবং অহরহ বিশ্ব রাজ্যে অনুরূপ ধ্বংস ও সৃষ্টি ঘটেই চলেছে, ঘটবেই।

اذا السماء انفطرت - و اذا الكواكب انتثرت - و إذا البحار فجرت-

و اذا القبور بعثرت - علمت نفس ماقدمت واخرت -

ইজাচ্ছামায়ুন ফাতারাত—অ ইজাল কাওয়াকেবুন তাছারাত—অ ইজাল বেহারো ফুজ্জেরাত—অ ইজাল কুবুরো বু'ছেরাত—আলেমাত নাফ্ছুম মাক্বাদ্দামাত্ অ আখ্খারাত

(৮ম আয়াত:) যখন আছমান বিস্ফোরিত হয়ে বিস্ফারিত হয়, আর (ফলে) যখন নক্ষত্রমালা (পরস্পর) থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সমুদ্র সকল যখন উদ্বেল হয়ে বিস্ফারিত হয়, যখন কবর সকল উন্মুক্ত হয়, তখন প্রতি সত্তা বুঝতে পারে সে পূর্বে কী ছিলো এবং পরে কী হয়েছে (কী হয়ে থাকে)। —এন্ফেতার ১—৫।

এর দার্শনিক তাৎপর্য হলো ঐ ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, কি শেষ কিয়ামত-হাশরের সময়ে যে কোন গ্রহ উপগ্রহের জীবনের ঐ হাল-হাকিকত। তখন বিশ্ব-রাজ্যে সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়, ভূমিকম্প ঝড় বন্যাদিতে তো সমুদ্র উচ্ছ্বলিত উদ্বেলিত ও বিস্ফারিত হয়ই। এবং কবর সকল উন্মুক্ত, কি ওলটপালট হয় মানে হলো: এক কালীন মৃত মানব-সকল বিধ্বস্ত, কি কবরস্থ হয়েই আবার বিচারার্থ তাদের আত্মার পুনরুত্থান, তখনই তারা বুঝ্‌তে পারে পূর্বে তারা কী ছিলো এবং পরে অর্থাৎ মৃত্যু অন্তে কী হয়েছে, তাদের কী হতে চলেছে।

এর বৈজ্ঞানিক সত্য হলো: এক এক নীহারিকা জগৎ বা ছায়ালোক—আমরা বলেছি—অসংখ্য নক্ষত্র-মালা খচিত এবং আরো আরো গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ সমেত বিরাট বিপুল সমুদ্র বিশেষ, বিস্ফোরণে তার উদ্বেল উচ্ছল হাল-হাকিকত অর্থাৎ বিস্ফারণ হচ্ছে, তারকাময় নীহারিকাদল পরস্পর থেকে সুদূরে সরে পড়ছে (ঐ বিস্ফারণ)। আর, কবর ও কভার (ঢাকনা) কিন্তু মূলতঃ এক অর্থ জ্ঞাপক। আরবী কবর শব্দ থেকেই ইংরেজী কভার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কিনা কে জানে। এক্ষেত্রে কবর ঐ কভার অর্থ। অর্থাৎ গ্যাসীয় বিরাট বিপুল অঞ্চলে আবৃত হয়ে আছে যেমন পূর্বোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর গ্যাসানল, তেম্‌নি তাদের থেকে উৎপন্ন হতে পারে ঐ ১০৮টি, কি ততোধিক মৌল উপাদান; কি আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি), বাদ (বায়ু)—তাদের রূপান্তর স্তর—সবই ঐ কবরে কবরস্থ (covered—আবৃত)। ঐ বিস্ফোরণেই তাদের উন্মোচন, তা-ই কবর উন্মুক্ত করন, আর ঐ ক্রম-বিবর্তন সাধিত হয়েই চলেছে। সেই পরিবর্তন, রূপান্তর বা বিস্ফারণ 'তারা পূর্বে কী ছিলো, পরে কী হয়েছে (কী হয়ে থাকে)' কথায় প্রকাশ, আর আত্মার আবির্ভাব, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি মানব, কি অপর গ্রহ

উপগ্রহে অনুরূপ বিবেকবান, বুদ্ধিমান অপর কোন জীব স্তরে পৌঁছানও ঐ একই দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক প্রক্রিয়া-প্রণালী-মোতাবেক ঘটে আসচে, ঘটে থাকে, তা-ও ঐ 'প্রতি সত্তা বা আত্মা (ক্রমে ক্রমে) বুঝ্‌তে পারে' কথায় প্রকাশ।

اذا السماء انشقت - و اذنت لربها و حقت - و اذا الارض مدت -
و القت ما فيها و تخلت - و اذنت لربها و حقت -

এজাচ্ছামায়ুন শাক্কাত—অ আযেনাত্ লেরাব্বিহা অ হুক্কাত—অ ইজাল আরদো-মুদ্দাত্—অ আল্‌কাত মা ফিহা অ তাখাল্লাত্—অ আযেনাত্ লে রাব্বিহা অ হুক্কাত্

(৯ম আয়াত) : কখনও কখনও আছমান বিস্ফোরিত হয় আর সে তার প্রভুর হুকুম মানে' আর সেই আনুপাতিক হয়। আর ছুনিয়া হয় আকর্ষিত, যা আছে তা বের করে' দিয়ে খালি। সেও তার প্রভুর হুকুম মানে এবং সেই আনুপাতিক হয়।—ইনশেকাক ১—৫, অকেয়া ১—৬।

যে কারণেই হোক ঐ বিস্ফোরণে যে গ্যাস পুঞ্জের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার এক এক আঞ্চলিক জোট বেঁধে, জমাট হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি, তা থেকে ঐ একই প্রক্রিয়ায় গ্রহ-উপগ্রহের পয়দায়েশ, আর ঐ বিস্ফারণে যে নীহারিকা সমূহের পরস্পর থেকে পলায়ন, ফলে বিশ্বের ক্রম ফুলে ফেঁপে উঠা, মহাবিশ্ব হওয়া, তা ঐ ধরনের আয়াত মোতাবিক বোঝা যায়। আর ছুনিয়া (আর্‌দ্) ঐ গ্রহ-সমূহ। তা ঐভাবে ছিটকে বেরিয়ে এসেও আকর্ষন এড়াতে পারে না, ফলে যা বের করে দেয়ার—প্রাথমিক সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণনে—উপগ্রহ বের করে' দিয়ে হয় খালি অর্থাৎ একটা ভারসাম্য অবস্থায় রূপান্তরিত। তখন ঘূর্ণনের ঐ প্রচণ্ডতা কমে গিয়ে গ্রহগুলোর আকৃতি প্রকৃতির তারতম্যে অনেকটা পরিমিত যার যার ঘূর্ণায়মান ত্বরনে ছুটে চল্‌ছে। উপগ্রহগুলোও—যার যার গ্রহের চারদিকে কম বেশী জুরিয়ে গিয়ে ঘুরছে। এইভাবে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম নিগড় মাফিক সব ঘটে এসেছে চির-যুগ এবং সেই আনুপাতিক

হচ্ছে। এর দ্বারা এ-ও বোঝা যায় এ এক চিরন্তন নিয়ম-নিগড়। মহাশূন্যের অপর কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে এমনি হাল-হাকিকতে সৃষ্টি, কৃষ্টি, প্রলয় চলছেই, চলবেই, তা পূর্বেও বলেছি।

فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان -

ফা ইজান শাক্কাতেচ্ছামায়ু ফাকানাত বারদাতান কাদ্দেহান

(i) আর যখন আছমান ফাটে, সে হয় চামড়ার মতো লাল। —রহমান ৩৭।

বিস্ফোরণেই যে আছমানে সব-কিছুর সৃষ্টি ও ধ্বংস এবং উভয় অবস্থাই লেলিহান গ্যাসীয় অগ্নিকাণ্ডের ফল তা ঐ যথাক্রমে 'আছমান ফাটে' এবং 'চামড়ার মতো লাল হয়' কথায় বোঝা যায়।

و لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون - لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون -

অ লাও ফাতাহ্না আলায়হিম বাবা ম্মেনাচ্ছামায়ে ফাযাল্লূ ফিহে ইয়ারুজুন লা ক্বালূ ইন্নামা ছুক্কেরাত আব্ছারুনা বাল্ নাহ্নু ক্বাওমুম্ মাছহুরুন

(ii) এবং আমরা (আল্লাহ, অপর সব গায়ব রহস্য-সহ) যদি তাদের অর্থাৎ মানুষের জন্য (ঐ অনন্ত) আছমানের (ছায়াপথের) কোন এক দরোজা (কোন এক ছায়ালোক-পথ) খুলে দেই, আর তারা তাতে (ঐ যে কোন একটি নীহারিকা-লোক বা ছায়াপথের দিকে) এগোতে থাকে, তখন তারা বল্বে, 'আমাদের চক্ষু সকল (ভাবার্থে দর্শন বিজ্ঞান বুঝ্বার ইন্দ্রিয় সকল) বিহ্বল হয়েছে, না, আমাদের (যেন) যাদু করা হয়েছে'।—হিজর ১৪, ১৫।

তাৎপর্য হলো : ওর যে কোন এক ছায়ালোকে সফর ও তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আহরণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, মানুষের পক্ষে এমনি ওর অফুরন্ত বিস্তার ও অপরিসীম দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়-বস্তু পরিপূর্ণ ওর সব। যে কোন নীহারিকা লোকের অন্তর্গত কোটি কোটি সৌরজগতের অধীন অসংখ্য জ্যোতিষ্কমালার অপরিমেয় রূপ-বৈচিত্র্যে বিহ্বল ও বিচলিত হওয়ার কথা বাদ দিলেও, ওর তেজস্ক্রিয়

পদার্থ সমূহের তেজ বিকীরণে রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে বেঁচে ফিরে আসাই বাতুল চিন্তা মাত্র,—এমনি অহরহ বিস্ফোরিত ও বিস্ফারিত হয়ে চলেছে ওরা অনবরত।

বিশ্ব-বিজ্ঞান—আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত

এখনই বিবেচ্য : ঐ যে বিপুল বিভিন্ন গ্যাস ও তার বিস্ফোরণ ও রূপান্তরনে বিশ্ব-সৃষ্টি, সেই গ্যাস এলো কোত্থেকে? আবার, কোন এক অপেক্ষাকৃত বড়ো সূর্যের আকর্ষণে আমাদের আদি সূর্যের ফুলে ফেঁপে ওঠা ও সেই সূর্য সরে গেলে ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে গ্রহ-সমূহ ও তাদের থেকে উপগ্রহ-সমুহের ঐ একই সময়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসা, তার কারণ কি?—কিংবা আমাদের সূর্য আদিতে প্লুটো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কালক্রমে সংকুচিত হওয়ায় মাঝে মাঝে ফাঁক হয়ে গেছে এবং চার দিকের অংশ সমূহ ক্রমশঃ গ্রহ-উপগ্রহের আকৃতি প্রকৃতি নিয়েছে—এ রকম সংকোচন সম্প্রসারনেরই বা কারণ কী? সেই আদি কারণ খোঁজা বিজ্ঞানের এখতিয়ারভূক্ত নয়, দর্শনের বিষয়-বস্তু। তবু দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পর পরিপূরক বলে' বিজ্ঞানীরা সে সম্পর্কে একেবারে নিরুত্তর থাক্‌তে পারেন নি। ববং আধুনিক বিজ্ঞানের আদি গুরু অতি বিনয়ী স্যার আইজাক নিউটন বলেছেন : 'জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে তিনি মাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করছেন'। অতি আধুনিক শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন বলেন : 'বুদ্ধির সমস্ত রাজ পথ এবং কল্পনার সমস্ত গলি ঘুঁজি অবশেষে এমন এক অতল গভীরে পৌঁছে দেয় যার পরিমাপ করা মানুষের শক্তির বাইরে, মানুষ তখন ধর্ম পুস্তকেরই সেই কথার প্রতিধ্বনি করে : আল্লাহ্‌র আদেশেই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল।

অতএব দৃশ্য সমস্ত জিনিসই অদৃশ্য জিনিস থেকে তৈরী।' তিনি আরো বলেন :

"যে অনন্ত উর্ধতম আত্মা আমাদের ভঙ্গুর ও দুর্বল মনের কাছে অতি সামান্য মাত্রায় নিজেকে বিকশিত করে' থাকেন, বিনীতভাবে, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁর প্রশংসা করাই আমার ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব চরাচরে প্রকাশিত সর্বোচ্চ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন সেই আত্মার অস্তিত্বের প্রতি গভীর আবেগপূর্ণ বিশ্বাসই আল্লাহ্ সম্পর্কে আমার ধারনার ভিত্তি।"

এখন বিবেচ্য আঞ্চলিক এক এক নক্ষত্র-মণ্ডল বা রাশি চক্র। ওর বিস্তারিত বিবরণ কোরআন, কি অপর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে খুঁজতে যাওয়া সঠিক জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করা নয়, তা পূর্বেও বলেছি। কিন্তু দৃশ্যতঃ রাশিচক্র যে আছে কোরআন তারও সাক্ষ্য বহন করছে।

و السماء ذات البروج অচ্ছামায়ে যাতেল বুরুজ

(অসংখ্য) রাশি-চক্র সমাবেশের আকাশ মণ্ডলের সাক্ষ্য।— ছুরা বুরুজ।

تبرک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سرجا و قمرا منیرا-

তাবারাকাল্লাজি জাআলা ফিচ্ছামায়ে বোরুজা অ জাআলা ফিহা ছেরাজাঁ অকামারাম মুনীরা

বরকত-ওয়ালা তিনি—যিনি মহাকাশ মণ্ডলে বুরুজ (অসংখ্য রাশিচক্র) বানিয়েছেন এবং তাতে এক এক বাতি (সদৃশ শ্রেষ্ঠ সূর্য) এবং তার (আলোকে) আলোকিত চন্দ্র (গ্রহ-উপগ্রহ) বানিয়েছেন।"—ফোর্কান ৬১।

জানা আবশ্যক সেই জমানায় বিজ্ঞানের এতোখানি উন্নতি হয় নি। তাই এক এক শ্রেষ্ঠ সূর্য বুঝাতে সেই জমানার লোকের পক্ষে বোধগম্য বাতি আর গ্রহ-উপগ্রহ বুঝাতে চন্দ্রের মেছাল দিয়ে বলা হয়েছে; তা না হলে কিছুই বুঝ্‌তো না। আল্লাহ্ জমানা-যুগ-মাফিকই কথা কয়ে এসেছেন, কয়ে থাকেন, সেইটেই

স্বাভাবিক। তথাপি সঠিক বুঝতে পারলে আল-কোরআনের কোন কথাই বিজ্ঞান আবিস্কৃত সত্যের বাইরে মনে হবে না মোটেই।

ঐ রাশিচক্রে, কি বিচ্ছিন্ন তারকারাজ্যে কোন কোন সূর্য প্রধান হয়ে রয়েছে। আর, সবাই যার যার কক্ষ পথে ঘুর্ ছে :

لا الشمس ينبغى لها ان تدرك القمر و لا اليل سابق النهار - و كل فى فلك يسبحون -

লাশ্‌শামছো ইয়ামবাগি লাহা আন্‌তুদরেকাল কামারা অ লাল্লাইলো ছাবেকো ন্নাহারে অ কুল্লো ফি ফাল্‌াকে ইয়াছবাহুন।

সূর্যের সাধ্য নেই যে চাঁদকে ধরে (চাঁদ ও সূর্যের সীমায় গিয়ে পড়তে পারেনা) এবং রাত্রিও দিনকে পার হয়ে যেতে পারে না, সব কিছু শূন্যমণ্ডলে (যার যার পথে নিয়ম-নিগড়ে' সাঁতরে বেড়াচ্ছে।—ইয়াছিন ৪০।

الشمس و القمر بحسبان -

অশ্‌শামছো অল কামারো বেহুসবান—

সূর্য ও চন্দ্র (নির্দিষ্ট পথে) ভাসমান।—রহমান ৫।

বলা বাহুল্য, পূর্বেই বলেছি, মহাশূন্যের নক্ষত্র-সূয'-গ্রহ উপগ্রহ মালার মহাকর্ষণজাত আয়তক্ষেত্রে ছুটে চলা বা ভেসে বেড়ান মানেই পারস্পরিক টানে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করা, অবশ্য যার ঐ আকর্ষণ শক্তি বেশী সে তার চেয়ে ছোট গুলোকে তার চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ায়। 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধেও দেখ্‌তে পাবেন পৃথিবী কেমন করে' শক্তির কতোটা পর্যায় পর্যন্ত রকেট গুলোকেও তার কৃত্রিম উপগ্রহ করে' ঘুর-পাক খাওয়ায়, আর তার অকর্ষণ-শক্তির বাইরে ছুটে যেয়ে চাঁদে নামে, কি অন্য গ্রহে গিয়ে পৌঁছে, কিংবা সূর্যের টানে তার আর এক একটি কৃত্রিম গ্রহ হয়ে ঘোরে।

এখন, সূর্য ও চন্দ্রের ঐ ঘুর্ণনের দুই অর্থ : এক অর্থ ব্যবহারিক। চন্দ্র ও সূর্যকেই আমরা ঘুরে আস্‌তে দেখছি,

তা-ই। আমাদের ব্যবহারিক নিত্য নৈমিত্তিক কার্যে তাদের প্রয়োজন তাতেই মেটে। আল্লাহ্‌ও সেই ব্যবহারিক প্রয়োজন আনুপাতিকই কথা কয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ কী? দ্বিতীয় অর্থ বৈজ্ঞানিক সত্য। তা কী? পৃথিবী ও অপর গ্রহ উপগ্রহের সংশ্রবে সূর্য আদৌ ঘোরেনা [তা জিজ্ঞাসা প্রবন্ধেও দেখেছেন]। বরং গ্রহগুলি সূর্যের টানে তার চার দিকে ঘোরে, উপগ্রহগুলি গ্রহগুলোর টানে এক একটির চারদিকে ঘোরে। কিন্তু সূর্যও মহাজোতির্বিজ্ঞান-অর্থে ঘোরে। বিজ্ঞান আবিস্কৃত সত্য সে-সম্পর্কে এই : স্ব-গ্রহ-উপগ্রহ-সমেত সূর্য রাশি রাশি চক্র, কি বিচ্ছিন্ন তারকা-সাম্রাজ্য পার হয়ে এক বিরাট বিপুল বৃত্ত, কি উপবৃত্ত কক্ষ-পথ ঘুরে আসে, তাতে লাগে প্রায় দু'হাজার লক্ষ বৎসর, আর তার জীবনে মাত্র ২৫ (পঁচিশ) কি ৩০ (ত্রিশ) বার ঘুরেছে [সূর্যের আনুমানিক বয়স ৫০০ (পাঁচ শত) কোটি বৎসর, পৃথিবীর বয়স আনুমানিক ২০০—৩০০ (দুই শত থেকে তিন শত) কোটি বৎসর]। সূর্যের ঐ ঘূর্ণন সম্পর্কে কি সন্দেহ হয়? সন্দেহের কারণ নেই। কেননা পূর্বের উল্লেখিত মহাকর্ষণজাত মহাচক্রের কারণে কোন কিছুরই শূন্যমণ্ডলে না ঘুরে উপায় নেই। কিন্তু ঐ বৃত্ত, কি উপবৃত্ত পথে ঘুরে আসার বৎসরের হিসাব, বারের হিসাবে হেরফের হতে পারে বৈ কি। সূর্য, কি পৃথিবীর ঐ বয়সের ধারনায়ও ভুলচুক হতে পারে। কারণ এমন একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বসে' আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহের কারাগারে বন্দী হয়ে মহাশূন্যের ঐ ধরনের হিসাব নিকাশ অনেক সময়ে সহজ সাধ্য নয়, সম্ভবপর হয় না, নিঃখুত হতে পারে না, হয় না। কিন্তু আলোকের গতি, দূরত্ব ইত্যাদির হিসাব-নিকাশ এবং ঘূর্ণন কার্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি মতবাদে বড়ো একটা ভুল নেই।—[দেখুন ঐ সবকিছু 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিজ্ঞান-বিশ্ব-গোলক' প্রসংগে]। সূর্যের গতি

প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ (দুই শত) মাইল, পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে প্রায় ২০ (বিশ) মাইল, চাঁদের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৭ (সাত) মাইল। এ সব হিসাবেও বেশীকিছু, বিশেষ কিছু হেরফের নেই। এই রকম সকল সূর্য, গ্রহ উপগ্রহরাই। এবং বার বার বলছি নক্ষত্ররা সবাই সূর্য. আর আমাদের সূর্য একটি মাঝারি নক্ষত্র মাত্র। আশা করি এতো বলায় পূর্বের বদ্ধমূল ধারনা একেবারে দূর হয়ে যাবে এবং এ-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও পাকা পোক্ত হবে যে প্রকাণ্ডতা, বিশালতা, বিপুল ভর আনুপাতিক—সূর্যের ঐ গতির মতো—কমবেশী গতি সকল নক্ষত্রের, এবং বৃত্ত, কি উপবৃত্ত কক্ষপথও সকলের। কতক রাশি চক্রের অন্তর্গত, কতক বিচ্ছিন্ন, কতক তারকা আবার যুগল। দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন এবং যুগল তারকারা আবার এক এক জোট। সঠিক এখান থেকে বোঝা দুষ্কর কোন্ জোটের অন্তর্গত বিচ্ছিন্ন, কি যুগল কোন্ কোন্ তারকা।—কিন্তু যুগল এবং জোট যে রয়েছে তা এ-ধরনের আয়াত থেকেও বোঝা যায়।

سبحن الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون-

ছোবাহানল্লজি খালাক্বাল আযওয়াজা কুল্লাহা মেম্মা তুমবেতোল আরদো অ মেন আনফুছেহিম অ মেম্মা লা-ইয়ালামুন—

মহিমা সব তাঁরই যিনি যুগল বানিয়েছেন সর্বত্র যা মাটি থেকে জন্মে, কি প্রাণীগণ মধ্যে এবং তোমরা জানোনা এমন সব দৃশ্য অদৃশ্য জগতে।—ইয়াছিন ৩৬।

তফ্সিরঃ—তাৎপর্য হলো সকল পদার্থেরই মৌল অবস্থা গ্যাস, তাতে রয়েছে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের অস্তিত্ব। তা যেমন পরস্পর বিকর্ষন করে তেমনি আকর্ষনও করে। সুতরাং যুগল কিংবা যুগলের মতো হালহাকিকত। আবার আব (পানি) আতশ (আগুন) খাক (মাটি) বাদ (বাতাস) যা

দিয়ে জীবের দেহ তৈরী তাতে যেমন দৈহিক অর্থাৎ জৈব তেমনি আত্মিক আকর্ষণ বিকর্ষণ—পুরুষ প্রকৃতি হিসাবে—রয়েছে ; সেও যুগল। আবার ঐ নীহারিকা (গ্যাসীয় অবস্থা) যার রূপান্তরনে সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতির সৃষ্টি, তাদের অভ্যন্তরে যেমন পদার্থের (মৃত্তিকার) মৌল ঐ গ্যাসীয় ইলেট্রনিক প্রোটনিক আকর্ষন বিকর্ষনের অস্তিত্ব 'যুগল' রয়েছে, তেম্‌নি প্রত্যেকে প্রত্যেককে—যুগল, ক্রমে বহু যুগলের মতো—পরস্পর আকর্ষণ করচে।—দেখুন এর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ 'পরমানবিক তথ্য'।

বলাবাহুল্য, পূর্বেই যে বলেছি এক এক আয়াতের মাধ্যমে আল্‌ কোরআনে আল্লাহ্‌ ব্যাপকভাবে এক এক বিষয় উত্থাপন করেছেন তা এ-ক্ষেত্রেও দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

আর, এই যুগলেরা এবং আপাতঃদৃষ্ট বিচ্ছিন্নরা যে এক এক জোট বাঁধা এবং জোট মানেই এক এক বিরাট বিপুল আয়তক্ষেত্রে আকর্ষণ বিকর্ষণ চল্‌ছে তা' এ-ধরনের আয়াত থেকেও বোঝা যায়।

و الصفت صفا - فالزجرات زجرا فالتليت ذكرا - ان الهكم لواحد-
رب السموات و الارض وما بينهما و رب المشارق -

অচ্ছাফ্‌ফাতে ছাফ্‌ফা—ফায্‌যাজেরাতে যাজরা—ফাত্‌তালিয়াতে জেক্‌রা—ইন্না এলাহাকুম লাওয়াহেদুন—রাব্বুচ্ছামাওয়াতে অল্‌ আর্‌দে অ মা বাইনাহুমা অা রাব্বুল মাশারেক

সাক্ষ্য (আছমান জমীনে) তাদের যারা জোট বেঁধে চলে (কিরূপে ?)—পরস্পর আকর্ষণ করে আর (এ-ভাবে) স্মৃতি পটে জাগায় (স্মরণ করিয়ে দিতে কোশিশ করে) নিঃসন্দেহ তোমাদের (মানব সকলেরও আকর্ষণ লক্ষ্য-মূল) একক আল্লাহ্‌ যিনি সর্ব আছমান (ছায়াপথসমূহ) এবং (তার মধ্যস্থ) পৃথিবীর—গ্রহ-উপগ্রহ যাতে জীবন-প্রবাহ ছিলো, আছে, কি

হতে পারে, সকলের প্রভু (সৃজন কর্তা, পালন-কর্তা, প্রলয়ন্তা এবং এদের মধ্যবর্ত্তী স্থলেও (অদৃশ্য গায়ব-জগতে) এবং সর্ব পূর্বাঞ্চলের প্রভু [তাৎপর্য হলো এ-রকম সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্বাঞ্চল, অস্তাচল পশ্চিমাঞ্চল যে কতো কে বল্‌তে পারে]।—ছাফফাত ১-৫।

স্পষ্টতঃ আল্লাহ্‌ যে মূল—আদি এবং শেষ গন্তব্যস্থল—যেখান থেকে বিকর্ষণ ক্রমে সারাজাহান এবং জীব সমূহের পয়দায়েশ এবং ঐ আকর্ষণে পুনঃ সেখানে প্রত্যাবর্তন—সেই সৃষ্টি-কৃষ্টি প্রলয়-রহস্যের বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কখনো কখনো শৈল্পিক আভাস বহুতর উপমা, উৎপ্রেক্ষা, উদাহরণ যোগে দিতে গিয়েই আল্‌ কোরআন এতো কথার আমদানি, অভিব্যক্তি করে' চলেছেন। তবু কি মানুষ বুঝবেনা ? খুঁজবেনা, জানবেনা, মানবেনা ?

তারকারা এ-ভাবে আমাদের এই ছায়াপথের অভ্যন্তর-ভাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোট বেঁধে স্ব স্ব মহিমায় এবং এদের পরস্পর আকর্ষণ-ক্ষেত্র যে মহা-আকর্ষণ-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছে তার বেড়াজাল ডিঙিয়ে বাইরে ছিটকে পড়বার সাধ্য কারো নেই। আমাদের এ ছায়াপথের বাইরের অসংখ্য ছায়াপথের (যেমন এণ্ড্রামিডা, ম্যাগেলান প্রভৃতি) ব্যাপারও তো এমনি এবং নিকট-বর্ত্তী ছায়াপথ গুলোও পরস্পর আকর্ষণ করে' বলে' এখন বিজ্ঞান জানতে পেরেছে। —দেখুন 'খগোল পরিচয় ২৭৪' পৃঃ।

যা হোক আলকোরআন ঐ রাশিচক্র, সূর্য, চন্দ্র (গ্রহ-উপগ্রহ), তাদের পরস্পর আকর্ষণ ও ঘোরাঘুরির আভাস দিয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদেরই যে সমর্থন যোগাচ্ছেন, তা দেখলেন ! কিন্তু পৃথিবী, কি অপর গ্রহ উপগ্রহ যে ঘোরে কোরআনে তার পরিস্কার আভাস কোথায় ? হাঁ, আভাস আছে।

যদি চাঁদ অর্থে পূর্ব-উক্তি-অনুসারে গ্রহ উপগ্রহ সবই ধরি তা হলে তো কথাই নেই। নিছক গ্রহ হিসাবেও পৃথিবীর

ঘোরার প্রমানও আল কোরআনে আছে : كل فى فلك يسبحون কুল্লু ফি ফালাকে ইয়াছবাহুল—সব কিছু শূন্য মণ্ডলে ঘুরছে (ইয়াছিন ৪০)। পৃথিবী সবকিছুর বাইরে নয় এবং শূন্য মণ্ডলে। সুতরাং প্রমাণিত হয় চন্দ্র সূর্য ও অপর গ্রহ উপগ্রহের মতো সেও ঘুরছে। আবার, নিছক পৃথিবী ঘোরার ইংগিত ইশারাও আল কোরআনে রয়েছে : الم نجعل الارض مهدا আলাম নায্‌আলিল আরদা মেহাদা—আমরা কি পৃথিবী এবং অপর গ্রহকে [আর্‌দ্‌ বলতে আমরা পূর্বেই বলেছি—গ্রহ উপগ্রহ উভয়ই বোঝায়] দোলনা করিনি ?—নবা ৬। দোলনা শূন্যে দোলায়মান অবস্থায় থাকে। পৃথিবীও তা-ই। দোলনা দোলানো হয়। পৃথিবী ও অপর গ্রহ-উপগ্রহও দোলে এবং মহাশূন্যে দোলার মানেই বিঘূর্ণন, কারণ পূর্বোক্ত ঐ অসংখ্য আকর্ষণ জাত আঁকা-বাঁকা ঘূর্ণায়মান ত্বরনে না ঘুরে উপায় কী ? এরূপেই অগন্‌তি মহা-বিশ্ব-সমূহ সুবিন্যস্ত [দেখুন বিশ্ব-রহস্যে আইষ্টাইন]। অতএব বিশেষজ্ঞকে একি আরো বুঝিয়ে বলার দরকার আছে ? কিন্তু নিম্ন আয়াতটি কেন ?

ولقد جعلنا فى السماء بروجا و زينها لانظرين-و حفظنها من كل شيطن رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين -

অলাকাদ জাআলনা ফিচ্ছামায়ে বোরুজাঁ অ জাইয়ান্নাহা লেন্নাজেরিন—আ হাফেজ নাহা মেন কুল্লে শায়তানের রাজিম—ইল্লা মানেছতারাকা চ্ছাম্‌আ ফাআত্‌বা য়াহু শেহাবো ম্মোবীন—

আমরা সুনিশ্চিত শূন্যমণ্ডলে বুরুজ (বহু সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র বিশিষ্ট রাশি চক্র) বানিয়েছি। আর তা পর্যবেক্ষক পরিদর্শকদের কাছে সুন্দর করেছি। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছি ; কিংবা কেউ লুকিয়ে কিছু শুনে পলায় আর তার পিছনে ধায় এক উজ্জ্বল আগুনের শিখা—জ্বলন্ত অংগার খণ্ড।....হিজর ১৬, ১৭, ১৮ ।

পর্যবেক্ষক পরিদর্শক হলেন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক। তাঁরাই গবেষনা করে ক্রমশঃ আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের আসল অনেকখানি বুঝতেপারেন। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান কারা? অভিশপ্ত শয়তান হলো এক শ্রেণীর জড় বিজ্ঞানী, সেই জমানায় তারা চোখে-দেখা-আকার-কল্পনায়-নাম রাখা রাশিচক্র গুলিকে এবং অপর বিচ্ছিন্ন গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে দেব দেবী জ্ঞানে নিজেরা পূজা করতো, অজ্ঞ জন-গণকে পূজা করতে বাধ্য করতো, নিজেরা পূজারী সেজে টাকা পয়সা ও অপর মাল-মাত্তা আহরণ করতো। ওর ফলিত জ্যোতিষ অর্থাৎ রাশিচক্রের বা গ্রহের ফের কল্পনা করেও মানুষ ঠকাতো। নিছক বিজ্ঞান দর্শনের ব্যাপার গুলোকে এমনি জড় পূজার বিষয় বস্তু ও মানুষের অদৃষ্ট গণনার বিষয়-বস্তু করায় আল্‌কোরআনে আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন। বলা হয়েছে তাদের থেকে এদের ঐ সম্পর্কীয় সত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সুরক্ষিত রাখা হয়েছে অর্থাৎ ঐ জড়-বিজ্ঞানী ও তার পুজারীরা ওর আসল সত্য বিজ্ঞান ও দার্শনিক রহস্য বুঝতে পারেনা।— ফলে 'কেহ কিছু লুকিয়ে শুনে' পলায়' অর্থ দৃশ্যতঃ রূপগুলি দেখে অদৃষ্ট গণনার ফলিত জ্যোতিষ কল্পনা করে' নিজেরা ঠকে ও জন-সাধারনকেও ঠকায়। ফলে 'পিছনে ধায় এক এক উজ্জ্বল আগুনের শিখা—জলন্ত অংগার' অর্থাৎ ইহকালে ঐ ভুল বিশ্বাস ও সেই আনুপাতিক আচরণ ও মানুষকে তা দিয়ে ধোকা দিবার ফল ইহ-পরকালে জ্বলন্ত অংগার খণ্ডে জ্বলনের মতো শাস্তি, অবশ্য তাদের ঐ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য, সত্য বিশ্বাসবান করে' গড়ে' তোলার জন্য, [প্রথম অধ্যায় 'জিজ্ঞাসা' ও জবাব [২] এর 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধও দেখুন]।

অবশ্য রাশিচক্রগুলোকে, কি বিচ্ছিন্ন নক্ষত্র গুলোকে চিনবার ও মনে রাখবার জন্য ঐ রূপ-কল্পনা, কি নাম-করন কোন দোষের হয় নি, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে জলে স্থলে সফরের কারনেও ওর জরুরাত ছিলো। এখন বিজ্ঞান দিগদর্শনাদি

আবিষ্কার করেছে বলে হয়তো ঐ জরুরাত কিছুটা কমেছে। কিন্তু এখনো সদা-জাগ্রত প্রহরীর মতো উত্তর দিকেই অবস্থান করে' ধ্রুব (আরবী নাম কুতব) নৌ চলাচলে দিগ্ নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকে। আদম ছুরত (কাল পুরুষ), সাত ভাই চম্পা প্রভৃতি বৎসরের, কি প্রতিরাত্রের সময় নির্ধারনে আজো জন-সাধারনকে সাহায্য করে থাকে। এতো গেলো ব্যবহারিক দিক ; বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষনার জন্যও ঐ রূপ-কল্পনা মাফিক ওদের নাম করনের প্রয়োজন ছিলো, এভাবে এখনও ওদের পরিচয় প্রয়োজন, এ জরুরাত ফুরোবেনা কোন দিন।

তাই মাত্র বারো রাশি চক্রের নাম এখানে বাংলা, আরবী ও ইউরোপীয় ভাষায় দিয়ে দিচ্ছি :

বাংলা মেষ—আরবী হামল, ইউরোপীয় Aries ; বৃষ—সওর, Taurus ; মিথুন—জওজা, gemini ; কর্কট—সরতান, cancer ; সিংহ—আছাদ, leo ; কন্যা—সম্বলা, virgo ; তুলা—মীযান, libra ; বৃশ্চিক—আকরব, scorpion ; ধনু—কওস, sagittarius ; মকর—জদি, capricornus ; কুম্ভ—দলাও, acquarius এবং মীন—হুত, pisces ; বিচ্ছিন্ন, কি দৃশ্যত দলবদ্ধ অপর তারকা পুঞ্জের নাম করন উপরোক্ত 'খগোল পরিচয়' পুস্তকেই দেখুন।

আমাদের সৌরজগৎ বার মাসে দৃশ্যতঃ ঐ বারো রাশি চক্র ঘুরে আসে বলে' মনে হয় (আসলে কে কোথায় কিভাবে ঘোরে তা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বসে' বোঝা মুস্কিল)। পৃথিবীর উত্তরদিকে এবং উত্তর মেরুতে ঠিক মাথার উপরে দৃষ্ট ধ্রুবের টানে পৃথিবী প্রায় ৬৬½ ডিগ্রী কোণ করে' প্রায় ২৩½ ডিগ্রী কাৎ হয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তার ফলে এবং সূর্যকে বারো রাশিচক্র বারো মাসে পার হতে দেখছি, তার ফলে আমাদের

পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তন, জোয়ার ভাটা, দিবারাত্রি, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির উপর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।
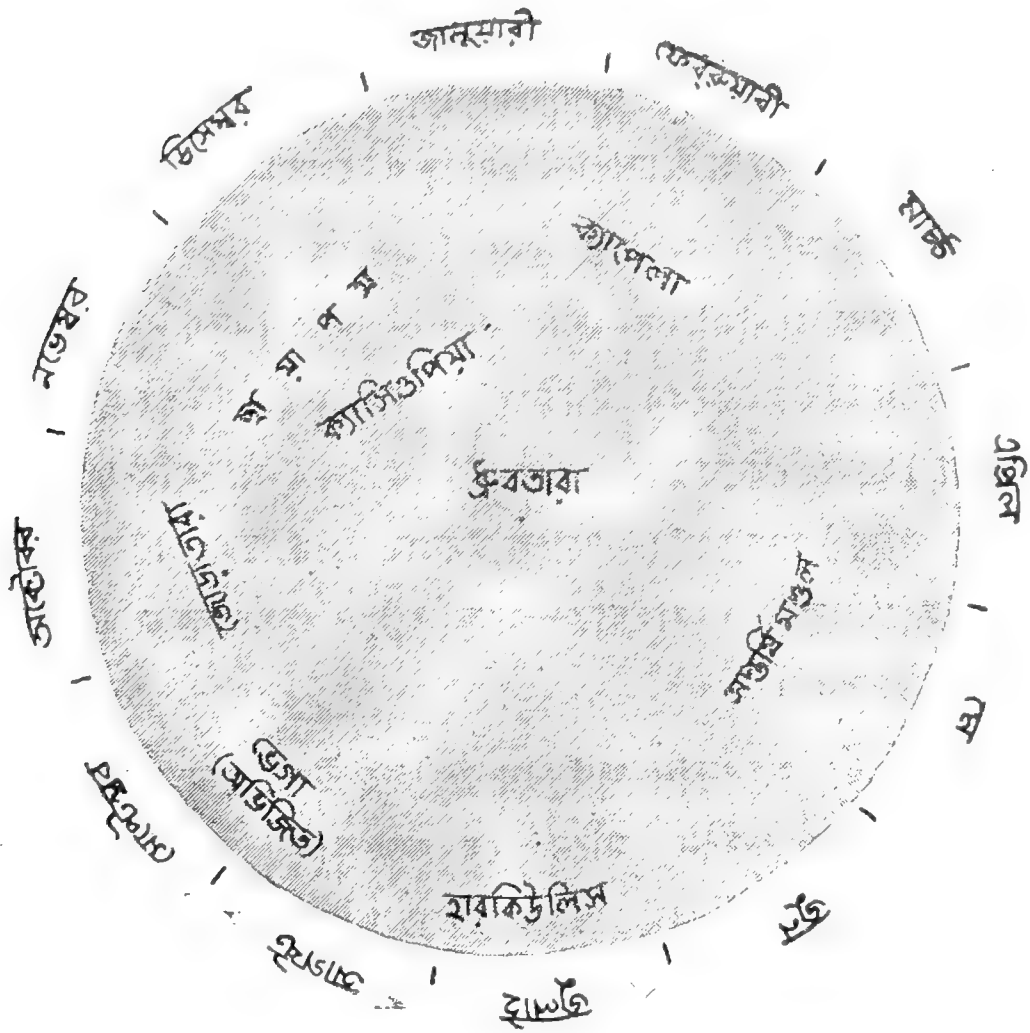
[এই মানচিত্রে ধ্রুবতারার চারপাশে যেসব তারাকে খালি চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সে গুলোকে দেখানো হয়েছে।

বইটাকে এমন ভাবে ধরুন যেন এখন যে-মাস চলছে সে-মাসের নামটা ওপর দিকে থাকে—তারপর ছবিটাকে তুলে ধরুন ধ্রুবতারার দিকে। তা হলে রাত প্রায় ন'টার সময়ে ঐ সব তারার অবস্থান পাবেন]

কাজেই চোখে দেখা ঐ ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত যে বিশ্ব বিজ্ঞান ও দর্শন তা যে কত বড়ো খোদায়ী কুদরত সে সম্পর্কে সেই খোদাই আমাদের সচেতন করে দিচ্ছেন এবং বুঝতে আহ্বান করছেন :

ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الایل و النهار لا یت
لاو لی الباب الاذین یذکرون الله قیما و قعودا و علی جنبهم و یتفکرون
فی خلق السموات و الارض ۔

ইন্না ফি খালকেচ্ছামাওয়াতে অল আর্দে অ এখতেলাফেল্লায়লে অন্নাহারে লা আয়াতে ল্লেউলিল আল্‌বাব আল্লাজিনা ইয়াজ্‌কোরুনাল্লাহা কিয়ামাঁ অ কোউদাঁ অা আলা জোনুবেহেম অ ইয়াতাফাক্‌কারুনা ফি খালবেচ্ছামাওয়াতে অল আর্দ—

আছমান-জমিন সৃষ্টিতে এবং দিনরাত্রি পরিবর্তনে নিশ্চয়ই তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানীদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন-মালা, যাঁরা আল্লাহর জেকের করেন দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে (যখন যেরূপ সুবিধে সুযোগ) এবং ফেকের (গবেষণা) করেন আছমান-জমিন সৃষ্টি (কৃষ্টি প্রলয়) সম্পর্কে।—আলে ইমরান ১৮৯, ১৯০। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির সংগে কৃষ্টি (কালচার—সংস্কৃতি) ও প্রলয় সমজড়িত ও পরস্পর পরিপূরক।

এখন, ঐ আসমান অর্থ যে ঐ গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপূর্ণ শূণ্যমণ্ডল এবং জমীন মানে যে যে-কোন গ্রহ-উপগ্রহ যাতে জীবনের অস্তিত্ব ছিলো, আছে, হতে পারে, তা পূর্বেও বলেছি। ঐ দিবা রাত্রি পরিবর্তন দ্বারা ব্যাপকতঃ ঋতু পরিবর্তনও বোঝায়, কারণ ঋতুতে ঋতুতেই দিবারাত্রির বিশিষ্ট বিশিষ্ট পরিবর্তন হয় এবং দৈনন্দিন জোয়ার ভাটার ও মৌসুমী বায়ু প্রবাহেরও স্থান কালের বিশিষ্টতায় বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হয়, সবই ঐ এখতেলাফেল্লায়লে অ ন্নাহারে—দিনরাত্রি পরিবর্তনের কথায়—বোঝা যায়, অন্তর্নিহিত।

কিন্তু ঐ দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে যে কোন হাল-হাকিকতে আল্লাহর জেকের (স্মরণ) করেন কারা? নিশ্চয়ই তাঁরা আল্লাহর খাঁটি ভক্ত। কিন্তু ঐ উলিল আল্‌বাব—তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানী কারা? যাঁরা ঐ আছমান জমীন সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয়াদি সম্পর্কে এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনাদি বিষয়ে ফেকের (গবেষনা) করেন।

তাঁরাই দার্শনিক বৈজ্ঞানিক। তাঁরা ঐ জেকেরকারীদের মধ্য থেকেও হতে পারেন, কিংবা নির্দিষ্ট কোন কায়দায় জেকের না-ও করতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টি-তত্ব অর্থাৎ ওর মূল কারণ, (ultimate reality) অনুসন্ধানও তো আল্লাহ্‌র কুদরত খেয়াল, সন্ধান, সুতরাং তা-ও-তো এক প্রকার জেকের (স্মরণ)। তাহলে আলকোরআন মোতাবেক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক-রাও আল্লাহ্‌র আবেদ (এবাদতকারী)। এবং তাঁদের কাযও তো আল্লাহ্‌র এবাদতের অন্তর্গত। শ্রেষ্ঠ এবাদত।

এরূপ আরও আয়াত দেখুন :

و سخر لکم ما فی السموات و فی الارض جمیعا منه - ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون -

অচ্ছাখ্‌খারা ল্লাকুম ম্মা ফিচ্ছামাওয়াতে অমা ফিল্‌ আরদে জামিয়াম মেনহু-ইন্না ফিজালেকা লা আয়াতে ল্লে কাওমিন ইয়াতাফাককারুণ

আর আছমান জমীনের সব-কিছু তিনি তোমাদের মোহতাজ (আয়ত্ত, অধীন করবার মতো) করে' দিয়েছেন, সবই তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র থেকে মত্তজুত, মোকরর। নিশ্চয়ই এতে ফেকেরকারী অর্থাৎ গবেষক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন-মালা !—জাসিয়া ১৩।

سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتیا یتبین لهم انه لحق -

ছানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাকে অফি আনফুছেহিম হাত্তা ইয়াতাবাইয়েনা লাহুম আন্নাহুল হাক্‌—

আমরা (আল্লাহ, অপর গায়েব-রহস্য-সহ) আমাদের নিদর্শন-মালা শূন্য-মণ্ডলে এবং তাদের মধ্যে আর্থৎ মানব-দেহ ও আত্মায় যথাশীঘ্র (যথা সময়ে তাদের গবেষণা মাফিক) দেখিয়ে থাকি এবং দেখাবো (কারণ এ চিরন্তন ব্যাপার) যাতে করে তাদের নিকট সত্য (দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ব) প্রকাশ পায় এবং পাবে (কারণ এ ঐ চিরন্তন ব্যাপার)।—হা-মীম ৫৩।

পরিশিষ্ট

নাস্তিক আস্তিক সমস্যা—সমাধান

ঐ খানে আমাদের 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধ শেষ করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু আপনারা তা দিলেন কই? বলে বস্‌লেন ঐ দার্শনিক বৈজ্ঞনিক কেউ কেউ তো নাস্তিকও অর্থাৎ আল্লাহ-অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম-আরকান মানেন না, এমনও আছেন; কাজেই এই পরিশিষ্ট প্রকল্পনার মাধ্যেমে তার ফায়ছালা (সমাধান) দিতে বাধ্য হচ্ছি।

আছেন, তাতে কী? 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ৬৬-৬৮ পৃষ্ঠায় দেখেছেন যে-সব কায়দা-কানুন (আহকাম-আরকান) বাইরে থেকে চাপানো, স্বাভাবিক নয় এবং বিশ্বের সর্বত্র খাটানো যাবেনা, আসল আদত সত্যের মোকাবিলা তার বিশেষ কিছু মূল্যমান নেই, তার মূল্য সামাজিক, কখনো কখনো রাষ্ট্রিক—জনসাধারনের প্রাথমিক পর্যায়! সূর্য পূর্বদিক দিয়া পশ্চিমে যায় এইটে সত্য, না, পৃথিবী পশ্চিম দিক দিয়ে পূর্বে যায় বলে' ঐ রকম দেখি, কোনটা সত্য? অথচ জনসাধারনের ব্যবহারিক প্রয়োজন ওতে করেই মিটে, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পীদের মিটেনা (প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে 'পরিশিষ্ট', 'পরিশীলনও' দেখে যান)। সুতরাং সেহিসাবে কে আস্তিক, কে নাস্তিক এ সব প্রশ্ন তোলা নেহায়েৎ শিশুজনোচিত এবং এভাবে বিচারও হবে অমনি শিশুসুলভ।

ঐ হিসাবে বিশ্ব-স্রষ্টাকে মৌখিক স্বীকার করলেই বা কী, না করলেই বা কী! আসল তো গুণ, জ্ঞান অনুশীলন। তা যে করছে, সে যদি তা-ই করতে গিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ না পেয়ে নাস্তিকও হয়, তথাপি সে যে বিধেতার দেয়া গুণ ও জ্ঞান শক্তির চর্চা করলো তার মূল্য যাবে

কোথায় ? ওতে করে যে তার আত্মার ঐ শক্তিগুলো শানিত হলো তার ফলই বা যায় কোথা ! আপনি জানেন না কে আপনাকে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে, মানেনও না কেউ আপনাকে ওগুলো দিয়েছে, মনে করেন আপনি আপছেআপ কুড়িয়ে পেয়েছেন। এখন আপনি যদি ঐ না জেনে না মেনেও ওর ব্যবহার অভ্যাস করেন, তাহলে শত্রুর মোকাবিলা কি আপনি আত্ম রক্ষা করতে পারবেন না ? পারবেন। আর যে ঐ দেনেওয়ালাকে স্বীকার করে, মানে, কিন্তু ওর ব্যবহার অভ্যাস করে না, মরিচা ধরে' ওগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার কোন্ কাযে লাগবে ওগুলো ? বরং শত্রুর মোকাবিলা সে হবে কুপোকাত, নাজেহাল, চুরমার। কাজেই, বাইরে তাকে স্বীকার করা না করা, সাধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা না-করা এরকম বিধেতার দেয়া আত্মার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিমান ও তার সদ্ব্যবহারকারী প্রকৃত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিদের বেলা খাটেনা। অবিশ্বাসী হয়েও, আচারনিষ্ঠ আদৌ না হয়েও অর্থাৎ নাস্তিক হয়েও তাঁরা ঐ গুণ-জ্ঞান-চর্চাহীন আচারনিষ্ঠ আস্তিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তবে হাঁ, তাঁরা যদি ঐ গুণকর্ম, জ্ঞানকর্ম অনুশীলনের সংগে সংগে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি অন্তরে কর্‌তে কোশেশ করেন, কর্‌তে পারেন (বাইরে আচার অনুষ্ঠান পালন, চাই, করুন আর নাই করুন) তা হলে তাদের স্থান যে অতি উর্ধে হবে—উভয় নাস্তিক গুণী-জ্ঞানী এবং আস্তিক নির্গুণ নির্জ্ঞানের চেয়ে—তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, ওর অপব্যবহারকারীরা আবার ওর সুফল থেকে হয় বঞ্চিত। সংশোধন-যোগ্য। সেজন্য ইহ-পরকালে সংশোধক শাস্তি পেতে হবে বৈ কি !

সাধারণের মাপকাঠির বিচার যে যে-কোন প্রকৃত গুণী-জ্ঞানীর ক্ষেত্রে অচল, সেটা বুঝানোই আমাদের লক্ষ্য।

তা হলেই এ সম্পর্কে শেষের কথা হচ্ছে : শুরু হিসাবে

প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক, কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানও লাগে, কিন্তু তাই মাত্র সার হলে তার মূল্যমান কী? আল্লাহ্ বিশ্বাসের অর্থাৎ আস্তিকতার এবং ধর্ম আচরণের অর্থ হবে কী যদি প্রাইমেরী ঐ ছবক ক্রমশঃ হাইস্কুলে অর্থাৎ আত্ম চিন্তা-ভাবনা ও সেই আনুপাতিক অনুশীলনে (জেকেরে) গুণ-কর্মে এবং জ্ঞান-কর্মে (ফেকেরে) উদ্বুদ্ধ না করে, পরিচালিত না করে? আর প্রাইমেরীর রুটিন ও পাঠ্যতালিকা কি হাইস্কুলে থাকে? থাকেনা। আর এ রকম লোকই ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ-স্তরে যাওয়ার মতো আরো আত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারেন ঐ রকম আরো প্রগতিশীল পথে চলে এবং ইউনিভারসিটি পর্যায়ে তাদের অতি এবং অধি গুণ ও জ্ঞান অনুশীলন—যার তরফ থেকে ঐ সকল প্রকার গুণ ও জ্ঞান কর্ম, ঐ প্রেরণা মূলতঃ এসেছে—সেইখানে পৌঁছে দিতে পারে, দিয়ে থাকে; আর এঁরাইতো সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং শ্রেষ্ঠতম আবেদ (এবাদতকারী)। পয়গম্বরী খতমের পূর্বে এঁরাই ছিলেন পয়গম্বর, নবী, রছুল। পয়গম্বরী খতমের পরে অলী, আব্দাল, গাউছ, কুতুব, মোযাদ্দিদ।—মুখবন্ধে উল্লেখিত পুস্তক মালায় এর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অপেক্ষা করুন।—আর যাঁদের বাহ্যিক আচরণ দেখে আউলিয়া ভেবে বসে' আছেন আর ভেট যোগাচ্ছেন পরকালের মুক্তিলাভের আশায়, অথচ যাঁরা আল্লাহর দেয়া ঐ গুন-জ্ঞান-কর্ম নিজেরা অনুশীলন করেন না, অপরকে করতে দিতে চাননা এবং হারাম বলেন, কেউ করলে তাকে ফাফেরী ফতোয়া দেন এবং তাদের জন্য পরকালে হাবিয়া দোযখ কল্পনায় নির্দেশ করে রাখেন, তাঁদের কথা ভুলুন। কারণ, আল্লাহর প্রকৃতি হতে পাওয়া দেহ-মন-প্রাণ আত্মার ধর্ম—ঐ গুণ-কর্ম, জ্ঞান-কর্ম—যেখানে নেই, সেখানে সেই আল্লাহ্ থাকতে পারেন কি? পারেন না। ছিলেনকি? ছিলেন না। কোনদিন থাকবেন কি? থাকবেন না। আর পয়গম্বর মানে

আল্লাহর অলী (বন্ধু) হয়ে জন-সাধারণ ও বিশেষজ্ঞদের জন্য আল্লাহ্‌র পয়গাম, বা সংবাদ বাহন। আল্লাহর দেয়া গুণ-জ্ঞান-শক্তির চর্চা ও স্ফুরণ বাদ দিয়ে তা কী করে সম্ভবপর ?—বৈজ্ঞামিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধ ('পরিশিষ্ট'-সহ) এবং জবাব [২] এর 'রকেটের রহস্য,-'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধে হযরত সোলায়মান (আ:), শেষ পয়গম্বর (স) ও অপরাপর অতি গুণী জ্ঞানীর রহস্য বুঝুন।

পয়গম্বরী খতম স্বীকার করি। কারণ, আল্‌কোরআনেই ঐ পয়গাম (সংবাদ) নির্ভেজাল লেখা আছে। প্রাচীন অনুন্নত জমানার তালপাতা, ভোজপাতা, তামার পাতে, পাথর খণ্ডে লিখা আল্লাহ্‌র কেতাবের মতো ভেজাল, প্রক্ষিপ্ত ঢুকবার কিংবা নষ্ট হবার আর অবকাশই নেই। এখন, ঐ পয়গামের দুটো-দিক; প্রথম—জনসাধারণের ঐ প্রাইমারী, সামাজিক, কখনো কখনো রাষ্ট্রিক ছবক। দ্বিতীয়—বিশেষজ্ঞদের গুণ-জ্ঞান-কর্ম-অনুশীলন; দার্শনিক—অতি এবং অধি দার্শনিক; বৈজ্ঞানিক অতি এবং অধি বৈজ্ঞানিক পন্থা; আয়াতের পর আয়াত তুলে দিয়ে দিয়ে যা আমরা বোঝালাম। ঐ বিশেষজ্ঞরাই আল্লাহ্‌র দেয়া ঐ অন্তরে নিহিত নিদ্রিত গুণ-জ্ঞান-কর্ম-প্রকৃতির তথা আত্মার ধর্মের অনুশীলন করতে করতেই হন একদা অলি-উল্লাহ—আল্লাহর বন্ধু; আবদাল—সাধারণের থেকে তাঁদের হাল-হকিকত হয় বদল; আবার তাঁরাই গাউছ—আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকাশক, ঐ পথিকদের (ছালেকদের) সহায়ক; এবং কুতব—ঐ সত্যানুশীলক, সত্য পথ প্রদর্শক (মোর্শেদ), ছালেক-দের পক্ষে ধ্রুবতারার মতো; তাদের কেউ কেউ আবার মুযাদ্দিদ [সংস্কারক,—দেখুন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের এবং 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্ট']। বাহ্যিক ঐ বিভিন্ন কার্য-কলাপ কারণে তাঁদের বিভিন্ন নাম, লকব (উপাধি); আসলে এক।—প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ দেখে যান।

পরমাণবিক তথ্য

আজ পর্যন্ত পদার্থের ১০৮টি মূল উপাদান (elements) আবিস্কৃত হয়েছে ; এদের ক্ষুদ্রতম অংশই বিভিন্ন প্রকার পরমাণু। এই বিভিন্ন পরমাণু দিয়েই অসংখ্য বিরাট বিপুল সৌরজগৎ এবং অগনতি সৌরজগৎ নিয়েই এক এক নীহারিকা অঞ্চল বা ছায়াপথের সৃষ্টি। জীব-দেহও ঐ রকম পরমাণু দিয়েই গড়া।

এখন, এক মহা সৌরজগৎ-চক্রই যেনো অতি ক্ষুদ্রতম আকারে এক এক পরমাণু কণিকায় রয়েছে। এর নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র-বস্তু) এক প্রোটন (যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু) কিংবা প্রোটন, নিউট্রন (যেমন কার্বন, সোডিয়াম, হিলিয়াম প্রভৃতি পরমাণু) নিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস (কেন্দ্র-বস্তু) যেন এই
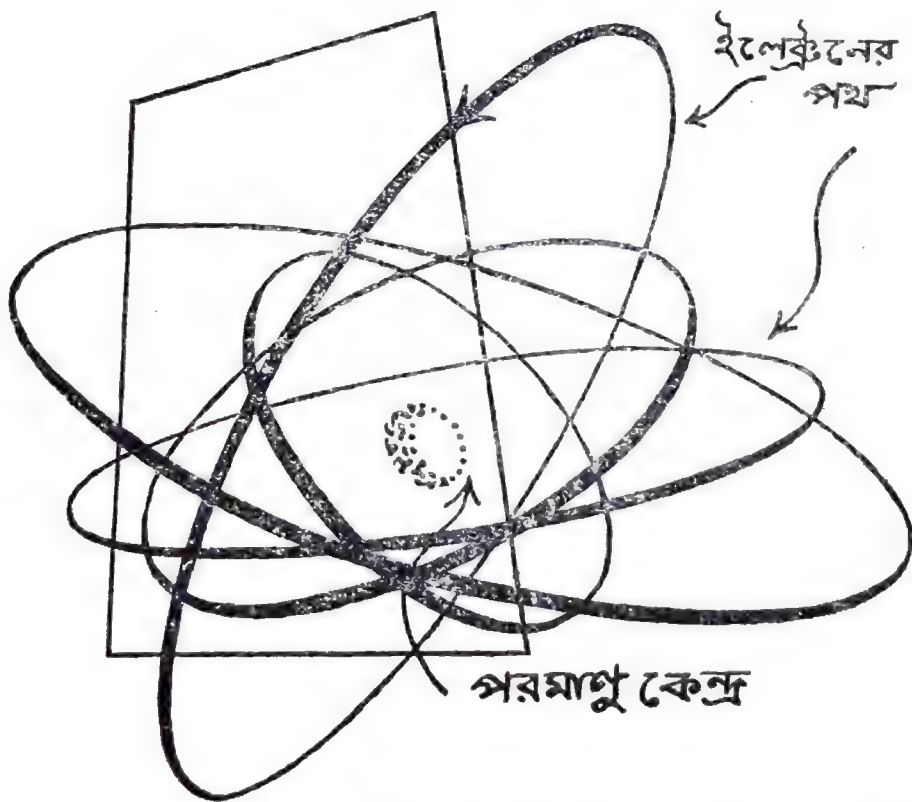
ক্ষুদ্রতম সৌরজগৎ-চক্রের সূর্য, আর তার চারিদিকে প্লানেট্‌স্‌ (গ্রহ-পুঞ্জ) কি স্যাটিলাইট্‌সের (উপগ্রহপুঞ্জ) মতো ঘুরে' বেড়াচ্ছে ইলেকট্রন কণিকা—এক (যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুতে)

এবং একাধিক (যেমন অন্যান্য পরমানুতে) রয়েছে। এক পজিট্রন (ধন-বিদ্যুৎ-কণিকা) এবং এক নিউট্রন (নিরপেক্ষ বিদ্যুৎ-কণিকা) মিলেমিশেই আবার নিউক্লিয়াসের প্রোটন। আর নিউট্রন হয়তো ইলেকট্রন (ঋণ-বিদ্যুৎ কণিকা) এবং প্রোটনের সংমিশ্রন অথবা উহা এক প্রোটন বাদ (—)পজিট্রন— এখনও সঠিক সাব্যস্ত হয়নি। মেসোট্রন (সংক্ষেপে মেসন) ইলেকট্রন, পজিট্রন, ফোটনের রকমারি। আর ফোটন নিউক্লিয়াসের নিউট্রন, প্রোটনের রকমফের। ডিউটিরণ, টিট্রণ ক্রমশঃ ভারী হাইড্রোজেন পরিমানুর নিউক্লিয়াস। সকল বস্তুরই পরমাণুস্থ অতি-পরমাণু- ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি একই পদার্থ। কেবল বেশী-কমে কিংবা কোন কোনটার অভাবেই অর্থাৎ ভাগবাটোয়ারায়ই বস্তুর ভেদ, বৈষম্য, বৈচিত্র্য।

و قال الذين كفروا لا تاتين السعة - قل بلى و ربى لتاتينا كم - علم الغيب لايعزب عنه مثقل ذرة فى السموات ولا فى الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا فى كتب مبين -

অ কালাল্লিজিনা কাফারূ লা তা'তীনাছ ছা'আয়াতু—কুল বালা অ রাব্বী লা তা'তিইয়ান্নাকুম—আলেমিল গায়বে, লা ইয়াযুবু আন্হু মেছক্কালা জার্‌রাতিন ফিচ্ছ্‌মাওয়াতে অ লা ফিল আর্‌দে অ ল। আছ্‌গারো মেন জালেকা অ লা আক্‌বারো ইল্লা ফি কেতাবেম মোবীন

যারা বিশ্বাস করেনা তারা বলে: কখনো আসবে না ছায়াত (সময়)। বলো (হে মোহাম্মদ) কী বল্‌ছো! সাক্ষ্য আমার প্রভুর যিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন, নিশ্চয়ই ওতো এসে থাকে। তাঁর নিকটে আছমান জমীনে এক পরমাণু প্রমান (মেছ্‌কালু জাররাতেন) লুকানো নেই, এবং ওর চেয়ে ক্ষুদ্র কিছু, কিংবা বড়ো কিছু যা নয় স্পষ্টতঃ লিখিত।—ছাবা ৩।

'ছায়াত' অর্থে শুধু সমষ্টিগত ও শেষ কিয়ামত মনে করবার কোন হেতু নেই, ও ছোট কিয়ামত ব্যক্তিগত মৃত্যু-সময়ও। যারা মৃত্যু-অন্তে পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ বিচার-নিষ্পত্তি বিশ্বাস

করে না তাদের লক্ষ্য করে' বলা হয়েছে যে এ সবই সত্য। এ হচ্ছে তাঁরি নির্ধারণ যিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন, যার কাছে পরমাণু, তার চেয়ে অতি ক্ষুদ্র অতিপরমাণু, কিংবা ঐ অতি পরমাণু-পরমাণু-অণু সমবায়ে গঠিত ক্রমশঃ বড়ো – কিছু, কিছুই লুকানো ছাপানো নেই, যা নয় স্পষ্টতঃ কেতাবে লিখিত অর্থাৎ তাঁরি নিয়ম-নিগড় মাফিকই সব কিছু সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয় চল্‌ছে, অভিব্যক্ত হচ্ছে।

قل ادعو الذين زعمتم من دون الله - لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ومالهم فيهما من شرك ومالم منهم من ظهير -

কুলেদ্‌য়ু ল্লাজিনা যাআমতুম মেন দুনিল্লাহে, লা ইয়ামলেকুনা মেছকালা জার্‌রা-তেন ফিছ ছামাওয়াতে অ লা ফিল আরদে অ মা লাহুম ফিহিমা মেন শেরকেঁ অ মা লাহু মেনহুম মেন জাহীর—

তুমি বলো : ডাক (তাদের) যাদিগকে তোমরা (কাফেরগণ) কল্পনা করো আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। তাদের আছমান-জমীনে [সৃষ্টি কৃষ্টি-প্রলয়-ব্যাপারে] এক পরমাণু পর্যন্তও ক্ষমতা নেই, আর ওতে (ঐ যে কোন রূপ সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয়-ব্যাপারে) তাদের কোন অংশ নেই এবং নাই তাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ্‌র সহায়ক।—ছাবা ২২।

এই সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয় সবই যে আল্লাহর প্রকাশ এবং সব-কিছু অতি পরমাণু—তথা ঐহিক পারত্রিক নূর [তাজল্লি—বিজলি-কণিকা] দিয়ে তৈরী—তা বোঝা যায় আর এক আয়াত থেকে। তার আগে বোঝা দরকার যে মৃত্যুও, প্রলয়ও আসলে সৃষ্টি, ইহ-জগতে যা দেখা যায় ধ্বংস হতে, পর-জগতে তা-ই হয় আর এক রূপ-বৈচিত্রে প্রকাশ বা সৃষ্টি।

الله نور السموات و الأرض - مثل نوره كمشكوة فيها مصباح - المصباح فى زجاجة - الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مبٰرکة زيتونةللا شرقية ولا غربية - يكد زيتها يضئ و لو لم تمسسه نار نور على نور -يهدى الله لوره من يشاء و يضرب الله الأمثال للناس - و الله بكل شئى عليم -

আল্লাহু নুরুছ ছামা-ওয়া-তে অল আরদে, মাছালো নুরিহি কামেশ্কাওতিন্ ফী হা মেছবাহুন, আল মেছবাহু ফী যোজ্জা-জাতিন, আয্যোজাজাতু কাআন্নাহা কাওকাবুন দোর্‌রী এওঁ ইয়ুকাদে মেন্ শাজারাতিম মোবারাকাতিন যায়তূনাতেন লা শারকীয়াতে ওঁ অ লা গারবীয়াতিন – ইয়াকাদো যায়তুহা ইয়ুদীয়্ অ লাও লাম তাম্‌ছাছ্‌হু নারুন, নুরুন আলা নুরেন, ইয়াহ্‌দীল্লাহু লে নুরেহী মাই ইয়াশা-য়ো অ ইয়াদ্‌রেবুল লাহুল আম্‌ছালা লেন্নাছে, অল্লাহু বেকুল্লে শায়্‌ইন্ আলীম।

"আল্লাহ্ আছমান-জমিনের আলো। তার আলোর মেছাল এই যে (এক) একটি তাক এবং (তার) মধ্যে এক (একটি) বাতি। বাতিটি কাঁচে ঘেরা, ঐ কাঁচ যেনো উজ্জ্বল নক্ষত্র যা জ্বালান হয়েছে মঙ্গলময় জয়তুন তেল দিয়ে যা না পূর্বদেশীয় না পশ্চিম দেশীয়। যার তেল এমনি উজ্জ্বল যে অগ্নি স্পর্শ করবার পূর্বেই (যেনো) জ্বলে ওঠে। আলোর পর আলো। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তার আলো দিয়ে হেদায়েত (পথ প্রদর্শন) করেন। আর উদাহরণ দেন মানুষের জন্য, এবং তিনি সব কিছু জানেন।"—নূর ৩৫।

একটু নিগূঢ়ভাবে এই আয়তটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে আল্লাহ যে সৃষ্টি-রহস্য ব্যক্ত করছেন তা'হুবহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংগে ঐক্য-সম্পন্ন। সবকিছুর মূলেই যে অতিপরমাণু তা' যেমন পরিস্কার তেমনি যে-কোন জড়দেহ ঐ অগ্নিকণিকা সমূহে মূলতঃ প্রজ্বলিত তাও পরিস্কার। গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র সবই ঐ আলোর অতিপরমাণু দিয়ে সৃষ্টি। কোন কোনটা হয়তো বাহ্যতঃ নিভে গিয়ে অন্তরে ঐ অতিপরমাণুসমূহ বহন করছে, কোন কোনটার মধ্যে হয়তো ঐ অতিপরমাণুর চল্‌ছে অহরহ বিস্ফোরণ, তা-ই সূর্য এবং নক্ষত্র। বলা বাহুল্য, শূন্যমণ্ডলের নক্ষত্রের সংশ্রবে সূর্যও একটি নক্ষত্র এবং মাঝারি ধরনের নক্ষত্র। কেবল নক্ষত্রের তুলনায় আমাদের অনেক নিকটবর্তী ও অতি প্রয়োজনীয় বলে' আমরা অর্থাৎ মানুষেরা ওর আলাদা নামকরণ করেছি 'সূর্য'।

আবার দার্শনিকতঃ বিচারে মানব-আত্মাও অমনি জয়তুন তেল নয়, বরং না পূর্বদেশীয়, না পশ্চিম দেশীয় কোন অদৃশ্য আলোর অতি পরমাণু বিচ্ছুরণ ও ক্রম-অভিব্যক্তি। ঐ জাহের বাতেন আলোর হেদায়েতও (পথ-প্রদর্শন) কারো-কারো পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছায় সম্ভবপর হয়। দর্শন বিজ্ঞান এভাবে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চল্‌ছে এবং অবশেষে অধ্যাত্ম দর্শন রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে; তা না হলে সৃষ্টি কৃষ্টি প্রলয় সম্পর্কে পূর্ণাংগ প্রজ্ঞা হতেই পারে না, হয়ইনা।

قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين -

ক্‌ল্‌ আয়েন্নাকুম লাতাক্‌ফুরুনা বে-আল্লাজি খালাকাল আরদা ফি ইয়াওমায়নে

বলো (হে মোহাম্মদ সঃ) কী! তোমরা তাঁকে অস্বীকার কর্‌চো যিনি দুনিয়া বানিয়েছেন দু'দিনে।— হা-মীম ৯।

কিন্তু পৃথিবী ও অপর গ্রহ-উপগ্রহ সবই—আমরা ইতিপূর্বে-কার প্রবন্ধে বলেছি 'আর্‌দ্‌'। তা-ই যে সংগত অর্থ তা বিভিন্ন আয়াতের উদ্‌ধৃতি ও তফসির দিয়ে প্রমাণ করেছি। সুতরাং পৃথিবী এবং অপর গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে কোথা দিবারাত্রি যে দু'দিনে দুনিয়া সৃষ্টি বলা হলো?

ঐ প্রবন্ধে এও প্রতিপন্ন করেছি যে আল্লাহ্‌ মানুষের জমানা আনুপাতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান আনুপাতিকই কথা কয়ে থাকেন, কয়ে এসেছেন। সুতরাং দু'দিন বলা হয়েছে সেই জমানা-মাফিক ভাষায়। কিন্তু দুদিন মূলে কী?

আর এক আয়াতে আছে চারদিন

و برك فيها و قدر فيها اقواتها فى اربعة ايام -

অ বারাকা ফিহা অ কাদ্দারা ফি আকওয়াতাহা ফি আরবায়াতে আইয়ামেন

আর বরকত দেছেন ওতে (ঐ গ্রহ উপগ্রহে) আর ওতে ওর জীবিকা (ব্যবস্থাপনা) দিয়েছেন চারদিনে। —হা-মীম ১০।

অন্য আয়াতে আছে ছয়দিনে

هو الذى خلق السموات و الأرض فى ستة ايام -

হু আল্লাজি খালাকোচ্ছামাওয়াতে অল আর্দা ফি ছেত্তাতে আইয়ামেন

তিনিই বানান আছমান-জমীন ছয়দিনে। হুদ্ ৭।—কিভাবে?

فقضهن سبع سموات فى يومين و اوحى فى كل سماء امرها -

ফাকাদাহুন্না ছাব্আা ছামাওয়াতেন ফি ইয়াওমানে অ আওহা ফি কুল্লে ছামায়িন আমরাহা—

এরপর তিনি সাজালেন সাত আছমান দু'দিনে আর প্রতি আছমানে তার কার্য (এন্তেযাম-উপযোগী) ব্যবস্থাপনা করলেন। —হা-মীম ১২।

الله الذى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن -

আল্লাহু আল্লাজি খালাক্বা ছাব্আ ছামাওয়াতেঁ অ মিনাল আর্দে মেছ্লাহুন্না।

আল্লাহ্ই পয়দা করেছেন সাত আছমান আর জমীনেও তাদের অনুরূপ।—তালাক ১২।

ঐ দুই, চার, ছয়দিন, অতঃপর সাত আছমান জমীন—এ সব কথার অর্থ কী?

নিছক অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক অশৈল্পিক ভাবাবেগের ব্যাখ্যা এ বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-জমানায় অচল। সৃষ্টির পূর্বে এবং সৃষ্টির সময়ে দিনই ছিলো না, তার আবার দুই, চার, ছয়, সাত কী? কাজেই প্রাচীন তফসিরে দিন ধরে' ঐ ধরণের যতো অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক অশিল্পিক কিস্সা কাহিনী মূলক ব্যাখ্যা (তফসির) দেয়া হোকনা কেন, সাত ধরে' অনন্ত আকাশ ও জমীনের অযথা ভাগ কল্পনা করা হোক না কেন, তা যে আসল সত্যের অপলাপ, তা বলাই বাহুল্য। তবে কি?

প্রকৃত ব্যাখ্যার নিমিত্ত তাকাতে হবে ঐ আলোর আয়াতের পানে। সেখানে আল্লাহ্কেই আছমান-জমীনের অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির মূল আলো বলা হয়েছে। তাৎপর্য হলো নূরে আহাদ

আদি, অন্ত, জাহের, বাতেন, অর্থাৎ স্থান কালে এবং স্থান কালের অতীতেও—চিরন্তন। তাই আর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن -

হুয়াল আউয়ালো অল্ আখেরো অজ্জাহেরো অল বাতেনো

তিনি আদি, অন্ত, জাহের (প্রকাশ) এবং বাতেন (গোপন) —হাদিদ ৩।

সুতরাং এখানে শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শন, এবং শিল্প। দার্শনিক ব্যাখ্যাও, শিল্প সুষমা মণ্ডিত করে', অথচ প্রকৃত বিজ্ঞান ও শিল্পকলা কখনও তার বৈরী নয়, বরং পরস্পর পরিপূরক।

ঐ নূরে আহাদ বা আল্লাহ্র চিরন্তন নূরই আদি, অন্ত, জাহের (প্রকাশ) ও বাতেন (গোপন)। হিন্দু সাংখ্য-দর্শন তাকে পরমপুরুষ বলে' থাক্লেও থাক্তে পারে। কারণ, ইস্লাম আসলে সকল প্রাচীন খাঁটি ধর্মমতেরই সংস্কার, সার সংকলন। আল্‌কোরআন সকল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সারনির্যাস, সংশোধন, শেষ সংস্করণ। নূরে আহাদ (পরমপুরুষ) থেকেই এসেছে নূরে আহমদ (পরমা প্রকৃতি) অর্থাৎ সৃষ্টির মৌল উপাদান অতি পরমাণু বা বিদ্যুৎ-কণিকা। কিভাবে এসেছে তা কেউই বলতে পারে না। কিন্তু এসেছে যে, তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। কাজেই নূরে আহাদ ও নূরে আহমদ এই দুই পর্য্যায় থেকেই শুরু হয়েছে সৃষ্টি কৃষ্টি, প্রলয়। ঐ পরমা প্রকৃতি নূরে আহমদ কোন কোন গ্রহে কি উপগ্রহে কালক্রমে আব (পানি), আতশ (আগুন) খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস) এই চারি স্থূল যৌগিক উপাদান বা পর্যায় লাভ করে। তা-ই পূর্বোক্ত ঐ দুই আর এই চার মিলেমিশেই হলো গিয়ে যৌগিক ছয় পর্যায়। দিন বলা হয়েছে জমানা মাফিক পর্যায় বুঝ্‌বেনা বলে,' অতএব ঐ রূপক অর্থে।

কিন্তু সাত আছমান জমীন আবার কী ?

পৃথিবীর উর্ধে সাতটা গ্রহ সাত আছমান [দেখুন জনাব মৌলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের সাত আছমান সম্পর্কীয় কোর-আন আয়াতের ব্যাখ্যা]। এ রকম ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। কারন, সূর্যের গ্রহ মাত্র সাতটা নয়, প্রধান নয়টা। আর রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা আর একটা গ্রহ আবিস্কার করেছেন বলে' দাবী করেন, নাম রেখেছেন 'ভালকান' ; এ সত্য হলে সূর্যের প্রধান গ্রহ হবে দশটা। আর গ্রহানুপুঞ্জ (Asteroids), উল্কা, ধুমকেতু প্রভৃতি ধরে' বে-এনতেহা, বে-শুমার। আবার, বহু আলোবর্ষে বহু দূরে দূরে অসংখ্য সৌরজগৎ এবং তার কোন কোন জগতে কতো গ্রহ উপগ্রহ ধুমকেতু উল্কা প্রভৃতি কতো অসংখ্য অঞ্চলে মহাশূন্যে ছড়িয়ে রয়েছে কে তার এনতেহা (সীমা সরহদ্দ), শুমার (গননা) করে।

সুতরাং সাত আছমানের ব্যাখ্যা ঐ রকম অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক অশিল্পিক হলে অর্থাৎ আবিস্কৃত সত্যের বিরোধী, বিপরীত হলে কেন বিজ্ঞ লোকে তা মান্‌বে ? জমীন অর্থাৎ পৃথিবীর সাত তবকের ব্যাপারেও অম্‌নি যা-তা বল্‌লে কেন তা গ্রাহ্য হবে ? যথা পাললিক শিলা, রূপান্তরিত শিলা, আগ্নেয় শিলা ইত্যাদি নাকি সাত স্তর, তা-ই সাত জমীন। কিন্তু এরকম নির্দিষ্ট বিভাগ কোনরূপ ভৌগলিক তথ্যেই পাওয়া যায়নি, কিংবা যাবে না। সুতরাং সমস্যা এড়াবার জন্য ঐরূপ নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর গোঁজামিলী ব্যাখ্যা দিলে আলকোরআনের আল্লাহর বাণী এবং প্রকৃত ছহি হাদিছেরও রছুলের বানী হওয়া সম্পর্কে মানুষ কেন সন্দিহান হয়ে উঠবেনা ?

কিন্তু, না, সন্দেহের কোন কারনই নেই। কারন, আল কোর-আনে আল্লাহ সাত আছমান সাত জমীন বলেছেন জমানা-জ্ঞান-মাফিক মানুষকে ইহ-পরকাল-জীবন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করতে। কারণ, সেই 'জমানার মানুষ বেহেশত (স্বর্গ) বুঝতো পৃথিবীর

উর্ধ লোকে, আর দোযখ (নরক, পাতাল) বুঝতো পৃথিবীর অধঃ লোকে, আর জমীন বুঝতো মৃত্তিকা বা পৃথিবী। অধ্যাত্ম জীবন-ধারা অমনি উর্ধ আছমান ও নিম্ন জমীন ধারনার সংগে ছিলো ওতপ্রোত জড়িত। আল্ কোরআনে আল্লাহ্ও তাই যুগপৎ 'ইহ-পরজীবন' আছমান জমীনের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তাৎপর্য হলো: শূন্যমণ্ডলে জড়-জগতের কোন সীমা সংখ্যা করা না গেলেও যে-যে জড় জগতে জীবনের শুরু, তার অধ্যাত্ম পতন যথাক্রমে পূর্বোক্ত, জড় ও চেতন এই দুই, জড়ের আবার আব, আতশ, খাক, বাদ এই চার—মোট ছয় পর্যায়ে। কিন্তু চেতনের দুই রূপ: এক বিশ্বআত্মা বা পরমাত্মা, আর জীবাত্মা। সুতরাং ঐ সাতস্তরে জীবনের আবির্ভাব সাত জমীন। আবার সেখান থেকে নিজস্ব জড়ের (অবশ্য মানব-জীবনে) ঐ নূরে আহমদ বা পরমার প্রকৃতির ঐ স্থূল চারি আগুন, পানি, বাতাস, মাটির মৌল উপাদান অতিপরমাণু বিশুদ্ধ করে' নূরে আহাদ অর্থাৎ পরমপুরুষে পুনঃ প্রত্যাবর্তন বা পুনরুত্থানেরও স্তর সাত—সাত আছমান [বলা বাহুল্য, এর পরবর্তী প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদে' দেখতে পাবেন কিভাবে জীবনের বিকাশ হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবের উদ্ভব এবং সেখান থেকে ক্রমবিকাশ করে নূরে আহমদ পরমাপ্রকৃতির আধার নূরে আহাদ পরম পুরুষে প্রত্যাবর্তন]।

ঐ ছুরা তালাকের ১২ আয়াতের বাকী অংশেও তা-ই প্রতিপন্ন করে:—

يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شئى قدير و ان الله

قد احاط بكل شئى علما -

ইয়া তান্নাজালোল আমরো বাইনাহুন্না লেতা'আলামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদির-অ আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বেকুল্লে শাইয়িন্ এলমা—

এদের (আছমান -জমীনের) ভিতর দিয়ে নাজেল হয় (আল্লাহর প্রকল্পিত) কার্যকলাপ যেন তোমরা জানতে পারো যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ ঘিরে আছেন সবকিছু (জড়-জীব উদ্ভিজ) তাঁর জ্ঞান যোগে (জ্ঞান-দানে)।

মানবের বেলা সর্বত্র বিরাজমান সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞান যোগ, জ্ঞানদান (এল্‌মে হাকিকত, মারেফাত) অমনি ক্রম সাত রঙ-রস-রূপে সাত স্তরে সম্ভবপর হয়, সে নিজস্ব আত্মা পরমাত্মার উপলব্ধির ব্যাপার, আসল প্রকল্পিত আমর বা কার্যকলাপ, তা কি বলে কয়ে বোঝানো যায় ? যা কোনদিন দেখেননি, চিনেননি তার ব্যাখ্যা দিলে কি বুঝ্‌বেন ?

তথাপি উপমা-উদাহরন-যোগে কতকটা বোঝানোর কোশিশ্ করা যাক।

এই ভাবে ঐ স্থূল জড় দেহে (physical body) যেমন আলোর পর আলো (نور فوق نور) আ-স-হ-বে-নী-ক-লা (আকাশী-সবুজ-হলুদ-বেগুনি-নীল-কমলা-লাল) রঙ-ধনুকের সাত রঙের সমাহার প্রকাশ পেতে পারে, তেমনি ঐ সূক্ষ্ম অন্তর্দেহেও (astral body) অনুরূপ আলোর উপর (ঊর্ধে) আলো (نور على نور) সাত রঙ রূপরস প্রকাশ পেতে পারে। জড় দেহের অতি পরমাণুর রঙ রূপ-রস যদি ধরেন জমীনের সূক্ষ্ম জ্যোতি, তাহলে ঐ অন্তর্দেহের (আত্মার) অনুরূপ রঙ-রূপ-রস ধরতে পারেন আছমানের আরো সূক্ষ্ম জ্যোতি— এইরূপে মূলতঃ চৌদ্দই হয় স্থূল ও সূক্ষ্মের মোটামোটি জ্যোতির্ময়তা— তাছাউফের গ্রন্থে যাকে চৌদ্দ ভূবন নামে অভিহিত করে রেখেছে। কারণ, ভুবনই তো, চতুর্দ্দশ লোকের জ্যোতির মালা যেন—সবই অধ্যাত্ম অর্থাৎ এল্‌মে হাকিকত, মারেফাতের ব্যাপার, বুঝতেও হবে সম্পূর্ণ এম্‌নি আত্ম অনুশীলন অভিজ্ঞতায় হাতে কলমে।

আলকোরআনে আল্লাহ্ এমনি বিচক্ষণতার সংগে ইহ-পর-জগৎ জীবন-লীলা সংক্ষেপে পেশ করেছেন এবং যুগে যুগে আত্ম-উদ্‌বর্তন-

সাপেক্ষ এর মৌল তাৎপর্য অবধারিত রেখেছেন। সুতরাং এলমে হাকিকত মারেফাত তথা খাঁটি দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-অভিজ্ঞতা ছাড়া আলকোরআনের ঐ রকম গূঢ় তত্ত্ব-পূর্ণ আয়াতের ঐ স্থূল দৃষ্টি-গোচর আছমান-জমীন-হিসাবে বিচার-বিবেচনা করা কতোদূর ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ হয়েছে, হতে পারে, হয়ে থাকে, চিন্তা করুন। অধ্যাত্ম দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সার-গর্ভ অন্য আয়াতের, কি ছুরার কথা এ-ক্ষেত্রে না-ই তুল্‌লাম।

বল্‌বেন হয়তো যে বিজ্ঞান ক্রম-বিবর্তিতই হয়ে চলেছে, যদি আরো উদ্‌বর্তনে স্থূল দুই, চার, ছয় দিন এবং সাত আছমান-জমীন আবিস্কৃতই হয়ে পড়ে?

কিন্তু তা কি সম্ভবপর? আবিস্কার অর্থ কী? আবিক্রিয়া দু রকম। এক : অদৃশ্য, অজানা, অচেনা, তাকে দেখা, জানা, চেনা, ইংরেজী Discovery. দুই : নূতন কোন যন্ত্রাদি, কি পদার্থ তৈয়ার করা, ইংরেজী Invention. অনাবিস্কৃত যখন ঐ প্রথম স্তরে আবিস্কৃত হয়ে পড়ে তার আর পরিবর্তন কী? ঐ ভিত্তিমূলে অপর অজ্ঞাতের সন্ধান ও প্রাপ্তি। সেক্ষেত্রে উপরোক্তরূপ দিন-রাত্রি, কি সাত সংখ্যক আছমান-জমীন প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ, মূল শূন্যমণ্ডল এখন আবিস্কৃত, তার আদি নেই, অন্ত নেই, স্থান নেই, কাল নেই, 'অসংখ্য ভর (mass)' 'গতিতে (motion, velocity তে)' ভাস্‌ছে। আধুনিকতম বিশ্ব-বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন এইভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন : $M = EC^2$; M হচ্ছে Mass (ভর), E হচ্ছে এনার্জি (শক্তি), C হচ্ছে আলোর গতি (সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬২৮৪ মাইল)। তাৎপর্য হলো : প্রতি ভরে (mass এ) তার সম পরিমাণ শক্তি (energy) রয়েছে সঞ্চিত। তাকে আলোর ঐ বিপুল গতির বর্গ (square— স্কোয়ার) দিয়ে পূরণ করলেই তা পাওয়া যেতে পারে। তেমনি $E = MC^2$; তাৎপর্য হলো : এনার্জি (শক্তি) ঐ স্কোয়ার (বর্গ) পুরিত আলোর গতির সমষ্টি-সম্পন্ন

ভর (mass)। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ভরের ঐ অতিপরমাণু সমূহে শক্তির (এনার্জি) আপাতঃ নিশ্চেষ্টতা—potential energy (জড়তা-প্রাপ্ত শক্তি), আলোর গতির অতি নিম্ন স্তরে কম বেশী সচল—স্থূল conservation of energy. দ্বিতীয়তঃ এনার্জি (শক্তি) kinetic অর্থাৎ আলোর গতিতে অতিপরমাণু সমূহ ছাড়া প্রাপ্ত (অজড়)—সূক্ষ্ম Conservation of Energy.
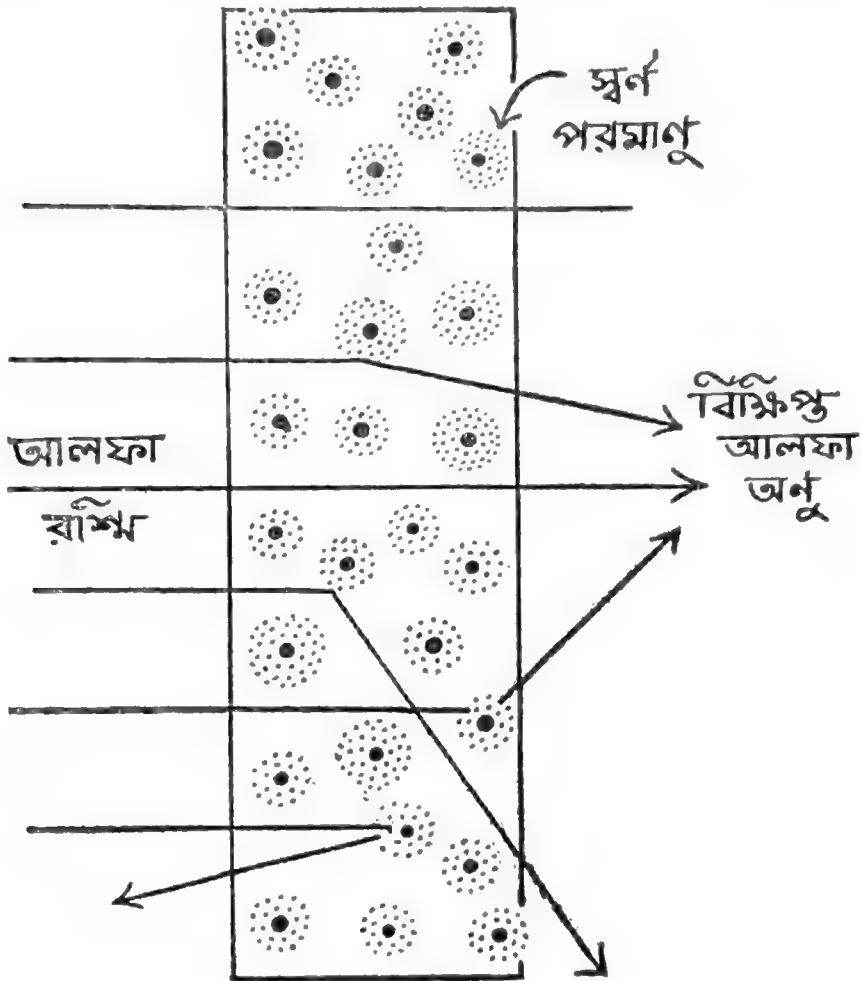
সুতরাং মূল ঐ অতিপরমাণু (Energy)—সেই অদেখা, অচেনা, অজানা এখন আবিস্কৃত। অতএব দিন রাত্রি বলেও আসলে আদতে কোন কিছু নেই, স্থান কালে ভর গতির (mass +energy-র) সে আপেক্ষিকতা অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র ভেদে স্থূল (জড়) সূক্ষ্ম (অজড়) পরিবর্তন, বিবর্তন (conservesion), সেও আবিস্কৃত। তার আবার সংখ্যা সাব্যস্ত কী? আছমান-

জমীনেরও অম্‌নি সীমা সরহদ্দ নেই ; তার আবার সাত, আট প্রভৃতি সংখ্যা সীমা কী ?

এখনো এসব না বোঝা, না মানা এবং অকারণ অকেজো অপব্যাখ্যা দেয়া আসলে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শৈল্পিক হাসির খোরাক যোগানো।

বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ

বিজ্ঞান ও কোর্‌আন

বিজ্ঞান বলছে :—পৃথিবী সূর্য থেকে খসে পড়া অংশ বিশেষ! প্রথমে এই জড়পিণ্ড ছিলো দারুন গরম। সে গরম জড়পিণ্ডে তরল আকারে ছিল নানা খনিজ পদার্থ। কাল যতো যেতে লাগ্‌লো ততই বাষ্পরাজি থেকে পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি হলো। আর ভূ-পৃষ্টের কতক অংশ জমাট হয়ে ভূ-ত্বকের (crust) সৃষ্টি কর্‌লো! অপেক্ষাকৃত নিম্ন কুচ্‌কে-যাওয়া অংশে গলিত গরম বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে পানিতে গেলো ভরে, হল মহাসাগর, সাগর, উপসাগর—যেস্থান যেরকম কুঁচ্‌কে যাওয়া এবং যতোখানি চওড়া ও গভীর,—কেবল কেবল ভূমিকম্পের ফলেও এ হতে পেরেছে। আবার ঐ তীব্র ভূকম্পনের ফলে সাগর, মহাসাগর, উপসাগর থেকে ঠেলে উঠেছে পাহাড় পর্বত। কোন কোন জায়গা ধ্বসে গিয়ে হয়েছে হ্রদ। পাহাড় পর্বত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে গড়িয়ে হয়েছে নদী-নালা। এ সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ্‌ বলছেন :

يوم ترجف الرجفة ه تتبعها الرادفة ه قلوب يومئذ واجفة ه ابصارها
خاشعة ه يقولون ء انا لمردون فى الحافرة ه

ইয়াওমা তারযুফুর রায়েফাহ্‌—তাতবায়ুহার রাদেফাহ্‌—কুলুবোঁ ইয়াওমায়েযেঁ অযেফাহ্‌—আব্‌ছারুহা খাশেয়াহ্‌—ইয়াকুলুনা আ ইন্না লামারদুদুনা ফিল্‌ হাফেরাহ্‌—

যেদিন কম্পনকারী কম্পিত হয়, তার পরের যে সে তার অনুসরণ করে (একের পর এক ঘটতে থাকে)। কতো হৃদয় সেদিন ঘনঘন হয় কম্পিত। তাদের দৃষ্টি হয় বিনত। তারা বলে 'আমরা কি পূর্ব পথে বিতাড়িত হবো' [মৃত্যু অন্তে পুনর্জীবন পাবো?]।—নাযেয়াত ৬—১০। দেখুন 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধে 'কোরানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী' প্রসংগ।

এ হলো সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের কারণে চিরন্তন জলজলা (ভূমিকম্প)। ক্রমে ক্রমে জীবধারণের উপযোগী হওয়ায় পৃথিবী ভূকম্পনের কবল থেকে অনেক খানি রেহাই পেয়েছে।

و القد فى الارض رواسى ان تميد بكم ـ

অ আল্কা ফিল আরদে রাওছেয়া আন তামিদা বেকুম

আর তিনিই পৃথিবীর উপর পাহাড়-পর্বত ঠেলে তুলেছেন যেনো পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে।—নহল ১৫

তাৎপর্য হলো : পূর্বোক্ত পুন: পুন: ভূকম্পনের ফলে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় ভাঙ্চুর ও পাহাড় পর্বত উৎক্ষেপনের পর এখন এমন এক ভারসাম্য অবস্থায় পৃথিবী পৌঁছেচে যে আর কেবল কেবল ভূকম্পনও হয় না, জায়গাজমি ধ্বসে গিয়ে হ্রদের সৃষ্টিও আর হয়না। ফলে, দুনিয়া প্রথমে জীব-কুলের ও পরে মানুষের বাসোপযোগী হয়েছে। মানব পর্যন্ত এ জীব আগমের মূল রহস্যও কোরআন বর্ণন করেচে :

و الله خلق كل دابة من ماء ـ فمنهم من يمشى على بطنه ـ و منهم من يمشى على رجلين ـ و منهم من يمشى على اربع ـ يخلق الله ما يشاء ـ ان الله على كل شئ قدير ه

আল্লাহ খালাকা কুল্লা দাব্বাতেম মায়েন, ফা মেনহুম মাঁইয়ামশি আলা বাত্নেহি অ মেনহুম মাঁ ইয়ামশি আলা রেজলাইনে অ মেনহুম মাঁ ইয়ামশি আলা আরবায়েন — ইয়াখ্লুক্লাহু মা ইয়াশাউ ইন্না ল্লাহা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদির।

"আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সকল জীব পানি থেকে (প্রথমত: জলে এবং জলাভূমিসমূহে প্রোটোপ্লাজ্ম্ সৃষ্টি, তা থেকেই মূলত: উদ্ভিজ্জ ও বিচরণশীল জীবনের সৃষ্টি)। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ (জলে-স্থলে বা উভয়ত:) বুকে ভর দিয়ে চলে (সরীসৃপ), কতক দু'পায়ে চলে (মানুষ ও পাখী) আর কতক চলে চার পায়ে (স্তন্যপায়ী)। এবং আল্লাহ্ (এভাবে) যা খুশী সৃষ্টি করেন। নি:সন্দেহে 'আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।'"—নূর : ৪৫।

বিজ্ঞান

এবারে প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক ডারউইন, ওয়ীজউ্যান, ল্যামার্কের উদ্‌ঘাটিত বৈজ্ঞানিক ক্রম-অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদ বিশ্লেষন করবো। তার পর আল-কোরআনের অভিমতের সাথে তার কতখানি ঐক্য বা অনৈক্য রয়েছে তা দেখাবার প্রয়াস পাবো।

ক্রমবিবর্তন ও পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার। জড়ের বুকে হল প্রাণসঞ্চার। পানি, বাতাস ও প্রখর রৌদ্রতাপ—এরা যেন কোনো যাতুমন্ত্রবলে জীবনকে বিকশিত করলো তুনিয়ায়। পানির গভীরে হল অতি ক্ষুদ্র এক-কোষী কণিকা (Protoplasm); নরম জেলির মত একটি পদার্থ ছিল তার বাহন।

এই সব জীবের খবর আমরা পেলাম কি করে? পেলাম তাদের জীবাশ্ম থেকে। কতকগুলি প্রাচীন শিলা পাওয়া গেছে। তাদের বয়সের কূলকিনারা নেই, পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশী হবে। তাদের অভ্যন্তরে জালি জালি ঝিনুক ও শামূকের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীর কাছে এগুলি যেন গল্পের বই। এইগুলো থেকেই প্রাচীন যুগের অনেক তথ্য জানতে পেরেছি আমরা। কল্পনায় দেখি, সেদিন সমুদ্রতলে যেন এক বিচিত্র জীবনের হাট বসেছিলো। নানা রঙের, নানা চেহারার জীব। তাছাড়া কয়েক রকম জলজ উদ্ভিদ্‌ও ছিল। লম্বা ডাঁটায় কত বিচিত্র ফুল, কত রঙ, কত বাহার!

পানির মধ্যে বাতাস নেই, তাই সেখানে শব্দ নেই। নীরবে নিঃশব্দে চলাফেরা করছে লক্ষ রকমের জলজীব। যার যা আহার বেছে নিয়ে সে খায়। তাদের আবার বাচ্চা হয় এবং সংখ্যায় তারা বাড়তে থাকে।

মনে করা যাক, কয়েক লক্ষ বছর পরে আমরা গেলাম তাদের দেখ্‌তে। দেখি দৃশ্যপট একেবারে বদ্‌লে গেছে, আগেকার জীবগুলোর অনেকেই গরহাজির। যারা আছে তারাও হয়েছে অন্যরকম। তাছাড়া অন্য জীবও এসেছে। এরা হচ্ছে মাছ—

ঝাঁকে-ঝাঁকে, লাখে-লাখে মাছ। কেউ ছোট, কেউ বড়, হাজার রকম আকার আর চেহারা সেই সব মাছের। এই সময়কে মৎস্যযুগ বলা হয়।

জীবের দেহে কেমন করে মেরুদণ্ড হলো, তা কেউ জানে না। কিন্তু এই সব বড় বড় মাছের দেহের মাঝখানে মেরুদণ্ড ছিলো, যেমন আজও আছে। বৃহৎ আকারের মাছগুলো শক্তিশালী, বিদ্যুৎগতিতে ছুট্‌তে পারে। অনেক মাছেরই চোয়ালে ধারালো দু'পাটি দাঁত। কেউ কেউ হাঙরের মত হিংস্র, ছোট ছোট মাছের কাছে তারা যেন বিভীষিকা। মৎস্যযুগের আগে যে সমুদ্রজল শান্ত, স্থির ছিল, এখন তা তোলপাড় হতে লাগ্‌লো—বড় বড় মাছের লাফ-ঝাঁপ আর দাপাদাপিতে।

পানির মুলুকে মাছের রাজত্ব চললো অনেকদিন। প্রকৃতি সবসময়ই পরিবর্তন ভালোবাসে, তাই এদেরও পরিবর্তন হল। মৎস্যযুগের কয়েকটি দুঃসাহসিক মাছকে আমরা দেখলুম ডাঙার দিকে এগোতে। খাদ্যের জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, তাদের অনেকে উঠলো ডাঙায়। এদের মধ্যে অনেকে ডাঙা সহ্য করতে পারল না, ধড়ফড় করে মরে গেল। আবার কেউ কেউ ডাঙায় বাস করার নতুন অভ্যেস রপ্ত করতে লাগলো। শুধু মাছ কেন, জলের কাঁকড়া বিছারা উঠ্‌লো, শামুক-ঝিনুকও উঠ্‌তে লাগলো ডাঙায়। অনেকে জলের ধারে রইলো, দরকার হলে তরতর করে পানিতে নেমে যায়। ডাঙায় যারা উঠ্‌লো, তাদের শিখ্‌তে হল ডাঙার উপর দিয়ে চলা-ফেরা করা।

এই সময়ে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে পৃথিবীর মাটিতে। নদী, নালা, হ্রদ আর সমুদ্রতটে, আর যত ভিজে নরম জলাভূমিতে দেখা দিলো ডাঙা-উদ্ভিদ। নানা উদ্ভিদ সবুজ পাতাবাহার নিয়ে গজিয়ে উঠ্‌লো মাটি থেকে। সে সব গাছপালার চেহারা কী বিচিত্র! কত রকমের পাতা, কত রকমের লতাগুল্ম! বড় বড়

ফার্ন জাতীয় গাছ মাথা তুলে দাঁড়ালো আকাশ জুড়ে'। এদিকে পানি থেকে ছোট ছোট বিছা ও মাকড়সা ডাঙায় উঠে প্রথম নিঃশ্বাস নিতে শিখেছে। মাছও উঠ্‌লো, পানির মাছের ফুলকো হলো ডাঙার মাছের ফুসফুস। এই ফুসফুস দিয়ে তারা বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিতে শিখলো, তারা হলো ডাঙার জীব, তারা শিখলো ডাঙা থেকে খাবার যোগাড় করতে আর গুড়ি মেরে হাঁটতে।

জীব আর উদ্ভিদের পরিবর্তনের সংগে সংগে পৃথিবীর চেহারাও বদলাচ্ছিলো। প্রকৃতি যেন নতুন করে গড়তে লাগলো। অনেক জমি পানি থেকে উঁচু হয়ে জেগে উঠ্‌লো, পানি গেলো সরে। কোথাও-বা পানি গেলো শুকিয়ে। পানি সরে যাওয়ায় অনেক পানির জীব প্রাণ হারালো, কেউ-বা জমির উপরেই থেকে গেলো। এই সময়ে আমরা দেখলাম টিকটিকি জাতীয় অনেক জানোয়ারকে। এদের মধ্যে একটি ছিলো সত্যই অদ্ভুত। জাহাজ টিকটিকি বলা হয় একে ; লম্বায় ন' ফুট, পিঠের উপর পাতলা চামড়ার যেন পাল তোলা, তাতে আবার গজালের মত একসার কাঁটা খাড়া হয়ে আছে।

ডাঙাতে যারা এলো, ধীরে ধীরে তাদের পরিবর্তন হতে লাগলো। অনেক জন্তুর পা গজিয়েছে, বেশ হেটে বেড়াচ্ছে তারা। সেই সংগে দেহের হাড়-গোড় মোটা হয়েছে, শক্ত-সমর্থ হয়েছে তারা। কচ্ছপ হাঁটছে চার পা দিয়ে, কুমীরও হাঁটছে চার পা দিয়ে। এক রকম কুমীর দেখা গেলো মাছের মত পাখ্‌না-ওয়ালা। কুমীর ডিম পাড়তো পানিতে, কিন্তু অন্য সরীসৃপরা ডিম পাড়তো ডাঙায়। বহু জীব হয়ে উঠলো উভচর।

আবার অসহ্য গরম এসে পড়লো পৃথিবীর উপর—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। জীবজন্তুর দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল। তারা আকারে বড় হতে থাকে। কেউ কেউ বিরাট হয়ে উঠলো। অনেকের

পিঠে কাঁটার সার। যাদের পা হল তারা আর পানিতে নামলো না।

নানা সরীসৃপে পূর্ণ পৃথিবী। এই সময়কে বলা হয় 'সরীসৃপ-যুগ।' এই যুগের একটি বিশিষ্ট জীবের নাম হলো ডাইনোসর। শিলাস্তরে অনুসন্ধান করতে করতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন একটি বিরাট দেহের জীবাশ্ম। আকারে বিরাট, গড়নেও অদ্ভুত। এরি নাম দেয়া হলো ডইনোসর। এটি গ্রীক শব্দ, ডাইনোসর কথাটির মানে হচ্ছে ভয়ংকর টিকটিকি।

বহু জাতের ডাইনোসর ছিল তখন। সবাই কিন্তু হিংস্র স্বভাবের নয়, যদিও চেহারা দেখলে ভয়ংকর ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এদেরই অতি নিরীহদের নাম রাখা হয় ইগুয়ানোডন। এতো দীর্ঘ-দেহী জীব আর দেখা যায়নি। এদের মাথা ছিলো ছোট, আর মস্তিষ্কও ক্ষুদ্র। বিজ্ঞানীর অনুমান, এই ডাইনোসরদের অত বড় চেহারা হলেও তারা বিশেষ চালাক-চতুর ছিল না।

পাখী নয়, অনেকটা বাদুড়ের মত। বাদুড়কে কি পাখী বলা যায়? তখনকার এ ধরনের আকাশে-উড়া জীবগুলোর নাম টেরোডাকটিল। এদের ডানায় পাখীর মত পালক ছিলো না। সে যুগে আমরা যদি ঘন্টার পর ঘন্টা বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াতাম, একটি পাখীও নজরে পড়তো না। কিন্তু যে-কোন বনের ধারে গেলেই শোনা যেতো বিকট ডানা ঝাপটানো ঝটাপট আওয়াজ, দেখা যেতো ঝাঁকে-ঝাঁকে লাখে-লাখে টেরোডাকটিলরা ডানা নেড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর তাদের দেহ ও ডানাই বা কত বড়! প্রায় দশ ফুট দেহে যখন দশ দশ করে বিশ ফুট পাখা নেড়ে আকাশে উড়ে বেড়াত, কি সুন্দরই না দেখাত! অবশ্য 'সৌন্দর্য বুঝবার মত' জীব মানুষের আবির্ভাব তখনো অনেক সুদূরে। আজকালকার পশুপাখীর তুলনায় অতি বিদ্‌ঘুটে, কী রকম কদাকার ছিল সেই যুগের প্রায় সকল পশুপাখীর চেহারা! কী রকম অতি

তীব্র উৎকট দুর্গন্ধ ছিল প্রায় সকলের গায়ে! আজকালকার পশুপাখীরা সেদিক দিয়েও অতি সরেস। যাহোক, আজকালকার বাদুড়রা কি টেরোডাকটিলদেরই বংশধর? কালপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র হয়ে গেছে, চেহারায় বিদ্ঘুত্বও অনেকটা কমে গেছে? কে জানে!

মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদ শোনা যেতো। সেটা আর কিছুই নয়, কোনো টেরোডাক্টিল শত্রুর চোয়ালে পড়ে যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠ্ছে। অরণ্য যেখানে কিনারায় এসে ঠেকেছে, সেখানে ওদের অসংখ্য শত্রু। লম্বা লম্বা গলাবিশিষ্ট জলেভাসা জীব, নাম প্লেসিওসর। এরা পানি থেকে ধরে মাছ, আর বিরাট লম্বা গলা বাড়িয়ে আকাশ থেকে ধরতো টেরোডাক্টিল। পায়ের বদলে এদের ছিলো মাছের মতো পাখ্না। তাই দিয়ে সাঁতার কেটে পানিতে ভেসে বেড়াতো এই অদ্ভুত প্লেসিওসররা!

পঁয়তাল্লিশ হাত লম্বা একটা জীবের চেহারা ভাবা আজকাল কী শক্ত! তার ওজন ভাবা আরো শক্ত, ওজন ছিল হাজার মণেরও বেশী। অথচ সত্যি সত্যিই এমন জীব ছিল, নাম ব্রণ্টোসর। কিন্তু ব্রণ্টোসরও লজ্জা পেতো আর এক জনের কাছে, সে হচ্ছে ডিপ্লডকাস। এর দৈর্ঘ ষাট হাত। এটি আবার ওজনে কম, একটু রোগাটে চেহারা। তাই ঘাড় তুলতে পার্ত অনেক উঁচুতে। মনে করুন, কেউ লুকিয়ে আছে তিন তিলার ছাদে, একটি ডিপ্লডকাস ইচ্ছে করলে মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তাকে দেখে নিতে পারত, যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থাক্তো তবে জিগ্গেস কর্তে পার্তো—কেমন আছেন?

আর একটি জীব ছিলো এংকাইলোসর। তার গায়ে প্রকৃতি আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ এক প্রকার বর্ম লাগিয়ে দিয়েছিলো। পিঠের শিরদাঁড়ার উপর দুইসারে আঁশের মত শক্ত তেকোণা অস্ত্র সাজানো ছিলো—যেন আত্মরক্ষা করতেও বটে, আবার শত্রু ঘায়েল করতেও

বটে। লেজের ডগাতেও খোঁচা খোঁচা গজাল। এই লেজের একটি ঝাপটায় যে-কোনো আততায়ীকে কাবু করা এর কাছে কিছুই ছিলো না।

ভাব্‌তে কেমন লাগে যে, এই সব দৈত্যের আকার বিরাট জন্তুগুলো এককালে ঘুরে বেড়াতো এই পৃথিবীর উপরই। তবে এরা প্রায় সবাই ছিলো উদ্ভিদভোজী এবং স্বভাবে ভদ্র ও নিরীহ। অনেক সময়ে তাই এরা প্রবল শত্রুর কবলে পড়ে নিষ্ঠুরভাবে মারা পড়তো।
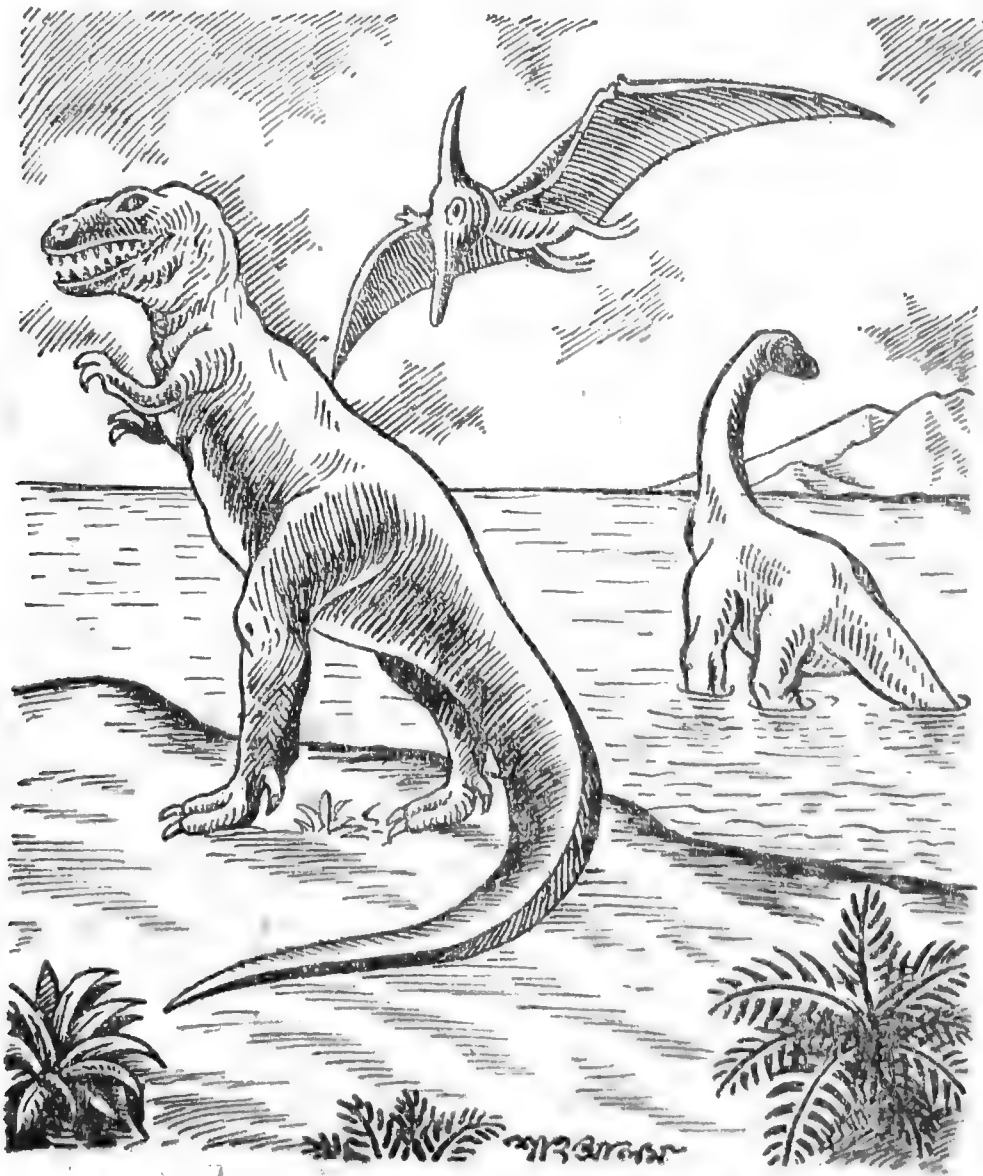
সরিয়ানদের সব গোত্রই যে নিরীহ ছিল তা নয়। এদের এক গোষ্ঠি ছিলো টিরানোসর। এদের স্বভাব ছিলো আলাদা, এরা

ছিলো সে জমানার আতংক বিশেষ। প্রকাণ্ড মাথা, বড় বড় চোয়াল যেন ইস্পাতের জাঁতিকল, তাতে সারি সারি ধারালো দাঁত, এরা ছিলো মাংসাশী আর ভীষণ হিংস্র। আকারে এরা ডিপ্লডকাস্, কি, ব্রণ্টসরের চেয়ে ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু দানবীয় শক্তি ছিলো এদের চোয়ালে আর নখরে। হাত দুখানা যেমন অস্বাভাবিক ছোটো, পা দু'টো তেমনি বড়ো আর মজবুত। শত্রুকে কিংবা শিকারকে মুহূর্তমধ্যে দাঁত আর নখর দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলত এই মূর্তিমান বিভীষিকা—টিরানোসর রেক্স্—অত্যাচারী সরীসৃপের সম্রাট (টিরানো—অত্যাচারী, সরস—সরীসৃপ, রেক্স্ রাজা, সম্রাট)।

যাহোক, সরিয়ানদের সংগে সংগে সরীসৃপ-যুগের শেষ হয়ে এলো। এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর উপর অনেক পরিবর্তন এসে গেছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে'। জীব জগতে আবার নতুন যুগের শুরু হলো।

এবার স্তন্যপায়ীর জমানা। তার আগে একটি অদ্ভুত জীবের কথা বলছি। প্লাটিপাস। সরীসৃপের সংগে এর মিল নেই, আবার স্তন্যপায়ীও নয় বটে। এ যেন উভয় দিগের সেতুবন্ধ। সরীসৃপেরা ডিম পেড়েই নিশ্চিন্ত, আর কোন কর্তব্য নেই তাদের। কিন্তু প্লাটিপাস ডিম পাড়্‌লো, দেহেরই থলের মধ্যেই রইলো ডিমগুলি। যতদিন না তাতে বাচ্চা হয় এবং বাচ্চারা শক্ত-সমর্থ হয়, দেহজাত এক প্রকার পুষ্টিকর পানীয় খেয়েই ততদিন তারা বড় হতে থাকে। হাঁসের মত ঠোঁট এই প্লাটিপাসের।

আজ্‌কালকার পাখীর পূর্বপুরুষ কি হিসপারোনিস? কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, ওদের ডানা ছিলো না, ওড়বারও বালাই ছিলো না, কেবল পানিতে সাঁতার কেটে বেড়াতো; লম্বায় ছিল তিন হাত।

এইবার আমরা স্তন্যপায়ীদের যুগে এসে পড়েছি। স্তন্যপায়ীরা হচ্ছে সেই সব জীব, যারা সরীসৃপের মত ডিম পারে না, সন্তান

প্রসব করে। সন্তানেরা মায়ের স্তন্য পান করে বড় হয়, যেমন মানুষ।

সরীসৃপের সংগে স্তন্যপায়ীর আর একটা তফাৎ আছে। সরীসৃপের রক্ত ঠাণ্ডা। স্তন্যপায়ীর রক্ত গরম। স্তন্যপায়ীর স্বভাবও অন্যরকম। এদের মায়ের সংগে সন্তানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বাচ্চাদের রক্ষা করার দায়িত্ব মা নিজের উপর নিয়েছে। প্রাণ বিপন্ন করেও সে বাচ্চাদের বাঁচায়। এই থেকেই তাদের মন বলে' বস্তুটির পরিচয় পাওয়া যায়; মাতৃস্নেহের মধুর সম্পর্ক জীবজগতে এই প্রথম। জীব যেন এবার উন্নতির অনেকখানি উঁচু ধাপে উঠে পড়লো।

এদিকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেক অসহায় জীব লোপ পেয়ে গেলো (Struggle for existence অর্থাৎ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম ও Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচন উভয়ই এজন্য দায়ী)। আবার অনেক নতুন জীবনের সূত্রপাত হল। গায়ে লোমের আভরণ এলো, আর এলো উন্নত মস্তিষ্ক। গণ্ডার, হাতী ও ঘোড়ার পূর্বপুরুষ এই সময়ই জন্মলাভ করে। এখনকার গণ্ডারের কপালে থাকে একটা খড়্গ। কিন্তু সেই যুগে গণ্ডার জাতীয় ঐ জীবটার ছিলো বেঁটে বেঁটে তিন জোড়া শিং, মুখের নীচেও ছিল দুটো বাঁকানো দাঁত। ঐ যুগে শ্লথ বলে একটি জীব ছিলো। তারা লম্বা জিহ্বা দিয়ে গাছের পাতা খেতো—বর্তমান যুগের লম্বা গলাওয়ালা জিরাফের পূর্বপুরুষ হয়ত। বিরাট দাঁতওয়ালা হাতীর মত একটা জীব ছিলো, নাম ম্যামথ- হয়তো বর্তমান জমানার হাতীদের পূর্বপুরুষ। ম্যামথদের আর এক জ্ঞাতি ভাই ছিলো, নাম মাষ্টডন, যেমন চেহারা তেমনি জমকালো নাম।

আবার গরম যুগ এলো। শীতের উদ্ভিদ্ শুকিয়ে মরলো। শীতের অনেক জীব, যারা তাপ সহ্য করতে পারলো না, তারাও

মরে' গেলো। সমতল ভূমিতে যেন সবুজ ঘাসের বন্যা এসেছে। মাঠভরা সতেজ সবুজ ঘাস। কোথাও বা দিগন্তের এপার-ওপার জুড়ে রয়েছে ঘন বন আর বন। তৃণভোজী বহু জীব চরছে মাঠে। ঘোড়া, উট, জিরাফ, হরিণ আরো কত উদ্ভিদ্‌ভোজী জীবের তখন সুদিন। মাঠে মাঠে জীবজন্তুর হাট বস্‌লো। তাপ-সহ কত জীব, বিচিত্র তাদের আকার-প্রকার, সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ, পৃথিবী যেন হয়ে উঠলো এক বিরাট পশুশালা। কিন্তু ভয়ও ছিলো তখন। দাঁতালো বাঘের উৎপাত কম ছিল না। এখনকার বাঘকেই আমরা ভয় করি, কিন্তু এর চেয়ে শতগুণ হিংস্র ছিলো ঐ দাঁতালো বাঘ। ছোরার ফলার মত ন' ইঞ্চি লম্বা ছিলো তার দাঁত। কখন যে সে পাহাড়ের অলক্ষ্য অন্তরাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে কে জানে? আগেকার বিরাট-দেহী নড়বড়ে জীবগুলির একটিও ছিলোনা এ সময়ে। তাদের জায়গায় এসে গেছে আরো অসংখ্য জীব—হরিণ, হাতী, উট, কুত্তা, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি। এদের কাউকে আমরা এখনো দেখ্‌তে পাই। আবার অনেক ছিল, যাদের আমরা মোটেই চিনি না।

ভূপৃষ্ঠের আবার পরিবর্তন হল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ আয়ু ফুরিয়ে গিয়ে আবার ঠাণ্ডা পড়লো। সে যে কী তীব্র ঠাণ্ডা, কল্পনা করা যায় না। দুরন্ত হিমপ্রবাহ, পানি জমে হল বরফ। খসে পড়া বরফ পাহাড় থেকে ছুটতে থাকে ঢালু পথে। তার গতিপথে যা কিছু পড়ে তাকে ধ্বংস করে দেয়। তার সংগে প্রবল তুষার ঝটিকা। এই সময়কে বিজ্ঞানীরা তুষার-যুগ বলেন। কতকগুলি জীব এই যুগের প্রচণ্ড শীতে টিকে থাক্‌তে পাড়লো না, নিশ্চিহ্ন হলো তারা। আবার কতক জীব—যেমন গণ্ডার, বাঘ, ঘোড়া, উট প্রভৃতি—তীব্র শীতে অভ্যস্ত হতে শিখ্‌লো। শীতের মধ্যে বাঁচতে হলে গায়ে আবরণ দরকার, তাই অনেকের গায়ে হলো লোমের আচ্ছাদন।

এবার একটি নয়া জীব এলো। এর অনেক জাতি। এরা ঘন জংগলের বাশিন্দা। এদের গায়ে ঘন লোম। এরা মাটিতে থাকে না, গাছের ডালে-ডালে এদের বাস, এদের খেলা। এদের আহার্য গাছের ফলমূল। অরণ্য মুখর হয়ে উঠলো অসংখ্য এই লেমুরের লাফালাফি আর তাদের কল-কোলাহলে। পাহাড়ী অঞ্চলে এদেরই জ্ঞাতি বেবুনকে দেখা যেতো। বেবুন লাফাতো এ-ডাল থেকে ও-ডালে। তার মুখের চার পাশে সাদা লোম, দেখলে মনে হয় বুড়ো দাদু। অনেক বানর কিন্তু বেশ রঙচঙে। মাথা ও মুখের গড়নও বড় অদ্ভুত। বাহারের তিলক-কাটা-মুখে পায়চারী করে বেড়াতো একদল, নাম ম্যানড্রিল। এই আদিম বানরদের সকলেই ছিলো স্তন্যপায়ী। পূর্বের জীবদের চেয়ে এদের বুদ্ধি ছিলো আরো বেশী। মস্তিস্ক ও দেহের অংগ-প্রত্যংগের দিক দিয়ে মানুষের সংগে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে এদের।

বানরদের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দেখবার মত। বেবুনেরা বাস করত গাছে গাছে, কিন্তু মাটির উপর দিয়ে চার পায়ে বেশ হাঁটতেও পারত। একটু হাসিখুশী মুখ হচ্ছে শিম্পাঞ্জির, চিড়িয়াখানায় বা সিনেমার ছবিতে অনেক সময় শিম্পাঞ্জী দেখা যায়। বেশী বুদ্ধি আছে এদের, বেশ বুদ্ধি করে মানুষকে অনুকরন করতে পারে। বড় বড় গোল চোখওয়ালা আরেক রকমের লেমুর আছে, এর অন্য নাম 'আয়আয়'। ওদের হাতের আঙুল ঠিক মানুষেরই মতো। আমাদের মতোই ওরা জিনিস-পত্র ধরে হাত দিয়ে। ছোটখাট চটপটে জীব, প্রখর দৃষ্টি, বেশ বুদ্ধি আছে। দু'রকম বানর ছিল, দেখতে মনে হত ব্যংগ-চিত্র। এ রকম বানর এখনও আছে, যাদের মুখের গড়ন অদ্ভুত, কিন্তু মানুষের মুখের সংগে আশ্চর্য মিল আছে। দৈত্যের মত জোয়ান গোরিলা বড় ভয়ংকর। তার বিরাট দু'খানা হাত, প্রচণ্ড শক্তি তাতে, লেজ নেই, সর্বাংগ মোটা লোমে আবৃত, বানর শ্রেনীর মধ্যে হিংস্রতম জীব এই গোরিলা।

গাছের ডাল ছেড়ে বানর-মানুষ একদিন দু'পা দিয়ে হাঁটতে লাগলো মাটিতে, সামনের পা দুটো হল তার হাত। মেরুদণ্ড এই রকম সোজা রেখে হাটে যে-জীব, বিজ্ঞানীরা তাদের বলেন প্রাইমেট। এই প্রাইমেটদের মস্ত বড় সুবিধে হলো হাত দিয়ে কাজ করা। এই দিন থেকে তারা যেন মানুষ হওয়ার পথে অনেক খানি এগিয়ে এলো। অনুমান করা হয় যে, প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বছর আগে তুষার যুগের তীব্র শীতের সময়েই আধুনিক মানুষের আদি পূর্ব পুরুষের জন্ম হয়েছে। গোরিলা, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জীর মতো কোন জীব অর্থাৎ বানর-মানুষ (Apeman) থেকে মানুষ হওয়াও মাঝে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে। ওদের মানুষ হবার মতো হিম্মত, হিকমত (properties) ছিলোনা বলে মানুষের চাচাতো, খালাতো ভাইবোন রূপেই রয়ে গেলো। অল্প অল্প করে পরিবর্তন ঘট্‌তে বহু যুগ কেটে যায়, তারপর এক জীব অন্য জীবে রূপান্তরিত হয়। মানুষ হওয়ার পূর্ববর্তী সব ধাপগুলোর খবর আমরা জানিনা (missing links)।

কিন্তু দৈত্য-দানবের কল্পনা কি মিথ্যে? পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্য, রূপকথায় দৈত্য বা দানবের কাহিনী দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, দৈত্য বা দানবের কল্পনা মিথ্যে নয়। সত্যিকার মানুষের আগে দৈত্য-দানব জাতীয় জীবের (জীনের) অস্তিত্ব ছিল। জাভা দ্বীপে এমনই এক অতিকায় মানুষের কংকাল পাওয়া গেছে। এই অতিকায় যে মানুষের কল্পনা করা হয় তাতে দেখা যায়, বিরাট তার চেহারা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ হাত, বিরাট বক্ষ, চোখ দুটি কুঁৎকুঁতে, গায়ে লোম, মাথায় বড় বড় চুল। কিন্তু কখনোই ষাট-সত্তর গজ বা হাত নয়, আজকালকার ৬-৬½ (ছয় থেকে সাড়ে ছয়) ফুট পর্যন্ত খুব উঁচু মানুষের তুলনায় বরং অতিকায়—এই ধরুন, সাত, আট, নয়, দশ ফুট-এর বেশী নয়। কাজেই পুরোনো কিস্‌সা-কাহিনীর গাঁজা অনেকখানি বাদ দিতে হয়

দৈত্য-দানবের অতিকায়িকতা সম্পর্কে। স্বভাবেও যে দৈত্য-দানব (জীন) হিংস্র ছিলো তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই দানবদের আর অস্তিত্ব নেই; বহু পূর্বেই তারা লুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন গেছে বিশালদেহী সরিয়ানরা। কোরআন হয়তো এ-সকলকে লক্ষ্য করেই বলেছেন।

فاهلكنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الا ولين

ফা আহ্‌লাক্‌না আশাদ্দা মেনহুম বাদশাঁ। অ মাজা মাছালোল আওয়ালিন

"আর আমরা ধ্বংস করেছি তাদের (তৎকালীন মানবদের) চেয়ে শক্তিশালীদের (সুবৃহৎদের), পূর্বেই গিয়েছে (সেই প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক) প্রাচীনদের দৃষ্টান্ত (মেছাল)"।—যুখরুফ ৮।

এবারে দেখা যাক, মানুষ এলো কোথা থেকে। প্রাইমেট থেকে নানা শাখায়, নানা দেশে নানা চেহারার মানুষ যারা হলো তারা গুহামানুষ। অনেক গুহা-গহ্বরে তাদের নিদর্শন আমরা পেয়েছি। পাথরের অস্ত্র তৈরী করতো এরা। গুহায় থাকতো। গুহা-গাত্রে ছবি আঁকতো, ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতো। সেটাই যেন ছিলো তাদের ভাষা। সে অদ্ভুত সুন্দর ছবি এখনও আছে।

এরকম গুহামানুষের নিদর্শন পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া গেছে। তাতে করেই বোঝা যায় নানা পরিবেশে নানা শ্রেণীর প্রাইমেট থেকে এই ক্রম-বিবর্তন। কারণ, এক শ্রেণীর থেকে আর শ্রেণীর চেহারা ও স্বভাবে ছিলো কিছু কিছু পার্থক্য। মধ্য এশিয়া, ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের গুহাসমূহে যে গুহামানুষের নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের এক কথায় নাম দেয়া হয়েছে নিয়াণ্ডারথ্যালম্যান। কিছুটা বেটেখাট জবুথবু গোছের গুহা-মনুষ ছিলো এরা। পশ্চিম ইউরোপের গুহামানুষের নাম ক্রোমাগন্যান। এরা ছিলো প্রায় ৬ (ছয়) ফুট লম্বা, বেশ বলশালী। চীনের পিকিংএর কাছাকাছি গুহায় পাওয়া গেছে সিনান-

থ্রোপাস অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক চৈনিক গুহামানবের নিদর্শন। দূর সমুদ্রদ্বীপপুঞ্জ সুমাত্রা জাভায় পাওয়া গেছে জাভা গুহা মানুষের পরিচয়। পূর্বেই বলেছি তারা ছিলো দৈত্যের মতো!

আফ্রিকার রোডেশিয়া অঞ্চলের চূনা পাথরের প্রাচীন গুহায় আর এক শ্রেণীর গুহা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের এক কথায় বলা হয়েছে রোডেশিয়ান গুহামানব। এছাড়া আফ্রিকার ট্যাংগানিকা অঞ্চলে পওয়া গেছে আনুমানিক কয়েক লক্ষ বৎসরের পুরনো গুহা মানবের নিদর্শন—নাম জিঞ্জান থ্রোপাস। এতে করেই প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশের কারনে আগপিছ ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে কিছুটা বিভিন্ন চেহারা খাছলতের গুহা মানবের উদ্ভব হয়েছে।

গুহা-মানবরা যে এক এক অঞ্চলে এক এক গুহায়ই কেবল বাস করতো তা-ও ষোল আনা সত্য নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে তারা গুহা হতে গুহান্তরে বসবাস করতে চলে যেতো। খাদ্যের খোঁজে তাদের এক এক দল আবার যাযাবর শিকারী হয়ে পড়েছিল। বিষম শীতের দাপটের সময়ে অবশ্য সবাই গুহায় আশ্রয় নিতো। কারণ, ঘরবাড়ী তো তখনও তারা বানাতে শিখেনি।

এ সব গুহামানুষ ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান হতে লাগ্‌লো। ধাপে ধাপে উন্নত হতে লাগ্‌লো। তখন তারা আর গুহামানুষ রইলোনা, যাযাবর শিকারীও সবাই রইলোনা। হলো মানুষ, যদিও অর্ধ সভ্য। গুহা-মানুষ-অবস্থায়ই তারা আগুন জালাতে, কাঁচা মাছ মাংস ছেড়ে আগুনে সেঁকে, কি আধ পোড়া করে' খেতে শিখেছিল। প্রস্তর দিয়ে প্রথমতঃ নানা ভোতা যন্ত্রপাতি (পুরনো প্রস্তর যুগ), পরে ধারাল, সুঁচালু যন্ত্রপাতি (নতুন প্রস্তর যুগ) বানাতে শিখেছিল। এখন লোহা তামা প্রভৃতি

ধাতব পদার্থ আগুনে গলিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র পাতি তৈরী করতে শিখ্‌লো (লৌহ-তাম্র যুগ)। শিখ্‌লো ঘর বাড়ী বানাতে, ভালো করে পশু পালন করতে, কৃষিকর্ম করতে। পশুর চামড়া আর গাছের বাকলের বদলে সূতোর বস্ত্রাদি তৈরী করতে শিখ্‌লো। কাজেই ঐ রকম নেংটি পরে' শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর দিন শেষ হলো। দস্তুর মতো গৃহবাসী হয়ে উঠ্‌লো মানুষ। যদিও ঐ গুহামানুষ অথচ শিকারী যাযাবর কোন কোন শাখারই হয়তো নিদর্শন রয়ে গেছে আজো অস্তিত্ব—জংলী মানুষ (অনার্য) মীরশিকারী, বেদে, বেদুইন প্রভৃতি নামে। তাও তো দিন দিন কমে আস্‌ছে।

জাগ্‌লো মানুষের একদা জ্ঞান স্পৃহা। ভিতরের প্রতিভা একদিন সৃষ্টি করেছিল যে মৌখিক ভাষা তা-ই ক্রমশঃ সৃষ্টি করে ফেল্‌লো লেখাপড়া। সৃষ্টি হলো স্বভাবতঃ জ্ঞান কর্ম—দর্শন, বিজ্ঞান। গড়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো ইমারত, নগর, কল কারখানা কতো কিছু, হলো সভ্য।

আর ছবি আঁকার ভিতর দিয়ে গুহা যুগে আপ্‌সেআপ প্রকাশ পেয়ে ছিল যে গুণ-কর্মের, সেই স্বভাবধর্ম ক্রমে ক্রমে রূপ নিল সুকুমার শিল্পে—Fine Arts এ—চিত্রকলা, নৃত্য-শিল্প, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে এবং সাহিত্যে—রূপকথা, পুঁথিকাব্য, পল্লীগাথা, মহাকাব্য, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে, পরিশেষে ছায়া ছবি শিল্পে: হলো সুসভ্য।

আসলে কতো লক্ষ, কি হাজার হাজার বৎসরের সঠিক কতো হাজার বৎসর লেগেছিল সভ্য মানব মানবী হ'তে, তা সঠিক বলা সম্ভবপরই নয়, এ সবই আনুমানিক কথা এবং সঠিক চুল-চেরা হিসাবও এ-সব ক্ষেত্রে আসল কথা নয়। আসল কথা হলো: এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার নানা স্থান কালের গুহামানব অতিপরবর্তীকালে মাত্র তিনটি মূল প্রধান সভ্য

মানব-জাতিতে পরিণত হয়। (১) এশিয়া ইউরোপের মধ্যবর্তী ককেশাস পার্বত্য চঞ্চলের অধিবাসী ককেশীয়, (২) মধ্য এশিয়ার মংগোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মংগোলীয় এবং (৩) আফ্রিকার নানা পার্বত্য গুহা অঞ্চলের নিগ্রো জাতি। কাল-ক্রমে এদের মধ্যে আন্ত-বিবাহ-শাদীর ফলে উৎপন্ন হয়েছিল প্রাচীন আর্য, দ্রাবিড়, সেমেটিক প্রভৃতি নানা সভ্যজাতির। আর অনেকটা আদিম অবস্থায় রয়ে-যাওয়া গুহামানব, যাযাবর মানব-গোষ্টিরই শাখা প্রশাখা অষ্ট্রিচ (কোল, ভীল, মুণ্ডা, গারো, সাঁওতাল, বেদে, বেদুইন, মীরশিকারী, নাগা, মিজো প্রভৃতি অনার্য জাতি) এবং আমেরিকার অষ্ট্রেলিয়া, কি অপরাপর দ্বীপ পুঞ্জের অর্ধসভ্য, অসভ্য মানব মানবী, এস্কিমো প্রভৃতি। দাস ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার অনেক নিগ্রো ধরে নিয়ে গিয়ে আমেরিকায় বিক্রয় করেছিল। তাঁদের চাষাবাদ ও অন্যান্য কার্যে ঔপনিবেশিক বণিকরা লাগিয়েছিল (সে অত্যাচার-কাহিনী আমেরিকার স্বনাম-ধন্যা নারী-লেখিকা 'মিসেস ষ্টো'র 'আংকল টম্‌স কেবিন' বই খানিতে দেখুন)। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের (বাদামী রঙের আদি আমেরিকা বাসীদের) সংগে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের এবং শ্বেতকায় ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, স্পেন, পর্তুগীজ, ইটালীয় প্রভৃতি ঔপনিবেশিকদের আন্তবিবাহ শাদীর ফলে আবার দুই মিশ্রজাতির উদ্ভব হয়েছে ও হচ্ছে।

সুতরাং সবাই ঐ বিভিন্ন গুহামানবজাতির স্থান কাল পরিবেশে রূপান্তরিত বর্তমান নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত সভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানবজাতি। বেহেশত থেকে পতিত-টতিত কোন মানব-মানবীর বংশধর-টংশধর আদৌ নন কেউ, তা' এখন পুরোপুরি বুঝুন এবং 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিজ্ঞান—বিবর্তন' ও 'বিবর্তন-মানব' প্রসংগদ্বয়ে তো সে আভাস আগেই ভালোরূপে পেয়ে গেছেন।

আজ দুনিয়ায় নানা দেশে নানা আবহাওয়ায় যে নানা মানুষ বাস করে, তারা এবং আমরা সকলেই এসেছি এক এক জোড়া আদিম সভ্য মানব-মানবী আদম-হাওয়া থেকে, বংশের
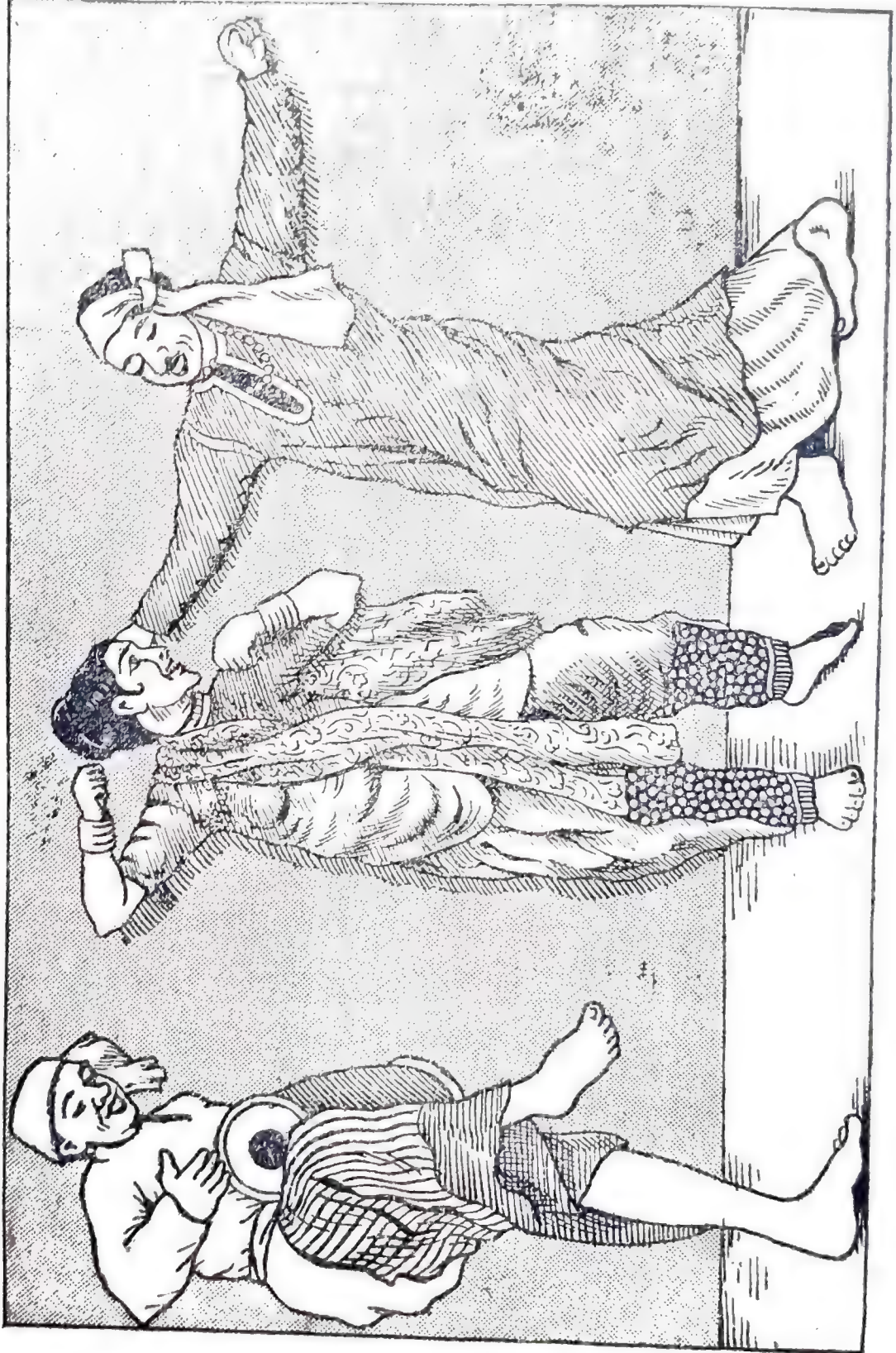
পর বংশ-ধারায়। এগিয়ে চলেছি সবাই আমরা। মানুষের অগ্রগতির পথ খোলা রয়েছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে।

কোর্‌আন

এখন আল-কোরআনের দৃষ্টিতে এই ক্রম-বিবর্তনের তত্ত্বটিকে বিবেচনা করে দেখা যাক। তবে আমাদেরকে পুনঃপুনঃ মনে রাখতে হবে যে, কোরআন নাজিল হয়েছিলো একটি ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা ও নব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে—প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো পুর্বতী সকল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংস্কার। সুতরাং নিছক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প হিসেবে আল্-কোরআনের আবির্ভাব নয় এবং নিছক দর্শন-বিজ্ঞান আল্‌কোরআনে খুঁজতে যাওয়া মোটেই কোরআন অনুধাবন করা নয়। শুধু আল্-কোরআন কেন ?—কোন ধর্মগ্রন্থই দর্শন-বিজ্ঞান শিল্প হিসেবে বিচার্য নয়। পূর্বের ধর্মগ্রন্থসমূহ কালপ্রবাহে অনেকখানি বিকৃত হওয়ায় সেগুলোতে কি ছিলো না ছিলো তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালেও সেগুলোর সার সংকলন বা মূলসূত্র আমরা পাই আল্-কোরআনে। এতে আমরা দর্শন-বিজ্ঞান শিল্পকলার অনুপম ইংগিত-ইশারা প্রসংগক্রমে পাই। অন্য যে-কোনো ধর্ম-গ্রন্থেই তা পুরোপুরি বা আংশিক অনুপস্থিত।—সৃষ্টি-রহস্য প্রবন্ধ ৩—৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

যে ক্রম-বিবর্তনের কথা আমরা বিজ্ঞান থেকে উপরে তুলে ধরেছি, তার সমর্থন আল্-কোরআনের এ ধরনের আয়াতে পরিস্কার পাওয়া যায় :

و الله انبتكم من الارض نباتا - ثم يعيدكم فيها و يخرجكم
اخراجا ٥ والله جعل لكم الارض بساطا ـ لتسلكوا منها سبلاً فجاجا ٥

আল্লাহু আনবাতাকুম মেনাল্ আরদে নাবাতা ছুম্মা ইয়ুয়িদুকম ফিহা অ ইয়ুখরেজুকুম এখরাজা।—অল্লাহু জায়ালা লাকুমুল আরদা বেসাতাল্লে তাছ্‌লুকু মেন্‌হা ছুবুলান ফেজাজা :

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে উদ্ভূত করেন মাটি থেকে উদ্ভিজ্জ রূপে, আবার ফিরিয়ে দেন তাতে এবং বের করেন তথা থেকে (প্রাণীরূপে) এবং ভূতলকে করেছেন তোমাদের জন্যে এক গালিচা —যাতে তোমরা বিচরণ করতে পারো ক্রমশঃ উন্নততর স্তরে"।—(নূহ ১৭-২০)

জড়-জগতের আব-আতশ-খাক-বাদ অর্থাৎ পানি-আগুন-মাটি বাতাস থেকে কিভাবে উদ্ভিজ্জ এবং পরে প্রাণী-জগতের আবির্ভাব, তারই ইংগিত-ইশারা পুরোপুরি এ আয়াতে রয়েছে। তাছাড়া এই জীবনপ্রবাহও যে ক্রমবিবর্তনশীল, তাও এতো পরিষ্কারভাবে বোধ হয় অপর কোন ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখিত নেই।

অন্য এক আয়াতে আছে:

و قد خلقكم اطواراً -

অ ক্বাদ খালাকাকুম আত্ওয়ারা

"আর নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের (ক্রমবিবর্তন) মাধ্যমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন"।—নূহ: ১৪।

কাজেই শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্বরকম ক্রমবিবর্তন বুঝানোই যে কোরআনের এ ধরনের আয়াতের উদ্দেশ্য, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। তবে বিজ্ঞান যেখানে মাত্র শারীরিক ক্রম-বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেয়, আল্-কোরআন সেখানে শারীরিক, মানসিক আধ্যাত্মিক সর্বরকমের অভিব্যক্তির ও বিবর্তনের আভাস দেয়—এই যা তফাৎ।

বলা বাহুল্য, আদম-হাওয়া অশরীরি স্বর্গে বা জান্নাতুল-ফেরদৌসে সশরীরে ছিলেন, এমন অবৈজ্ঞানিক অসম্ভব কিস্সা এ বৈজ্ঞানিক যুগে ভুলতে হবে। বরং আদম-হাওয়া যে জান্নাতে ছিলেন বলে' কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অশরীরি ফেরদৌস নয়। জান্নাত অর্থ বাগান, তেমনি এক বাগিচায় তাঁরা ছিলেন। এক এক আঞ্চলিক অসভ্য মানব-মানবী, যাদের কোরআন বলেছেন

জীন এবং অন্য ধর্মগ্রন্থ বলেছেন অসুর কি দৈত্য-দানব (giants), তাদের মধ্যে প্রথম বিবর্তিত সভ্য মানব-মানবীই আদম-হাওয়া। নতুবা রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে সেই অশরীরি আত্মিক অলৌকিক লোকে কি মানুষের বসবাস সম্ভবপর? তাহলে আর মৃত্যু কেন? রসূলুল্লাহর (সঃ) মতো সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকেই বা সেই জান্নাতুল-ফেরদৌস বা অশরীরি-লোকে যেতে মৃত্যুকষ্ট বরণ করতে হবে কেন? আর বিতাড়িত নাপাক শয়তান কি করে সেই পাক-সাফ জান্নাতুল-ফেরদৌসে পুনঃ প্রবেশপথ পায় ও ওয়াস্‌ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) দেয়? সুতরাং এ যে দুনিয়ার সুখ-শান্তিপূর্ণ জান্নাত—যেমন শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় স্থান, তেমনি মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় স্থান, বর্তমান কালের 'এডেন বন্দর', তা' বলাই বাহুল্য। আল্‌কোরআন তাকেই এ ক্ষেত্রে বলেছেন জান্নাতুল আদন। আর অসংযমী আচরন বা বদ রিপুর তাবেদারীই শয়তান। বদ্‌ রিপুর তাবেদারী করেই আদম-হাওয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয় এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাঁরা জীবিকা অন্বেষণে কষ্টকর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন—সে কথাই স্বর্গ-বিচ্যুতির রূপকে কোরআন, ইঞ্জিল ও তৌরাতে বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় তাঁরা আল্লাহ্‌র জিক্‌র-ফিক্‌রে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উরুজ (উন্নতি) লাভ করে, আল্লাহ্‌র আলোকে আলোকিত হয়ে শান্তি লাভ করেন। এ কথাই পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির রূপকে বর্ণিত হয়েছে; তা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি একটু নিবিষ্ট মনে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়ঃ

و اذ قال ربک للملائكة انی جاعل فی الارض خليفة - قالو آتجعل فيها من يفسد فيها و يسفک الدماء - و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك - قال انی اعلم ما لا تعلمون ٥

অ ইজ্‌ কালা রাব্বুকা লেল মালায়েকাতে ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফাহ্‌,—কালু আ তাজ্‌আলু ফিহা মা ইয়ুফছেদো ফিহা অ ইয়াছফেকো দেমাআ অ নাহনু নুছাব্বেহু বোহামদেকা অ নুকাদ্দেছো লাকা—কালা ইন্নি আ'লামো মালা তা'লামুন

"আর যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন : আমি দুনিয়ায় এক প্রতিনিধি বানাবো ; তারা (তখন) বললো : তুমি কি পৃথিবীতে এমন প্রতিনিধি (খলীফা) বানাবো যারা ফসাদ করবে ও রক্তপাত ঘটাবে ? আর আমরাই তো তোমার গুণগান করছি, তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। তিনি বললেন : আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" —বাকারা : ৩০।

কাজেই আদম-হাওয়ার ক্রমবিবর্তনের পূর্বে জীন বা অসভ্য মানব-মানবী বা বনমানুষ না থাকলে ফসাদ ও রক্তপাতের কথা ওঠে কি ক'রে ? কিন্তু সে সব অসভ্যদের মানুষ হিসেবে গণ্যই করা হয়নি।

و الجان خلقه من قبل من نار السموم -

অল জান্না খালাকনাহু মেন কাব্‌লো মেন্‌ নারুচ্ছামুম,

আর জীনদের আমি এর আগে বায়ুর আগুন দিয়ে বানিয়েছি। —হিজর ২৭।

সুতরাং জীনের এক অর্থ সেইসব মানব-মানবী, যাদের রিপুর উত্তেজনা এমনই প্রবল ছিলো যে বায়ু চালিত আগুনের সংগে তার তুলনা করা চলে, তুলনা করা হয়েছে। কথাটার আসল তাৎপর্য হলো নাফ্‌ছআম্মারা বা কুরিপুসমূহ বায়ু চালিত আগুনের মতো হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কুকর্ম ঘটায়, তাই ঐ তুলনা।

আদম হাওয়াই এ সব অসভ্য জীনদের মধ্যে প্রথম ক্রম-বিবর্তিত সভ্য মানব-মানবী হলেও * তাদের অন্তরেও স্বভাবতঃ লুকিয়ে ছিলো নাফছআম্মারা বা কুরিপু সমূহ ; একত্রে তাদের বলা হয়েছে, ব্যক্তিসত্তা দিয়ে (Personified করে) বোঝান হয়েছে

---

* চার্লস ডারউইনের (১৮০৯—১৮৮২) 'The origin of Spceies by Natural Sebction.' গ্রন্থে ক্রমবিবর্তনে (Variation) মানব বিবর্তন এবং হিউগো ডি ভ্রাইজের (১৮৪৮—১৯৮৫) 'The Mutation Theory of Evolution' অনুসারে আকস্মিক মানব বিবর্তন দেখুন।

'শয়তান'। হঠাৎ তার একটি অর্থাৎ কাম রিপুর অতি উত্তেজনায় তাদের যৌন পদস্খলন হয়, তার পরিণামের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি ['জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিবর্তন-মানব প্রসংগ দেখুন] মানব মানবীর বংশধারা রক্ষার জন্যও এর দরকার ছিলো। তারি রূপক বয়ান ঃ

فوسوس اليه الشيطن قال يادم هل ادلك على الشجرة الخلد و ملك لا يبلى -

ফা অয়াছ্‌অয়াছা এলাইহেশ্‌শায়তানো কালা ইয়া আদামো হাল আদুল্লোকা আলা শাজারাতিল্‌ খুল্‌দে অ মুলকেঁন লা ইয়াব্‌লা—

আর শয়তান (নাফছ আম্মারা) তাকে অয়াছ্‌অয়াছা দিলো সে বল্‌লো (খায়েশ জন্মালো), হে আদম। আমি কি তোমাকে স্থায়ী বৃক্ষ ও অশেষ রাজত্বের অদল (প্রতিদান, প্রতিফল) দিবো ?—তা-হা ১২০।

কাজেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ এবং তার ফল (গন্দম) কী তা এতোক্ষণে আরো পরিস্কার বোঝা গেলো। আর এও বুঝ্‌তে হবে ঐ 'আদমকে' এসবক্ষেত্রে লক্ষ্য করে বলা হলেও 'হাওয়াও' তার সংগে বিজড়িত। কারণ আদম এক্ষেত্রে মানব অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে ; আর মানব তো নরনারী মিলে'।

এর পর বংশ বৃদ্ধির ফলে—আর মাত্র বাগানের প্রকৃতির দান ফলমূল আহার করে নয়—চাষ আবাদ করে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল বলেও ঐ ফল (গন্দম) ভক্ষণ রূপকেও তা বলা হয়েছে।

কিন্তু বিবাহেতর অর্থাৎ সেই এক এক আদিম জমানার অতি অসংযমী অতি যৌনাচার নিশ্চয়ই ছিলো দোষণীয় এবং প্রাথমিক সভ্য মানব মানবীর পক্ষেও ছিলো এক প্রকার অপরাধবোধ, বিবেক দংশন যার রূপক স্বর্গ-চ্যুতি।

فدلهما بغرور - فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة - و ناداهما ربهما الم الهكما عن تلكما الشجرة و اقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين -

ফাদাল্লাহুমা বেগুরুরেন—ফালাম্মা জাকাশ্‌শাজারাতা বাদাত লাহুমা ছাও আতুহুমা অ ত্বাফেকা ইয়াখছেফানে আলাইহিমা মেঁ ওরাকেল জান্নাতে—অ নাদাহুমা রাব্বুহুমা আ লাম আনহাকুমা আনতিলকুমা শ্‌শাজারাতে অ আকুল্‌ লাকুমা ইন্নাশ্‌শাইতানা লাকুমা আতুব্বুম্ মোবীন

"সে (শয়তান বা কু-রিপুর কুমন্ত্রণা, নফসে আম্মারার অছঅছা) তাদের ভুলিয়ে ফেল্‌লো। যখন তারা সেই বৃক্ষের ফল আস্বাদন করলো, তাদের নিকটে তাদের গোপন স্থান বেরিয়ে পড়লো, আর তারা গাঁথতে লাগলো নিজেদের গায়ে বাগানের পত্র। তখন তাদের প্রভু তাদের ডেকে বল্‌লেন, আমি কি তোমাদের মানা করিনি ঐ গাছের নিকট যেতে [অতি যৌনাচারে, অতি সম্ভোগে বিভ্রান্ত হতে?] আরো কি বলিনি যে শয়তান (ঐ কুরিপু-সমূহ) তোমাদের স্পষ্ট শত্রু? আরাফ ২২।

يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما - انه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم - ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون -

ইয়াবানি আদামা লা ইয়াফতেনোন্নাকুমুশ্‌শায়তানু কামা আখ্‌রাজা আবাওয়ায়কুম মেনাল জান্নাতে ইয়ানজেয়ু আনহুমা লেবাছাহুমা লেইয়ুরিহুমাছাওআতেহিমা—ইন্নাহু ইয়ারা কুম হুয়া অ কাবিলুহু মেন হায়ছো লা তারাওনাহুম—ইন্না জাআলনাশ শায়াত্বিন আওলিয়া লেল্লাজিনা লা ইয়ুমেনুন

"হে আদম-সন্তান, শয়তান যেন তোমাদের বিপদে না ফেলে, যেমন সে তোমাদের (আদিম) মা-বাপকে জান্নাত (ঐ বাগানের ফলমূলাহারী সুশান্তি ও মানসিক সুখ-শান্তি) থেকে বের করেছিল। (কি ভাবে?) খুলে ফেলেছিল তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ (পুনঃপুনঃ)

এবং দেখিয়েছিল তাদের গোপন স্থান। তিনি তোমাদের দেখেন— তিনি এবং তার (গায়বী) দলবল—এমন স্থান থেকে যে তোমরা দেখতে পাওনা। আমি শয়তানদের (কুরিপু সমূহ) করেছি কাফেরদের (অবিশ্বাসী অপকর্মকারীদের) বন্ধু।"—আরাফ ২৭।

সুতরাং উপরোক্ত বেহেশ্ত-চ্যুতির এমন পরিষ্কার বয়ান থাকার পর অশরীরি বেহেশ্ত-চ্যুতির কষ্টকল্পনা নিরর্থক ও নির্বুদ্ধিতা।

و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى باسماء هاؤلاء ان كنتم صادقين ہ قالوا سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا - انك انت العليم الحكيم ہ قال يا آدم انبئهم باسمائهم - فلما انباهم باسمائهم - قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السماوات و الارض - و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون ہ و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس - ابى واستكبر و كان من الكافرين ہ

অ আল্লামা আদামাল আছমা আ কুল্লাহা— ছুম্মা আরদাহুম আলাল মালায়েকাতে ফাকালা আম্বেয়ুনি বে আছমায়ে হাউলায়ে ইন্ কুনতুম ছাদেকীন—কালু ছোবহানাকা লা এল্মা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা—ইন্নাকা আনতাল আলীমুল হাকিম—কালা ইয়া আদামো আম্বে হুম বে আছমায়ে হিম—ফালাম্মা আমবাআহুম বে আছমায়েহিম কালা আ লাম্ আকুল লাকুম ইন্নি আ'লামো গায়বাচ্ছামাওয়াতে অল আরদে অ আলামো মা তুবদুনা অ মা কুন্তুম তাকতুমুন—অ ইজ কুলনা লিলমালায়েকাতেস্জুদু লে আদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস—আবা অ আছ্তাক্বারা অ কানা মেনাল কাফেরীন

"আর, তিনি আদম (-হাওয়া) কে সব নাম শিখালেন, তা সব ফেরেশতাদের কাছে পেশ করে বললেন, যদি তোমরা সঠিক জানো তবে এদের নাম বলোতো! তারা বল্লো: সব মহিমা তোমার—তুমি আমাদের যা শিখিয়েছো তা ব্যতীত আমাদের জ্ঞান নেই, নিশ্চয়ই তুমি জ্ঞানী, বিজ্ঞানী। তিনি বল্লেন, হে আদম! তুমি এদের এ-সকলের নাম বলে দাও। যখন আদম তাদের নাম বলে দিলো, তিনি (আল্লাহ্) বল্লেন: কেমন! আমি তোমাদের বলিনি যে, আসমান-জমীনের সব গায়েব (গূঢ় রহস্য)

আমি জানি, অবশ্য তোমরা যা জাহির করো কিংবা বাতেন রাখো তাও আমি জানি। কাজেই আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, সেজদা করো আদম-ওয়াস্তে' তারা সবাই সেজদা করলো, কিন্তু ইবলিস (করলোনা) ; সে অস্বীকার করলো, অহংকার করলো ও কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেলো।"—বাকারা ৩১-৩৪।

আসল কথা ঐ অধ্যাত্ম গুণ ও জ্ঞান, যাকে 'নাম'-রূপকে বলা হয়েছে, তা অনুধাবন হাল-হকিকতেই আদম-হাওয়ার আবির্ভাব ও ক্রম-বিবর্তন। আর ফেরেশতা এখানে কোন অশরীরি আত্মা নয়, বরং আদম-হাওয়ার অন্তস্থ অধ্যাত্ম উন্নতি (উরুজ)-পরায়ণ সৎগুণ-জ্ঞানাবলী। আর শয়তানও বাইরের কোন অশরীরী জীন বা অসভ্য জীব নয়, বরং অন্তর্নিহিত কু-রিপুসমুহ। হাকিকত হলো এই যে, কু-খাসলত সু-খাস্‌লতের অধীন থাকবে, তাহলে মিলবে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শান্তি, ঘটবে ক্রম অধ্যাত্ম উন্নতি (উরুজ) ও পরিণতি মে'রাজ। আর কু-খাস্‌লত যদি সু-খাস্‌লতের অধীন না থাকে অর্থাৎ শয়তান যদি ফেরেশতার অধীনতাপাশ ছিন্ন করে' বেয়াড়া-বেহদ হয়ে পড়ে, তখনই শুরু হয় অধ্যাত্ম অধঃপতন বা স্বর্গবিচ্যুতি। এ অবস্থায় আবার ঐ নাম বা পরাগুণ-জ্ঞান হাসিলে আসে পূর্ণ মুক্তি (শান) পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তি—এমনি উত্থান-পতন, পতন-উত্থানের রহস্যই এ-ধরনের আয়াতে রূপকের মাধ্যমে কখনো কখনো ঐরূপ অশরীরি বিষয়বস্তুকে শরীর দিয়ে অর্থাৎ personified করে' বোঝান হয়েছে। শরীরী আদম-হাওয়া বানব-মানবীর অন্তস্থ অশরীরি চিরন্তন কায়ফিয়াৎ বা কারবার এভাবে কোরআনে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং ক্রম-বিবর্তনে মানবের যে ক্রম-সভ্য হবার হাল হাকিকত আমরা দেখিয়েছি, মানব-হিসেবে জীন বা অসভ্য খাছলত থাকে তার ভেতরেই লুক্কায়িত। কেননা, মানুষের আবির্ভাব সে স্তর থেকেই। সুতরাং পতনও একটা স্বাভাবিক পর্যায়, উত্থানও আবার তাই-ই। এরকম পতন-উত্থানের ভেতর

দিয়েই শুরু অধ্যাত্ম পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, ক্রম আত্ম উন্নতি এবং পরিণতি একদা পুনঃ পরমাত্মায় গিয়ে পৌঁছানো (মে'রাজ) অর্থাৎ যেখান থেকে আগমন সেখানেই প্রত্যাবর্তন করে' একান্ত একাত্ম হওয়া। এরই আর এক নাম তৌহিদ অর্থাৎ একত্ব-বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিণতি।

'কেবল ফিরিশতারা সিজ্‌দা দিল, কিন্তু শয়তান দিল না' ইত্যাকার কথা আরেকটু খোলাসা হওয়া দরকার।

এরপর 'মাজমা-উল-বাহারায়েন' প্রসংগে দেখতে পাবেন একটি প্রকৃত ছহি হাদিছ : تخلقوا باخلاق الله (তাখাল্লকু বে-আখ্‌লাকিল্লাহ্)—আল্লহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও। আল্লাহর চরিত্র কী ? তা যে তাঁর সৎগুণ ও জ্ঞানাবলি তা উপরোক্ত ঐ প্রসংগে পুরোপুরি দেখতে পাবেন। সম্ভবপর মতো সেই সৎ ও মহান গুণ ও জ্ঞানাবলিতে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করাই ঐ হাদিছের মর্ম, তা আশা করি বুঝতে পারছেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ঐ চরিত্র অর্থাৎ সৎগুণ ও জ্ঞানাবলী ফেরেশতা রূপকে এবং তার অন্তরায় কুরিপুগুলি শয়তান রূপকে বর্নিত হয়েছে, তা আগেও বলেছি। এখন ঐ গুণ ও জ্ঞানাবলি যখন আল্লাহর ঐ গুণ ও জ্ঞানাবলির অনুরূপ হয়, উপরোক্ত হাদিছের মর্ম-মূলে তখন তা হয় প্রকৃত সেজদা বা সেজদার রূপকে তা বর্নিত। আবার ঐরূপ কুরিপুর তাবেদারীতে তা যখন হয় না, তখনই আসলে আল্লাহর মানব-সৃষ্টির ঐ মূল উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। সেই কথাই শয়তান অস্বীকার করলো অর্থাৎ আল্লাহকে মানলোনা (ابى—আবা) এবং অহংকার করলো অর্থাৎ অগ্রাহ্য করলো ঐ গুণ জ্ঞান হাছেলকে (استكبر আছ্‌তাক্‌বারা) এই দুই রূপকে বলা হয়েছে।

'শয়তান কাফিরদের অন্তর্গত হলো' কথাটার তাৎপর্য তা হলে অতি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বর্নিত সময়ের তথা সব সময়ের অসভ্যতা ঐ জীন খাছলত। ঐ অসভ্যতা অর্থাৎ জীন

(শয়তান) খাছলতই আসলে প্রকৃত কুফরী এবং উক্ত জীন অর্থাৎ অসভ্যরাই তো কাফির। শয়তান অর্থাৎ কুরিপুর তাবেদারীতে, কুখাছলতে মানুষের অনুরূপ পর্যায় প্রাপ্তিই 'কাফেরদের অন্তর্গত হওয়ার' রূপকে বলা হয়েছে *

এর আগের দুই আয়াতের মাধ্যমে দেখেছেন আদম হাওয়ার অনুরূপ পতন-মাধ্যমে সেই স্বর্গীয় সুখ-শান্তি সাময়িক হারানোর কাহিনী অর্থাৎ স্বর্গ-বিচ্যুতি (Paradise Lost)। এ আয়াতে দেখুন সে অবস্থা মানুষ যে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে, সেই হালহাকিকতে যে মানুষের পয়দায়েশ সেই স্বর্গ পুন প্রাপ্তির (Paradise Regained) কাহিনী। তখন আল্লাহ্‌র সংগে অর্থাৎ পরমাত্মার সংগে আত্মার, পরম পুরুষের সংগে পরমাপ্রকৃতির পুনর্মিলন হয় বলেই আল্লাহ্‌ ঐ 'আমি তোমাদের বলিনি যে আছ্‌মান জমীনের সব গায়েব (গূঢ়-রহস্য) আমি জানি, অবশ্য তোমরা যা জাহির করো, কি বাতেন রাখো তা-ও জানি' প্রভৃতি কথায় সে গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত কর্‌ছেন। তাৎপর্য হলো ঐ অধ্যাত্ম সংগুণ জ্ঞানাবলি [কাশফ, কেরামত, মোজেজা, ভবিষ্যৎ কথন প্রভৃতি আকারে] ঐ রকম অতি-মানব, মহামানবের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়লেও তা আসলে ঐ আল্লাহ্‌রই আত্ম প্রকাশ, আল্লাহ্‌রই মানবসমাজে ঐ অধ্যাত্ম স্ফুলিংগরূপে প্রকাশ, যেমন পাওয়ার হাউজ বা ডাইনামোর বিদ্যুৎ তরংগের অজস্রতার খানিকটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে বাল্‌বের মাধ্যমে বিজলি-বাতিতে। তা-ই আদম-হাওয়া প্রকাশ করলেও আল্লাহ্‌রই সে গুণজ্ঞান— জাহের (প্রকাশ্য) ও বাতেন (গোপন) মহাগুণজ্ঞান বলে'— আল্লাহ্‌ ঐ দাবী কর্‌ছেন। রহস্যটা বুঝুন।

কাজেই ফেরেশতাদের সেজদা দেওয়া অর্থাৎ আল্লাহরই ঐ

---

* 'ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার ১৯৬৩ জানুয়ারী—মার্চ' সংখ্যায় 'আল কোরানের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ' নামে প্রকাশিত।

সংগুণ জ্ঞানাবলি সম্ভবপর মতো আয়ত্ত করার কথা বলার সংগে সংগে, শয়তান অর্থাৎ কুখাছলত, কুরিপুগুলো যে এর অন্তরায়, তার সংগে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম দরকার হয়েছিল, হয়ে থাকে, তাও ইবলিসের অর্থাৎ শয়তান তথা কুরিপুগুলোর না-মানার, নস্যাৎ করার কাহিনী তুলে' মানবকে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

অধ্যাত্ম বিবর্তন

ইস্‌লাম دين الفطرت (দীনোল ফিতরাত)—ফিতরাতের (প্রকৃতির) ধর্ম। কথাটার তাৎপর্যও এ ভাবে পরিস্কার হয়ে যায়। ফিতরাত (প্রকৃতি) দু'রকম (ঃ) (i) فطرت السئى (ফিতরাতু-চ্ছাইয়া)—মন্দ প্রকৃতি এবং (ii) فطر الحسن (ফিতরাতুল হাছানা)—সৎ প্রকৃতি। উভয়ই জড় জীবনের ভিতর দিয়ে মূলতঃ আল্লাহ্‌র ঐ আখলাক বা ফিতরাত থেকে এসেছে; যথা ঃ

فطرت الله التى فطر الناس عليها

ফিতরাতাল্লাহে আল্লাতি ফাত্বারান্নাছা আলাইহা

আল্লাহ্‌র প্রকৃতি যার থেকে, যৎ-মাফিক মানব-প্রকৃতি গঠিত (উদ্‌ভূত)— রুম, ৩০।

কিন্তু আল্লাহর মধ্যে ভালো মন্দ বিভাগ বলে' কিছু আছে কি? নেই। কেন নেই সেটা বোঝা দরকার।

هو الاول والاخر و الظاهر والباطن

হু আল আউয়ালো অল আখেরো অজ্জাহেরো অল বাতেনো—

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ, তিনিই গোপন।—হাদিদ্‌ ৩। সেই একই আদি অকৃত্রিম অবস্থায় যেমন তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন, তেমনি মহাবিশ্বও তারি বহিঃপ্রকাশ, যেনো তার শরীর, এবং গোপন অজুদ (অস্তিত্ব) বা পরমাত্মিক, পরমার্থিক প্রকাশও তাঁরি।

এ কারণে সব কিছু তাঁর ইচ্ছাধীন এবং এক ভারসাম্যে সম্পুর্ণ, সর্বজ্ঞতায় স্বস্থ। কাজেই, কাম (মানবিক ব্যভিচার বাসনা, কখনো কখনো তা-ই করা) সেখানে কাম নয়, প্রেম। ক্রোধ সেখানে ক্রোধ নয়, প্রয়োজনে মানুষের সংশোধন, কি প্রকৃতির প্রয়োজনীয় ওলট পালট ওয়াস্তে কখনও, কদাচিৎ গজব প্রকাশ। লোভ আর সেখনে লোভ নয়; স্রষ্টা পলয়িতা হিসাবে মানব, কি প্রকৃতির যে কোন বস্তু বা প্রাণীর কল্যাণ কামনা ও কল্যাণ সাধন। মোহ সেখানে অন্ধ মায়া নয়, প্রয়োজনে গুণী, জ্ঞানী, কি অন্য সৃষ্টির প্রতি স্নেহ, অনুকম্পা (রহমত) প্রদর্শন। মদ সেখানে অহংকার নয়, প্রয়োজনে আত্ম-সৃষ্টি-কৃষ্টি-প্রলয়-প্রতিভা সম্পর্কে মানব সাধারণকে ওয়াকেবহাল করা। এবং মাৎসর্য (পরশ্রীকাতরতা, পরের ভালো দেখ্তে না পারা, মন্দ করার ইচ্ছা, কখনো কখনো তাই করা) আর মাৎসর্য নয়, বরং আত্ম পরিচয় প্রদানের খাতেরে গুণ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কিন্তু বলেছি আল্লাহ্‌র ঐ প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি মানবে এসেছে জড় ও নিম্নস্তরের জীবনের ভিতর দিয়ে [জবাব [১] এর ৬৯, ৭০ পৃষ্ঠাও পুনঃ দেখুন)। মূলতঃ যদিও আল্লাহ্‌ মানব সৃষ্টি করেছেন আপনার প্রকৃতিতে যেমন (পূর্বের ফিতরত অর্থাৎ প্রকৃতির আয়াত পুনঃ দেখুন) তেম্‌নি ঐ প্রতিকৃতিতে:

خلق الله آدم علىٰ صورته

খালাকাল্লাহু আদামা আলা ছুরাতিহি—

আল্লাহু আদমকে (মানব-আকৃতিপ্রকৃতি) বানিয়েছেন তার প্রতিকৃতিতে (নূর ঐশ্বর্যে)।—হাদিছ। তবু মানুষে ঐ প্রতিকৃতি বিভিন্ন জড়, জীবনের ভিতর দিয়ে মাটির দেহে আসতে গিয়ে সেই আব (পানি) আতশ (আগুন), খাক (মাটি), বাদ (বায়ু) তাছিরে বিকৃত। আল্লাহর ঐ দুই প্রকৃতির একটি ঠিকই আছে, তা ফেতরাতুল হাছানা—সুপ্রকৃতি; দ্বিতীয়টি আল্লাহর মধ্যে (অস্তিত্বে)

যে-রকম সে-রকম ইচ্ছাধীন কিংকর তুল্য আর রয়নি, মানবের বেলা ফেত্‌রাতুচ্ছাইয়া—মন্দ প্রকৃতি হয়ে গেছে। তারি উপরোক্ত মোটামুটি প্রধান ছয় রকম বদ কায প্রকাশ পায় বলে' বাংলায় বলে' ষড়রিপু, আরবীতে ওর রকমফেরে হয় দশ, তা এই :

হাছাদ (প্রতিহিংসা), বোগজ (মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা), কীনা (ক্রোধ, গজব, কাহর, শত্রুতা), কেজব (মিথ্যা মায়া-মোহ-সমূহ), কেবর (ওজব, মদ, অহংকার) শহবত (কামরিপুর রকমারি উত্তেজনা) হের্‌ছ্‌ (লোভ-লালসা, ঐ কারণে বোখল বা কৃপণতা), তাম্‌মা (দুরাকাংখা, দুশ্চিন্তা, দুঃশীল অশ্লীল চিন্তা, চিত্ত বিকারাদি), রিয়া (লোক দেখানো এবাদত-রিয়াজত—ভণ্ডামী যণ্ডামী), গীবৎ (পশ্চাতে পরনিন্দা)।

এগুলোকেই আল কোরআন এককথায় নাফছ আম্মারা বলেছেন :

انا النفس لا مرة بالسوء الا ما رحم ربی

ইন্না ন্নাফ্‌ছা লা আম্মারাতুম বেচ্ছু্‌য়ে ইল্লামা রাহেমা রাব্বি

নিশ্চই নাফছ আম্মারা বদকায করায়, যাঁদের আমার প্রভু রহমত (দয়া) করেন তাঁদের ছাড়া—ইউছুফ ৫৩। বলাচ্ছেন হযরত ইউছুফের (আঃ) মুখ দিয়ে আল্লাতালা। কারণ, হযরত ইউছুফ (আঃ) মিশরের প্রধান মন্ত্রী আজিজ মিছিরের অনুপম রূপ লাবণ্যবতী স্ত্রী জোলায়খার শত ফুস্‌লানিতেও আল্লাহর ইচ্ছায় তার কামরিপু চরিতার্থ করা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন।

সাধনায় এই নাফ,ছ আম্মারা (ষড় রিপু) উন্নত হলেই হয় নাফছ লাওয়ামা। তখনকার কথা এই :

لااقسم بيوم القيمة - و لا اقسم بالنفس اللوامة

লা উক্‌ছেমু বেইয়াওমুল ক্বিয়ামাহ-অলাউকছেমু বেন্নাফছে লাওয়ামাহ্‌

(আল্লাহ বল্‌ছেন) আমি কিয়ামত দিবসের কছম করছি আর নাফ্‌ছ লাওয়ামার কসম করছি।—কিয়ামত। কিয়ামতের সংশ্রবে নাফছ লাওয়ামা বলার তাৎপর্য হলো : মৃত্যুর পর যে আত্মার

হিসাব নিকাশের জন্য পুনরুত্থান, তাই কিয়ামত (দ্রঃ 'সৃষ্টি রহস্য' পৃষ্ঠা ৭-১৩) তেমনি মানুষের আত্মার ঐ আব আতশ খাক বাদের তাছিরে নাফছ আম্মারায় হয় পতন, তারি প্রথম উত্থান ঐ নাফছ লাওয়ামা। তখন নাফ্‌ছ আম্মারার তাবে হঠাৎ পাপ কার্য করে ফেল্‌লেও অনুতাপের অন্ত থাকে না। এজন্যই তখনকার আত্মার কায়ফিয়াৎ (হাল) নাফ্‌ছ লাওয়ামা অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারী, তিরস্কার কারী আত্মা। পাপের পরক্ষণেই ঐ আত্মা করে জবর ভর্ৎসনা, চার্জ কেন পাপ করলো তার, ফলশ্রুতি হয় অনুতাপ—সুতরাং এ অনুতাপী আত্মা আর এ ধরণের অনুতাপের নামই তাওবাতুন্নাছুহা—শুদ্ধ সরল অন্তঃকরণের তওবা (অনুতাপ)। আর তা ষড়রিপুর সংগে আভ্যন্তরীণ লড়াইও বটে। এজন্যই রছুল (স) বলেছেন: আশাদ্দোল জেহাদে জেহাদোল হাওয়া—শ্রেষ্ঠ জেহাদ রিপুপ্রপঞ্চের (সমূহের) সংগে যুদ্ধ—জেহাদে আকবর। আর বাহিরের ব্যবহারিক ধর্ম শরিয়ত, দেশ, জাতীয় স্বার্থাদি রক্ষার্থ যুদ্ধ জেহাদে আছগর—ছোট খাট ধর্ম যুদ্ধ।

আরো উন্নতিই নাফ,ছ মুৎমায়েন্না

يا يتها النفس المطمئنة ار جعى الى ر بك راضية المرضية - فادخلى
فى عبادى وادخلى جنتى -

ইয়া আইয়াতোহান্নাফছোল মুৎমায়েন্নাতুরজি এলা রাব্বেকা রাজিয়াতাম মারজিয়াহ্‌ —ফাদখুলি ফি এবাদি অ আদখুলি জান্নাতি—

হে নাফ্‌ছ মুৎমায়েন্না (পুরো শুদ্ধির কারণে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা) তুমি তোমার প্রভুর (আল্লাহর) পানে ফিরো, [আর তিনিও তোমার দিকে ফিরেন], তিনি তোমার উপর খুশী, তুমিও তার উপর খুশী, অতএব আমার খাস বান্দাগণ (পয়গম্বর অলি, আবদাল, গাউছ-কুতব) - মধ্যে স্থান লাভ করো। এবং (জেন্দায় মওতে) জান্নাতে (সুখশান্তিময় ধামে) দাখেল হও।—ফজর ২৭-৩০।

কাজেই আল্লাহর সংগে বান্দার, তথা পরমাত্মার সংগে আত্মার একটা নীবিড় নিগূঢ় যোগাযোগ হয়ে পাপ তাপের সংগে লড়াইতে

(জেহাদে আকবরে) পূরো জিতে গিয়ে তার উর্ধে পুরো শুদ্ধি শান্তি-শান-প্রাপ্ত আত্মা, তা বোঝাই যায়। রিপুগুলি তখন ঐ জেহাদে আকবরে পুরো পরাস্ত হয়ে আয়ত্তাধীন হয়েছে, কিংকরতুল্য প্রয়োজনীয় মহৎ হুকুম বরদার, কি বন্ধু হয়ে সৎ ও মহৎ প্রেম-প্রেরণা ও তদনুগ কার্যের সহায়ক হয়েছে।

এই অবস্থা কায়েম দায়েম হলেই হয় নাফছ মুৎমায়েন্না—

والنفس و ما سوها فالهمها فجورها و تقوها

অন্নাফছে অ মা ছাওয়াহা ফাআলহামাহা ফাজুরাহা অ তাকওয়াহা—

আর নাফছ (লাওয়ামা, মুৎমায়েন্না) যা তাকে (মানুষকে) সুন্দর সুশোভন করে (কারণ পূর্ণশান্তি লাভ হয়) তখন পাপপুণ্য এলহাম (অনুপ্রেরণা) দান করি।—শাম্‌ছ্‌ ৭—৮। অর্থাৎ কোনটা পাপ সুতরাং পরিত্যাগ করতে হবে, আর কোনটা পুণ্য, সুতরাং করতে হবে তা তিনি তার প্রিয়তম রহমানুর রাহিমের তরফ থেকে এল,হাম (অনুপ্রেরনা)—যোগে জেনেশুনেই করে' যান। সুতরাং সাধারনের গণ্ডির পাপ-পুণ্য বিচারের উর্ধে।

বাংলা তৎসম প্রতিশব্দে ঐ নাফ্‌ছআম্মারাই (ষড়্‌রিপুই) তমোগুণ। তমঃ অর্থ অন্ধকার—অধার্মিকতা, অজ্ঞানতা ও পাপের অন্ধকার। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে : তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকার হতে, হে প্রভু, আমাদের আলোকে নিয়ে চল। কোরআনে বলা হয়েছে : রাব্বানা আতমেম লানা নুরানা—হে আমাদের প্রভু! আমাদের আলো (ক্রম) পূর্ণ করো (তাহ্‌রীম ৮)। আরো বলা হয়েছে : রাব্বি জেদ্‌নি এল্‌মান—প্রভুহে! আমার জ্ঞান ক্রম বাড়াও (তা-হা ১১৪)। অ হাবলানা মেল্‌ লাদুনকা রাহমাতান—এবং তোমার খাস তরফ থেকে রহমত দাও (আলে এমরান ৭)।

ঐ নাফ্‌ছ লাওয়ামাই তাহলে বাংলা তৎসম প্রতিশব্দে রজোগুণ—ঐ জ্ঞানের আলো কিছুটা জ্বলেছে; অজ্ঞানতা কিছুটা দূর হয়েছে; আল্লাহ্‌র রহমত (দয়া, দান) কিছুটা অংকুরিত হচ্ছে; ফলে তমোগুণ ঐ নাফ্‌ছ্ আম্মারার তাবে কখনো কখনো পাপ কায করে ফেল্‌লেও অনুতাপের অন্ত থাকেনা। কিন্তু পূন্যকায করে সে প্রতিফলের, পুরস্কারের আশায় এবং তা বেশ প্রচার প্রকাশনার অবকাশ, অভিলাষ রয়েছে।

এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই হওয়া যাবে নাফছ মুৎমায়েন্না —বাংলা তৎসম প্রতিশব্দে সত্তগুণ। তখন কোন প্রতিদান আশায়, পুরস্কার প্রত্যাশায় নয় বরং পরমাত্মার প্রেমেই আত্মা সদা সত্য কথা বলে, সৎকার্য করে, ফলে অন্তরে অনাবিল শান্তি প্রবাহিত হয়।

কিন্তু এরও অতীত অবস্থা আছে, তা আরবী ঐ নাফছ মুলহেমা, বাংলা তৎসম প্রতিশব্দে ত্রিগুণাতীত অবস্থা; অর্থাৎ পরমাত্মার এলহাম তথা প্রেম-প্রেরণায়ই মাত্র তিনি চলেন। প্রেমময়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা, তাঁর অহরহ আদেশ নিষেধেই তার ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত, নির্বাচিত।

فوجه عبد من عبادنا اتينه رحمة من عندنا و علمنه من لدن علما ـ

ফা অজাদা আব্‌দাম মেন এন্‌দেনা আতায়নাহু রাহ্‌মাতাম মেন ইন্‌দেনা অ আল্লামনাহু মেললাদুননা এল্‌মা

এর পর তারা (মুছা আঃ ও তার সংগী) আমাদের ভক্ত-দের মধ্য থেকে এক ভক্তকে পেলেন। তাঁকে আমরা আমাদের খাস তরফ থেকে দিয়েছিলাম রহমত (দয়া) এবং আমাদের খাস তরফ থেকে জ্ঞান (এল্‌মেলাদুন—হাকিকত-মারেফাত, ঐ নিয়ন্ত্রন, নির্বাচন)।—কাহফ ৬৫।

মাজ্‌মা-উল্‌-বাহ্‌রায়েন

তাহলেই খাজা খিজির কোন ব্যক্তি বিশেষ নন, যুগ যুগ যারা আল্লাহ্‌র আবেহায়াত (প্রেমামৃত বারি) পুরোপুরি পান করে'

অধ্যাত্ম অমরতা লাভ করেন তাঁরাই খাজা খিজির বা চির-সবুজ। সেই অতীত জমানার এমন এক মহাপুরুষের ছোহবতে অধ্যাত্ম গুণ, জ্ঞান শান—হাকিকত-মারফত—হাছিল করতে গিয়েছিলেন হযরত মুছা (আঃ), সংগে ছিলো এক নওকর। তাদের মাছ সমুদ্রে চলে যায় আর সেই মাজমা-উল্-বাহ্রায়েন বা সাগর-সংগম-স্থলে উপরোক্ত মহাপুরুষের সন্ধান মিলে। তাৎপর্য হলো ঃ জেছমানী ও রুহানী অর্থাৎ শারীরিক (মানসিক) আধ্যাত্মিক (শরিয়ত মারেফাত) সফরের কাহিনীই বর্নিত হয়েছে মাজমা-উল্-বাহ্রায়নে অর্থাৎ দুই সাগর সংগম উপলক্ষ্য করে'। আর মাছ যেমন সেই কালের উপযোগী নৌকা বা ভেলার সংগে দড়ি দিয়ে বেঁধে' পানিতে ঝুলিয়ে রাখা অবস্থা থেকে পলায়ন করলো, তেমনি শরা-শরিয়তের সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় আকল উর্ধে অতীন্দ্রিয় লোকেই মিলে অসাধারনত্ব, অবিনশ্বরত্ব, অমরত্ব। জাহের শারীরিক সফর আর মাছ পলায়ন অম্নি বাতেন অধ্যাত্ম সফর সংগে অংগাংগী জড়িত। এবং অতিমাত্রা সংসার আসক্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিই ঐ নওকর। মাছ বা বৈষয়িক ব্যাপার-বুদ্ধি চলে' যাওরার ফলেই যে আসল স্থান এবং সময় এসেছে তা' সে বুঝ্তে পারে না, এবং ঐ সাংসারিক বিষয় বস্তুই তার কাছে চরম পরম বিধায় ও-কে হারানো তার পক্ষে, তার মতে শয়তানের ওয়াছওয়াছার সামিল, তাই

و ما انسنيه الا الشيطان

অ মা আন্ ছানীহু ইল্লাশ্ শায়তানো

আর শয়তান ছাড়া এটা আমাকে কে বল্তে ভুলিয়েছিল' ইত্যাকার কঠিন মন্তব্য করতেও বাঁধেনা।

কিন্তু সেই মহাপুরুষ তো সহজ ব্যক্তি নন। তিনি প্রথমতঃ মুছাকে (আঃ) সংগে নিতে রাজি হন্নি, কেননা মুছা (আঃ) তখনও নিছক নবুয়ত (১) বা শরিয়ত-স্তরের লোক, সুতরাং আসল রহস্য বেলায়তি (আল্লাহ্র বন্ধুত্ব লাভে) (২) এল্হাম কাশফের

(১), (২), এর পরে 'বেলায়ত নবুয়ত' প্রসংগ পড়ে ভালো করে বুঝুন।

কারবার বুঝতে পারবেন না। তবে শেষমেশ রাজি হলেন এই শর্তে যে মুছা (আঃ) যা দেখ্‌বেন তাতে উচ্চবাচ্য করবেন না। কিন্তু যে-নৌকায় তাঁরা নদী পার হলেন তাই ফুটা করে' দেয়ায় 'যাত্রীদের ডুবিয়ে মারার অপকৌশল' বলে মুছার (আঃ) ঘোরতর আপত্তি, ফলে ছাড়াছাড়ি হবার যোগাড়। বলে-কয়ে মুছা (আঃ) আবার সংগ নিলেন। পথে খেলা-রত এক কিশোরের শির দ্বিখণ্ডিত করায় 'এক নির্দোষ নিষ্পাপ লোককে খুন' বলে' মুছার (আঃ) পুনঃ দোষারোপ, পুনঃ ছাড়াছাড়ি হবার পালা। পুনঃ কাকতি মিনতি করে মুছার (আঃ) সংগে গমন। এক জন-পদে পৌঁছে কোন বাড়ী খানাপিনা না পেলেও ওর এক পোড়ো-পোড়ো দেয়াল খিজিরের (আঃ) সেরে যাওয়া, মুছার (আঃ) মজুরী গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাব। খিজির (আঃ)-সংগে এখানেই মুছার (আঃ) আপাততঃ ছাড়াছাড়ি। খিজির (আঃ) তাঁর ঐ রহস্যময় (কাশফ-কেরামত-ভরপুর) কার্যকলাপের ফায়ছালা করে' গেলেন এই ভাবে ঃ ঐ নাও ছিলো কয়েকজন গরীব লোকের, তারা নদীতে এ-কে চালিয়ে উপার্জন করতো (মাঝী মাল্লারূপে, কি মাছের ব্যবসায়ে) আমি ওতে খুঁত করতে ইচ্ছা করলাম, কেননা তাদের পিছনে (আসছিলো দলবলসহ) এক অত্যাচারী মালেক যে জোর করে সব (ভালো) নাও কেড়ে নিচ্ছিল। আর ঐ যে কিশোর বালক তার মাতা-পিতা ছিলো ঈমানদার। কিন্তু আমার ভয় হলো সে তাদিগকে জড়িত করবে অবাধ্যতায় আর কুফরে (আসলে এল্‌হাম এবং কাশফ-যোগেই ঐ দুষ্টমতি বালকের গুপ্ত গুণ্ডামী ষণ্ডামী ভণ্ডামীর খবর পান, ফলে আল্লাহর হুকুমেই তার পুণ্যাত্মা পিতামাতাকে তার পরিণাম থেকে বাঁচাতে খুন করেন) ; অতএব আমি (খাজা খিজির আঃ) ইচ্ছা করলাম যে তাদের প্রভু ওর বদলে এক পবিত্রতর উৎকৃষ্টতর সন্তান দেন । আর ঐ যে দেয়াল 'ও' ছিলো শহরের এতিম দুই বালকের। ওর নীচে পোতা ছিলো তাদের ধন এবং তাদের পিতা ছিলেন

সৎলোক, অতএব তাদের প্রভু চাইলেন যে তারা বড়ো হয়ে ঐ ধন-সম্পদ বের করে নেয়, তোমার প্রভুর (এহেন গোপন) অনুগ্রহ।

وما فعلته عن امری - ذلک تویل ما لم تستطع علیه صبرا -

অ মা ফাআল্‌তুহু আন আমরী—জালেকা তাভীলো মা লাম তাছ্‌তাতেয়্‌ আ-লাইহে ছাব্‌রা—

এবং আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিনি, এ হচ্ছে যাতে তুমি ছবর করতে পারোনি তারি তাবীল (তাৎপর্য—হাকিকত মারেফাত)।—কাহফ ৯ম, ১০ম রুকু।

তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আর তার ভক্তের ইচ্ছা এক ইচ্ছা হয়ে যায় এবং এই হালহকিকতকেই বলে মানুষের ইচ্ছাময় অবস্থা অর্থাৎ মোকাশ্‌ফা। অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সেই মাফিক মোযেযা কেরামত সম্বপর মতো হাছেল হয়। মানুষ তখন ঐ খাজা খিজির, আছহাবে কাহাফ, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রভৃতি বোজর্গানের অতি এবং অধি মানস-লোকে বিহার করেন। তার অর্থ আবার এ নয় যে ঐ মানুষ যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন; আসলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়, এবং তারও স্বাভাবিক সম্ভবপর মত ইচ্ছা—প্রবল আকুতি আবেদন (দোয়া, প্রার্থনা, will force) অনেক সময়ে কার্যকর হয়। 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'বিবর্তন-মানব' প্রসংগ এবং জবাব [২] এর 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধ দেখুন।

এই রূপলোক, রসলোকের কাহিনী আর একভাবে দেখুন, বিষয়টা আরো পরিস্কার হবে।

মানুষের ঐ পতন স্তরে সাত পর্যায় যথাক্রমে প্রথমতঃ জড় ও চেতন, জড়ের আব আতশ খাক বাদ এই চার, মোট ছয় পর্যায়। কিন্তু চেতন জড়ের সংগে মিলতে গিয়ে মিশতে গিয়ে নিম্নস্তর জন্মেছে ঐ নাফ্‌ছআম্মারা, 'তা ধরেই হয় সাত। এই সাত স্তরই ভাবার্থে, রূপক সাত জমীন রূপে আল কোরআনে

বলা হয়েছে যার কথা আমরা 'জিজ্ঞাসা' ও জবাব [১] এর ২য় প্রবন্ধে বিশেষ করে বলেছি। আবার ঐ নাফছ আম্মারার নাফছ লাওয়ামা নাফছ মুৎমায়েন্না, নাফছ মুলহেমা এই তিন স্তরে আত্মার ক্রম বিবর্তন বা উর্ধগতির সংগে জড়িত জড়-দেহের আব আতশ খাক বাদের অতিপরমাণুর ক্রম বিশুদ্ধতা, রূপক অর্থে, ভাবার্থে যেন সপ্ত আছমান আর কি। আবার রঙের দিক দিয়ে বিবর্তন বা উর্ধগতি (আছমান) লাভ করতে গিয়ে যেমন জড় দেহের ঐ আব-আতশ-খাক-বাদ-অতিপরমাণুর সাত রঙ জমিনের মেছালে ধরা যায়, বলা যায়, তেমনি ঐ রুহ বা আত্মার অতিপরমাণুরও আরো অতি উজ্জ্বল প্রোজ্জল সাত রকম হয় রঙ বদল যেনো সাত আছমান আর কী!

صبغة الله - ومن احسن من الله صبغة و نحن له عبدون -

ছেবগাতাল্লাহে—অ মান আহ্ছানো মিনাল্লাহে ছেবগাতাঁ অ নাহনু লাহু আবেদুন

আল্লার রঙ (রূপ-রস)। আর আল্লাহর চেয়ে রঙ (রূপ-রস) শ্রেষ্ঠ কার? কাজেই, আমরা তাঁরি আবিদ (প্রেমিক-উপাসক)। —বাকারা ১৩৮।

কিন্তু এ সব বুঝাই কাকে? আমরা রছুলুল্লাহর (স) নবুয়ত লাভের প্রায় ১২ বৎসর পরে মে'রাজে প্রাপ্ত বিশেষ করে' সামাজিক, রাষ্ট্রীয় তার সংগে কিছুটা ধর্মবোধের অর্থাৎ নাফছ আম্মারা সুশাসন সংযত করন ও রাখার আকিদা, আদব-কায়দা, আহকাম আরকানকে একমাত্র ইস্লাম ঠাওড়িয়ে বসে আছি। এবং ইসলাম অতি সোজা ধর্ম (Simple religion) বলে' আত্ম তৃপ্তিতে নাচছি; তার 'ক্রমবিবর্তন স্বরূপ' গেছি কিংবা যেতে বসেছি ভুলে'। অথচ চিন্তা করিনা রছুলুল্লাহ্ (সঃ) হেরার গুহায় গিয়ে কী সাধনা করলেন যার ফলে আল্লাহ্র মিলন ও ওহি (এলহাম) লাভ করলেন, নবী হলেন? ঐ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আর কিছুটা ধর্মবোধের আইন-কানুন নাজেলের পূর্বপর্যন্ত তাঁর

এবং আছহাবগনের কী ছিলো ধর্ম ? তাঁদের কারো কারো পরবর্তী জীবনেই বা নিগূঢ় পর্যায়ে কী ছিল আসল এবাদত বন্দেগী, ধর্ম—অনুশীলন। বড়ো বড়ো পীর ওলিরা কি ঐ সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও প্রাথমিক ধর্মবোধের শরিয়ত কম জান্তেন ? কেন তারা তার দ্বারাই পুরোপুরি কামিয়াব হলেননা, পথ প্রদর্শক (মোর্শেদ) খুঁজলেন, পুনঃ শিক্ষা দীক্ষা লাভ কর্লেন ? কী সেই সব পুনশ্চ শিক্ষা-দীক্ষা ? উচ্চাংগের সেই ক্রমবিবর্তিক রূপ, গুণ, জ্ঞান ও রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে মন মস্তিষ্ক ফিরিয়ে, বঞ্চিত রেখে, বুভূক্ষু রেখে মিছে মিছি শুধোশুধি ইসলাম ইস্লাম বলে চিৎকার করছি, মুসলিম মুসলিম বলে' দিক দেশ-কালহীন বিশ্বকে দাওয়াত দিচ্ছি। কী বেকুব !

কাজেই আল্লাহর গুণে গুনান্বিত, জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত অর্থাৎ উপরোক্ত চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া যাবে শারীরিক, মানসিক (নৈতিক) ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ক্রম-বিবর্তনে। তখন জাহেরতঃ কিংবা বাতেনতঃ কিংবা উভয়তঃ সৎকার্যই হবে অবলম্বন, আর, মন্দ রিপুগুলো আল্লাহ্র বেলা যেমন, তেমনি মানুষের বেলাও আত্ম, পর কি উভয়তঃ মংগল সাধনেই মাত্র কিংকর, কি বন্ধুতুল্য খাট্বে।

এভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গভীরভাবে কোন-কিছুকে বুঝতে গেলেই দর্শন এসে যায়, সে শিল্প বিজ্ঞানই হোক, কি দুনিয়াবী অপর কোন জ্ঞান-গবেষনাই হোক। কারণ দর্শন (ফিলোজফি) হচ্ছে সকল (শিল্প) বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (Philosophy is the science of all sciences.)। এই দর্শনেরই আরো গভীর—গভীরতর, গভীরতম—স্তরই হচ্ছে ঐ অধ্যাত্ম দর্শন ও অধি-বিজ্ঞান।

এ-ছাড়া আসল আদত কোন ধর্ম-দর্শন, ধর্ম-বিজ্ঞানও নয়। কোরআন-কালামের জ্ঞান—এলমুলকালাম—দ্বারা তা আরো ছাবেত হয়।

ولقد كرمنا بني ادم -

অ লাক্বাদ কাররামনা বানি আদামা

আর, বানি আদমকে অর্থাৎ মানব জাতিকে আমরা (আল্লাহ অপর গায়ব-রহস্য সমবায়ে, সহযোগে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; দিয়ে থাকি (কারণ, এ এক চিরন্তন ব্যাপার)।—বনি এছরাইল ৭০।

এই শ্রেষ্ঠত্ব কী? 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিবর্তন মানব' প্রসংগে ৪৬ পৃষ্ঠায় এবং এই প্রবন্ধে ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় দেখেছেন যে আল্লাহ্ আদমকে অর্থাৎ আদি মহামানবকে তার প্রতিনিধি বানাচ্ছেন। সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখ্‌লুকাত) হিসাবে মানব ক্রমে ক্রমে এই খলিফাতুল্লাহ (خليفة الله) হতে পারে। এবং তা হয় শারীরিক, মানসিক (নৈতিক) আধ্যাত্মিক ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে, তা বুঝ্‌তে রুহের হাল হাকিকত আরো বোঝা দরকার।

انی خالق البشر من طین - فاذا سویته و نفخت فیه من الروحی

ইন্নি খালেকুল বাশারা মেনতিন—ফা এজা ছাওয়ায়তুহু আ নাফাখ্‌তু ফীহে মেররুহি

মানুষকে (তার দেহ) আমি মাটি থেকে (আব-আতশ-খাক-বাদ-যোগে) বানিয়েছি (এবং বানাই, কারন এ চিরন্তন ব্যাপার) এবং তার অংগ-প্রত্যংগাদি ঠিক করে দেবার সংগে সংগে আমার (আল্লাহর) রুহ (পরমাত্মা) থেকে ফুকে দিয়েছি (এবং দেই, ঐ চিরন্তন ব্যাপার)। ছ-দ ৭১-৭২।

রছুলকে (স) বলতে বলা হয়েছে

یسئلونک عن الروح - قل الروح من امر ربی

ইয়াছ্‌আলুনাকা আনের রুহে কুলেররুহো মেন আমরে রাব্বি।

তারা (জন সাধারণ) রুহ (আত্মা) সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে; বলো: রুহ আমার প্রভুর আমর (তার আদেশে তাঁর পরমাত্মা) থেকে (উদ্ভূত)।—বনি এছরাইল ৮৫।

আল্লাহ্‌র ঐ 'আমর' যে আল্লাহ্‌র 'প্রকল্প' যে অনুসারে সৃষ্টি কৃষ্টি প্রলয় চল্‌ছে অর্থাৎ সব কিছু ক্রম-বিকশিত হয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তা 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ১১ পৃষ্ঠায়ও দেখেছেন।

এখন রুহ সম্পর্কে আমরা যে বদ্ধমূল ভুল ধারনা পোষণ করে' আসছি তা দূর না হলে যে অধ্যাত্ম বিবর্তনমূলক দর্শন বিজ্ঞান ও শিল্প-সুষমা বুঝ্‌তে চাচ্ছি, তা' বুঝ্‌বো কী করে' ?

রুহ্‌।—আমরা মনে করি রুহ বাতাস বা বড়োজোর একটা প্রজাপতি (কেন না, কিংবদন্তি—মরণের পরে প্রজাপতি রূপে রুহ আত্মীয় স্বজনের ঘরে আসে, আর আমরা দুধ-কলা খাওয়াই)। অথচ জানিনা, মানিনা অতিপরমাণবিক যে প্রক্রিয়া প্রণালীতে রুহের পয়দায়েশ সেই প্রক্রিয়া প্রণালীই ঐ উপরে বলে দিচ্ছে রুহ আসলে কী! রুহ আল্লাহরই, নূরে আহাদেরই অতি পারমাণবিক ছটা, যেমন সুর্য অহরহ অতি পারমাণবিক ছটা বিকীরণ করচে, এও অনেকটা সেইরূপ ; যদিও সর্ব মেছালের বাইরে ; কারণ, সূর্যের ছটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আল্লাহ্‌র অতিপারমাণবিক ছটা অতীন্দ্রিয়। 'প্রজ্ঞার বিবর্তন' প্রসংগে আরো বুঝবেন এবং পুরোপুরি পাবেন 'আত্মদর্শন, তত্ব দর্শন' গ্রন্থে 'বেহেশত দোযখ' অধ্যায়ে।

আবার মনে করুন মহাবিশ্বের জড়-জগৎ নূরেআহাদেরই দেহ-স্বরূপ, তাই তিনি আদি অন্ত জাহের (প্রকাশ) ও বাতেন (গোপন)। তার বাতেন অস্তিত্ব ঐ জাহের রূপে-রঙে-রসে -ছটায় প্রকাশ পাচ্ছে অহরহ অজস্র নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, ধুম-কেতু, উল্কা, গ্যাস প্রভৃতি বস্তু-পুঞ্জে ; সব মিলে তিনি macrocosm—বিরাট বিপুল-বপু প্রকাশ ; মানুষে তার ঐ গোপন, (বাতেন) ছটা রুহ রূপে এসে তারি জড় দেহের খানিকটা ধারন করে microcosm—ক্ষুদ্র বপু-প্রকাশ। ঐ জড়ের ভিতর দিয়ে রুহের আসতে গিয়েই সে জড়তার প্রভাবে বিকৃত, বিপর্যস্ত ; রিপু প্রপঞ্চের তাবেদার হয়ে পড়েছে। আল্লাহ অর্থাৎ নূরে আহাদ আদি অন্ত জাহের বাতেন চিরন্তন এক রকমই আছেন, 'জড়' তার দেহ হলেও তিনি জন্ম গ্রহণ করেন না বলে' তার

আত্ম বিচ্ছুরিত জড়-দেহ তার আসল অস্তিত্বের, গোপন (বাতেন) অজুদের কোন বিকৃতি, বিপর্যয় ঘটাতে পারেনি কিংবা কোন দিন পারবে না।

বাইরে আল্লাহর জড় দেহকে যেমন নূরেআহমদ বা পরমা প্রকৃতি বলা হয়, নূরে আহাদ রূপে তিনি যেমন পরম পুরুষ, তেমনি মানব-দেহও নূরে আহমদের গড়া ; তা কতো বারই বলেছি এবং বলবো এবং বুঝতে পারছেন। এখন, সৃষ্টি করতে গিয়ে, কি আপনার আসল বাতেন অস্তিত্বকে জড়দেহ দিতে গিয়ে স্রষ্টা-রূপে তার যে এক পর্যায়—আদিতে হয়েছিল, এখনও হচ্ছে—তাকেও কিন্তু নূরেআহাদের নূরেআহমদ পর্যায়, কি পরম পুরুষের পরমা প্রকৃতি—রূপ-ধারন বলা হয়। সেই হিসাবে তারি প্রতিনিধি (খলিফা) মানব-আত্মাও যেমন আত্ম সৃষ্টি-কৃষ্টি-মূলে ঐ নূরেআহমদ বা পরমা প্রকৃতি অর্থাৎ নূরে আহাদের পরমা প্রকৃতি ঐ নূরে আহমদের বিভা, বিকাশ, প্রকাশ, তেমনি তার জড়দেহও ঐ আল্লাহর, নূরে আহাদের ঐ নূরেআহমদ -রূপ জড়দেহের, পরমা প্রকৃতির প্রতিচ্ছটা প্রতিবিম্ব, নূরে আহম-স্বরূপ ;—দুই মিলে মিশে নূরে আহমদ। ঐ বিশ্ব-ব্যাপী নূরে আহামদের সংগে মিলনেই মাত্র—বাহ্যতঃ নূরে আহমদ ঐ জড়, দৈহিকই থাক—অন্তঃস্থতঃ নূরে আহাদে একাকার এক অস্তিত্বময় হয়ে পড়ে। পরমাপ্রকৃতি পরমপুরুষে স্থিতধী, সম্পূর্ণ স্ব-জ্ঞ হয়ে পড়ে। তার কথাই তো আমরা বোঝাচ্ছি।

আসলে রুহ সম্পর্কে আমাদের এতোদিন ছিল সীমাহীন অজ্ঞতা, অপোগণ্ডতা। রুহ বাতাস বা প্রজাপতি বা ঐ রকম কোন কিছু নয়। রুহই আমি আপনি সে। আমাদের শরীরটা বরং তার বাহন। দুনিয়ার জীবন যাপন ও কার্যকলাপ করনের জন্য তৈয়ার, যেমন আল্লাহর অর্থাৎ পরম রুহের দেহ এই বিশ্ব-জগৎ। দুনিয়ায় জীবন যাপন, কার্যকলাপ করনের উপযোগী ইন্দ্রিয় যন্ত্রপাতি এই

দেহের, তেম্নি রুহের অংগ প্রত্যংগ অতীন্দ্রিয় যন্ত্রপাতি আছে যে। যুগপৎ আমরা ইহ-জাগতিক যন্ত্রপাতি-যোগে ইহজগতে আছি, ঠিক সেই একই সময়ে অতীন্দ্রিয় যন্ত্রপাতি লতিফা-মোকাম-মঞ্জিল-সহ পরজগতে আছি। কিস্সার মতো শুনায়? কিন্তু তা-ই সত্য। মরনেই মাত্র ইহ-জাগতিক যন্ত্রপাতির দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন হয়ে পরজাগতিক রুহ তার পারলৌকিক অতীন্দ্রিয় যন্ত্র-পাতি সহ পরলোকে গিয়ে পড়ে।

চিংড়ি মাছ বা সাপের খোলসের মতো অবিকল রূপ-রঙ-রস, আকার-প্রকার নিয়ে রুহেরই খোলস বা খাঁচা এই দেহ। পানি যে পাত্রে রাখা যায় অবিকল সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে, এ-ও অনেকটা সেইরূপ। স্বপ্নেও তাই মৃত ব্যক্তিকে অর্থাৎ আত্মাকে, রুহকে অবিকল ইহ-দৈহিক আকৃতি প্রকৃতিতে দেখি। কাশফ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দর্শন-ক্ষমতায়ও অবিকল ইহলোকে, কি পরলোকে ঐ একই রূপ দেখা যাবে * সুতরাং ইহ-জগতে দেহ-সমেত যেমন সুখ বা দুঃখ ছিলো, পরজগতেও তেমনি পারদৈহিক রুহের শান্তি বিধান (বেহেশত-সুখ-পরিক্রমা), কি শাস্তি প্রদান (দোযখ-দুঃখ-পরিক্রমা) সম্ভবপর। এজগৎটা আসলে পরজগতেরই প্রতিচ্ছায়া এবং সুখ বা দুঃখ (বেহেশত-দোজখ) সে জগতেও যুগপৎ, একের পর আর, কিংবা আগা-গোড়া যে কোন একটিই বেশী মাত্রায় বিশেষ করে'। আল্লাহ্ বলেন:

ایحسب الانسان الن نجمع عظامه - بلى قادرين على ان نسوى بنانه

আ ইয়াহ্ছাবুল এনছানো আল্লান্নাজমাআ এজামাহু—বালা ক্বাদেরীনা আলা আন্নুছাভেইয়া বানানাহু

মানুষ কি মনে করে যে আমি জুড়্তে পারবোনা তার

---

* জবাব (২) এর 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধের 'স্বপ্ন-দর্শন' প্রসংগাদি দেখুন।

অস্থিগুলি? বরং আমি জুড়ে দিতে পারি (এবং দেই) তার আঙুলেরও অগ্রভাগগুলো!—কিয়ামত ৩,৪।

قال من يحى العظام وهى رميم - قل يحييها الذى انشاها اول مرة - و هو بكل خلق عليم -

কালা ম‍া ইয়ুহিলএজামা অ হিআ রমীম—কুল ইয়ুহ্য়ীহা আল্লাজি আন্শাহা আউয়ালা মাররাতেন—অ হুআ বেকুল্লে খালকেন আলীম...

সে (অবিশ্বাসী মানুষ) বলে: কে জীবিত করবে এই অস্থিগুলোকে যখন এরা পচে গলে যাবে? বলো তাকে (হে মোহাম্মদ স) যিনি প্রথমবার ওদের বানিয়েছেন তিনিই ওদের পুনঃ জীবন দেন এবং সবরকম অভিজ্ঞ স্রষ্টা তিনি।—ইয়াছিন ৭৮,৭৯।

زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا - قل بلى و ربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم - وذلك على الله يسير -

জাআমাল্লাজিনা কাফারু আঁল্লান ইয়ুবআছু—কুল বালা অ রাব্বি লাতুবআছুন্না ছুম্মা লাতুনাব্ব্উন্না বেমা আ'মেলতুম—অ জালেকা আলাল্লাহে ইয়াছির।

অবিশ্বাসীরা মনে করে তারা কখনো পুনর্জীবিত হবে না। তুমি (হে মোহাম্মদ) বলো নিশ্চয়ই শপথ আমার প্রভুর, তোমরা পুনর্জীবিত হবে। এবং তখন তোমাদের জানান হবে যাকিছু তোমরা করেছ, খোদার পক্ষে এটা সহজ।—তাঘাবুন ৭।

اوليس الذى خلق السموات و الارض بقدر على ان يخلق مثلهم - بلى - وهو الخلق العليم - انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون -

আভা লায়ছাল্লাজি খালাকাচ্ছামাওয়াতে অল আরদ্ বেকাদেরিন আলা আঁ ইয়াখলুকা মেছ্লোহুম—বালা—অ হুআল খালকোল আলীম—ইন্নামা আমরোহু ইজা আরাদা শাইয়ান আঁ ইয়াকুলা লাহু কুন ফাইয়াকুন—

আছমান জমীন যিনি বানিয়েছেন তিনি পুনঃ কি ওদের মতো বানাতে পারেন না, কি পারবেন না? বরং তিনি যে

কোন সৃষ্টি করনে অভিজ্ঞ [অর্থাৎ ইহ-পরজগতে অহরহ কতো এরকম সৃষ্টি-কৃষ্টি হচ্ছে ; প্রলয়ও যুগপৎ চল্ছে ; 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধের 'কোরআনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী' প্রসংগ পুনঃ দেখুন]। যখন তিনি কোন কিছু বানাতে বাসনা করেন, বলেন 'হও', আর তা (ক্রমশঃ) হয়ে যায়। ইয়াছিন ৮১,৮২।

তাৎপর্য হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্রমশঃ রূপলাভ করে তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-নিগড়ে, প্রকল্পে।—দেখুন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের ৪৯ ৫০ পৃষ্ঠাও।

এক্ষেত্রে ইহ-পরজগতে ঐ অহরহ সৃষ্টি কৃষ্টি-প্রলয় যেমন তেমনি পরলোকগত আত্মার পক্ষে এক নতুন পৃথিবী এবং আছমান ঐ পরজগৎ যেনো নবতর সৃষ্টি, যেমন জন্মের পর তার ইহ-জগৎ ক্রমশঃ ধরা দেয় নব নব সৃষ্টি-কৃষ্টি-লীলায়, মৃত্যুর পরেও তেমনি সেই নব নব ভালমন্দ অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সেই জগৎ, তা-ই নব নব সৃষ্টি—পৃথিবী ও আছমান।

আসলে রুহের ঐ দেহ-আনুপাতিক সকল অস্তিত্ব আছে বলে' পারলৌকিক ঐ প্রতিকার কি প্রতিবিধান সম্ভবপর হয়, কি হবে। পুনর্বার দেহ বানান লাগেনা, কি লাগবে না। মৃত্যুতে যে সে চৈতন্যহারা হয়ে যায়, পরলোকে রুহ অবস্থায় পৌঁছে পুনঃ চৈতন্য লাভ করাই ঐ পুনর্জীবন লাভ—ঈমান মোফাচ্ছলের বায়াছ বায়াদাল মওত—মৃতুর পর পুনর্জীবন, পুনর্জাগরণ— 'আত্মদর্শন তত্ত্বদর্শন' গ্রন্থথেকে তার কিছুটা একটু পরেও দেখুন।

পৃথিবী ধ্বংসের কথা যে কিস্‌সা, পুনঃ পৃথিবী বানানোও যে তা-ই তা 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'ইস্‌লামিয়াৎ' প্রসংগের ৪ নং এবং ১১ নং থেকে পূনঃ জানুন, 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধ থেকেও 'আর এক মত' এবং 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগ থেকে পুরো বুঝুন :

তা না হলে যে-কিয়ামত পুনঃ পুনঃ নযদিগ (নিকটবর্তী)

বলা হলো তা এই প্রায় দেড় হাজার বছর ধরেও নযদিক হলো না?

انهم يرونه بعيدا - ونره قريبا -

ইন্নাহুম ইয়ারায়ুনাহু বায়ীদা—অ নারাহু ক্বাবীরা।

তারা (জন-সংঘ) ওকে (কিয়ামত-হাশর) দেখ্‌চে সুদূর, আর আমরা দেখ্‌চি সন্নিকট।—মে' রাজ ৩৭।

ازفت الازفة

আযেফাতেল আয়েফাহ্‌

নয্‌দিগ হয়েছে যা' নয্‌দিগ হবার।—নজম ৫৭।

সুতরাং এ কেয়ামত-হাশর যে ঐ 'জিজ্ঞাসা' ও 'সৃষ্টি রহস্যে' বর্ণিত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও শেষ কেয়ামত হাশর তা বলাই বাহুল্য; 'শিল্প সংস্কৃতি (কালচার) কথা' প্রবন্ধেও 'দাউদ (আঃ) ইস্রাফিল (আঃ), প্রসংগে তা পুনঃ দেখতে পাবেন।

পৃথিবী ধ্বংসের এবং পুনঃ বানাবার কথাও যে কিস্‌সা বিশেষ তা-ওতো ঐ 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ থেকে আর একবার দেখ্‌লেন এবং সৃষ্টি-রহস্য প্রবন্ধে 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগেও দেখেছেন। ঐ 'শিল্প-সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধেও পুনঃ দেখবেন। কাযেই নিম্ন ধরনের আয়াতের তাৎপর্যও আর অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক অশৈল্পিক পর্যায়ে সত্য নয়:

يوم تبدل الارض غير الارض و السموت و برزوا لله واحد القهار -

ইয়াওমা তুবাদ্দালোল আরদো গাইরাল আরদে অচ্ছামাওয়াতে অ বারাজু লিল্লাহেল ওয়াহেদেল কাহ্‌হার—

একদিন এই পৃথিবী-দেহকে বদল করা হয় অন্য পৃথিবী-দেহে এবং আছমান সমুহকেও। আর তারা (মৃত মানুষেরা) হাজির হয় আল্লাহর হুজুরে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম অমিত তেজা।—ইব্রাহিম ৪৮

তাৎপর্য হলো ইহজাগতিক জড় দেহের (Physical body) আনুপাতিক অজড় অমর দেহ (Astral body) আছে যে। ফল

কথা, এদেহের ইন্দ্রিয়-কলকব্জা, অংগ-প্রত্যংগ আনুপাতিক রুহেরও অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-কল-কব্জা (লতিফা) অংগ প্রত্যংগ (মোকাম-মঞ্জিল) রয়েছে। আসলে ঐ অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কলকব্জা (লতিফা) অংগ-প্রত্যংগ (মোকাম-মঞ্জিল) প্রভাবেই, পরাক্রম-প্রেরণায়ই ইহজাগতিক ঐ স্থূল কল-কব্জা, অংগ প্রত্যংগ চলে। তাই মৃত্যুতে রুহ তার নূরানী ঐ সকল যন্ত্রপাতি অংগ-প্রত্যংগ-সহ চলে গেলে জড়দেহের যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বজায় থাকলেও আর কায করেনা—চক্ষু দেখেনা, কর্ণ শোনেনা, নাসিকা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয়না, জিহ্বা কথা বলেনা, ত্বক স্পর্শ অনুভব করেনা, হাত ধরেনা, পা চলেনা, অর্থাৎ এরা থাকা সত্ত্বেও এদের পিছনের রুহের যে কলকবজা অংগ-প্রত্যংগ ইহ-জাগতিক ঐ সকল এবং আরো অংগ প্রত্যংগের পিছনে রুহের আরো অংগ প্রত্যংগ—কার্য সম্পাদন করাত—তারা না থাকায় তা আর হয় না, হতেই পারেনা। ইহজগতিক জড়দেহ তার ঐ সকল কলকজা অংগ প্রত্যংগ-সহ ক্রমশঃ পচে গলে যায়। তা যদি না হবে তবে ওরা একটা সময় পর্য্যন্ত তর-তাজা থাকা সত্ত্বেও কায করেনা কেন? কী চলে গেলো যার ফলে জড়-দেহ অচল, অসাড়, অসম্পূর্ণ, নষ্ট-নীড়? কাজেই জড়-দেহের পরিচালক আসলে ঐ সকল যন্ত্রপাতির অংগ প্রত্যংগের আনুপাতিক যন্ত্রপাতি, অংগ-প্রত্যংগ-সহ নূরানী রুহ। জড়দেহের খাঁচায় খোলসে বন্দী হয়ে তার প্রভাবে সে বিকৃত, বিপর্যস্ত হতে পারে স্বভাবে, ছুরতে, কিন্তু তার ক্রম ছাপ-ছুৎরায় ক্রমবিকাশ-বিবর্তনে সে অপূর্ব, অচিন্তনীয় আধ্যাত্মিক ঐশর্য আয়ত্ত করনের, অবধারনের ক্ষমতা (Potential energy) রাখে।

যা হোক, মরনের পর মানবের ঐরূপ রুহানী অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে তো আর জড় দৈহিক নয়, কিংবা তার পৃথিবীও আর এই পৃথিবী নয়, তাই 'ইহ-পৃথিবী-দেহকে অন্য পৃথিবী-দেহে বদল করার

কথা বলা হয়েছে। আর সেখানকার আছমান অর্থাৎ শূন্যমণ্ডল আর জড়-বস্তু-পুঞ্জ-পূর্ণ আকাশ বা শূন্য মণ্ডল নয়, তাই তারো ঐ পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে।

সুতরাং শাস্তি বিধান, শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত পুনঃ পৃথিবী বানানোর, পুনঃ জড়-দেহ বানানোর কল্পনা আসলে অনভিজ্ঞতার কারনে ঐ ধরনের আয়াতের, ছুরার আসল তাৎপর্য বোঝতে না পারার দরুণ—কিস্‌সা কাহিনী তৈয়ার। আর, যা, ধ্বংস হয় স্বাভাবিক কারণে, স্বতঃই, তাতে আবার শান্তি বিধান, শাস্তি প্রদান কী! একটু আগেই দেখেছেন শান্তি বিধান—সুখ-শান্তি, শাস্তি প্রদান—দুখঃ কষ্ট ইত্যাদি—সব রুহের, আত্মার; তাই রুহ (আত্মা) চলে গেলে আর ওর ইহ-জাগতিক কায-কারবার চালানোর বাহন, বিকল্প জড়-কল-কব্‌জা-ময় জড়-দেহের আর প্রয়োজনই নেই; পাত্তাই নেই; সেই অকেজো জিনিষ গুলো পুনঃ বানান লাগ্‌বে? আর পৃথিবী যদি ধ্বংসই হয় তবে তাকেও পুনঃ বানান লাগবে? তা হলে ও-গুলো ঐ ধ্বংস করার কারণটা ছিলো কী!—[দেখুন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ ৭০ পৃষ্ঠাও] আবার, কবর থেকে দলে দলে ছুটে আসার কথা আছে :

و نفخ فی الصور فاذاهم من الاجداث الی ربهم ینسلون -

অ নুফেখা ফিচ্ছুরে ফা ইজাহুম মেনাল আযদাছে এলা রাব্বেহিম ইয়ানছেলুন

আর ছুরে (শিঙায়) ফুঁক দেয়া হয় (বাজান হয়) তখন তারা কবর ছেড়ে তাদের প্রভুর পানে ফিরে যায়।—ইয়াছিন ৫১।

یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا -

ইয়াওমা ইয়ুনফাখু ফিচ্ছুরে ফাতাতুনা আফ্‌ওয়াজা

সেদিন ছুরে (শিঙায়) ফুঁক দেয়া হয় (বাজান হয়) আর (অমনি) সকলে দলে দলে ছুটে আসে।—নবা ১৮।

স্থূল কোন শিঙায় ফুঁক দেয়া যে এটা নয় তা 'শিল্প-সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে ভালো করে' বোঝানো হয়েছে, তা দেখুন। এখানেও সংক্ষেপে পুনঃ দেখুন : ব্যক্তিগত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ অর্থাৎ ব্যক্তিগত

কিয়ামত, সমষ্টিগত অনেকের ঝড়-ঝঞ্জা বন্যা যুদ্ধ বিগ্রহ, মহামারি প্রভৃতিতে মৃত্যু অর্থাৎ সমষ্টিগত কিয়ামতও ঐ ধরনের আয়াতের লক্ষ্য। আবার পৃথিবীর জীব ধারনের অনুপযোগী অবস্থায় ঐ ভাবে ব্যক্তিগত শেষ সব জীব গোষ্ঠির শেষ নিঃশ্বাস পাত অর্থাৎ শেষ কিয়ামতও ঐ ইছরাফিলের শিঙা ফুঁকা।

তা না হলে শিঙার প্রথম ফুকেতেই তো পৃথিবী ফানা বা ধ্বংস হলো, তার সংগে কবর গুলোও তো গেলো, আর কতো লোকের তো কবরই হয় না, তাহলে দ্বিতীয় ফুঁকে পুনঃ বানানো পৃথিবীতে কবর কোথায় যে তার থেকে তৃতীয় ফুঁকে দলে দলে গিয়ে ময়দানে হাজির হবে বিচারার্থ? স্থতরাং এর পরবর্তী 'আত্মদর্শন তত্ব দর্শন গ্রন্থে ঈমান মোফাচ্ছলের 'বায়াছ বায়াদাল মওত' অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনজীবন যে পুরো পুরি বোঝানো আছে, এক্ষেত্রে অধ্যাত্ম সেই বিবর্তন খানিকটা অন্ততঃ বুঝ্তে তার থেকে কিছুটা আভাস নিন।

এ সব ক্ষেত্রে মৃতের কবর যে মরণ-লোকে রুহের আস্তানা ঐ 'ইল্লিয়ুন' এবং 'সিজ্জিন তা' বলাই বাহুল্য ;

كلا ان كتب الفجار لفى السجين - و ما ادرك ما السجين - كتب مرقوم -

কাল্লা ইন্না কেতাবাল ফুজ্জারে লা ফি সিজ্জিন—অ মা আদ্রাকা মা সিজ্জিন—কিতাবুম্ মারকুম

না, না, কখনো না, নিশ্চয়ই বদকারদের কর্মফল সিজ্জিনে আর কিসে তোমাকে বোঝাবে সিজ্জিন কী?—লিখিত কিতাব—

كلا ان كتب الابرار لفى عليين - و ما ادرك ما عليون - كتب مرقوم -

কাল্লা ইন্না কেত্তাবাল আব্রারে লা ফি ইল্লিয়িন—অ মা আদ্রাকা মা ইল্লিয়ুন—কিতাবুম মারকুম

না, না কখনো না, নিশ্চয়ই নেককারদের কর্মফল ইল্লিয়ুনে, আর কিসে তোমাকে বোঝাবে ইল্লিয়ুন কী?—লিখিত কিতাব।—তাৎফিফ ৭,৮,৯,১৮,১৯,২০।

তফসির : তাৎপর্য হলো প্রত্যেক ভালোমন্দ কর্মের প্রতিচ্ছবি আছে, তা-ই লিখিত কেতাব বা আমল নামা। সেই অনুসারে মৃতের 'রুহ (আত্মা)' বদ. কর্মের প্রতিফল প্রতিক্রিয়া ভুগতে সিজ্জিনে এবং নেক কর্মের পুরস্কার প্রতিদান পেতে ইল্লিয়ুনে যায়। সিজ্জিন অর্থ কারাগার, ইল্লিয়ুন অর্থ উচ্চস্থান। যুগপৎ রুহকে বদকার্যের ঐ শাস্তি ও সৎকার্যের ঐ আরাম আয়াশ পেতে হয় : পরিশেষে গিয়ে পরিত্রাণ : সে অনেক দূরের রাস্তা।

এ হাজত বাসও নয়; যে হাজত বাস থেকে একদিন কিয়ামতে বিচারার্থ আল্লাহ্‌র হুজুরে হাজির হতে হবে, কল্পনা করা হয়। তা যে অবিজ্ঞজনোচিত কল্পনা, তা 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ইস্‌লামিয়াৎ প্রসংগে ৫, ১১ নং এ ৬৯, ৮৩ পৃষ্ঠায়ও দেখেছেন। কারণ, পাপ পুন্যের সংগে সংগেই আল্লাহ তা জানেন, কিংবা পূর্বেই তা জানেন; সুতরাং দুনিয়ার অজ্ঞ বিচারকের মতো সাক্ষ্য সাবুদ নিয়ে তা জানা লাগেনা যে আসামীদের বিচার-দিন সাপক্ষে হাজত বাসে রাখা লাগবে। তাতে করে আর কী কী অসংগতি দেখা দিতে পারে তা ঐ প্রসংগ পড়ে পুনঃ জানুন। প্রতিকর্মের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ আমলনামা কি ভাবে রক্ষিত হতে পারে, তা-ও ঐ প্রবন্ধের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'আইয়ানে ছারেতা'....'সৃষ্টির মুলসুত্রসমূহ'....'লাওহেমাহফুজ...সংশ্রবে পুনঃ বুঝুন।

তা হলে চিন্ময় জগৎ—যা-কে ঐ অন্য পৃথিবী-দেহ ও আছমানে বদল করা বলা হয়েছে—সেই পরলোকেই পরলোকের বস্তু রুহের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, কি শেষ কিয়ামতে জড়ো হওয়া, তা-ই ঐ কবর ছেড়ে দলে দলে ছুটে যাওয়া।

ইছরাফিলের শিঙার প্রথম ফুঁকের তাৎপর্য তা হলে : দেহের বেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, পৃথিবীর বেলা শক্তি ফুঁকৃতে ফুঁকৃতে একদা সামগ্রিক শেষ স্পন্দন এবং জীবন ধারনের

অনুপযোগী হওয়া। দ্বিতীয় ফুঁক তাহলে ঐ উভয় ক্ষেত্রে ইস্রিয়ূন সিজ্জিনে রুহের সমবেত হওয়া—যার যখন যেমন দরকার—তা-ই আবার বায়াছ-বায়াদাল মাওত—মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, পুনর্জাগরণ। তৃতীয় ফুঁকই তা হলে ঐ ইন্ছাফ—উপরোক্ত আমল নামা অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি—প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল, কি পুরস্কার প্রতিদান প্রদান।

এইভাবে ইহ-পরকাল-ব্যাপী জগৎক্রিয়া চল্ছে, যেমন অধ্যাত্ম বিবর্তন ইহ-জীবনে, তেম্নি পর-জীবনে। পর-জীবনের এই বিবর্তন বোঝা বড়ো দুরুহ ব্যাপার, তাতে করে বেহেশত দোযখের আসল রহস্য বুঝতে হবে; তা ঐ 'আত্ম দর্শন তত্ত্ব দর্শন' পুস্তকেই আলাদা ভাবে আগাগোড়া বোঝানো হয়েছে। অধ্যাত্ম বিবর্তন জড়-জীব-উদ্ভিজ্জের ভিতর দিয়েই চলে আস্চে, চলতে থাকবে; তাও ঐ পুস্তক পড়ে ষোল আনা বুঝুন। এখানে এক জীবনে ঐ অধ্যাত্ম বিবর্তন কি ভাবে হতে পারে, হয়ে থাকে তা-ই এই পুস্তকে দেখুন, বিশেষ করে' এ-অধ্যায় পড়ে' বুঝুন।

মানবের বেলা ঐ নাফ্ছআম্মারা (ষড়রিপু পরিচালিত) আত্মা শরিয়াতের শুরু সূচনার সঠিক তালকিনে তৎপরতায় কঠোর সুশাসনে নাফছ লওয়ামায় (অনুতাপশীল আত্মায়) পর্যবসিত হয়। তখন তরিকতের আসল আদত ধর্মে ক্রমশ: নাফছ মুৎমায়েন্নায় (শুদ্ধি-শান্তি-শান-প্রাপ্ত আত্মায়) পরিণত হয় এবং তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র এলহাম অর্থাৎ অনুপ্রেরণায় পরিচালিত আত্মা হলেই হবে নাফছ মুলহেমা। তখন কার জন্যই হাদিছে বলা হয়েছে تخلقو باخلاق الله (তাখাল্লকু বে-আখ্‌লাকিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও (আল্লাহ্‌র গুণাবলিতে গুণান্বিত, জ্ঞানাবলিতে জ্ঞানান্বিত হও)। [এর আগের 'কোরআন' প্রসংগের ৭৭ পৃষ্ঠাও দেখুন] আর তা' হয় আল্লাহ্‌র সংগে অর্থাৎ পরমাত্মার

সংগে আত্মার একাত্মতায়, একীভূত হওয়ায়,—তওহীদ অর্থ একত্ব, সেই বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিণতিতে, তার বিশ্লেষণ এর আগেও দেখেছেন, পরেও আরো দেখতে পাবেন। এই একাত্মতা, একীভূত হওয়া সম্ভবপর কেন? আর এক হাদিছে এ-কারণেই বলা হয়েছে: كل شيئي يرجع الى اصله (কুল্লু শাইয়িন ইয়ারজেয়ু এলা আছ্লেহি) সব কিছু (ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে) তার আসলে (অস্তিত্ব-মূলে, originএ) পৌঁছে, ফিরে যায়।

এ সম্ভবপর বলেই কোরআনের এ আয়ত:

الست بربكم - قالو بلى

আলাসতো বেরাব্বেকুম—কালূ বালা

(আল্লাহ রুহদের বলছেন:) আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তাঁরা (ঐ উন্নত, ক্রমবিকশিত, বিবর্তিত রুহরা) বল্লো, 'হাঁ'। আরাফ ১৭২।

তাৎপর্য হলো: তখন আর বাইরে থেকে চাপানো নাফছ আম্মারা সুশাসন মূলক কঠোরতায়ই নয়; দোযখের ভয় এবং বেহেশতের লোভ দেখানোয় নয়, বরং তরিকতে রুহরা আত্ম উৎস (পরমাত্মার) সন্ধান পেয়ে আপছেআপ সেইমুখী হয়; তখন রবুবিয়ত (প্রভুত্ব) ও অবুদিয়ত (দাসত্ব) উপলব্ধি হয়ে যায়। এ হাল-হাকিকত্কে লক্ষ্য করে' আল্কোরআনে আল্লাহ ফের বল্ছেন।

و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আ মা খালাকতু জিন্না অল ইন্ছা ইল্লা লেইয়াবুদুন।

আমি জীন এনছানকে আমার এবাদত করার জন্যই বানিয়েছি।—যারিয়া ৫৬।

এই জীন কী? তার কথা পরে হবে, আগে এনছান অর্থাৎ নরনারীর কথাই ধরুন। রিপুগুলোকে স্তিমিত করে আল্লাহ-মুখী করতে পারলেই হয় রবুবিয়ৎ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র

প্রভুত্বের উপলব্ধি অবুদিয়ৎ অর্থাৎ দাসত্বভাব আবেদের (দাসের, ভক্তের)। তজ্জন্যই এই সাবধান বাণী সমুচ্চারিত ঃ

قل اعوذ برب الناس - ملک الناس - اله الناس - من شر الوسواس -
الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس - من الجنة و الناس -

কুল আউজু বেরাব্বিন্নাছে-মালেকিন্নাছে-এলাহীন্নাছে-মেন শাররিল ওয়াছওয়াছেল খান্নাছ-আল্লাজি ইয়ুওয়াছভেছো ফিছোদুরেন্নাছে-মিনাল জিন্নাতে অন্নাছ—

বলো (হে মানব-আত্মা) আমি পানাহ্ (আশ্রয়—শরণ) চাই মনুষ্য জাতির প্রভুর, মনুষ্য জাতির (ভালোমন্দের বিচার) অধিপতির, মনুষ্য জাতির (একমাত্র) উপাস্যের—সেই (গুপ্ত) খান্নাছের কুমমন্ত্রনার অপকারিতা থেকে যেকুমন্ত্রনা দেয় মানুষের-অন্তরে জিন ও মানবদের মধ্য থেকে।—ছুরা নাছ।

পুনঃ এই জীন কী ?

জীন-ইনছান।—আমরা যে ক্রম-বিবর্ত্তন বুঝিয়ে আস্চি তাতে করে' দুটো জিনিস এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ এক দৈহিক বিবর্তন যা জড়-জীব উদ্ভিজ থেকে এই মানব আকৃতি প্রকৃতি পর্যন্ত পৌছেচে; দ্বিতীয়তঃ আত্মিক বিবর্তন যা ঐ জড়-জীব উদ্ভিজ-প্রভাব অর্থাৎ ফিতরাতুছাইয়া (মন্দ খাছলত) কাটিয়ে উঠে ফিতরাতুল হাছানা অর্থাৎ সু-স্বভাবে পরিণত করা ও হওয়া। ঐ যড়রিপুর কুমন্ত্রণা তাই যুগপৎ জড়-জীব-উদ্ভিজ স্তরের যাকে-ঐ জীন আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে; আবার মানুষের মধ্যেও ঐ খাছলতে অভিভূত, অনাচারী মানবদের মধ্যেও ঐ খান্নাছ ও তাদের অয়াছঅয়াছা—কুমন্ত্রনা—অবধারিত, উভয়তঃ কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার তাকিদই ঐ ছুরায়।

জীনের ঐ অর্থ দেখেছেন আদম-হাওয়ার পতন উত্থান যথাক্রমে রূপক স্বর্গ বিচ্যুতি ও স্বর্গ পুনঃ প্রাপ্তির বর্ণনায়, সাধারণ নাম সেখানে শয়তান। আবার জবাব [২]এর 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধেও ঐ অসভ্য জনগনকে জীন আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে তা যেমন দেখবেন

তেমনি শিল্পীবিজ্ঞানীদেরও সেখানে 'জীন' নামে দেখতে পাবেন। আর ঐ জড়-জীব-উদ্ভিজ্জ খাছলতের মূল কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতি; সুতরাং ব্যাপক অর্থে বিশ্ব-প্রকৃতিও জীন। কিন্তু সে আল্লার, স্রষ্টার, প্রতিপালকের, প্রলয়ন্তার নিয়ম নিগড়ে চল্‌ছে, আল্লাহ্‌র অবুদিয়ত (এবাদতকারিতা) সেখানে ঐ নির্ধারিত নিয়ম নিগড়ে তাদের চলা, পথ পরিক্রমা, ব্যাপকতঃ সেই আত্ম সমর্পনও—মূলের, —আসলের—origin এর—অনুবর্তনও তাই ইছলাম।

افغير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض طوعا و كرها و اليه يرجعو -

আফা গাইরা দীনিল্লাহে ইয়াবগুনা অ লাহু আছলামা মান ফিচ্ছামাওয়াতে অল আরদে ত্বাউয়াঁ। অ কারহাঁ। অ এলাইহে ইয়ুরজায়ুন

এরা (অর্থাৎ মানব জাতি) কি আল্লাহর ধর্ম (বাদ দিয়ে) অন্য ধর্ম চায়? অথচ আছমান জমীনের অর্থাৎ বিশ্ব-প্রকৃতির সব কিছুই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ইছলামই অনুসরণ করে চলেছে (আছলামা) এবং তার কাছেই (এভাবে) ফিরে যাচ্ছে।—আলে ইমরান ৮২।

এই ইছলাম অনুসরণ, অনুবর্তন কী রকম? এক ইংরেজী রচনা থেকেই তার আভাস নিন:

"The powerful law which governs and controls all that comprises the Universe from the largest stars to the tiniest particle in the earth, is made and enacted by the Great Governor, whom the whole creation obeys. The Universe, therefore, literally follows the religion of Islam, as Islam signifies nothing but obedience and submission to God, the Lord of the Universe. The sun, the moon, and the stars are thus all 'Muslims'. The earth also is a "Muslim" and so are air,

water and heat. Trees, stones and animals are all 'Muslims'. Even a man who does not recognise God, denies Him, or worships others besides true God, or associates others in divinity with Him, has perforce to be Muslims on account of his nature ; for 'his birth,' his life and his death are all governed under God's law and he is not out of the Kingdom of God:

যে মহাশক্তিশালী আইন—সর্ববৃহৎ তারকা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র অতিপরমাণু পর্যন্ত যে মহাবিশ্বের প্রকাশ—তাকে সুশাসন সংরক্ষণ সুনিয়ন্ত্রণ করচে—তা তৈরী এবং কার্যকর হয়েছে এক মহা শাসক দ্বারা, যাকে সমগ্র সৃষ্টিই সম্পূর্ণ মেনে চল্‌ছে। সুতরাং ইছলাম শব্দের সংজ্ঞা অনুসারে বিশ্ব-প্রকৃতি ইছলাম ধর্মই অনুসরণ করে। কারণ ইছলাম শব্দের আসল মানে মতলব হলো বিশ্ব-প্রকৃতি পয়দা-করনেওয়ালা পাক-পরোয়ার-দিগারের আনুগত্য, আত্ম সমর্পন। সুতরাং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবই সমভাবে মুছলিম। পৃথিবীও মুছলিম আর তার আব আতশ খাক বাদও তা-ই। বৃক্ষ-লতা-পাতা পাহাড়-পর্ব্বত জীব জানোয়ার সকলই মুসলিম। এমন কি যে মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে না (সুতরাং নাস্তিক) অথবা যে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর-কিছুর পূজা অর্চনা করে (পৌত্তলিক) অথবা অপর কিছুকে আল্লাহ্‌র তুল্য মনে করে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য পূজা-অর্চনা তাকে প্রদান করে (মোশ্‌রিক) সে-ও প্রকৃতি-গত (ফিতরা তুল্লাহ্‌) মুছলিম ; কারণ, তার জন্ম, জীবন, মৃত্যু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কানুনের মারফত নিয়ন্ত্রিত এবং সে আল্লাহ্‌র সুমহান সাম্রাজ্য-সীমা-সরহদ্দের আদৌ বাইরে নয়।

কাজেই বিশ্ব-প্রকৃতির সব- কিছুরই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ইছলাম অনুসরনের্‌ অনুবর্তনের হাকিকত (রহস্য) বোঝা গেল। বিশ্ব-

প্রকৃতির বিকর্ষিত বস্তুপুঞ্জের মতো অধার্মিক মানুষও আসলে বিকর্ষিত। কিন্তু বিবর্তিত হয়ে সে একদিন ঐ আকর্ষণ অনুভব করে, তখন ঐ প্রকৃতি-জাত বিকর্ষন ও প্রকৃতি-জাত আকর্ষণ—অর্থাৎ দুষ্কৃতি সুকৃতির চলে টানা পোড়েন—সংগ্রাম; শেষমেশ একদিন সে আকর্ষনই অনুভব করে বেশী করে, বিশেষ করে, তখনকার কথা এই :

ان الدين عند الله الاسلام

ইন্নাদ্দিনা ইনদাল্লাহেল ইসলাম—

নিশ্চয়ই ইছলামই (ঐ আকর্ষন, আপছেআপ অনুসরণ, অনুবর্তন, আত্মসমর্পনই) আল্লাহর কাছে (সঠিক সত্য) ধর্ম। আলে ইমরান ১৮।

ঐ আকর্ষন অর্থাৎ প্রেম যখন পূর্নাংগতা লাভ করে অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মায় গিয়ে পৌঁছে, পূর্ণ প্রজ্ঞা হাছেল হয়, তখনকার সেই অতিমানব মহামানদের অভিব্যক্তির কথা আল্লাহতালা আঁ হযরতের অর্থাৎ ধর্মের শেষ সংস্কারক, সংশোধক মহামানব, অতিমানবের মধ্যমে এই ভাবে বলেছেন :

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعامتى - و رضيت لكم الاسلام الدين -

আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম আতমামতু আলাইকুম নেঅমতি অ রাজিতু লাকুমুল ইছলামা দীনা—

অদ্য (আখেরী জামানায় হযরত মোহাম্মদের (সঃ) মাধ্যমে) তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম। আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ শেষ মেশও) পূর্ণ বর্ষণ করলাম, আর তোমাদের অন্য ইছলামকেই ধর্ম মনোনীত করলাম!—মাইদা ৩।

শরিয়তের দিক দিয়েও মূলসূত্র সেই একই বলে' আল কোর-আনে বলা হয়েছে :

شرع لكم من الدين ما وصحىٰ به نوحا و الذى اوحين اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسىٰ و عيسىٰ ان اقيمو الدين و لا تتفرقوا فيه -

كبر على المشركين ما تدعوهم اليه - الله يجتبى اليه من يشاء و يهدى اليه من ينيب -

শারায়া লাকুম মেনাদ্দিনা মা অচ্ছাবিহি নুহা অ আল্লাজি আওহায়না এলাইকা অ মা অচ্ছায়ানা বিহি এব্রাহিমা অ মুছা অ ইছা আন আকীমুদ্দিনা অ লা তাতাফাররুকু ফিহে—কাবুরা আলাল মোশরেকীনা মা তাদয়ুহুম এলাইহে—আল্লাহু ইয়াজ্তাবি এলাইহে মাইয়াশায়ো অ ইয়াহাদি এলাইহে মঁাইয়ুনিব

শরিয়ত দিচ্ছেন তিনি তোমাদের জন্য ধর্ম থেকে যা তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমরা তোমাকে অহি করেছি, এবং ইব্রাহিম মূছা ইছাকে দিয়েছিলেম যে তোমরা ধর্ম ঠিক রাখো আর বিভিন্ন হয়ো না—মোশ্রেকদের পক্ষে কঠিন যা দিয়ে তুমি তাঁর দিকে ডাক্চো—আল্লাহ যাকে খুশী তাঁর নিকটে মনোনীত করে' নেন—আর যে ফিরে তাকে তিনি তার দিকে পথ দেখান।—শুরা ১৩।

তফসির ঃ শরয়ুন (شرع) ধাতু থেকে শরিয়ত ও শুরু, সেই 'শরায়া' শব্দই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে,—আসলে যুগের যুগের শরিয়তের মূলসূত্রও একই। কেবল যুগের যুগের চাহিদা, ক্রম-বিবর্তন মোতাবেক অনেক কিছু পরিবর্তন—পরিবর্জন পরিবর্ধন—ইজতেহাদ—সুতরাং নূহ (মনু), ইব্রাহিম, মুছা, দায়ুদ, ইছা, প্লটিনাস প্রভৃতি এবং ঐ সমসাময়িক, কি আগপিছ অপর অঞ্চল সমূহের অপর পয়গম্বরদের যা দেয়া হয়েছিল, মোটামোটি সেই শরিয়ত (মারফত)ই মূল সূত্রে এখনো যুগোপযোগী জরুরী ইজ্তেহাদ পর রয়ে গেছে, চল্ছে। কাজেই ঐ পয়গম্বরদের উম্মতদের বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন হবার ও থাক্বার কারণ ছিলে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশ মোশরেক অর্থাৎ পৌত্তলিক হওয়ায় যে চিরন্তন শরিয়তের যুগোপযোগী জরুরী ইজ্তেহাদ মারফত এক আল্লাহ্র এবাদতে তাঁর দিকে ডাকা হচ্ছে, তা তাদের পক্ষে কঠোর মালুম হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে সেও আল্লাহ্র ইচ্ছা, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যুগোপযোগী 'শরিয়ত'ও তার ক্রম

উন্নত স্তর 'তরিকত' উন্নততর স্থাল 'হাকিকত' ও পরিণতি 'মারফত'-মোতাবেক তাঁর কাছে মনোনীত করে নেন, আর যে যুগোপযোগী শরিয়ত সুশাসন সুশৃংখলা মোতাবেক তাঁর দিকে ফিরে, তাকেই তিনি ঐ শুরু (শরিয়ত) এবং উপরোক্ত তার ক্রম-বিকাশ-প্রকাশ—প্রগতি-পরিণতি-পথে তাঁর কাছে হেদায়েত করেন (ক্রমশঃ টেনে নেন)।

كان الناس امة واحدة - فبعث الله النبين مبشرين و منذرين - و انزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه - وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاء تهم البينت بغيا بينهم - فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه - والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم -

কানান্নাছো উম্মাতাঁ অহেদাহ—ফাবায়াছাল্লাহু ন্নাবিয়িনা মুবশ্‌শেরীনা অ মুন্‌জেরিনা, অ আন্‌জালা মাআহুমুল কেতাবা বেল হাক্কে লেইয়াহকুমা বাইনান্নাছে ফিমাখতালফু ফিহে, মাখ্‌তালাফা ফিহে ইল্লাল্লাজিনা উতুহু মেম বাআদে মা যায়াতহুমুল বাইয়েনাতো বাগিয়াম বাইনাহুম—ফাহাদাল্লাহু আল্লাজিনা আমানু লেমাখতালাফু ফিহে মেনাল হাক্কে বে-এজনেহি, আল্লাহু ইয়াহ্‌দি মা ইয়াশায়ু এলা ছেরাতেম মুস্‌তাকীম—

মানবগণ (মূলতঃ) একই জাতি (ও মতের) ছিলো ; আল্লাহ্ পাঠান পয়গম্বর সুসংবাদ বাহক ও সতর্ককারী হিসাবে, আর তাদের সংগে অবতীর্ণ করেন গ্রন্থও সত্য সহকারে, মীমাংসা করতে লোকের মধ্যে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে। আর মতভেদ তারাই করে যাদের গ্রন্থ দেয়া হয় তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে, শুধু নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা হেতু। অতঃপর খোদা নিজ দয়ায় সত্য বাৎলান মোমীনদের যেবিষয়ে তারা মতদ্বৈধতা করে। এবং আল্লাহ্ (এভাবে) যা-কে ইচ্ছা পরিচালিত করেন সহজ সরল সুদৃঢ় পথে। বাকারা ২১৩।

و ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا - و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

অ মা কানান্নাছো ইল্লা উম্মাতা অহেোতান ফাখ্‌তালাফু, অ লাওলা কালেমাতুন ছাবাকাত্ মের রাব্বেকা লাকুযেআ বাইনাহুম ফিমা ফিহে ইয়াখ্‌তালেফুন্

মানুষ সব (আদিতে) এক জনসংঘ বই ছিলোনা, পরে বিভিন্ন মত্ হয় ; আর, যদি তোমার প্রভুর তরফ থেকে পূর্ব থেকেই একথা না থাক্‌তো—তবে তারা যে সব বিষয় মতভেদ করছে তার মীমাংসা তাদের মধ্যে করেই দেয়া হতো। —ইউনুছ ১৯।

কাজেই, ক্রম-বিবর্তনের পর্যায়-ক্রমেও বিভিন্ন মত ও পথ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যের মূল সূত্র—কিবা ব্যবহারিক দিক দিয়ে শরিয়তে—কিম্বা মর্ম অনুধাবনের দিক দিয়ে মারফতে—আসলে একই রয়ে গেছে। জবাব (২) এর শেষ প্রবন্ধের 'পরিশীলনেও' দেখবেন কী করে মুছার (আ) কাছে অবতীর্ণ তৌরাতের দশ আদেশ মালা (Ten Commandments) ক্রমশঃ ইঞ্জিলে (বাইবেলে) ফোর্কানে (আলকোরআন) ক্রমবিবর্তিত হয়ে এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। শেষ সংস্কৃত সংশোধিত গ্রন্থ থেকেও যুগে যুগে দেশ-কাল-পাত্র-উপযোগী তার ইজ্‌তেহাদের প্রয়োজন রয়েছে, ইজ্‌তেহাদ হয়েছে, হচ্ছে, হবে তারও দৃষ্টান্ত সেখানে দেখ্‌তে পাবেন।

কিন্তু দ্বিত্ব-ত্রিত্ব-বহুত্ব-বাদ-মূলক পৌত্তলিকতা নিরসন কর্‌লে অন্তরের সাধনায় আর বিশেষ হেরফের নেই, আর বোঝ্‌বার বিষয়ও তো মূলতঃ অন্তর দিয়ে। সেজন্যই এক ইংরেজ মনীষি বল্‌তে পেরেছেন :—

What is prayer? What is it to pray? Prayer does not mean the words which are generally accepted as prayer, but the spirit in which those words are used. Prayer simply means a longing of the heart. It is the wish felt—it may be expressed or not expressed. It is for God to hear our prayer and not for man. When we stand or sit in prayer

in a mosque, temple or church we may utter our prayer in loud, harmonious chorus ; but God does not take into consideration the posture, or manner in which prayer is offered. He looks into the depth of the heart. He sees the spirit of our prayer, whether expressed or unexpressed, Even our prayer, offered with a silent heart, is accepted by God if it be sincere. God sees our heart and judges us by the spirit of our prayer.

"অসলে এবাদত বা প্রার্থনা কী ? কী প্রার্থনা, বা এবাদত কর্‌তে হবে ? প্রার্থনা বা এবাদত অর্থ কথা নয়, অথচ সাধারণতঃ তাই মনে করা হ'য়ে থাকে। আসলে ও হচ্ছে মূল প্রকৃতি (Spirit) যা প্রকাশ করতে হয়তো কথাগুলিও বলা হয়। এবাদত বা প্রার্থনার আসল মানে হচ্ছে আত্মার আকুতি, আর্তি, অনুভূতি—যা কথা কি কায়দা-কানুনে (Form এ) প্রকাশ পেতে পারে কিংবা নাও পেতে পারে। আমাদের প্রার্থনা, কি এবাদত শুন্‌বেন আল্লাহ্, মানুষের শোনার জন্য নয়। যখন কোন মস্‌জিদ মন্দির কি গীর্জায় আমরা প্রার্থনায় অর্থাৎ এবাদতে দাঁড়াই কি বসি, আমরা হয়তো উচ্চৈঃস্বরে কি সমস্বরে আমাদের কথা বল্‌তে পারি। কিন্তু কি প্রথায়, প্রকারে কিংবা কায়দা-কানুনে আমরা এবাদত করি, আল্লাহ্ তা বিবেচনা করেন না, তিনি তাকান মানুষের আত্মার গভীরে। তিনি দেখেন আমাদের এবাদত-বন্দেগীর মূল প্রকৃতি (spirit),—প্রকাশ হৌক কিংবা তা অপ্রকাশই থাক।—যদি প্রকৃত সততা-সরলতার সহিত করা হ'য়ে থাকে তবে আল্লাহ্ আমাদের নীরব প্রার্থনা—এবাদত বন্দেগীও—গ্রহণ কর্‌তে পারেন। আল্লাহ আমাদের অন্তর দেখেন এবং আমাদের প্রার্থনা—এবাদত-বন্দেগীর-মূল প্রকৃতি-মোতাবেকই 'বিচার করে' থাকেন।

ঐ প্রকৃত প্রার্থনায়—এবাদতেই—উপলব্ধি হতে পারে মাহুতি-

প্রজ্ঞা। নাছ অর্থ ঐ মানব, তার থেকে মানবিক সংগুণ-জ্ঞান-স্তরের প্রথম স্ফুরণ, তাতে করেই জড়জীবউদ্ভিজ্জ এবং সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির ঐ অবুদিয়াত-রহস্য বোধগম্য হয়, বিশ্বরূপ-দর্শন বিশ্ব-গুণ-জ্ঞান-শান হাচ্ছেল যার ক্রমশঃ অন্তর্গত, আয়ত্তাধীন। সংসারের মায়াচক্রে আর একেবারে ভুলে থাকা নয়। ভুলে পাপ কখনো হয়ে পড়লেও অনুতাপের আর অন্ত থাকে না, তা-ই নাফছ লাওয়ামা। তার এবাদতও তাই উন্নত পর্যায়ের, প্রেম পর্যায়ের, কেবল রবুবিয়ত (প্রভুত্ব) ও অবুদিয়ত (দাসত্ব) পর্যায়ের নয়, আশেক মাশুক পর্যায়ের অর্থাৎ ক্রমবিবর্তনে আত্মা তার উৎস-মূল পরমাত্মার সন্ধান পেয়ে সেই আকর্ষণে—রাবেতায়—জেকের ফেকের—মোরাকেবা মোশাহেদা জেকের করচে আপছেআপ, স্বভাবজঃ স্বভাবতঃ। আরো বিবর্তনে হাকিকতে নাফছ মুৎমায়েন্নার আরো উন্নত অর্থাৎ উন্নততর পরিক্রমা—সাধনা (রিয়াজত)। আর প্রজ্ঞার দিক দিয়ে নাছুতি অভিজ্ঞতার পরে মলকুতি অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালবর্তী ফেরেশতা তথা সর্ব আরওয়াহ্-জগতের অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি। অতঃপর মারেফাতে নাফ্ছ মুল্হেমার অর্থাৎ আত্মার পরমাত্মার সংগে চিরস্থায়ী যোগাযোগে (এলহাম, নবীদের বেলা ছিলো অহি—ঐ এলহাম ও অহি বিজড়িত হয়ে) উন্নততম সাধনা, সিদ্ধি। প্রজ্ঞার দিক দিয়ে জাবারুত অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে অস্তিত্ববান আত্ম দর্শন, তত্ত্ব দর্শন, এর কায়েম দায়েম হাল-হাকিকতই 'লাহুত', 'হাহুত',—বলে' ক'য়ে বুঝাবার ব্যাপার নয় আদৌ, তবু জবাব (২) এর 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্ট' থেকে যতোদূর সাধ্য আরো বুঝে নিন।

আদম-হাওয়ার ঐ স্বর্গ বিচ্যুতির অর্থাৎ বিকর্ষনের পর আকর্ষনে স্বর্গ পুনঃ প্রাপ্তির, খাজা খিজিরের ঐ আত্মশুদ্ধি ও সিদ্ধির, হযরত মুছা (আ।), ইছা (আ), হযরত মোহাম্মদ (স),

এমন কি তপোবনের প্রকৃত প্রজ্ঞা পারমিতায় পূর্ণ মুনী ঋষিদের সেই একই চিরন্তন সাধন ভজন ঐ জেকের ফেকের, ক্রম বিকাশ ও বিবর্তনে তার ক্রম রূপ বদলাক, তাতে কী! আসল আদত আদি অকৃত্রিম অনন্ত চিরন্তন তার সত্তা তো ঐ।

বস্তুতঃ তপোবনের কথা বলায় কি এখনও উষ্মা প্রকাশ করবেন? একটু আগেই তো দেখ্‌লেন আল্লাহ্‌ আসলে সব মানুষ মিলে এক জাতি, এক জাতিয়তাবাদের কথা বলেছেন; যা যা এখ্‌তেলাফ তা দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। ভেজাল প্রক্ষেপ দূর করলে, করতে পারলে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধও মূলতঃ সেই এক কথাই বলে গেছেন, এক কাযই মূলতঃ করে গেছেন। জনসাধারণ কালক্রমে—স্বভাবতঃ প্রকৃতি-পুজারী, পুতুল পুজারী বলে'—তাঁদের ধর্মকে বিকৃত বিপর্যস্ত করে ফেলাক, সেজন্য তাঁরা তো আর দায়ী নন। হযরত মোহম্মদ (স) শেষমেশ যেমন মধ্য প্রাচ্যের উপরোক্ত পয়গম্বরদের, তেমনি পাক ভারতের, এমন কি দুনিয়ার অপরাপর অংশের যে কোন দেশ কাল জাতির পয়গম্বরদের প্রবর্তিত ঐ একই মৌলিক ধর্মের বিকৃতি বিপর্যয় বিদূরণ করে গেছেন। কোন ধর্মকেই তাই একেবারে অসত্য অসার ভাববার কোন কারণ নেই, বরং ভেজাল প্রক্ষেপ বাদে সকলই আবার সত্য সুন্দর সুমংগলময় হয়ে দেখা দিতে পারে, তা দেখুন পরবর্তী প্রসংগে; কেবল পূর্ণতা নিশ্চয়ই আখেরি জমানার এই ইছ্‌লামে [তরিকত, হাকিকত, মারেফাতে]। আর শরিয়ত-উক্ত সৎ শুভ কাযের ছওয়াব, অর্থাৎ পুন্য-ফল এবং পাপের প্রতিক্রিয়া প্রতিফল—যথাক্রমে ইহ-পরজীবনে বেহেশত দোযখ তো সকল ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই সমান, তার আভাস নিন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'পাপ পুন্য দর্শন' প্রসংগে এবং এবিষয়েও পূর্ণ প্রজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করতে হবে 'আত্ম দর্শন তত্ব দর্শন' গ্রন্থের, বিশেষ করে তার 'বেহেশত-দোযখ' অধ্যায়ের।

কোরআন এবং প্রকৃত ছহি হাদিছ থেকে তার আরো নজির

নিন, বিচার বিশ্লেষন দেখুন, বুঝতে সুবিধে হবে।

و إذ اعتزلتموهم و ما يعبدون الا الله فاوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة و يهيئى لكم من امركم مرفقا -

অইজ্বে তাযালেতোমুহুম অমা ইয়াবুদুনা ইল্লাল্লাহা ফা'-ভূ এলাল কাহফে ইয়ান-শোর লাকুম রাববুকুম মেররাহ্‌মাতেহি অইয়োহায়য়ি লাকুম মেন আমরেকুম মেরফাকাঁ।

এবং যখন তোমাদের দূরে সরতে হয় নিজেদের লোক থেকে আর আল্লাহ ছাড়া এরা (কাফেরেরা) যাদের পূজা করে তা থেকে [সেই দ্বিত্ব ত্রিত্ব বহুত্ব পূজা থেকে] তখন গুহায় গিয়ে বসো, তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাঁর (খাস) রহমত প্রশস্ত করবেন এবং তোমাদের এই কার্যে মেরফাক দিবেন।—কাহফ ১৬।

খালি খালি কি বসে থাক্‌তে বলা হয়েছে? তার কোন অর্থ হয়? না, আল্লাহ্‌র জেকের ফেকেরে বস্‌তে বলা হয়েছে? আর দূরে কেন? না, এই চিরন্তন এবাদত রিয়াজত দূরে সরে গিয়েই সুচারু রূপে করা সম্ভবপর হয়। অন্তত ঐ সব জমানায় দূরে সরে গিয়েই, নির্জনবাস অবলম্বন করেই এ সব করা সম্ভবপর হতো। পুতুল-পূজারী, প্রকৃতি-পূজারী অজ্ঞ কাফেরেরা ছিলো এমনি এই সব একত্ববাদী চিরন্তন বিশ্বাস ও তার অনুশীলন চিরন্তন এবাদত রিয়াজতের উপর খড়্গ হস্ত। তার অর্থ আবার এই নয় যে এই নির্জন বাসেই চিরকাল কাটাতে হবে। বরং রছুলুল্লাহ্‌ (সঃ) এবং অনুরূপ বোজর্গরা মাঝে মাঝেই ঐ রকম নির্জনবাসে গিয়ে ঐ জেকের ফেকের করতে করতেই একদা আল্লাহ্‌র দীদারে মেরাজে মিলনে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ খাস রহমত (অনুগ্রহ) ও মেরকাফ (ঐ সম্বল আত্ম দর্শন তত্ত্ব দর্শন) তা-ই। এই রকম মানুষের মাঝে মাঝে নির্জনবাস তাই প্রয়োজন। কিন্তু এই নির্জন বাস অর্থ যে আবার জংগলে যাওয়া আর সেখানে বাস করা নয়, অন্ততঃ এই জামানায় নয়, তা-ও বুঝুন। বাইরে ঘুরে বারো ঘরে বসে তেরো।

জামানার পরিবর্তনে অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে পূর্বের জামানার চেয়ে সহন-শীলতা বেড়ে যাওয়ায় আস্তানা বা আশ্রমই, হুজরাই এখন নির্জন বাসের উপযুক্ত স্থান হয়ে রয়েছে, হয়তো একেবারে সংসারের ঝামেলা মামেলা থেকে কিছুটা সংগত দূরে সে স্থান—নিরিবিলি —ঐ পন্থীদের কখনো কখনো একত্রে এবাদত রিয়াজতেরও মওকা, প্রতিষ্ঠান।

ঐ করে করে প্রকৃত কামালিয়াতে পৌঁছে তখনকার হাল হাকিকত আল্লাহর ইচ্ছায়, সর্বক্ষণ সেই প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্যে সম্মিলনে যা-ই হোক, আছহাবে কাহফ সম্পর্কীয় ঐ ধরনের কালাম (ওহি) নাজেল করে' এবং ইতিপূর্বে-উদ্ধৃত খাজা খিজির-জীবন বয়ান করে' বোঝানো হয়েছে। অবশ্য ঐ সম্পর্কে কোরআন-কালামের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝে যতো রকম অলৌকিক অসম্ভব অস্বাভাবিক কিস্সা-কাহিনী তৈয়ার করে রাখা হয়েছে এবং তা বয়ান করে ওয়াজ মজলিসের নামে কিস্সা-কাহিনীর আসর জমানো হয় তা ভুলতে হবে। ঐ আছ্হাবে কাহক অর্থাৎ গুহাবাসীর আরো প্রকৃত তাৎপর্য ও তাত্ত্বিকতা 'সত্য দর্শন' নামক আলাদা পুস্তকে বল্‌বার ইচ্ছে র'লো।

কোরআন-কালামের সংঙ্গে ঐক্য হয় এমন ছহি হাদিছই মাত্র রছুলুল্লাহ (সঃ) মান্‌তে বলেছেন, অনৈক্য হলে তা হাদিছই নয় বলে ঘোষনা করে গেছেন 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধে 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগে তা' দেখেছেন, জবাব (২) এর 'শিল্প সংস্কৃতি (কালচার) কথা 'প্রবন্ধেও তা' পুনঃ দেখ্‌বেন।

কোরআন-কালামের উপরোক্ত তাৎপর্য তাত্ত্বিকতার সংগে ঐক্য সম্পন্ন হাদিছ তা হ'লে নিশ্চয়ই ছহি হাদিছ। তা থেকেই আরো প্রমাণিত হবে আছহাবে কাহাফের মতো, খাজা খিজিরের মতো, হেরার গুহার সাধক—নির্জনবাসে জেব্রাইলের

(আ) তালীম-তায়জ্জোহ-প্রাপ্ত রছুলুল্লাহ্‌র (স)—এসমে তরিকত, হাকিকত, মারেফাত, তথা ক্রম কামালিয়াৎ অর্থাৎ ঐ এবাদত রিয়াজতের পূর্ণতা, প্রাজ্ঞতা, অতি এবং অধি অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

হাদীছঃ আয়েশা ছিদ্দিকার (রাঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ) থেকে শোনা রওয়ায়েতঃ হযরত মোহাম্মদের (সঃ) হেরার গুহায় থাকা কালীন একদা জেব্রাইল (আঃ) এসে বলেন—"পড়ো।" আঁ হযরত বল্‌লেন—আমি লেখাপড়া জানিনে। রছুল বল্‌ছেন—এ কথায় জেব্রাইল (আঃ) আমাকে এতো জোরে চেপে ধর্‌লেন যে, আমার মনে হলো আমার শক্তি লোপ পেয়েছে (তায়জ্জোহ্)। ছেড়ে দিয়ে জেব্রাইল (আঃ) বললেন—পড়ো। রছুল বল্‌লেন—আমি লেখা পড়া জানিনে। একথায় দ্বিতীয়বার জেব্রাইল (আঃ) এতো জোরে রছুলকে চেপে ধরলেন যে, রছুল বল্‌ছেন—আমার বোধ হলো আমার শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে—ছালেকে মযযুব বা বেখোদ অথচ হুঁশ-হাল (জামাল)। ছেড়ে দিয়ে জিব্রাইল (আঃ) বল্‌লেন—পড়ো। রছুল বল্‌লেন—আমি লেখাপড়া জানিনে। জেব্রাইল (আঃ) এ-কথায় তৃতীয়বার রছুলকে (সঃ) এতো জোরে চেপে ধরলেন যে রছুল বল্‌ছেন—আমার মনে হলো যেন আমার দেহ-মন-প্রাণ সম্পূর্ণ অসাড় হয়েছে—মযযুবে ছালেক—সম্পূর্ণ বেখোদ বেহুঁশ হাল (জালাল)। জেব্রাইল (আঃ) ছেড়ে দিলে রসুলের (সঃ) হুঁশ হলো (জামাল-জালাল)। জেব্রাইল (আঃ) বল্‌লেন—পড়ো। রছুহ বল্‌ছেন—উম্মি হ'লেও এবার আমি পড়তে পারলাম—

اقر باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق - اقر و ربك الاكرم - الذى علم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم -

একরা বে-এছমে রাব্বেকা আল্লাজি খালাকা—খালাকাল ইনছানা মেন আলাক—একরা অ রাব্বকাল একরাম—আল্লাজি আল্লামা বেলকালাম—অ আল্লামাল ইনছানা মা লাম ইয়ালাম

পড়ো তোমার সেই প্রভুর নামে যিনি পয়দা করেছেন মানুষকে আলক থেকে—বাহ্য জড়-অতিপরমাণু জার্ম-প্লাজ্‌ম্ আর অধ্যাত্ম অতিপরমাণু মিলন-মিশ্রণে [দেখুন 'সৃষ্টি রহস্য ও পরমাণবিক তথ্যও]—পড়ো, আর প্রভু তোমার মহা-মহিমান্বিত—যিনি শিখিয়েছেন কলমের শিক্ষা—যাবতীয় ব্যবহারিক গুণ-জ্ঞান-বিজ্ঞান বা নবুয়তি-শরিয়তি শিক্ষা—আর শিখিয়েছেন তিনি (বিনা কলমে উপরোক্ত জেব্রাইলী তালীম-তায়াজ্জোহ্‌ বা বেলায়তি প্রেম-প্রেরণা-উপায়ে) যা তারা (মানব-সাধারণ) জানতো না।—আলক ১-৫।

এই বেলায়ত (বন্ধুত্ব) স্তরে কি ভাবে পৌঁছা গেছে, কি ভাবে ঐ ঐশী বাণী 'নবুয়ত' ধারণ করা সম্ভবপর হয়েছে? তার মূলসূত্র, প্রক্রিয়া-প্রণালী, পন্থা বা তরিকত হচ্ছে যথাক্রমে রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের। ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানই হাকিকত, তার পূর্ণতাই মারেফাত [পর প্রসংগে পুরো দেখুন]।

ঐ অতি নিগূঢ় (esoteric) সাধনা জেব্রাইলের (আ) মতো অভিজ্ঞ ওস্তাদ পথ প্রদর্শক (পীর মোর্শেদ) ছাড়া সকলে জানে না বলে', জানতে পারে না বলে' ওরই শুরু-সূচনা বা শরিয়ত(exoteric) সাধনা দেয়া হয়েছে যথাক্রমে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত।

বলাবাহুল্য, কোর্‌আনের আয়াত, ছুরা—এক কথায় ওহি—নাযেল সময়ে চিরদিন রছুলের (সঃ) ঐ উচ্চস্তরের হাল-হাকিকত জামাল জালাল (ছালেকে ময্‌যুব, ময্‌যুবে ছালেক) হতো এবং তার আগে প্রায়ই নিজেকে চাদর দিয়ে, কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে বলতেন, ঢাকতেন। আল্লাহ্‌ এজন্য তাঁকে মুযাম্মিল, মোদাচ্ছির (কম্বল-আবৃত, চাদর-আচ্ছাদিত) বলে' সম্বোধন করেছেন।—দ্রঃ ঐ নামীয় ছুরা। এ জন্য তিনি কম্‌লিওয়ালাও বটেন। আর ছুফীদের কম্বল আবৃত হওয়া বা খেরকা পরা ঐ হাল-হাকিকত থেকেও নেয়া। বলাবাহুল্য, কম্বল ছুফ বা পশমের, তার থেকেও ছুফী। আবার রছুলের মোস্তফা নাম আর ছুফী নাম এক হওয়

মাদ্দা থেকে, অর্থাৎ পাক-পবিত্র মুক্ত, মহাপুরুষই মুস্তফা, ছুফী। উচ্চস্তরে সকল ছুফী আউলিয়ারই ঐ হাল-হাকিকত হয়। যার জীবনে একবারও ঐ হাল-মোকাম 'ওয়াজ্দ—ecstasy' বা প্রকৃত ছলুক ময্যুব অবস্থা জামাল জালাল না হয়েছে তিনি প্রকৃত আউলিয়া, অলিউল্লাহ নন, ফাঁকিবাজ। কারণ কী? কারণ রছুলের(স) যেমন শেখ বা পীর ঐ জেব্রাইল থেকে ফানাফিশ্শেখে আত্ম নূরে আহমদ উজ্জীবনে উদ্ভাসনে ফানাফির রছুলে হয়েছিল ঐ ফানাফিল্লাহ্—আল্লাহ্তে অস্তিত্বহীন অবস্থা, পরিশেষে বাকাবিল্লাহ—ঐ আল্লাহ্তে (ইহ-পরকালে) চিরস্থিতিবান অবস্থা—হাল-হাকিকত, তেমনি প্রত্যেক প্রকৃত—আউলিয়া, অলিউল্লার—ঐ একই প্রক্রিয়া প্রণালী মারফত (রাবেতা, মোরাকেবা মোশাহেদা, জেকেরে) ঐ ক্রম হাল-হাকিকত হাছেল হয়েই হয় রছুলের পুর্ণ নায়েবত্ব, খাঁটি প্রতিনিধিত্ব, প্রকৃত নায়েবে রছুল। এ ছাড়া হবে কী করে'? চিন্তা করে দেখুন। কাজেই ফাঁকিবাজদের কথায় কাণ না দিয়ে, ফাঁকা বুলিতে না ভুলে' প্রকৃত হাল-মোকাম জানুন, চিনুন ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব হাছেলের জন্য সেই পথে চলুন।

হাল-মোকাম। এই হাল-মোকামের অধ্যায় বা স্তর, বলেছি, ঐ চারটি: (১) ফানাফিশ্শেখ—শেখ বা সত্যিকার পীরে নাস্তি অবস্থা, (২) ফানাফির রছুল—রছুল বা প্রেরিত পুরুষে (নূরে আহমদ-মোহাম্মদীতে) নাস্তি বা ছালেকে মযযুব (হুঁশে বেহুঁশ) অবস্থা বা হাল, (৩) ফানাফিল্লাহ—আল্লাহতে নাস্তি বা মযযুবে ছালেক অবস্থা (হাল-হাকিকত), (৪) বাকা বিল্লাহ—হুঁশে বে-হুঁশে আল্লাহতেই স্থিতিবান হাল-মোকাম—ছালেকে মযযুব, মযযুবে ছালেক অবস্থা-অবস্থিতি। এ কোরআন-হাদিছ এবং সর্ব সত্য ধর্মের, ধর্মগ্রন্থেরই অতি নিগূঢ় (বাতেন—esoteric) হাকিকত মারেফাত—মূলতত্ত্ব, গুণ, জ্ঞান, শান (জামাল জালাল)। আর

শরিয়ত হচ্ছে, এরই জাহের (exoteric) বিষয়-বস্তু, বিভাগ।—পরে 'বেলায়ত নবুয়ত' প্রসংগে পুরো পুরি দেখুন।

এক নজরে এখন ঐ 'জামাল জালাল' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিন, বুঝতে আরো সুবিধে হবে।

যে পরমাত্মার অস্তিত্ব-মূল থেকে আত্মা এসেছে তা মহাতেজোময়। তার মহাতেজের স্বভাবতঃ দুই প্রকৃতি: এক—শান্ত তেজোময় প্রকৃতি। আরবীতে তাকেই বলা হয়েছে জামাল—সূর্যের যেমন শান্ত সৌন্দর্যময় জ্যোতিচ্ছটা এ-ও অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয়—রুদ্র তেজোচ্ছটা। আরবীতে বলে জালাল—সূর্যের যেমন দারুণ রুদ্র সুন্দর তেজস্ক্রিয় ছটা, এ ও তেমনি অনেকটা। [বোঝাবার জন্য মাত্র মেছাল দেওয়া গেল, আসলে সব রকম তুলনা উপমা রহিত, অতীত]। পরমাত্মার সংগে আত্মার ঐ জামালী মিলনে শান্ত হুঁশে-বেহুশ সৌন্দর্যচ্ছটা—ঐ ছালেকে মযযুব, ঐ জালালী মিলনে রুদ্র সৌন্দর্যচ্ছটা—বেহুঁশে-হুঁশ ঐ মযযুবে ছালেক হাল-মোকাম প্রকাশ পায়—অতিঅভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, বলে কয়ে বোঝাবার বোঝবার বিষয়বস্তুই নয়।

অবশ্য ঐ আলা-দরজায় না পৌঁছেও ঐ রকম খাঁটি ওলি আবদাল গাউছ কুতবের সত্যিকার পদাংক অনুসারী তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) হিসাবে ঐ আদি অকৃত্রিম অনন্ত অধ্যাত্ম পথ (তরিকত) দেখাতে বোঝাতে, হাকিকত-মারেফাত-জ্ঞান পরিবেশন করতে পারেন বটে, দেখান বটে। তজ্জন্য পূর্বাহ্নে সে সনদ গ্রহণ করতে হয়, পেতে হয়, পাওয়ার উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে হয়।

এখন পরবর্তী 'বেলায়ত নবুয়ত' প্রসংগ এবং 'পরিশিষ্ট' পড়ে জীবনের এই একান্ত জরুরী অথচ বহু বিতর্কিত 'তাসাউফ' (ছুফীবাদ) অর্থাৎ আত্মধর্ম ও বিবর্তন সম্পর্কে মোটামুটি আরো ওয়াকিব নিন, ওয়াকিবহাল হউন।

বেলায়ত-নবুয়ত

ওলি থেকে বেলায়ত। ওলি অর্থ বন্ধু, সুতরাং বেলায়ত অর্থ আল্লাহর নৈকট্য, বন্ধুত্ব, ঐ পন্থা। নাবা অর্থ সংবাদ আনা, তা থেকে নবী অর্থ সংবাদ বাহক, নবুয়ত অর্থ সংবাদ বাহনের কায। বেলায়ত-যোগে আল্লাহর নৈকট্য, বন্ধুত্ব লাভ করে' সাধারণের আচরণীয় প্রারম্ভিক ধর্ম শরিয়তের সংবাদ বাহনই নবুয়ত, ঐ সংবাদ বাহকই নবী।

নবীদের এ ভাবে দুই কার্য ছিলো—বেলায়ত এবং নবুয়ত। হযরত মোহাম্মদে (সঃ) ঐ নবুয়ত খতম বিধায় অর্থাৎ আর নতুন কোন শুরু সূচনার ধর্মমূলক সংবাদ বাহনের প্রয়োজন না থাকায় নবী আস্‌বেন না ঐ স্বাভাবিক কারণে। কিন্তু বেলায়তের শিক্ষাদীক্ষা-দাতা আসবেন, আসছেন, কেননা শিল্প-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতো হাতে-কলমে ওর শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং ঐভাবে ওর নাম দেয়া যেতে পারে অধ্যাত্ম দর্শন ও বিজ্ঞান (কার্যকর প্রজ্ঞান)। নবুয়ত ওরপর সঠিক লিপিবদ্ধ কোরআন ও প্রকৃত ছহি হাদিছ থেকে ইজ্‌তেহাদ করে নেয়া যাচ্ছে এবং চির দিন যাবে [দেখুন প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসার' পরিশিষ্টে 'মোযাদ্দিদ' প্রসংগ এবং সর্বশেষ প্রবন্ধ শিল্প-সংস্কৃতি (কালচার)-কথার 'পরিশীলনে' 'ইজ্‌তেহাদ—দৃষ্টান্ত' প্রসংগ]।

সুতরাং শরিয়ত আগে, না মারেফাত আগে এ প্রশ্নের জবাব এই পর্যায়ে হয়ে যায়। নবীদের বেলা মারেফাত তথা বেলায়েত ছিলো আগে, তাঁর দ্বারাই আল্লাহ্‌র সংগে যোগাযোগ সাধন করে', বন্ধুত্ব হাছিল করে' তাঁর থেকে ওহী যোগে ভেজাল প্রক্ষেপ-মিশ্রিত শরিয়তের তথা নবুয়তের করতেন সংস্কার, সংশোধন। কিন্তু ঐ শেষ সংস্কৃত, সংশোধিত জামানায় আর তো নতুন শরিয়ত তথা নবুয়তের দরকার করে না। কিন্তু বেলায়তের তথা মারেফাতের দরকার আছে, সুতরাং তজ্জন্য যে ওলি, আবদাল, গাউছ, কুতব,

মোযাদ্দিদ আসছেন এবং আসবেন তাদের জন্ম এবং প্রাথমিক জীবন তো কাটে এবং কাট্‌বে ঐ সংস্কৃত, সংশোধিত শরিয়ত তথা নবুয়তের মধ্যে, সুতরাং তাদের জন্য আর মারেফাত তথা বেলায়েত আগে নয়, শরিয়ত তথা নবুয়তই আগে। তারপর বেলায়তের রাস্তা তরিকত পেলে, হাকিকত ঢুরে' মারেফাতে (বেলায়তে) পূর্ণ প্রাজ্ঞ, কামেল হলে ঐ শিক্ষা-দীক্ষা তো দিবেনই, দেনই, ঐ শরিয়তে তথা নবুয়তে ভেজাল প্রক্ষেপ ঢুকে-টুকে কিছুটা বিকৃত, বিপর্যস্ত হয়ে থাক্‌লেও ঐ শেষ সঠিক লিপিবদ্ধ ঐশী গ্রন্থ আল্‌কোরআনের দেশ কাল, কখনো কখনো পাত্র উপযোগী ব্যাখ্যা (তফসির) তাবীল (তাৎপর্য) দিয়ে এবং তার সমর্থনে বাছাই-টাছাই করে' প্রকৃত ছহি হাদিছ তুলে দিয়ে ঐ ভেজাল প্রক্ষেপের সংশোধন সংস্কার সাধন করে' ঐ বিকৃতি, বিপর্যয় দূর করে যাবেন, দূর করে যান।

এখন, হেরার গুহা থেকে শুরু করে' আঁ। হযরতের তামাম জীবন কোরআন-হাদিছ থেকে আমরা যা আগাগোড়া দেখালাম, বিশেষ করে' 'আছহাবে কাহফ' এবং 'খাজা খিজির-জীবন-রহস্যের' আলোকে সকল প্রকৃত অধ্যাত্ম সিদ্ধ পুরুষের (বোজর্গানেদীনের) অতি-অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি আমরা দিবালোকে টেনে এনে যা' বোঝালাম তা পড়ে,' জেনে এবং বিশ্বাস করে' কেউ কি কখনো চিন্তা করতে পারেন যে মুসলিম তাছাউফ (ছুফীবাদ) তথা এলমে তরিকত, হাকিকত, মারেফাত—এক কথায় এল্‌মে লাদুন্নি, মেনহাজ মারুফ —বৌদ্ধ, বেদান্ত, ম্যানিকীয়, নিউপ্লেটোনিজম কি বাউল নামক কোন মতবাদ, কি ধর্ম থেকে ধার করা—ইসলামে প্রক্ষেপ বিশেষ? না, এ-ই হচ্ছে ইসলামের আসল সত্য, প্রাণবস্তু; বাইরেরটাই বরং দেহ—যুগোপযোগী—ইজতেহাদ মারফত দেশ-কালোপযোগী? অবশ্য এ আত্মার ধর্ম বলে এবং আত্মা চিরন্তন এক বলে'—এক স্বভাবজ বলে'—যুগের যুগের অনুরূপ

আত্মিক ধর্মের সংগে—স্বভাব ধর্মের সংগে ওর মিলঝিল স্বতঃ, স্বাভাবিক। তাতে করেই না বুঝে একটা আর একটা থেকে ধার করা, প্রক্ষিপ্ত মনে করা হচ্ছে। কী ভ্রান্তি!

আর এও কি বল্‌তে পারেন যে আঁ হযরতের ওফাত শরীফের প্রায় ৪৫০—৫০০ বৎসর পরে আবির্ভূত ইমাম গাজ্জালীর (র) দৌত্যের কারণে ঐ সুফীমত ও শরিয়তের সমন্বয় হয়েছে [দ্রঃ পারশ্য প্রতিভা, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৬৪, ৮৪ পৃঃ, ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ ও যুক্ত সংস্করণ, ১৯৬৫, ৩৭৭—৩৮০ পৃঃ] ? না, আঁ হযরতের হেরার গুহার জীবন থেকে কিংবা তারো পূর্ব থেকেই 'বাতেন এল্‌ম', 'ছিনার এলম' হিসাবে 'ও' চিরকালই ছিলো ও আছে। বরং ঐ নবুয়ত বা শরিয়ত আঁ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির অর্থাৎ ঐ বেলায়ত (বন্ধুত্ব-লাভ) যোগে নবী হওয়ার প্রায় একাদশ দ্বাদশ বৎসর পরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা ও প্রাথমিক (শুরুর) ধর্মবোধ ও করনীয় হিসাবে মে'রাজ শরীফেই মাত্র নাজেল হয়েছে, তা পূর্বেও কতোবার বলেছি, আরো কতো বল্‌তে হবে। আর বন্ধুত্ব স্থাপন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার যোগাযোগ না হলে তাঁর সংগে কথাবার্তা কহা যায় কি ভাবে এবং সংবাদ আদান প্রদানই বা করা যায় কিরূপে? রছুলুল্লাহ্‌র (স) হেরার গুহায়, মুছার (আ) কোহেতুরে প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে যাওয়া, নির্জন বাস করা কেবল শুধোশুধি নিজেদের খামখেয়ালী হিসাবে নয়, বরং পরমাত্মা থেকে প্রত্যক্ষ এক অনিবার্য আকর্ষণেই তাঁদের ঐ জনসাধারণের থেকে কখনো কখনো দূরে সরে গিয়ে সাধনা করতে হয়েছে। ঐ স্বাভাবিক আকর্ষনেরই নাম রাবেতা অর্থাৎ সম্বন্ধ-স্থাপন-মূলক যোগানুভূতি (প্রেম), এবং যার জন্য ঐ আত্মার ঐ রকম অনুভূতি জাগে তার স্বাভাবিক তার জন্য জাগে ধ্যান, জ্ঞান-গবেষণা আরবী মোরাকেবা; জাগে স্বাভাবিক

দর্শন-স্পৃহা, হয় অন্তর্চক্ষে (intuition এ) অধ্যাত্ম জ্যোতি বা নুর (রূপ) দর্শন, আরবী মোশাহেদা; আর ঐ সব কারণেই স্বভাবতঃ তার জন্য হয় অন্তর থেকে, আত্মা থেকে গুণগান, যে দেশে যে ভাষায়ই তা হৌক, আরবী নাম 'জেকের'। এই-ই পৃথিবীর সকল দেশে নানা পরিবেশে নানা নামে নবী, পয়গম্বর রছুল, এমন কি অবতার কল্পিত ব্যক্তিদের আসল আদত ধর্ম। তাঁদের থেকেই ফকির, দরবেশ, মুনী, ঋষি, রাহিব—এক কথায় প্রকৃত ছুফী, মিষ্টিকদের (mystics), রহস্যবাদী মানুষদের—আত্মার আসল চিরন্তন ধর্ম। কেবল দেশে দেশে কালে কালে আত্মার ঐ একান্ত সাধন-ভজন করতে গিয়েই দোয়া দরুদ, মন্ত্র তন্ত্র, কি গীতবাদ্য প্রভৃতি ওর সাহায্য হিসাবে, অনুসংগ করে নিতে গিয়েই নানা রকমফের, নাম-ধাম হয়েছে। আসল চির কাল এক আছে ও থাকবে, তার বিশেষ বিচার ও বিশ্লেষন দেখুন 'পরিশিষ্টেও'।

এ পর্যায়ে 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ইস্‌লামিয়াৎ প্রসংগের ৪নংএ উত্থাপিত সর্বজনীন, বিশ্ব-জনীন ধর্ম-সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব হবে এই ভাবে: এই সূর্যের অপর কোন গ্রহে, কি উপগ্রহে, কিংবা অপর সূর্যের কোন কোন গ্রহে কি উপগ্রহে এই পৃথিবীর মানুষের মতো ক্রমবিবর্তিত, বিকশিত সভ্য মানুষ থেকে থাকলে তাদেরও তো ধর্ম ঐ স্থান কালে, কি স্থানকালের অতীত আত্মার একান্ত অনুভূতি, উপলব্ধি ও অতিঅভিজ্ঞতা-মূলক ঐ আসল আদত ধর্ম। কাজেই ওয়াকৃত বা সময় নির্ধারনের, কি কোন্ কোন্ মাসে কোন্ কোন্ ধর্মানুষ্টান, মাস-ব্যাপী ছিয়াম (রোজা) কি হজ্জ-জাকাত-ব্রত পালন, কি অন্য ধর্মে অন্য সময়ে, কি মাসে ধর্মানুষ্টান ও পর্ব প্রতিপালন তো হতে পারে ঐ সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ধর্মের, ধর্মানুষ্ঠানের যুগে যুগে দেশে দেশে ঐ নানারূপ বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ইতিপূর্বে ঐ হাল

মোকাম প্রসংগে উল্লেখিত ঐ বাতেনের (esoteric এর) জাহের (exoteric) ভাগ, বিষয় বস্তু। সে সম্বন্ধে আরো পরে দেখুন।

বিশ্ব-ধর্ম, সর্বজনীন ধর্ম ঐ স্থানকালেও, কি স্থানকালের অতীতেও অন্তরের স্বাভাবিক করণীয় কর্ম। এ দার্শনিক পর্যায় হিসাবে কোন নবী, পয়গম্বর, কি অবতার কোন দেশের, কোন কালের, কিংবা বিশ্বের জন্য এ কথারও কোন অর্থ হয় কি? হয় না। অবুঝ জনসাধারণের কল্পিত ভেজাল, প্রক্ষেপ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ববাদ বাদ দিলে, কি প্রয়োজনে দেশ কালোপযোগী সমাজ-ব্যবস্থা, কি কখনও কখনও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা-দান বাদ দিলে ঐ চিরন্তন অধ্যাত্মবাদের দিক দিয়ে তিনি সকল দেশের, সকল কালের, সকল পৃথিবীর। এ অধ্যাত্ম দার্শনিক পর্যায় হিসাবেই আল্ কোরআনে বলতে বলা হয়েছে ঃ

لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون

লা নুফাররেকো বাইনা আহাদে মেনহুম অ নাহনু লাহু মুছলেমুন —

আমরা [ঐ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও দর্শন হিসাবে] তাঁদের [অর্থাৎ পয়গম্বরদের] মধ্যে কোন পার্থক্য (দেখিনা, অতএব) করিনা, আর (এই আদি অনন্ত অধ্যত্ম ধর্ম হিসাবে) আমরা তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান [আত্মার দিক দিয়ে ঐ একই স্বাভাবিক ধর্ম কর্মে আল্লাহ্‌তে সোপর্দ, আত্ম সমর্পিত, সেই চিরন্তন একই পরমাত্মা-প্রাপ্তির সেই চিরন্তন একই আত্মার ধর্ম ইস্‌লাম -অবলম্বী]।—আলে ইমরান ৮৩।—দেখুন—'শিল্প সংস্কৃতি-কথা' 'উপসংহার' প্রসংগও।

و ما ارسلنك الا رحمة العلمين

অ মা আরছালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন ঃ—

এবং আমরা (পরআত্মা, ঐ জীবন্ত আত্মা, জলন্ত-বাতি-সদৃশ্য পবিত্র আত্মা জেব্রাইল-যোগাযোগে) তোমাকে (রসুলকে দ:) পাঠিয়েছি সমগ্র দুনিয়ার রহমত স্বরূপ।—আম্বিয়া ১০৭।

আসলে রসুল এখানে ব্যক্তিগত কেউ নন, নূরে আহমদ-মোহাম্মদী। তাঁর মাধ্যমে ঐ সব দেশকাল ও পৃথিবীর আত্মা-পরমাত্মার তরিকত, হাকিকত, মারেফাত বলা হচ্ছে। বিষয়টি সেভাবে বিচার না করলে গ্রহে গ্রহে উপগ্রহে উপগ্রহে মানুষের অস্তিত্ব যখন প্রমাণিত হবে তখন এই পৃথিবীর মাত্র সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রছুল ধারনা ভুল প্রতিপন্ন হবে, হতে বাধ্য। অতএব অন্ধ-বিশ্বাসের মোহে ভুলে' অযৌক্তিক কিচ্ছা-কাহিনীর অবতারনা না করে' বিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ব্যাখ্যাই হবে এসব ক্ষেত্রে সংগত তফসির ও তাবীল (তাৎপর্য)।

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليو م الاخر و ذكر الله كثيرا -

লাকাদ কানা লাকুম ফি রছুলুল্লাহে উছওয়াতুন হাছানাতু লেমান কানা ইয়ারজুল্লাহা অল ইয়াওমাল আখেরা অ জাকারাল্লহা কাছিরা—

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রছুলের (চরিত্র) মধ্যে তোমাদের জন্য যাঁরা আল্লাহকে ও আখেরের দিনকে চাও, আর আল্লাহ্‌র জেকের করো প্রচুর—উছওয়াতুন হাছানা—রয়েছে।—আহযাব ২১।

তফসির : 'উছওয়াতুন হাছানা' মানে উত্তম আদর্শ। —এরূপ উত্তম আদর্শ অনুসরণ অনুকরণেই হয়েছে যুগ যুগ আল্লাহর রহমত, প্রেম, দীদার, মিলন, ফলে আখেরাতেও উচ্চ মর্যাদা। এরূপ চিরন্তন পরমাপ্রকৃতি বা নূরেআহমদকে ধরেই চলে এসেছে যুগ-যুগ সাধনা—ঐ প্রচুর বা অহরহ জেকের ফেকের প্রণালী—যা পূর্বাপর আমরা অতি পরিষ্কার করে বলেছি। আখেরাতের সুখ শান্তি হাছেলও হয় প্রকৃত ঐ মহা প্রেম-প্রেরণা পন্থায়; আর সিদ্ধি—আহাদ আল্লাহর নূরের দীদার (দর্শন) ও মিলনও মিলে ঐ ভাবে। কাজেই ঐ উছওয়াতুন হাছানার সংগেই তা উল্লেখিত; সংশ্লিষ্ট যে! এ ভাবেই শেষ হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এই পৃথিবীতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব-বাদ-মূলক পৌত্তলিকতা-রহিত

এক সর্বাংগ-সুন্দর সুপ্রকাশ। সেখানেই অবশ্য থেমে রননি, থাক্‌তে পারেন না। ঐ উম্মতমণ্ডলী-মধ্যেই বিভিন্ন ছুরতে, এছমে, লকবে জামানায় জামানায় ওঁরই মূলতঃ প্রকাশ এবং ঐ উত্তম উত্তম আদর্শ (আহমদ) ধরেই আসলে তরিকত, ঐ ঢুরেই প্রথমতঃ পুরো ঐ পরমা প্রকৃতি আহমদ-হাকিকত, আর তাতে ক'রেই ক্রমশঃ পরম পুরুষ আহাদ-আল্লাহর দিকে অগ্রগতি, অভিসার, পরিশেষে ঐ পরিণতি মারেফাত। কাঁচা মেছালে বলা যায় পরিচয়ে পরিণয়। কাজেই এ সর্বজনীন, বিশ্ব-জনীন।

আশা করি যে তথ্য (থিওরী) ও তত্ত্ব (অধি-দর্শন, অধি-বিজ্ঞান) আমরা প্রকাশ করচি তার ধারনা এখন পরিস্ফুট ও পরিস্কার হয়েছে। মূল ঐ একই নূরে আহাদ (পরম পুরুষ) থেকে নূরে আহমদ (পরমা প্রকৃতি) প্রকাশ পায় বলে বিশ্বের সর্বত্রই ঐ পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির একই জড়-দৈহিক (physical) ও আত্ম দৈহিক (astral) বিকর্ষণ, পরে আকর্ষণ—স্বভাব-ধর্ম-কর্ম, পরিশেষে মে'রাজ, মিলন।—দেখুন পরমাণবিক তথ্যও ৪০-৫০পৃষ্ঠা।

যে পৃথিবীতে (গ্রহে, কি উপগ্রহে) যে-দেশে, যে-কালে ওঁর ঐ দৈহিক ও আত্মিক চরম পরম প্রকাশ হোক না কেন, তা মূলতঃ সমগ্র ছুনিয়ারই অর্থাৎ ঐ গ্রহ, কি উপগ্রহেরই মানবীয় ঐ একই দৈহিক ও অতি দৈহিক (Physical and Astral), ঊর্ধ দৈহিক বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান—আত্ম দর্শন, তত্ত্ব দর্শন। বলা বাহুল্য, এর পরবর্তী জবাব (২) এর 'রকেটের রহস্য' ও 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধ দ্বয়ে দেখতে পাবেন দৈহিক অতিপারমাণবিক উজ্জীবন উদ্‌ভাসন অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি-মুক্ত অতি এবং অধি প্রকাশ ছাড়া অতি দৈহিক ঊর্ধ দৈহিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অতি-পারমাণবিক —উজ্জীবন—উদ্‌ভাসন (সুপ্রকাশ) হয়ই না, হতেই পারে না। সুতরাং যুগে যুগে আবিস্কৃত ও জানা সমগ্র-ছুনিয়ার (পৃথিবীর) রহমত (দয়া প্রকাশ) স্বরূপই ঐ রছুল অর্থাৎ নূরে আহমদ ও

তৎমারফত নূরে আহাদের ঐ মৌল আত্ম প্রকাশ, আবির্ভাব, কার্য কারিতা। কারণ, তাঁর মারফত্ তখনকার জানা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের হেদায়েত —ঐ আসল সৎ-পথ-প্রাপ্তি।

এখন শুধু এই পৃথিবীর জানা অজানা অঞ্চল সমূহের কথাই ধরুন। নবুয়ত খতম হবার মানে কী? মানে এমন এক জামানায় হযরত মোহাম্মদের (সঃ) ঐ মৌল আবির্ভাব, আত্মপ্রকাশ যে যুগের যুগের সমাজ-ব্যবস্থা দানের, কি কখনও কখনও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দানের মূলসূত্র আল্‌কোরআনে, কি ছহি হাদিছে গ্রথিত। তার থেকেই ইজ্‌তেহাদ মারফত যুগের যুগের ঐ চাহিদা মিটানো যাবে। কিন্তু আত্মার পরমাত্মা প্রাপ্তির ধর্ম চিরন্তন। সে জন্য বেলায়তের পথ প্রদর্শক ওলি (ওলি থেকে বেলায়ত) আসছেনই, আসবেনই।—'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট এবং এ প্রবন্ধের পরিশিষ্টেও তাই মোজাদ্দিদ-রহস্য প্রকাশ করতে হয়েছে, তা দেখুন।

এখন, ঐ চিরন্তন আত্মার চিরচলন্ত এবং জ্বলন্ত ধর্ম, কি ধর্মীয় সাধনা যদি আঁ হযরতের হেরার গুহার জীবন, কি তারো পূর্বের জীবন থেকে না থেকে থাকে, তবে তা কী করে' তাঁর এন্তেকালের (বেছাল শরীফের) ৪৫০—৫০০ বৎসর পরে ইস্‌লামে অপর বোজর্গান দ্বারা সংযোজিত হয় এবং তা' মুসলিম সমাজ ও অন্যান্য মুসলিম বোজর্গরা মেনে নিবেনইবা কেন? মেনে নিয়েছেন, কারণ 'ও' আসলে আদপে গোড়া থেকেই আছে। কিন্তু একদল মুসলিম বোজর্গ যথা মনসুর হাল্লাজ (রঃ) ঐ আত্মা পরমাত্মার একান্ত গোপনীয় যোগাযোগের অনুভূতি, উপলব্ধি, একাত্মতা অর্থাৎ তওহিদ (একত্ব) বিশ্বাসের কার্যকারিতা প্রকাশ্যে 'আনাল হক' আমিই একমাত্র সত্য (আল্লাহ) প্রভৃতি রকমারি বুলিতে ঘোষনা করে'ফেলেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও আল্লাহ অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মায় পূর্বোক্ত নাফছআম্মারা অর্থাৎ ষড়রিপুর কারণে রয়েছে বিভেদ, বিস্তর তফাৎ। সুতরাং

হোসেন মনসুর হাল্লাজের বেলা ঐ অনুভূতি, উপলব্ধি খাঁটি এবং সত্য হলেও তা' ঐ প্রকাশ করে দেওয়ায়, বলে ফেলায় সাধারণ মানুষ না বুঝে দেখাদেখি আবার বলে ফেল্‌তে পারতো, কিংবা অবতারবাদী মানুষপূজা, মূর্তিপূজার দিকে আবার ঝুঁকে পড়তে পারতো। তাই মহামানুষ মনসুর হাল্লাজের (রঃ) বেলা ঐ অতি সত্য সংগত ভাষণ হলেও প্রাথমিক অর্থাৎ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইসলামের (শরিয়তের) কাঠামো—আকিদা, আচরণ—ঠিক রাখতে তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হলো—তিনিও ঐ কারণে স্বেচ্ছায় আত্ম বিসর্জন দিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়েই একদল তথাকথিত বোজর্গ আবার ঐ এল্‌মে লাদুন (এলমে তরিকত, হাকিকত, মারেফত) ইসলাম-বহির্ভূত অর্থাৎ বাইরের নিওপ্লেটোনিজম, ম্যানিকীয়, বেদান্ত-দর্শন, গ্রীক দর্শন প্রভৃতি থেকে ধার করা বলে' জোর প্রচারণা চালিয়ে ইসলামের থেকে ওকে খারিজ করতে উঠে পড়ে লাগ্‌লেন (এ জামানায় আবার বলা হচ্ছেঃ 'ও' হচ্ছে হিন্দু বৌদ্ধ নাথ যোগীদের 'বাউল ধর্ম' থেকে ইস্‌লামে প্রক্ষিপ্ত) * যা হোক

---

* ইস্‌লামের ঐ তাসাউফের অনেক পরে, বিশেষ করে তারি প্রভাবেই বাঙ্‌লার হিন্দু বৌদ্ধ নাথ যোগিগণ পাঠান-মোগল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম মতবাদ ও বেদান্ত দর্শন মিলিয়ে ঝিলিয়ে বাউল ধর্মের সৃষ্টি করেন ও প্রচার করেন। ছুফীমতবাদের প্রভাব থাকলেও ওযে ছুফী মতবাদ থেকে অনেকটা আলাদা জিনিস তা অন্য আর এক খানা পুস্তকে বোঝাবার বাসনা রইলো। তবে ছুফীবাদ আত্মার ধর্ম বলে এবং আত্মা চিরকাল এক বলে সকল ধর্মের সংগেই তার মিলঝিল তো স্বাভাবিক, স্বতঃ তা ইতিপূর্বেও বলেছি। সংক্ষেপে আর একটু আভাস দিলেও ছুফীবাদ ও বাউল ধর্মের ঐক্য ও পার্থক্য বোঝা যাবে।—আমরা আগাগোড়া বুঝিয়েছি যে আত্মার ধর্ম পরমাত্মার বিকর্ষনে আকর্ষনে। ছুফীবাদীরা এবং চিরকাল ঐরূপ আত্মার ধর্মবাদীরা তাই পরমাত্মার দীদার-মিলন-প্রাপ্ত সংগুরু বা মোর্শেদের সাহায্য নেন। এ যেন জলন্ত বাতি থেকে নিভন্ত বাতি জ্বালানো। বাউলরা এবং ঐ ধরনের এক শ্রেণীর ফকিরেরা ঐ সাহায্য তো নেনই, তদুপরি তাঁরা—পুরুষেরা রমণীর ও রমণীরা পুরুষের—সাহায্য অর্থাৎ প্রেম-প্রেরণা নিতে কোশেশ করেন সাধক সাধিকা হিসাবে। বলা বাহুল্য তাতে যে অনেক সময়ে তাঁদের পতনই হয়, কামে থেকে নিষ্কামী হাল হাকিকত বড়ো একটা হাছেল হয় না, হতে পারে না, তা আমরা 'বাউল দর্শন' পুস্তকে প্রতিপন্ন করেছি। ওর আরো বিকৃতির আভাস দিয়েছি 'শিল্প সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের 'পরিশীলনে' 'স্থূল, প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধি' প্রসংগে, তা দেখুন।

সেই জমানায়ও ওকে কোণ ঠাসা করে' রাখা হইয়াছিল, ওত-প্রোত জড়িত বিষয়-বস্তুকে তো আর একেবারে বের করে' দেয়া সহজও নয়, সম্ভবপরও নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালীর (র:) মতো মহা প্রতিভাবান ছুফীর আবির্ভাবে আবার যথাকার বস্তু তথাকার সুপ্রমাণিত হলো। বাইরের ভেজাল কিছু ঢুকে থাক্লে তা দূরীভূত হলো। বলা বাহুল্য, বাইরের থেকে ঢুক্তে পারে ওর প্রকাশের ভংগীমায়, প্রকল্পেই মাত্র, আসল আদত ঐ প্রাণের ধর্মে আত্মার ধর্মে, স্বাভাবিক সকল ধর্মেরই অন্তর্নিহিত ঐ করণীয় কর্মে নয়; কারণ 'ও' একেবারেই ভেজালের, প্রক্ষেপের অতীত। প্রাণ থেকে, আত্মা থেকেই ঐ আকর্ষণ (রাবেতা) ঐ ধ্যান-জ্ঞান, গবেষনা (মোরাকেবা), ঐ দর্শন-স্পৃহা, দর্শন (মোশাহেদা), ঐ গুণগান (জেকের) হয় উৎসারিত, ভেজাল প্রক্ষেপ আস্‌বে কোথা থেকে, কিভাবে?—কোরআন ঐ প্রথম তিন কর্মকে ফিক্‌র্ 'ধরে' জেকেরের সংগে একত্রে 'বিশেষ করে' জেকের-ফেকের বলেছেন।—কিন্তু কোরাণিক আয়াত অনুধাবনে ঐ তিন স্তরের আলাদা নামও পাওয়া যাবে, সংক্ষেপে তা এখানে দেখুন:

و ربطنا على قلوبهم اذقامو فقالو ربنا رب السموات و الارض - لن ندعوا من دونه الها لقد قلنا اذا شططا -

অ রাবাত্না আলা কোলুবেহিম ইজ্‌কামু—ফাকালূ রাব্বুনা রাব্বুচ্ছামাওয়াতে অল আর্‌দে-লান্নাদ্‌য়ু মেন দুনিহি এলাহাল্‌ লাকাদ কুল্‌না ইজান শাতাতা...

এবং আমরা তাঁদের (আছহাবে কাহফদের) অন্তরে রাবেতা (সংযোগ বা সম্বন্ধ-স্থাপন-মূলক আকর্ষণ, প্রেম, যোগানুভূতি) দিলাম যাতে করে' তারা শক্ত সুদৃঢ় হয়ে বলেছিল (বলতে পেরেছিল) আমাদের প্রভু সেই আছমান-জমীনের প্রভু (এক-আল্লাহ), আমরা ডাকবো না তাঁকে ছাড়া অন্য প্রভু, নিশ্চয়ই তা হলে আমাদের বলা হবে বড়ো অন্যায় কথা।—কাহফ ১৪।

والنجم اذا هوى - ماضل صاحبكم و ما غوى - و ما ينطق عن الهوى - ان هو الا وحى يوحى-علمه شديد القوى - ذو مرة - فاستوى - وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى - فكان قاب قوسين او ادنى - فاوحى الى عبده ما اوحى - ما كذب الفؤاد مارای

অননাজ্‌মে ইজা হাব্‌আ—মা দাল্লা ছাহেবোকুম অ মা গাব্‌আ—অ মা ইয়ানতেকো আনেল হাব্‌আ--ইন্‌ হুয়া ইল্লা অহিয়ু ইয়ুহা---আল্লামাহু শাদীদুল কুব্‌আ—জুমের্‌রাতেন ফাছতাবআ অ হুআ বেল উফ্‌কেল আ-লা—ছুম্মা দানাফাতাদাল্লা—ফা কানা কাবা কাওছায়নে আও আদ্‌না—ফা আওহা এলা আব্‌দেহি মা আওহা—মা কাযাবাল ফুওয়াদো মা'রাআ

তারার সাক্ষ্য যখন ডুবে যায়, তোমাদের বন্ধু [হযরত মোহাম্মদ (স)] ভ্রষ্ট হননি, কিংবা সুপথ থেকে বিপথে যান নি এবং তিনি আপন ইচ্ছা মতো কিছু বলেন না। 'এ' তাঁর প্রতি নাযেল হয়েছে সেই ওহী ভিন্ন নয়, সুদৃঢ় শক্তিশালী (তাঁর মোর্শেদ—পথ প্রদর্শক জেব্রাইল আ) শিখিয়েছেন। তিনি মহা-জ্ঞান-অধিকারী এবং তিনি দিকচক্রবালে প্রকাশ হলেন (**মোরাকেবা** তথা ধ্যানযোগে প্রথম প্রত্যক্ষ দর্শন, দীদার, যার আরবী নাম **মোশাহেদা**) এবং উচ্চ কিনারায় ছিলেন, তারপর দুল্‌তে দুল্‌তে অর্থাৎ ক্রমশঃ নেমে আসেন [**রাবেতা** অর্থাৎ সংযোগ-সূত্র-বন্ধন, যোগানুভূতি, প্রেম আকর্ষণ-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার ক্রম পরিণতি এমনি মিলনে, মে'রাজে। কিভাবে?] তারপর রলেন দুই ধনুক বা তার চেয়েও কম দূরে, এরপর তার বান্দার নিকট তিনি (ঐ যোগাযোগে—রাবেতার পূর্ণতায় মে'রাজে মিলনে) অহি করেন যা' অহি করবার, অন্তর তার (পয়গম্বরের) ভুল করেনি যা তিনি দেখ্‌লেন অর্থাৎ ঠিকঠাকই দেখলেন।—নাজ্‌ম্‌ ১—১১।

و لقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى

অ লাকাদ রাহু নায্‌লাতান উখ্‌রা ইন্‌দা ছিদরাতেল মুন্‌তাহা—

এবং আর একবার তিনি দেখেন (প্রত্যক্ষ দর্শন ঐ মোশাহেদা লাভ করেন) সীমান্তের বদরি তরুর নিকট।—নাজ্‌ম্‌ ১৩।—আরো বিশ্লেষন দেখুন জবাব [২] এর 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্টে'।

বেলায়তের পূর্ণতায় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পুরো বন্ধুত্ব লাভ করে কিভাবে আল্লাহ্‌র অর্থাৎ পরমাত্মার যোগাযোগে আত্মায় অহি নাযেল হতো অর্থাৎ নবুয়ত লাভ হতো তা ঐ উপরে পরিস্কার বোঝানো হয়েছে। পুনঃ পুনঃ বল্‌তে হয় এখন নবুয়ত খতম অর্থাৎ সামাজিক এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক কোন ঐশী কিতাব এবং ঐ প্রাথমিক ধর্মবোধের নতুন কোন বিধান অর্থাৎ শরিয়ত গ্রন্থ-মারফত নাজেল করবার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঐ একই প্রক্রিয়া-প্রণালীতে বেলায়ত হাছেল হয়, আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ হয়, ব্যক্তিগত কথাবার্তা—বাণী বিনিময়—হয়, কিন্তু তা সকলের জন্য নয় বলে তাকে অহি না বলে' এল্‌হাম বলা হয় এবং লিপি বদ্ধ হয় না, প্রয়োজন করে না। কিন্তু কার্য-কলাপ ঐ একই। ঐ এলহাম ও ওহী নবুয়তের জমানায় ছিলো একই রকম সকম, পরস্পর বিজড়িত। এখন শরিয়তের ইজ্‌তেহাদ তথা দেশ কালোপ-যোগী নতুন নতুন বিধি ব্যবস্থা কোরানের ঐ ওহী এবং প্রকৃত ছহি হাদিছ থেকে নেয়া যেতে পারবে, নেয়া হচ্ছে। তার দৃষ্টান্ত দেখুন জবাব [২] এর শেষ প্রবন্ধের শেষে 'পরিশিষ্টে'। এলহাম ব্যক্তিগত মারেফাতের—অধ্যাত্মবাদের—বিষয়-বস্তু হয়ে রয়েছে, চিরকাল থাকবে, কখনো কখনো ঐ দলগত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছে, চিরকাল করবে।

কিন্তু জেকেরের কথা বলা এখনো বাদ রয়েছে। শতাধিক জায়গায় জেকেরের কথা রয়েছে কোরআনে। কারণ, ঐ তিন অবশ্য করণীয়ের (ফরজের) সংগে অংগাংগী জড়িত, এক ছাড়া আর হয়ই না, হতেই পারে না। অনেক উদাহরণের থেকে মাত্র দুটি উদাহরণই যথেষ্ট :

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

অজকুর্ এছমা রাব্বুকা অ তাবাত্তাল এলাইহে তাব্তিলা

এবং তোমার প্রভুর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামের **জেকের** করো এবং সর্বশূন্য-স্বান্ত হয়ে তাতে মিশে যাও।—মোজাম্মিল ৮।

ঐ তাবাত্তাল এলায়হে তাবতিলা—সর্বশূন্যস্বান্ত হয়ে মিশে যাওয়ায়ই আসলে ঐ রাবেতার পূর্ণতা বা মেরাজ। আর সেই রকম আত্মাই 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' প্রসংগাদিতে বর্ণিত নাফছ মুৎমায়েন্না। তারি কায়েম দায়েম হাল-হাকিকতই নাফছ মুলহেমা। এ সকলই হয় ঐ জেকেরে ফেকেরে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

আলা বেজেক্‌রিল্লাহে তাত্তামায়েন্নোল কুলুব—

জানো কি? আল্লাহ্‌র জেকের (ফেকেরেই) আত্মা শুদ্ধি-শান্তি শান প্রাপ্ত হয়।—রাদ ২৮।

বলা বাহুল্য, আল্লাহর **জেকেরের** সংগে **ফেকের** ঐ তিন অবশ্য করণীয় (ফরজ কায) রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা সব সময়ে সমজড়িত। এক ছাড়া আর হয়ই না, হতেই পারে না। তা আর কতো, কাঁহাতক বলবো। আর ঐ তাৎমায়েন্নো থেকেই নাফছ মুৎমায়েন্না (শুদ্ধি-সিদ্ধি-শান্তি-শান-প্রাপ্ত আত্মা), আর তার কায়েম দায়েমেই তো ঐ নাফছ মুলহেমা—একমাত্র আল্লাহর এলহাম-পরিচালিত প্রকৃত মহা-মানব-আত্মা, অতি-মানব-আত্মা।

এখন জেকের এবং ফেকের নামে ঐ রাবেতা, মোরাকেবা মোশাহেদার কথা একত্রে দেখুন :

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الالباب الذین یذکرون الله قیما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والارض - ربنا ما خلقت هذا باطلا *

নিশ্চয়ই আছমান জমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি দিবার পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে',

শুয়ে (যে কোন সুযোগ-সুবিধে মতো অবস্থায় ও সময়ে) আল্লাহ্‌র জেকের করেন এবং আছমান জমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে ফেকের করেন। প্রভুহে, এই সব-কিছু বৃথা বেহুদা বানাও নি।—আলে ইমরান, ১৮৯—১৯৯। *

এই ফিক্‌র্‌ সাধারণ অর্থে জ্ঞান-গবেষনা যা আমরা সৃষ্টি-রহস্য প্রবন্ধে 'বিশ্ব-বিজ্ঞান—আল্লাহ্‌র কুদরত' প্রসংগে বুঝিয়েছি। তারি গভীরতর স্তরে অর্থাৎ অধ্যাত্ম রাজ্যে ইহ-পরকালীন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি—intuition—অর্থ মোরাকেবা; তার ফল বা গভীরতম স্তর ঐ মোশাহেদা (দর্শন), মূল রাবেতা ঐ যোগানুভূতি, প্রেম-আকর্ষণ (পূর্ণতা অবশ্য মে'রাজ মিলন, তা পূর্বেও বলেছি)। কোরআন জেকের-সংগে একত্রে ঐ তিন গভীর, গভীরতর ও গভীরতম স্তর বয়ান করেছেন। সৃষ্টির ঐ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে বিশেষ করে' প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আল্লাহ্‌ বেহুদা বেফায়দা কিছু বানাননি, তা ঐ 'প্রভুহে এই সব-কিছু বৃথা বেহুদা বানাওনি' কথায় প্রকাশ।

এই আসল আদত ধর্ম জনসাধারণের জন্যই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং ঐ নাফ্‌ছ আম্মারা (ষড়রিপু) সুশাসন-মূলক প্রাথমিক ছবক ও ধর্মবোধ ও করণীয় (ফরজ) রূপ নিলো যথাক্রমে ঐ রাবেতার রূপ ছালাত (পারশী নাম নামাজ), মোরাকেবার রূপ ছিয়াম (পারশী রোজা), মোশাহেদার রূপ হজ্জ আর জেকেরের রূপ জাকাত।—প্রাচীন কালের অন্যান্য ধর্মে হয়তো অন্য রকম রূপ নিয়েছে। কিন্তু তাতে দ্বিত্ব-ত্রিত্ব-

---

* * ইন্না ফি খাল্‌কে চ্ছামাওয়াতে অল আর্দে অ এখতেলাফেল্লায়লে অন্নাহারে লা আয়াতে লেউলিল আল্‌বাব আল্লাজিন। ইয়াজকুরুনাল্লাহা কিয়ামাঁ অ কোউদাঁ অআলা জোনুবেহেম অ ইয়াতাফাক কারুনা ফি খাল্‌কে চ্ছামাওয়াতে অলআর্দ-রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতেলা।—আরো দেখুন 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধে 'বিশ্ব বিজ্ঞান—আল্লাহ্‌র কুদরত' প্রসংগে ৩২ পৃষ্ঠায়।

বহুত্ববাদ-মূলক পৌত্তলিকতা—দেবদেবী পূজা, অগ্নিপূজা, অবতার পূজা, আল্লাহ্‌র জাত পুত্র-কন্যা পূজা—প্রভৃতি নানা ভেজাল ও প্রক্ষেপ ঢুকানোয়ই ইস্‌লাম অতি সতর্কতার সহিত ঐ আসল আদত চিরন্তন আত্মার চির ইহ-পরকালীন ধর্মকে বাতেন এলম (গুপ্তজ্ঞান), ছিনার এলম (অন্তর থেকে অন্তরে, আত্মার থেকে আত্মায় প্রবাহিত প্রজ্ঞা) হিসাবে নির্ভেজাল, নিরংকুশ হেফাজত করে চলেছে।

ফল্গু-ধারার মতো ঐ পন্থা (তরিকত) খোদ আল্‌কোরআনেই আগা-গোড়া প্রবাহিত, তার পরিষ্কার প্রমাণ :

وان لواستقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدقا - لنفتنهم فيه - و من
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا -

অ আল্‌লাবেছতাকামু আলাত্তারিকাতে লা আছকাইনাহুম মায়া গাদাকাল্লেনাফ্‌-তেনাহুম ফিহে—অ মাইয়ুরেজ আন জেক্‌রে রাব্বিহি ইয়াছলুক্‌হু আযাবান ছায়াদা

আর যদি তারা তরিকতে কায়েম থাকে অর্থাৎ ঠিক সত্য তরিকা মতো চলে, চল্‌তে পারে, তবে আমরা (আল্লাহ গায়ব সাহায্য সহকারে) তাদের প্রচুর পানি পান করাই, যাতে এইভাবে তাদের পরীক্ষিত করতে পারি অর্থাৎ সত্য-পথ পেয়ে সাংসারিক বিপথ-গামিতা হতে রক্ষা পেতে পারে, পরীক্ষায় পাশ হতে পারে; আর যারা তাদের প্রভুর জেকের (ফেকের) থেকে ফিরে থাকে তাদের তিনি কঠিন শাস্তির পথ দেখান।—জীন ১৬, ১৭।

ঐ পানি পান করানোর তাৎপর্য হলো : প্রকৃত তরিকতেই মিলে আল্লাহর প্রেম-প্রেরণা-প্রবাহ, আল্লাহর ফয়েজ-রহমত, অবশ্য সকল সময়ে অছিলা-বরাবর। কোরআন-মজিদে ফোর্কানে হামিদে ওকে কাওছার, নাহার, শারাবানতাহুরা (পবিত্র পানীয়) সল্‌সবিল, তাছনিম প্রভৃতি কতো নামেই না বিভিন্ন ছুরায় বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ওর সচরাচর প্রতিশব্দ হচ্ছে আবেহায়াত—জীবন-বারি বা অমৃত, যার কথা আমরা 'মাজমাউল বাহরায়েন' প্রসংগে 'খাজা খিজির' উপলক্ষে উল্লেখ করেছি।

ঐ জেকের (ফেকের) সাধারণ মুখে মুখে, কি মনে মনে মাত্র স্মরণ নয়, তরিকতের প্রক্রিয়া প্রণালী রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকেরই একত্রে প্রতিপন্ন করে। কারণ পরস্পর এ সবই সম-ভাবে জড়িত, এক ছাড়া আর হতেই পারে না। কাজেই ওর থেকে মুখ ফিরায়, ফিরে থাকে, সুদূরে সরে থাকে অর্থ তারা ওর জরুরাত-জ্ঞান বোঝেনি, পথ পায়নি। কাজেই দুনিয়াদারী কার্য-কলাপেই একমাত্র আল্লাহকে ভুলে' গেরেপ্তার থাকে। ফলে তাদের ইহকালে, পরকালে, কি উভয়তঃ একদা কঠোর শাস্তি ভুগে ঐ জরুরাত-জ্ঞান হবে, একদিন তালাস করবে, পাবে। আব-আতশ-খাক-বাদের ভিতর দিয়ে আত্মাকে দুনিয়ায় আসতে হয় বলেই তার ঐ মোহ-মায়া (বিকর্ষণ), কিন্তু তরিকত হলো আকর্ষণ ; তা ঐ প্রকার শাস্তি সর্বনাশ জ্ঞানের ভিতর দিয়ে ছাড়া আবিস্কার, অনুভূতি হয়ই না। বেশ বুঝে দেখবার বিষয়, ব্যাপার।

সংক্ষেপে বলা যায় ঃ সাধারণ মানুষতো স্বভাবতঃ ঐ 'রাবেতা অর্থাৎ আকর্ষণ, প্রেম, যোগানুভূতি অনুভব করে না, কারণ, জগতে সে আসতে গিয়ে জড় দৈহিক যে বিকর্ষণ জন্মেছে, তা স্বভাবত সংশোধিত হয়ে কাটিয়ে ওঠা সময়-সাপেক্ষ। কাজেই ঐ বিকর্ষণ ও তার ফলশ্রুতি বিপথগামিতা অর্থাৎ প্রধানতঃ নাফ্‌ছআম্মারা (ষড়রিপুর) তাবেদারি থেকে তাদের টেনে তুলতেই বিশেষ করে' বেহেশ্‌তের লোভ ও দোযখের ডর দেখানো হয়েছে, এবং আল্লাহ্‌কে হাজের নাজের জেনে ছালাত অর্থাৎ নামাজ-মাধ্যমে তার সম্মুখেই যেন দাঁড়ান, রুকু দেয়া, সেজদা দেয়া ও বসা মারফত ঐ রাবেতারই (আকর্ষণ-সম্বন্ধেরই) কিছু অনুভূতি আন্‌বার কোশেশ করতে বলা হয়েছে ['জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'ইসলামিয়াৎ' প্রসংগের ৯নং ৮১ পৃষ্ঠায় সেই 'আহমদ' আকায়েদ ধরে' 'আহাদ' উপলব্ধির কিছুটা অর্থাৎ প্রথম ধাপ অবলম্বন]।

স্বভাবতঃ তো আর সকলের ‘মোরাকেবা’ অর্থাৎ ধ্যান-জ্ঞান গবেষণা হয়না, আর তা না হবার প্রধান অন্তরায় ঐ নাফ্‌ছ আম্মারা অর্থাৎ ষড়রিপু। তাই একমাস ‘ছিয়াম ব্রত’ পালন করে অর্থাৎ রোজা রেখে নাফছ-আম্মারা দমিত রেখে একমাত্র আল্লাহরই চিন্তা-ভাবনা করা অর্থাৎ রুজু থাকা, উদ্দেশ্য স্বভাব কিছুটা সারবে এবং সারা বৎসর ওর প্রভাবে ওর আসল আদত প্রকৃতি ঐ মোরাকেবা কিছুটা হাছিল হবে। স্বভাবতঃ ঐ একই কারণে সকলেরই তো আল্লাহর নূর-তাজল্লির দীদার (দর্শন) অর্থাৎ ‘মোশাহেদা’ হয়না, তাই আল্লাহর নিদর্শন (শায়েরিল্লাহ) কাবা-ঘর তাওয়াফ, হযরে আছওয়াদ (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন * ছাফা মারওয়া পাহাড় দৌড় * আরফাত-সম্মেলন প্রভৃতি মারফত সেই মোশাহেদা বা দর্শনের, দীদারের ভাব মনে আনা, অন্ততঃ আন্‌তে যথাসাধ্য কোশেশ করা, উদ্দেশ্য ঐ করে’ ওর আসল স্বরূপ ও ধর্ম মোশাহেদা কিছুটা অন্ততঃ হাছিল হবে, সেই দিকে অন্ততঃ দীল কিছুটা রুজু হবে, সেই পন্থার (তরিকতের) খোঁজ হবে, করবে। * স্বভাবতঃ ঐ একই কারণে সকলেরই তো আর আল্লাহ্‌র গুণগান ‘জেকের’ করতে মন চায়না, তাই মাল-মাত্তা থেকে জাকাত অর্থাৎ নির্দিষ্ট বখ্‌রা দান করে, দীলকে ত্যাগী করে, মাল-মাত্তার পবিত্রতার অনুভূতির সংগে সংগে

উপরোক্ত কার্যগুলি উপলক্ষে একমাত্র আল্লাহর নূর-তাজল্লির মোশাহেদা (দীদার —দর্শন) আদৌ না হলে ঐ নিছক পাথরের ঘর প্রদক্ষিনে, কালো পাথর চুমোয়-টুমোয় পাহাড়-জঙ্গল ছুটী অর্থাৎ দৌড়ে-টোড়ে কেন পৌত্তলিকতা হবেনা, তা বলতে পারেনকি ? পারেন না। এই প্রসংগ ক্রমেই বলতে হয় ঐ উপলক্ষে মীনা বাজারে কি বিশ্বের অন্যত্র লাখ লাখ পশু কোরবানীতে যদি বনের পশু ঐ ষড়রিপুরও কোরবানী (উৎসর্গ) না হয়, তবে প্রকৃত পশু কোরবানী হয় কি, হয় না। আবার ঐ উপলক্ষে শয়তান (ঐ ষড়রিপু) উদ্দেশ্য রমী অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপে যদি মনের শয়তান ঐ ষড়রিপু দূরীভূত না হয় তাহলে ঐ রমী প্রকৃত হয় কি ? হয় না। বুঝে দেখুন।

মনের পবিত্রতার অনুভূতির মারফত ক্রমশঃ ঐ জেকের-স্বভাব কিছুটা আয়ত্ত করন, অধিগত করন।

কিন্তু প্রাথমিক ঐ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি ওর ঐ আসলের জন্য আদৌ আকাংখা না জন্মে—সেই পন্থা তরিকত গ্রহণের তাকিদ অনুভূত না হয়, সেই হাকিকত (সত্যোপলব্ধি) হাছিলের জন্য প্রাণ না কাঁদে, আর সেই পূর্ণতা মারেফাত [পরমাত্মা আল্লাহর সংগে আত্মার পূর্ণ মিলনে, মে'রাজে পূর্ণ প্রজ্ঞা কামালিয়াৎ] কামনার কিছু না হয়—তবে এসব প্রাথমিক অর্থাৎ শরিয়তের শুরুর অনুষ্ঠানাদি পালনও ব্যর্থ, বেহুদা, বে-ফায়দা কিনা ভেবে দেখুন। আর মারেফাত জটিল, কঠিন, দুরুহ আমাদের জন্য নয়, ইত্যাদি ঠাওড়িয়ে একেবারে সুদূরে সরিয়ে রাখার, সরে থাকার অর্থ কোন ধর্ম ই আর না হওয়া, না থাকা, ধার্মিকও আর না থাকা—আশা করি এতো আলোচনার পর তা বুঝ্‌তে পেরেছেন নিশ্চয়ই। আর 'ও' মোটেই কঠিন জটিল, দুরুহ কিছু নয়, যোগ্য খাঁটি পথ প্রদর্শক (পীর মোর্শেদ) থেকে জেনে নিলে, জান্‌লে অতি সোজা সরল চিরস্থায়ী শক্ত পথে চলা, শারীরিক, মানসিক (নৈতিক), আধ্যাত্মিক ক্রমবিকশিত, বিবর্তিত হওয়া।

সকল জাতির জন্যই এ ব্যবস্থা

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

লেকুল্লেন জাআলনা মেনকুম শেরয়াতাঁ অ মেনহাজা

—তোমাদের প্রত্যেক জাতির জন্য শরিয়ৎ ও মেনহাজ দিয়েছি।—মাইদা ৪৮।

ক্রমবিবর্তিত তরিকত, হাকিকত ও মারেফাতকে একত্রে বোঝাবার কারণেই মেনহাজ (সর্ব-প্রশস্ত পথ) লফ্‌জ (শব্দ) ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাপর ধর্ম তা বেশীমাত্রায় বিকৃত করে দ্বিত্ব-ত্রিত্ব-বহুত্ববাদ-মূলক পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিক, কিংবা

ইস্‌লাম তা না বুঝে মাত্র একদিক কেই ইস্‌লাম বলে চালাক কিংবা তাকেও বিকৃত করে নিক, তজ্জন্য ইস্‌লাম-প্রবর্তক, কি সেই ধর্ম-গ্রন্থ তো আর দায়ী নয়।—দেখুন 'শিল্প-সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে 'পরিশীলন'।

এর আরো বিশ্লেষণ এই রকম :

واتينهم بينت من الامر فما اختلفوا الا من بعد جاءهم العلم بغيا بينهم

অ আতায়নাহুম বাইয়েনাতে মেনাল আম্‌রে—ফামাখ্‌তালাফু ইল্লা মেমবাদে জাআহুমুল ইল্‌মো বাগইয়াম বাইনাহুম

আর আমরা (আল্লাহ্‌ জেব্রাইল বা পয়গম্বর—অছিলায়) তাদের (মানব-জাতিদের) দেই আমাদের আমর থেকে আলবাইয়েনা। তথাপি তারা (ঐ বিভিন্ন জাতিরা) যে ঐ প্রজ্ঞা পেয়েও বিভিন্ন মত পোষণ করে, তা' শুধু পরস্পর মধ্যে হাছাদ বোগজ-বশতঃ।—জাসিয়া ১৭।

সকল ধর্মেরই মূল ঐ এক বলে তাদের মধ্যকার ঐ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ (হাছাদ বোগজ) ত্যাগ করে' পৌত্তলিকতা পরিহার করে' এক ধর্মাবলম্বী হবার জন্য এইভাবে আল্‌-কোরআনে দাওয়াত রয়েছে।

قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله
ولا نشركا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا
فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

ক্কুল্‌ ইয়া আহ্‌লাল কেতাবে তাআলাও এলা কালেমাতিন ছাওয়ায়েম বাইনানা অ বাইনাকুম আল্লা নাআবুদা ইল্লাল্লাহা অ লা নুশরেকা বিহি শাইয়া অ লাইয়াত্তাখেজা বা'দোনা বা'দান আরবাবা ম্মেন দুনিল্লাহ—ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুলুশহাদু বে-আন্না মুছ্‌লেমুন

বল, হে কেতাবী লোক! এসো তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে যা সাধারণ তার দিকে? (তা কী?); আমরা অর্চনা করবোনা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে, তাঁর শরীক (সমকক্ষ, সমতুল্য) বানাবোনা আর কাউকে (সেই লাত্‌, মানাত্‌, ওজ্জা

প্রভৃতি পুতুলদের)। আর, তাদের কাউকে প্রভু বানাবোনা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে। এর পরেও যদি তারা মুখ ফিরায় তবে বলো তোমরাই সাক্ষীরও আমরা মুসলিম।—আলে ইমরান ৬৩।

منهم المؤمنون واكثرهم الفسقون

মেনহুমুল মো'মেনুনা অ আক্‌ছারোহুমুল ফাছেকুন

(কেননা) ওদের মধ্যেও (সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই) মোমেন (ঐ চিরকালের মুছলিম) রয়েছে, কিন্তু অধিক জনগণই ফাছেক (উচ্ছৃংখল-অনাচারী)। – ঐ ১০৯।

ঐ ফাছেক (উচ্ছৃংখল-অনাচারী), জালেম, (আত্ম-পর-অত্যাচারী), তাঁরা থাকেন না এবং পরকালের শাস্তির ভয়ও তাঁদের থাকে না যদি কোরআন এবং সর্ব সত্য ধর্ম-গ্রন্থ ও সার-শাস্ত্রের হাকিকত মত তাঁরা কায করেন। তা কী? না।—

ان الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصابعين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون

ইন্নাল্লাজিনা আমানু অল্লাজিনা হাদু অন্নাছারা অচ্ছাবেয়িনা মান আমানা বিল্লাহ্ অলইয়াওমেল আখেরে অ আমেলা ছালেহান ফালাহুম আজরোহুম ইন্দা রাব্বেহিম-অলা খাওফুন আলায়হিম অ লাহুম ইয়াহ্‌জানুন

—যাঁরা ঈমান এনেছে (মুছলিম) আর যাঁরা য়িহুদী, খৃষ্টান, সাবেয়ীন (সূর্য-চাঁদ-তাঁরা-উপাসক—পৌত্তলিক) তাঁদের যাঁরাই এক আল্লাহ বিশ্বাস করেন, আখেরাত মানেন, আর সৎকায করেন, তাঁদের প্রভুর তরফ থেকে তাঁদের পুরস্কার রয়েছে, তাঁদের কোন ভয় নেই, আর তাঁরা কষ্ট ক্লেশও পাবেন না।—বাকারা ৬২।

যাহোক, আল্লাহর আমর থেকে ঐ 'আলবাইয়েনা' অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শন হক্কোন্‌নূর—জ্যোতির্ময় সত্য, সত্য-ময় জ্যোতি:—পয়গম্বর, পরে ওলি-উল্লাহ-মারফত প্রকাশ হবার পর তাকে ব্যবহারিক করার দরকার সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্যই বিশেষ করে'। তখনকার কথা এই:

ثم جعلنك عل شريعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون

ছুম্মা জাআলনাকা আলা শরিয়াতেম্মেনাল আমরে ফাত্তাবেয়্হা অ লা তাত্তাবেয় আহওয়াহ্ আল্লাজিনা লা ইয়ালামুন

তারপর অর্থাৎ মেনহাজ মারেফাত প্রকাশ পাওয়ার পর, আমার 'আমর' থেকে তোমাকে (যুগের যুগের পয়গম্বর, কি মোজাদ্দিদকে) আমরা এক শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করি। অতএব অনুসরণ করো তা-ও, অজ্ঞদের বাসনা কামনা মতো চলোনা।—জাসিয়া ১৮।

তাৎপর্য হলো মানুষের আত্মাই যেমন আসল অথচ শরীর না হলে দুনিয়ার কার্যকাম চলে না, তেমনি মেনহাজ মারেফাত বা রুহানিয়াতই আসল, কিন্তু স্বরাষ্ট্র, স্বসমাজ বজায় রাখতে, কি নূতন রাষ্ট্র ও নূতন সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন হয় যুগানুপাতিক শরিয়ত অর্থাৎ সময়োপযোগী বিধি-ব্যবস্থা দানের। জামানার পথিকৃৎকেও বাহ্যতঃ ব্যবহারিকত সেই অনুসারে চল্‌তে হয়, ঐ নব ইজ্‌তেহাদ মান্‌তে হয়, নতুবা তার মতা-বলম্বীরা, পথাবলম্বীরা চল্‌বে কেন, মানবে কেন? (পরবর্তী 'পরিশিষ্ট' অধ্যায় পুরোপুরি দেখুন)। আর অজ্ঞ—এক এক জামানার বিকৃত শরিয়ত মারেফাত পন্থী, চিরকালেরই ঐ রকম লোক যাদের প্রকৃত পাকা দলিল-প্রমাণ না থাকার দরুণ মনের বাসনা-কামনা বা নাফছআম্মারা (ষড়রিপু)-তাবেদারীতে বানানো বিকৃত শরিয়ত মারেফাত-পন্থায় (উচ্ছৃংখল তরিকায়) চলে, যুগের যুগের আলবাইয়েনা বা হক্বোননূরের (সত্যময় জ্যোতি, জ্যোতির্ময় সত্যের) প্রকাশ আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দেয়া ঐ আসল ধর্মকর্ম মানে না, ফলে তাদের সংশোধনের জন্য, সংস্কারের জন্য ইহকালে, কি পরকালে, কি উভয়তঃ শাস্তির দরকার হয় ঐ আসল ধর্মকর্ম-মুখী করার জন্য, সেই জরুরাত জ্ঞান উন্মেষের জন্য। তারি অপর নাম দোযখ। (আত্ম দর্শন, তত্ত্বদর্শন

পুস্তকে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে)। যুগের পথিকৃতের মাধ্যমে তাই তাঁর অনুবর্তীদের ঐ অজ্ঞদের বাসনা কামনা (নাফছআম্মারা) পথে চল্‌তে, তাদের বিকৃত মতামত মান্‌তে মানা করা হচ্ছে।

এভাবে 'শরিয়ত' দু অংশে বিভক্ত: (১) মোয়ামালাত —সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুশৃংখলা সুশাসন মূলক আইন কানুন; (২) এবাদত—ঐ অনুগ নামায-রোজা-হজ্জ-জাকাত। এই শরীর—মানে সুশৃংখলা সুশাসন সুতরাং নাফছ আম্মারার সংযম সুশান্তি সঠিক থাকলেই সম্ভবপর, সহজ-সাধ্য ওর অন্তঃস্থ আরো উন্নত এবাদত (রিয়াজত) যথাক্রমে রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের—বা ঐ শরীরের রুহ—রুহানিয়াত (রুহের ধর্ম)। কাযেই শরীয়ত মূলতঃ মূখ্যতঃ শারীরিক ধর্ম, তরিকত প্রকৃত প্রেম-পন্থা সুতরাং মানসিক ধর্ম, হাকিকত প্রাণের প্রয়োজনীয় প্রগতি বা প্রাণের ধর্ম—প্রেম-প্রেরণা [ইলহাম, নবীদের বেলা ছিলো ওহি, তখন ঐ বেলায়েতের এলহাম ও নবুয়তের—শরিয়তের—ওহি এক-জনের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেতো, কখনো কখনো একত্রেই প্রকা-শিত হত ঐ অনুভুতি, উপলব্ধি], আর মারেফাত আত্মার ধর্ম—মানে আত্মা পরমাত্মায় পৌঁছে আদি-অন্ত অবিনশ্বর একাকার অর্থাৎ তওহীদ (এক আত্মা পরমাত্মা) বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিনতি—বলে কয়ে সম্পুর্ন বোঝান যায় না, অনুশীলন অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, তা ইতিপূর্বে বহুবার বলেছি, পরেও আরো অনেকবার দেখতে পাবেন।

প্রজ্ঞার বিবর্তন

একত্ববাদে আসতে মানুষকে বহু কাটখড় পোড়াতে হয়েছে। মানুষ আদিতে স্বভাবতঃই ছিলো প্রকৃতি পুজারী। প্রকৃতির নানা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ পেয়ে আর নানা গুণ, জ্ঞান, শান দেখে মুগ্ধ মস্তিহাল মানুষের, ওদিকে প্রকৃতির নানা জোর-জবরদস্তি-

মূলক খেলা—ঝড়-তুফান, বন্যাবাদল, আগুন-লাগা, মড়ক-মহামারী—জ্বালা জর্জর জীগর। ভীত বেকারার মন কল্পনা কর্‌তে লাগলো কারণ, জামানা আনুপাতিক আন্দাজে জন্ম নিলো বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism)। প্রচলন হ'লো স্মিত-শান্ত আর রুদ্র-সুন্দর নানা দেব-দেবীর পুজা। এরই স্বাভাবিক পরিণতি আবার দ্বৈত-ঈশ্বরবাদ (Dualism)—সর্ব সুমংগলময় সুন্দর স্রষ্টা অহূরময্‌দা (আল্লাহ) আর যতো অমংগল অসুন্দরের স্রষ্টা অহর্‌-মন (শয়তান)। কিন্তু কথা হচ্ছে ঈশ্বর বহুই হোন, কি দুইই হোন্, তাদের মধ্যে কাইজা-ফসাদ, ঠোকাঠুকি লাগে না কেন, আর বহুজন বা দু'জনের পৃথিবী প্রকৃতি কী প্রকার এক মালার মতো গাঁথা সুন্দর সুশৃংখল থাকতে পারে, একটুকুও এদিক ওদিক ওলটপালট দেখিনা কেন? * বহু এবং দ্বিঈশ্বরবাদ জবাব দিতে না পেরে নাজেহাল হ'য়ে তল্পি গুটালো। এলো আরো প্রজ্ঞা আরো প্রজ্ঞাবান; শুরু হলো নিরেট জড়-বিজ্ঞান চর্চা, সৃষ্টি হলো নিরীশ্বরবাদ (Nihilism, Atheism)। তাদের মতে আল্লা বিল্লাহ কিস্‌সু নেই, সব কিছু আপনা আপনি পয়দায়েশ, পয়মাল—ব্যস। কিন্তু এতো সুন্দর অসুন্দর সুনিয়ম সুশৃংখলা কি সুবুদ্ধিমানের খেলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে? সব কিছুর পিছনেই তো এক সদা-জাগ্রত সুবুদ্ধিমান সুকৌশলীর অদৃশ্য হস্ত—না দেখতে পেলেও—বেশ মালুম করা যায়। সুতরাং নিরীশ্বরবাদ—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি—যে পলায়ন করে সে বাঁচে—এই মহাজন পন্থা অবলম্বন করে বহু দূরে সরে গেলো। নাজুক নিরংকুশ এককবাদ

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا

* লাও কানা ফিহিমা আলেহাতুন ইল্লাল্লাহু লা ফাছাদাতা

যদি (আছমান জমিন) এ উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কোন ইলাহ্‌ (স্রষ্টা, পালয়িতা, প্রলয়ন্তা,) থাকতো, তবে তারা পরস্পর ফসাদ করতেই থাকতো, (ফলে বিশ্ব-প্রকৃতি বিশৃংখল, বিনষ্ট হয়ে যেতো।)—আম্বিয়া ২২।

১০—

(Deism) ওদের বেগতিক দেখে, মাঝখানে উড়ে' এসে' জুড়ে বসে' বল্‌লো—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক,—বহু, দুই বা নাই এর কোনটাই নয়, এক আল্লাহ্‌ই বটেন, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে বড্‌ডো পাগলামী করেন—সুদূরে সরে' থাকেন, তাই অমংগল, অত্যাচার, অসুবিধা, আরো কতো রকম অনর্থপাত ঘটে ; গোনাহ-খাতা, পাপতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা সবই এই সুদূরে সরে থাকার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু কথা হ'লো ইহ-পর-দুনিয়া ছাড়া আল্লাহ্‌র সরে' থাক্‌বার আর একটা জায়গা আছে নাকি? তা হলে তো তিনি নিরাকার নির্বিকার চৈতন্য স্বরূপ নন, অনন্ত অসীম অনাদি নন; সান্ত, সসীম, সাকার, সবিকার, সীমাবদ্ধ। আর স্রষ্টা সরে থাকলে কী ক'রে তার সৃষ্টি-কৃষ্টি প্রলয় চলে, কেম্‌নে রক্ষা পায় তার সংসার? যা নিজে নিজে হয় নি, তাকি নিজে নিজে বেঁচে থাক্‌তে পারে? পারে না। কাজেই ঐ সরে থাকার এককবাদ (Deism) টিক্‌লোনা কিংবা টিকানো গেলোনা। জওয়াবে প্রাচীন গ্রীসের খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ, ৭ম শতাব্দির ইলিয়াটিক ফিলোজফির অনুসরণে ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দির ইউরোপীয় স্পিনোজা প্রমুখ ফিলোজফাররা বল্‌লেন : সকল সুন্দর অসুন্দর ভালোমন্দ সমেত সর্ব এক আল্লাহ্‌; সুতরাং সর্ব খোদাবাদই সম্পূর্ণ সত্য।

প্যান—সর্ব, থিউস—আল্লা=প্যান্‌থিজ্‌ম্‌। বিশ্বের সব-কিছু মিলিয়েই আল্লাহ্‌, বাঙলায় বলা যেতে পারে সর্বেশ্বরবাদ। হিন্দু বেদান্তদর্শন এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেদাভেদ, পাপপুন্য, প্রাকৃতিক বৈষম্য-বৈচিত্র, জ্বালা-যন্ত্রনা (দুঃখ)-সুখ সবই মায়া (illusion)। কিন্তু মায়া তো অবাস্তব। অথচ মানুষের পাপপুন্য, দুঃখ সুখ, শোকতাপ প্রভৃতি শারীরিক মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো তো অবাস্তব নয়, দস্তুরমতো বাস্তব। আর মায়া হলেই বা জনে জনে, সুসময়ে, অসময়ে এতো হেরফের কেন? আবার সত্য মিথ্যা (পুন্য-পাপ) প্রাকৃতিক বৈষম্য বৈচিত্র প্রভৃতি সব

নিয়েই যদি আল্লাহ্ হন, তা হলে সকলেই সমপূজ্য ; সুতরাং ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, শয়তান, অশয়তান প্রকৃত বিচার, বিভেদ-বিজ্ঞান থাকে কি ? থাকে না। তা হলে মূলতঃ ধর্ম থাকে কি ? থাকে না। সত্য জ্ঞান হয় কি ? হয় না।

কাণ্ট বল্‌লেন—আসল সত্ত্বা বা সত্য জ্ঞান Noumena (নৌমেনা) (1) তা জানা যাবে না, বোঝা যাবে না। আসল সত্ত্বা-প্রভাব এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sense-perception)-প্রভাব মিলে-মিশেই Phenomena (ফিনৌমেনা) (2)—প্রকৃতি-প্রজ্ঞা—understanding maketh nature—প্রকৃতি আমাদেরই তৈরী বিভিন্ন জ্ঞান-সমষ্টি।—কেননা, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ স্বাদে জীবে জীবে, মানুষে মানুষে আমরা পার্থক্য দেখি ; এক যার কাছে সত্য, আর তার কাছে সত্য নয় ; সুতরাং কোনটাই সত্য নয়।

যে মড়ক কতক পশু পাখীর সুখাদ্য তা মানুষের কাছে দুর্গন্ধযুক্ত, দূরে ফেলে দিবার বস্তু। কাঁচা ঘাস, লতা-পাতা কোন কোন পশুর খাদ্য, মানুষের অখাদ্য। সাপের মারাত্মক উগ্রবিষ মানুষের জীবন-নাশক, কতক পশু পাখীর তা ক্ষতি করতে পারে না। মানুষের সকলেই যে রূপ, রঙ, একরূপ দেখে কিংবা সব রসের আস্বাদনে সমান মজা পায় তা সত্য নয়। রোগাবস্থায় কতো পার্থক্য হয়ে যায়। মোটের উপর, একরকম ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলে' মোটামুটি একরূপ অভিজ্ঞতা, তারও অমনি হেরফের ; বর্ণকানা (Colour blind), শব্দ, শ্রুতি, দৃষ্টিভংগীতে কতোরকম তফাৎ, তারতম্য। এরূপে সব দিক দিয়ে দেখা যাবে বিভিন্ন জীবে, জনে বিভিন্ন সত্য। এখন কথা হচ্ছে আসল সত্ত্বা বা সত্য কি জীবের ঐ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, না, বস্তু-পুঞ্জে ? কাণ্ট বললেন, তা নৌমেনন (noumenon), তা জানবার বোঝবার, ধরবার কোন উপায়ই নেই। উভয় মিলে মিশেই আমাদের জ্ঞান, আমাদের সত্য (phenomenon) ও সত্ত্বা (entity)।

(1) Noumenon (sing) noumena (plu). (2) Phenomenon (sing) phenomena (plu).

হেগেল বল্‌লেন : প্যানথিজম নয়, প্যানেনথিজম (প্যান—সকল, এন—ভিতরে, থিউস—আল্লাহ্) : সব কিছু আল্লাহ্‌তে, আল্লাহ্ সব কিছুতে। দুনিয়ার সব কিছু সেই একক অনন্ত সত্বার (Absolute এর) বিভিন্ন প্রকাশ, বিকাশ, প্রতিচ্ছবি—Reproduction. তাহলে আর সুখ-দুঃখ, পাপ-পূন্য, সুন্দর-কুৎসিত, অজ্ঞ-বিজ্ঞ, আতুর-মূক, বধির, অন্ধ প্রভৃতি বৈষম্য-বৈচিত্র, ব্যভিচার-ব্যতিক্রম কেন ? হেগেলীয় দর্শন তার আগের এবং পরের সকল দর্শনের অনেকটা সংশোধন হলেও সম্পূর্ণ সদুত্তর সেখানেও নেই। কিন্তু কোথায় কী ভাবে আছে ?

এ হলো মুক্ত-বুদ্ধি ফিলোজফারদের প্রজ্ঞা অনুশীলনে ক্রমশঃ ঐ প্রকৃত সত্যের দিকে অগ্রসর। কিন্তু এর বহু পূর্বে যুগে যুগে আল্লাহ প্রেরিত ব্যক্তিরাও—পয়গম্বর রছুলরাও—মূলতঃ ঐ সত্যই প্রচার করে' গেছেন। আর, তাঁদের থেকেই হেগেলের বহু পূর্বে ছুফীরা—বিশেষ করে হোসেন মানছুর হাল্লাজ, শেখে আকবর মহীউদ্দিন ইবনুল আরবী, জালালউদ্দিন রুমী, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ ছুফীরা এবং তাদের পরবর্তী কালে ইব্‌নে তোফায়েল, ইব্‌নে রুশ্‌দ প্রমুখ মুক্ত-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা চর্চার মুসলিম ফিলোজফাররা—ওহাদত দর কছারত, কছারত দর ওহাদত—বহুতে একক (Absolute) এবং এককেই (Absolute এ-ই) বহু বলে' ঐ ফিলোজফিই উদ্ভাবন ও প্রচার করে গেছেন। কেন ?

আল-কোরআনের 'আল্লাহুই' ঐ রহস্য (হাকিকত) ব্যক্ত করে : আল-লাহু—সব-কিছু তার বা সব-কিছু তাতে, আর তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর আল-হু, ইয়া-হু, হুয়া-হু—সবই 'হু' বা তিনি—সব কিছু তাতে ; হু আল্লাহ—তিনি আল্লাহ সব-কিছুতে, সর্বত্র সর্বথা, এবং ইল্লাহু—তিনি ব্যতীত কিছুই নয়, অর্থাৎ অসত্য-অসুন্দরও আসলে তাঁরি বিভূতি, বিকাশ ; মাখ্‌লুক (সৃষ্টি) চক্রের সর্বশেষ সম্পূর্ণতার কারণে সৃষ্টিতে স্রষ্টার বিকাশ বা প্রকাশ (তানাজ্জোলাত)। এতে মনে_

কর্‌তে হবে না যে, আল্লাহ অসম্পূর্ণ ছিলেন বা আছেন বা থাকবেন, তাই সৃষ্টি করেছেন, করছেন, করবেন এবং নিজের অতুল ঐশ্বর্য, ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন, পাচ্ছেন, পাবেন (যেমন হেগেল ও হেগেল-পন্থীরা মনে ক'রে থাকেন); বরং তিনি চির এক, অভিন্ন, অনবদ্য, অনাদি, অনন্ত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিলেন, আছেন, থাক্‌বেন :

قل هو الله احد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد - ولم يكن له كفوا احد

কুলহু আল্লাহু আহাদ—আল্লাহু ছ্যামাদ—লাম ইয়ালেদ অলাম ইয়ুলাদ—অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ

বলো : আল্লাহ চির একক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ (বে-নিয়াজ অর্থাৎ তিনি কোন-কিছুর উপর নির্ভরশীল নন, অথচ সব-কিছু তাঁর উপর নির্ভরশীল)। (জীবের মতো) তিনি জন্ম দেন না, নিজেও (অনুরূপ) জন্মিত নন্‌ (সুতরাং স্বয়ম্ভু), তাঁর সমকক্ষ (সমতুল্য) কেউই নয় (কোন কিছুই নয়)—ছুরা এখ্‌লাছ।

কিন্তু—   هو الله في السموت وفي الارض

হু আল্লাহু ফিচ্ছামাওয়াতে অ ফিল্‌ আরদ্‌

তিনি আল্লাহ (জাহের-বাতেন) আছমান জমীনে সর্বত্র বিরাজমান।—আন্‌আম ৩।

কেন না :   هو الاول والاخر والظاهر والباطن

হুয়াল আউয়ালো অল আখেরো অজ্জাহেরো বাতেনো

—তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি জাহের (প্রকাশ) তিনিই বাতেন (অদৃশ্য)।—হাদিদ ৩।

তফসির : সৃষ্টি করতে গিয়ে এক এক পর্যায়ে, স্তরে তাঁর যে ছিফাত (বিভূতি)—নূরে মোহাম্মদী-আহমদী বা পরমা প্রকৃতি প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, তার বিভিন্নতা, বাহ্যতঃ বিকাশ, প্রকাশ, প্রগতি, পরিণতি আছে বটে। সূর্য-রশ্মির বিভিন্ন বিকাশ-প্রকাশে, গ্রহ-উপগ্রহ-পুঞ্জ, কি নীহারিকা নিঃসরণে নক্ষত্রপুঞ্জের কিছুই আসে যায়নি, যায় না, যাবে না ;— এও

অনেকটা তদ্রূপ—যদিও সর্ব মেহাপ্লের বাইরে এবং মানুষে ঐ সর্বশেষ বিকাশ-প্রকাশ—প্রগতি-পরিণতি—বেলায়ত-মনুয়তে। আর এক এক সৃষ্টি নাশ মানে ঐ আহ্‌মদের আহাদে আত্মগোপন।

হাদিছ কুদ্‌ছিতে (রছুলের সঃ পবিত্র বাণীতে) আল্লাহ্‌ বল্‌ছেন (১)

كنت كنجا مخفيا - فاحببت ان يعرف فخلقت الخلق

কুন্‌তো কান্‌জান মাখ্‌ফিয়ান ফা আহবাবতু আঁ ইয়ুরাফা—ফাখালাক্‌তুল-খাল্‌কা।

আমি এক গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিলাম, ইচ্ছা হল প্রকাশ হই, তাই সৃষ্টি করেছি (প্রকাশ হয়েছি, হচ্ছি, হ'বো)।

আল্লামা রুমী (রঃ) বলেন :

দিদাঃ হুছ্‌নে খেশে ব-চশ্‌মে শহুদ।
খোদ তজ্জল্লা করদে দর মুল্‌কে অজুদ॥

নেহারিল নিজ রূপ মানস-আঁখিতে
সৃজিলেন বিশ্ব সেই রূপ প্রকাশিতে।—মসনভি।

ঐ হাদিছ কুদ্‌ছিরই প্রতিধ্বনি।

ইবনুল আরবী প্রমুখ উচ্চাংগের ছুফী দরবেশদিগের এই হচ্ছে আবার ওয়াহেদাতুল অজুদ—আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন কিছুর অজুদ (অস্তিত্ব) নেই—'লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ' মতবাদ! আর এ-ইতো মুখ্যতঃ তানাজ্জোলাত (সৃষ্টিতে স্রষ্টার বিকাশ, প্রকাশ) (২)। সর্বশেষ ঐ অজুদিয়ার প্রতিবাদী মোযাদ্দেদ আল্‌ফেছানী প্রমুখ

(১) হাদিছ কুদছি হচ্ছে আল্লাহ ও রছুলের—পরমাত্মা এবং আত্মার—এমন সব অভিব্যক্তিমুলক পবিত্র কথা, যা মাত্র ঐ পন্থীদেরই প্রয়োজন, তাই সাধারণ্যে বিশেষ প্রচার হয়নি। এবং অনেকে একে ছুফীদের উদ্ভাবন বলে' উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু তা যে সম্ভবপর নয়, এ বইখানা আগাগোড়া পড়েই তা' বুঝতে পারবেন।

(২) ভূমিকা 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' ইবনুল আরবীর ঐ মতবাদের আরো বিশ্লেষণ দেখুন।

আওলিয়ার 'শহুদিয়া' সংস্কার (তায্দিদ)—সৃষ্টি আর স্রষ্টা এক নয়, অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। লোহা আগুনে পোড়ালে সে অগ্নিময় হ'য়ে নিজেকেই আগুন মনে করতে পারে বটে; কিন্তু জুরিয়ে যায় যখন, তখন মনে হয় আগুন ও লোহা মূলতঃ বিভিন্ন! তেমনি অজুদিয়ারা ইশ্কে মাযযুব—মাগ্লুবুল হালে—এক, অভিন্ন মনে করলেও—ঐ হাল-হাকিকতের উর্ধে' অতীত-লোকে তিনি স্রষ্টা আর তারা দ্রষ্টা (মাশ্হুদ—শাহেদ) এইমাত্র নিস্বত (সম্পর্ক)। গোঁড়া আল আশারিয়া এবং উদার ইবনে হাজম প্রমুখ দার্শনিকদের এইই আবার 'মুকালিফা' অর্থাৎ 'সৃষ্টি আর স্রষ্টা বিভিন্ন' মতবাদ—প্রথমতঃ কথিত ঐ নিরংকুশ একক্বাদ (Deism) কতকটা। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাহলে কোরআনের আউয়াল আখের জাহের বাতেন সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস আর থাকে কই! সৃষ্টি যখন বিভিন্ন, তখন তিনি তার অতীত, ঊর্ধ; সুতরাং জাহের অপর কিছু; অনিবার্য সূক্ষ্মতঃ দ্বৈত মতবাদের প্রশ্রয়; কোরআনের 'জাহেরেও তিনি' মতবাদের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ; নির্ঘাত অনাবিল তওহীদ অর্থাৎ সবকিছু তাঁর, তাঁর থেকে (ইন্নালিল্লাহে) এবং সবকিছু তাতে (অইন্না-এলায়হে), আর সবকিছুতে তিনি (ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আর্দ) আর থাকে না, থাকতে পারে না। অতএব সম্পূর্ণ অনৈছ্লামিক মতবাদ। এর ফায়ছালা কী! আমরা আগাগোড়া অকাট্য অখণ্ডনীয় সব যুক্তি প্রয়োগে, আশা করি, বোঝাতে পেরেছি যে সিফ'র (Cypher—Nothingness) বা মহাশূন্য পরিমণ্ডল বলে' আসলে কোন দিন কিছু ছিলো না, নেই, থাক্বে না। সুতরাং সৃষ্টির জড়-অজড়-অতিপরমাণু-লোকে সব কিছু তাঁরি স্থূল প্রকাশ, আর অতি-পরমাণুর অতীত সূক্ষ্ম প্রকাশও তিনি। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে যুগপৎ ঐ সূক্ষ্ম স্থূল প্রকাশের পূর্ণাংগ স্বরূপ ব'লে সে ঐ স্থূল সূক্ষ্ম পরমাণবিক পূর্ণ জাগ্রত করে' অনন্ত অসীমের সম্ভবপর অতিপরমাণ-

বিক এবং তার অতীত গুণ জ্ঞান শান হাছেল করতে পারে বটে। তা-ই মূলতঃ তওহীদ কিংবা তওহীদ (একত্ব) মতবাদের স পূর্ণতা— কার্যে পরিণতি, তা বহুংবার বলেছি। ঐ একত্ব যোগ ও অভিজ্ঞতা— অজুদিয়ার লা-মাওজুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া মূলতঃ কোন অস্তিত্ব নেই) উপলব্ধির অভিব্যক্তি—আসল এবং সম্পূর্ণ সত্য (হক)। কিন্তু শহুদিয়ার ঐ স্রষ্টা আর দ্রষ্টাও মূলতঃ অসত্য নয়। কেননা কাশ্‌ফ (অধ্যাত্ম-দৃষ্টি) সম্মুখে তিনি দর্শনীয়, দ্রষ্টব্যই বটেন : লা-মশাহিদা ইল্লাল্লাহ্—আল্লাহ ছাড়া দর্শনীয় ; দ্রষ্টব্য কিছু নেই।— কিন্তু যাকে দেখা সম্ভবপর, দেখা যাবে, তাকে পাওয়া যাবে না কেন ? মিলন-লাভই বা অসম্ভব অবাস্তব কিসে ? মূল যদি এক স্তর থেকে একই পদার্থ পদার্থাতীতের হ'য়ে থাকে, তবে সেখানে না পৌঁছতে পারাটাই বরং অবাস্তব, অস্বাভাবিক। উপরোক্ত লোহা আর আগুনের দৃষ্টান্তও আর থাকে না। মোযাদ্দেদ জানতে পারেননি যে, আগুন ও লোহা অতিপরমাণবিক এবং তার অতীত স্তরে মূলতঃ একই। সুতরাং সম্পূর্ণ একত্ব-একত্র (তৌহিদ) সম্ভবপর ; কেন না সব-কিছু ক্রমবিকাশ করে' বিবর্তিত মানব, মানব-স্তরে আরো ক্রম-বিকাশ-বিবর্তনে ঐ হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সুপরিণতি, সু-অভিব্যক্তি।

কারণ কী ? কারণ প্রকৃত ছহি হাদিছ কুদছি—পবিত্র হাদিছে —রছুল বল্‌ছেন :

(i) আউয়ালো মা খালকাল্লাহু নূরী—

প্রথম আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেন তা' আমার নূর,

(ii) আনা মেন নূরেল্লা অ কুল্লো শাইয়িন মেন্ নূরী

আমি আল্লাহর নূরে আর (বিশ্বের) যা-কিছু সব আমার নূরে (পয়দা),

iii মান রাআনি ফাকাদ রাআল হাক্কা—

যিনি আমাকে দেখ্‌লেন, তিনি (মূলতঃ) সত্য (সত্য— আল্লহকে) দেখ্‌লেন।

ঐ হাদিছ কুদছিতে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

(iv) লাও লাকা লাম্মা খালাকুতোল আফ্‌লাকা—

তোমার—মানে নূরে আহমদের—(তদ্‌মাধ্যমে নূরে আহাদের প্রকাশের) জন্য না হ'লে বিশ্ব-আছমান-জমীন বানাতাম না।—

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন, নিউট্রন, আর তার রকমারি পজিট্রন, বহির্ভাগে ইলেকট্রন, রকমারি আলফা-বিটা-গামা রশ্মি, কিংবা মেসোট্রন, ফোটন, ডিউটরণ, টিট্রণ আর এক্‌স্‌-রে (রঞ্জনরশ্মি), অতি-বেগুনি-আলো (আলট্রাভায়োলেট রেজ), মহাজাগতিক রশ্মি (কস্‌মিক রেজ), লালেতর রঙ্‌ (ইনফ্রা রেড)—প্রভৃতি রকমারি অতিপরমাণু ও আলোকমালায়, আর ওর আইওন আইসোটোপের তাজ্জব তেজস্ক্রিয় ধ্বংসকারী শক্তি—Destructive energy ও সম্ভাব্য সাংগঠনিক শক্তি—Constructive energy-তে—তাকতে —তারি সামান্য প্রতিভাস মাত্র। তা-ই আবার বস্তুর (matter-এর) রকমারি তেজে (energyতে) পরিণতি, তেজ ঐরূপ অতিপরমাণু, পরমাণু হয়ে ক্রমশঃ বস্তুতে পরিণত হয়। সবই আসলে নূরে আহমদ (দ্বিতীয় নাম নূরে মোহাম্মদী) অর্থাৎ ছেফাত নূরের বিভা, বিধা। 'পরমাণবিক তথ্য' প্রবন্ধেও এ রহস্য দেখেছেন।

অনুরূপ আরো কতো কিছু আবিষ্কার সম্ভবপর। কিন্তু তাতে করে' কি যাত নূরেআহাদ জানা যাবে, চেনা যাবে? কিংবা পরমাণবিক বোমা বিস্ফোরণেও কি অতিপরমাণবিক ছেফাত নূরে আহমদের অতীত কোন স্তর ধরা যাবে, পাওয়া যাবে? কখনই নয়। কারণ তা' অতীন্দ্রিয় তো বটেই, বস্তুতঃ কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (experiment) পর্যবেক্ষণের (observation) বাইরে, কেবল আত্ম-আহমদ-আহাদের পূর্ণ যোগাযোগে (রাবেতায়) সম্মেলনে (সরোকার-ইলাকায়) পাওয়া যেতে পারে। আর পেতে পারেন ঐ বাতেন অধ্যাত্ম সত্তা অর্থাৎ হাকিকত-হাল এবং সংজ্ঞান অর্থাৎ মারফত শানে (সত্তায়) মহাগুণী-জ্ঞানী এ-জমানার আওলিয়া,

অবশ্য নবুয়ত খতম হবার পূর্ববর্তী জমানায় পেতেন আম্বিয়া। আর ঐ পন্থাই তরিকত, ব্যবহারিক --বাহ্যিক (জাহের) রূপ-গুণ-জ্ঞান-শানই—ওর শুরু বা শরিয়ৎ।

আল্লাহ্ তাই বলেন : আমি এঁদের (আওলিয়া-আম্বিয়ার) কর্ণ হই যদ্দারা শোনে, চক্ষু হই যদ্দারা দেখে, হস্ত হই যদ্দারা কায করে, পা হই যদ্দারা চলে আর অন্তর হই যদ্দারা বোঝে। ঐ হাদিছ কুদছি।

ঐরূপ প্রকৃত বোজর্গরা অর্থাৎ অতি এবং অধি জ্ঞানী-বিজ্ঞানী আত্মারা, পরম প্রাকৃতিস্থরা, পরমাত্মা পরম পুরুষ আল্লাহ্‌র মিলন-মে'রাজ লাভ করেন, তা কতোবার কহা হয়েছে। এই মিলন-মে'রাজেরই আর এক নাম বেছাল [অছলুন মাদ্দা (ধাতু) থেকে বেছাল, যার অর্থ মিলন লাভ করা]। সুতরাং জীবিতেই যাঁরা মিলন-মে'রারজ হাছেল করেন, মৃত্যুক্তে তো তা' আরো পূর্ণতা, নিবিড়তা লাভ করেন, তাই তাঁদের মরণকে বেছাল শরীফও বলা হয় (দেখুন ১২৬ পৃষ্ঠায় আঁ হযরতের বেছাল শরীফের কথা)।

আবার, ছালাত বা নামাজের গূঢ় অর্থও ঐ বেছাল। কাজেই প্রকৃত ছহি হাদিছ কুদসী শরীফে বলা হয়েছে :

لاصلوات الا بحضوری القلب

লাচ্ছালাতা ইল্লা বেহুজুরিল কাল্‌ব্—

(ঐ মিলন-মে'রাজের) একাগ্রচিত্ততা (নৈকট্য) ছাড়া ছালাত (নামাজ) নেই, হয় না। পুনঃ

ان الصلوات معراج المومنين

ইন্নাচ্ছালাতা মে'রাজুল মোমেনীন—ছালাত (নামাজ) নিশ্চয়ই (প্রকৃত) মোমীন (বিশ্বাসী বোজর্গানের) মে'রাজ শরীফ।--কোন্ ছালাত (নামায)? রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকেরের—এক কথায়—জেকের-ফেকেরের—পূর্ণতায় যে ছালাত (নামাজ) ঐ মিলন, বেছাল, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্‌র একমাত্র অস্তিত্বই

তাঁদের মধ্য দিয়ে হতে পারে, হয়ে থাকে সুপ্রকাশ (মাজ্.হেরে আতম—উত্তম প্রকাশ)। স্বয়ং আল্লাহ্.ই তাঁদের তারিফ ঐ উপরে তাঁদের অংগ প্রত্যংগ অর্থাৎ সর্ব অবয়বে—দেহ-মন-প্রাণ-আত্মায়—প্রকাশ হন বলে' ঘোষণা করছেন।

وانا اخترتک فاستمع لما یوحا - اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی - واقم الصلوة لذکری

অ আনাখতারতুকা ফাছতামেয় লেমা ইয়ুহা—ইন্নানি আনাল্লাহু লা-এলাহা ইল্লা আনা ফা আবুদনি—অ আকেমেচ্ছালাতা লেজেক্.রি।

এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব, শোনো তোমার প্রতি যা নাযেল হয় (এলহাম, ওহী), নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ্, আমি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, সুতরাং এবাদত করো (একমাত্র) আমারই। (কি ভাবে?) আর (তার জন্য) কায়েম করো ছালাত আমার জেকের (ফেকের) যোগে।—তো-হা ১৩—১৪।

প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে হযরত মুছার (আ) প্রতি এই আয়াত এবং এরূপ আরো আয়াত নাযেল মানে সকল অনুরূপ বোজর্গানের হাকিকত মারেফাত ব্যক্ত করা। নতুবা ঐ সব জমানায় তো এ-ধরনের নামাজ রোজা হজ্জ জাকাত ছিলোইনা। সুতরাং কী সেই ছালাত এবং জেকের? তা যে আত্মার পরমাত্মার দিকে, পরমা প্রকৃতির পরম পুরুষের পানে এগোনোর এবং মিলন-মে'রাজ হাছেলের সেই চিরন্তন রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের—এক কথায় জেকের-ফেকের—তা এরকম হাজার ছুরা-কেরাত-যোগে জমানার জমানার ঐ একই ছালাত (নামাজ) জেকের-ফেকের নাম উল্লেখে পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু তার কি আরো প্রয়োজন আছে? তা হলে মূল প্রবন্ধ, প্রকল্পগুলোই পুনঃ পুনঃ পড়ে যান।

لذکری (লেজক্.রি) শব্দ তিনটিকে 'আমার জেকের উদ্দেশ্যে' অর্থ করলে আসলে কোন অর্থই হয় না। কারণ, পুনঃ পুনঃ

বলচি, অর্থাৎ বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, সেই সব জমানায় তো এ-ধরনের ছালাত (নামাজ) ছিলোই না যে, তা কায়েম করতে আল্লাহ্ 'আমার জেকের উদ্দেশ্যে' বলবেন। আসলে ل (লে) আরবী এই 'হরফে যের (অব্যয়, Preposition)' এক্ষেত্রে 'লইয়া' অর্থে। ঐ 'লে' হরফে যের থেকেই বাংলা 'লইয়া (সংক্ষেপে ল'য়ে)' শব্দের উৎপত্তি কিনা তা ভাষা-তত্ত্ববিদগণকে গবেষণা করে প্রকাশ করে দিতে অনুরোধ করি।

কিন্তু ঐ ل (লে) যে ল'য়ে, দিয়ে, যোগে অর্থও হয় তার বহু দৃষ্টান্তের মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেখুন:

يهدى الله لنوره من يشاء

—ইয়াহ্‌দিল লাহু লেনুরেহি মাঁ ইয়াশায়ু—আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা তার নূর (জ্যোতি) যোগে (ল'য়ে, দিয়ে') সৎপথ দেখান।—নূর ৩৫।

ঐ রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের—এক কথায় জেকের-ফেকের-যোগে আল্লাহ্‌র মে'রাজ-মিলন হাছিলই যে ঐ ছালাত (নামাজ) কায়েম (চির প্রতিষ্ঠিত) করা, আশা করি, তা এখন পুরো পুরি বুঝ্‌তে পেরেছেন।—দেখুন জবাব [১] এর 'পরমাণবিক তথ্যও' পুনঃ।

জিজ্ঞাসা

ঐ নূরের হেদায়েতে নূরুন্ময় (আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান) হবার দৃষ্টান্ত আরো দেখুন। প্রথমে দেখুন ঐ নূর (জ্যোতি) অন্তর্চক্ষে দেখার দৃষ্টান্ত; তখন বাহ্যদৃষ্টি আর অন্তদৃষ্টি একাকার এক-চাক্ষুস দৃষ্টি হয়ে যায়, জবাব (২) এর 'রকেটের রহস্যে' 'অতি অভিজ্ঞতা' প্রসংগে এবং 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধে আরো বিশদ তা দেখ্‌তে পাবেন। দ্বিতীয়তঃ দেখুন ওতে অভিভূত (মাগ্‌লুবুল) হাল-হাকিকত, মারেফাত।

اذ را نارا فقال لاهله امكثوا انى انست نارا لعلى اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى - فلما اتها نودى يموس - انى انا ربك فاخلع نعليك - انك بالواد المقدس طوى

ইজ্ রা নারান ফাকালা লেআহ্লেহিম্কুছু ইন্নি আনাছ্তু নারাল লাআল্লি আতিকুম মেন্হা বেকাবাছিন আও আযেদু আলান্নারে হুদাফালাম্মা আতা'হা নুদিআ ইয়ামুছা—ইন্নি আনা রাব্বুকা ফাখ্লা' না'লায়কা ইন্নাকা বেলওয়াদেল মুকাদ্দাছে তুআ—

"যখন (মেডিয়া বা মদীয়ান হতে ফিরবার পথে) তিনি (মুছা আঃ) আগুন দেখ্লেন, তিনি তাঁর পরিজনকে বললেন, "তোমরা এন্তেযার করো, আমি এক আগুন দেখেছি, হয়তো ওর থেকে আমি তোমাদের জন্য একটি জ্বলন্ত অংগার (প্রেম-প্রেরণা, এল্হাম, অহি) আন্তে পারবো, অথবা ঐ আগুনের কাছে গিয়ে কোন পথের সন্ধান পাবো (শরিয়ৎ মারফত পাবো)।"

যখন তিনি আগুনের কাছে এলেন, আওয়াজ হলো—হে মুছা (আঃ)! আমি তোমার প্রভু। অতএব তোমার জুতো খুলে ফেলো (আল্লাহর হুজুরে হাজির হ'য়ে সাংসারিক মায়া-মোহ-প্রপঞ্চ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মায়াজ বা রূপক ঐ ইশারা ইংগিত) তুমি পবিত্র তোয়ায় (কোহেতুর পাহাড় অঞ্চলে আছো, সুতরাং পায়ের জুতোও পবিত্র স্থানে খুলে ফেলা দরকার—যুগপৎ এমনি শরিয়ৎ মারেফাত অর্থ)।"—তো-হা ১০—১২।

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه - قال رب ارنى انظر اليك - قال لن ترنى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترنى - فلما تجلا ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

অ লাম্মা জাআ মুছা লে মিকাতেনা অ কাল্লামাহু রাব্বুহু—কালা রাব্বি আরেনি আন্জুর এলাইকা—কালা লান তারানি অ লাকেনিন্জুর এলাল যাবালে ফাইনিছতাকার্রা মাকানাহু ফাছাওফা তারানি-ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বুহু লেলযাবালে জাআলাহু দাক্কা অ খার্রা মুছা ছায়েকা

"এবং যখন মুছা (আঃ) হাজির হলেন আমার (ঐ অগ্নিময় বা জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের হুজুরে) নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর তাঁর প্রভু তাঁর সংগে কথা বল্‌লেন [এলহাম-ওহি-যোগে জেব্রাইলের (আঃ) মধ্যস্থতায়]। মূছা বল্‌লেন—দেখা দেও আমাকে (পূর্ণরূপে), আমি তোমাকে দেখ্‌বো (চর্ম চক্ষে আর কোনরূপ অছিলা ছাড়া যা সম্ভবপর নয়)। আল্লাহ বল্‌লেন, মুছা (আঃ) কিছুতেই তুমি আমাকে (চর্মচক্ষে আর কোনরূপ অছিলা ছাড়া) দেখতে পাবে না; কিন্তু তাকাও ঐ পাহাড়ের দিকে, যদি ওর অস্তিত্ব স্থির থাকে—তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে (ঐ অছিলা বরাবরে অন্তর-চক্ষে) দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর প্রভু (অপরূপরুদ্র জ্যোতির্মালায়) প্রকাশ পেলেন ঐ পর্বতের উপর ওকে বেসামাল করলেন [মুছার (আঃ) চর্ম-চক্ষের দৃষ্টি-পথ থেকে ঐ কোহেতুর এবং জাগতিক সব-কিছু বিলুপ্ত অর্থাৎ ফানা হ'য়ে গেলো] আর মুছা (আঃ) বেহুঁশ-বেখোদ—ছালেকে মযযুব, মযযুবে ছালেক (সমাধিস্থ)—হয়ে পড়েন।"—আরাফ ১৪৩।

অনন্ত অসীম সত্তা সীমার মাধ্যমে স্ব-স্বরূপে এরূপেই নাযেল হয়ে ছালেকে মযযুব, মযযুবে ছালেক—হুঁশে বেহুশ, বেহুঁশে হুঁশ—হালহাকিকত মারফতে ধরা দেন। নিছক চর্মচক্ষে তাঁকে দেখবার কারো কোন সাধ্য নেই; তবে দিব্য-চোখ (কাশ্‌ফ) খুলে গেলে ঐ ভাবে মশ্‌গুল মনোহারিত্বে সর্বত্র জ্যোতির্ময় সত্য-সত্তা (হক্কোন্ নুর) রূপে তাকে দেখা যায়; চর্মচোখ দিব্যচোখ তখন অবশ্য এক চোখ হ'য়ে যায়, তা'পূর্বেও বলেছি। রছুলুল্লাহ্‌ও (সঃ) কোরআন-আয়াত, ছুরা নাযেল ওয়াক্‌তে অনুরূপ মযযুব, ছালেক হ'তেন, সেই সময়ে বা অপর যে কোন সময়েও আল্লাহ্‌র অনন্ত জ্যোতির সায়রে অবগাহন ক'রে অফুরন্ত গায়ব-রহস্য (হাকিকত মারফত) জেনেছেন, পেয়েছেন বটে। তার দৃষ্টান্ত আগেই দেখেছেন (পৃষ্ঠা...১১৫-১১৬)।

পরিশিষ্ট

কলসের পানি যদি ভিতরে বদ্ধ অবস্থায় বায়বীয় নানা জীবাণু সংস্পর্শে এসে দূষিত হয়েও বলে' 'আমি নদী বা সাগর' তবে সেটা হয় নেহাৎ অহমিকা ও অপরাধ। নয় কি? কিন্তু নদী বা সমুদ্র-তরংগে ডুবে ঐ দোষ-ত্রুটি মুক্ত হয়ে সে যদি বলে 'আমিই নদী, কি আমিই সাগর' তবে তাতে কোন দোষত্রুটি, কি অপরাধ হয় কি? হয় না। বিষয়টা ভালো রূপে বুঝাবার জন্য এই রূপ মেছাল দিলাম। আসলে কিন্তু এ ঐরূপ বাহ্যতঃ প্রকাশ, কি প্রচারনার অবকাশ রাখেনা, একান্তই আত্মার অনুভূতি, প্রাণের অভিব্যক্তি, মনের দিগন্ত প্রসারণ। মনসুর হাল্লাজ (র) কেন জানি বলে ফেলে-ছিলেন। সেই মনসুর হাল্লাজ (র) থেকেই তার দৃষ্টান্ত নিন:

i) কহে মনসুর সুন কাজি গায়ের কা পিয়ালা মাৎ পি
আনাল হক পড়্হো তু সবিদ ওহি কলমা পড়া তা যা।

মনসুর কহেন, শুন কাজি, অপরের পেয়ালা পান করোনা, সোহহং (আনাল হক বা আমি সত্য, আমিই তিনি) বাদের উপর দাঁড়িয়ে সেই কলেমা পড়াও। —মহর্ষি মনসুর, ভূমিকা।

ii) আনা মান হুয়া অয়া মান অহুয়া আনা
নাহনো রুহানে হালাল না বদান।
ফাএজা আবছারতানী আবছারতাহু
ওয়া এজা আবছারতাহু আবছারতানী ॥

আমিই তিনি যাকে আমি চাই, আমি ভালবাসি। এবং যাকে আমি চাই, আমি ভালেবাসি তিনিই আমি। আমরা দু'টো আত্মা একই দেহে আছি। এ কারণে যখন আমাকে দেখ তখন তাকে দেখবে, ফলতঃ আমাকে দেখলেই তাকে দেখা হবে।—মহর্ষি মনসুর, ১৭, ১৮ পৃঃ।

রছুলুল্লাহরও এ ধরণের এক হাদিছ রয়েছে। যথা:—মান রায়ানি ফাকাদ রায়াল হাক্বা—যিনি আমাকে দেখ্‌লেন তিনি (মূলতঃ)

সত্যকে (আল্লাহকে) দেখলেন [দেখুন 'Sayings of Prophet' by Marhum Dr. Sir Abdullah Mamun Suhrawardi]। হোসেন মনস্থরের বানী তারি প্রতিধ্বনি, একই প্রকার অভিজ্ঞতায় পাওয়া—তাই আর এক হাদিছে বলা হয়েছে : من عرف نفسه فقد عرف ربه —মান আরাফা নাফ্‌ছাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু—যিনি তার নিজকে চিনেছেন, তিনি তার প্রভুকে (আল্লাহকে) চিনেছেন। এরূপে আত্ম-দর্শনই তত্ত্বদর্শনে পৌছায় এবং তওহীদ (একত্ব) বিশ্বাসের কার্যে পরিণতি একাত্ম জ্ঞান, মেরাজ-মিলন লাভ হয়।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورالرحيم

কুল ইন কুনতুম তোহেব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেয়ুনি ইয়ুহ্‌বেবকুমুল্লাহু অ ইয়াগফের লাকুম জোনুবাকুম অল্লাহু গাফুরোর রাহিম

বলো [হযরত মোহাম্মদ (সঃ)], যদি আল্লাহকে ভালো বাসতে চাও তবে আমার অনুবর্তী হও [অগ্রে আমাকে ভালো বাসো, ভক্তি-মহব্বত করো] তা হলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন আর তোমাদের গোনাহ্‌ খাতা সব মাফ করে' দিবেন।—আলে ইমরান ৩০।

এ কিন্তু চিরন্তন মামেলা, মুক্তির উপায়। কেননা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) অছিলায় আল্লাহর মাহবুবিয়ত হাছেল তার অবসানে অন্তর্ধানে ফুরিয়ে যেতে পারেনা, যায়নি, যাবেনা কোন দিন। তাঁর নায়েব বা প্রকৃত প্রতিনিধি ওলি উল্লা বরাবরে এ মামেলা মোওয়াছালাত (মিলন-মেরাজ) হাছেল চলে আস্‌চে, চলতে থাকবে চিরকাল। এভাবেই হায়াতুন্নবী—নবী বা রছুলের হায়াত দরাজ – চির বিদ্যমানতা, ব্যাপকতা, বেলায়ত।

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين

মা কানা মোহাম্মদোন আবা আহাদেম্মের রেজালেকুম অ লাকের রাছুলুল্লাহে অ খাতামান্নাবিয়িন—

মোহাম্মদ (সঃ) কারও পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রছুল (প্রেরিত পুরুষ), আর (এই পৃথিবী গ্রহে) শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর।—আহযাব ৪০।

তফসির : জাগতিক সম্পর্কে তিনি পিতা-পুত্রাদি হ'তে পারেন বটে, ছিলেন বটে, কিন্তু হাকিকতে মোহাম্মদীয়া মতে এই পৃথিবী গ্রহে সেই আদি নূরে আহমদের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম সুপ্রকাশ তিনি, তাই নবুয়ত খতম ; কিন্তু বেলায়তের হেদায়ত বা পথপ্রদর্শনের প্রয়োজনে ঐ পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম সুপ্রকাশের প্রতিনিধি (খলিফা, নায়েব) রূপে তাঁর ঐ হক নূর বা সত্য-জ্যোতিরই তানাজ্জোলাত (আবির্ভাব) গাউছ কুতুব মোযাদ্দিদ লকবে যুগে যুগে। কাযেই উপরোক্ত পিতা-পুত্র, কি অন্য কোনরকম জাগতিক সম্পর্কাদি বিচার হাকিকত বা নিগূঢ় নিরাবিল সত্য মোতাবেক অহেতুক, অনাবশ্যক।

আমি যা বলছি তার অনেক কিছুই আপনাদের কাছে একেবারে আনকোরা অভিনব মনে হবে, এমন কি উদ্ভটও মনে হতে পারে, কিন্তু আমি আপীল করছি আপনাদের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধির কাছে এবং তার যথাযথ বিকাশে আমার বক্তব্যেরই জয়লাভ হবে বলে' আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও সুদৃঢ় ধারণা।

ফলে, দেখুন না চিন্তা করে'—জীবনটা একটা ক্রম-বিবর্তিত রূপ বই আর কিছু নয়। আর তাই যদি সত্য হয়, তা হলে যার শরীরতঃ শুরু আছে তার শরীরতঃ যেমন শেষ আছে, তেমনি আবার আত্মা যদি মানি (আর তা না মেনেই বা পারছি কই ?) তা হলে তারও ঐ শুরু আছে এবং যার শুরু আছে তার ক্রমবিকাশ আছে আর সর্বশেষ আছে। তা হলে সে যে যেখান থেকে এসেছে সেখানে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে গিয়েই সমাপ্তি, সে আর অবিশ্বাস্য কিসে ? তা হলে তের শত বৎসরের পূর্বেকার এক মহাপুরুষের শাফায়াতের অপেক্ষায় যে আমরা বসে'

আছি তার অস্তিত্ব আর থাকে কই? যিনি তাঁর জীবনের শুরু ক্রম-প্রগতি ও পরিণতি—এবং সেই আনুপাতিক তাঁর ইহ-পর জীবনের কর্তব্য-কর্ম-সমূহের তামামশুদ করে' তাঁর অস্তিত্বমূলে পৌঁছে গিয়ে আত্ম বিকাশের স্বাভাবিক চরম পরম গতি প্রকৃতি, পরমা প্রকৃতি পেয়েছেন, তিনি আর কী করে' কারো শাফায়াতে সুপারিশে সাহায্যে ইহ-পরকালে পুনঃ নাযেল হবেন, হতে পারেন,—যা আমরা কিয়ামতের ধারণায়ও কিস্সার আকারে বয়ান করে' চলেছি, তা' বিচার করুন।—কেবল তাঁর সম-সাময়িক যাদের তিনি সুপথ দেখিয়েছেন, তাদের জন্যই মাত্র তিনি দায়ী থাক্তে পারেন, ছিলেন; এবং আত্মা যখন সচল, কোথাও বসে নেই, থাক্তে পারেনা, তখন এতো শত বৎসরে তাদের ঐ ক্রমবিকাশ ও তার পূর্ণতা—ঐ যেখান থেকে আসা সেখানে পৌঁছা এবং সে কারণে শাফায়াত সাহায্য সুপারিশ–যা-ই বলুন—তাকি এখনো বাকী আছে? যাদের তিনি দেখেন নি, দেখবেন না, জানেন না, চিনেন না, জানবেন না, চিনবেন না, তাদের শাফায়াত, সাহায্য সুপারিশের অর্থ কী?

বলবেন হাদিছের কথা। কিন্তু কোন্ প্রকার হাদিছ সত্য, বিশ্বাস্য ও মান্য হতে পারে তা যেমন পুনঃ পুনঃ এ পুস্তকে প্রমাণ করেছি, তেমনি যে যে হাদিছ-বলে আমাদের ধারণা সত্য, শুদ্ধ ও সিদ্ধ সাব্যস্ত হতে পারে, তাও যথাস্থানে তুলে দিয়ে তাদের সঠিক তাবীল, তাৎপর্য, তাহকিক দিয়েছি। [দেখুন ১৪৮—১৪৯ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী প্রবন্ধ সমূহ]। এবং কোরআনে আল্লাহ যে-আদর্শের কথা, জীবন-দর্শনের কথা সেই সম-সাময়িক ও চিরন্তন জনসাধারণের জন্য বলেছেন তারও সঠিক তাৎপর্য তো কতোবারই দেখেছেন। সুতরাং ঐ শাফায়াত সুপারিশ সাহায্যের মূল তাৎপর্য হলো জমানায় জমানায় ঐ রকম মহাপুরুষেরই শাফায়াত-সুপারিশ-সাহায্য, নচেৎ ওর কোন সংগত সুযুক্তিপূর্ণ

ফায়ছালাই নেই—'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্টে''মুজাদ্দিদের'তাৎপর্যে তা যেমন দেখেছেন, তেমনি এ পরিশিষ্টেও তা আর একটু পরেও দেখবেন। মহাশূন্যের মাত্র একটি সৌরলোকের একটি গ্রহেই মানুষ আছে, এই সৌরলোকের অপর কোন গ্রহে, কি অপর সৌরলোকের অপর গ্রহ, কি উপগ্রহে কোন মানুষ নেই এ যুক্তি আর এ জমানায় ধোপে টেকেনা, তা' যেমন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে, তেমনি 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধেও দেখেছেন। তা হলে সেই সকল গ্রহ কি উপগ্রহের পয়গম্বর, ধর্ম, শাফায়াত সুপারিশ সাহায্য প্রভৃতি কী হতে পারে? আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন মারফতই মাত্র তার ফায়ছালা সম্ভবপর, অন্যথায় নয়—প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে তার বিশদ বিশ্লেষন দেখুন।

এ পৃথিবীতে হয়তো সেই রকম অতি উন্নতস্তরের মহামানব, অতি মানব, এরপর এই শেষ ইছলামেই আবির্ভূত হয়ে এসেছেন এবং আস্‌বেন [নামের পার্থক্যে ও দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব-বাদ প্রভৃতি ভেজাল বিকৃতিবাদে প্রাচীন, অতি প্রাচীন সকল ধর্মই যে মূলতঃ আল-ইছলাম, তা ইতিপূর্বেও প্রতিপন্ন করেছি, পরেও করছি]। তাই আল্‌-কোরআনে আল্লাহ এবং আল হাদিছে রছুলুল্লাহ ঐ রকম আদর্শ ও জীবন-দর্শনের কথা বলেছেন। অন্য ধর্মে গুণী, জ্ঞানী মহাপুরুষ থাকতে পারেন কিন্তু হযরত মোহাম্মদের (স) দ্বারা এই পৃথিবী-গ্রহে সর্বশেষ সর্বোত্তম ধর্ম সংস্কার, ধর্ম-বিপ্লব যেখানে হয়েছে, ধর্ম হয়েছে নির্ভেজাল, প্রক্ষেপ-মুক্ত,—ঐ প্রকার অতি উন্নত মহাপুরুষ, তাঁর সর্বোচ্চ আদর্শ ও তাঁর থেকে নিখুঁত সত্য প্রকাশ ও প্রচার (জীবন-দর্শন) ও চির-সত্য-পথ-প্রদর্শন (হেদায়েত) তো সেখানেই, সে ইছলামেই হবে, সেখানেই তো হতে পারে, হয়ে থাকে, দেখুন না চিন্তা করে'।

'শিল্প সংস্কৃতি (কালচার) কথায়' দেখতে পাবেন ছুফীরা—বিশেষ করে ইমাম গাজ্জালী (র), জালালউদ্দীন রুমী (র)

প্রমুখ ছুফীরা ঐ আসল আদত ধর্মের ফরয কায রাবেতা মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকেরের—এক কথায় জেকের-ফেকেরের —অনুসংগ গ্রহণ করেছিলেন নৃত্যগীতি, বাজনা, কখনো কখনো অপর সংগুণজ্ঞান-চর্চা। কেন? কারণ ঐ সকলই এক উৎস-মূল থেকে উৎসারিত. উচ্ছ্বসিত—আপসে আপ্ অভিব্যক্তি।

মহা মনীষী মরহুম সৈয়দ আমীর আলী তাঁর বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থ Spirit of Islam-এ (স্পিরিট অব ইস্‌লামে) ঐ অবগাহনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে' গেছেন?

In the phraseology of the Sufi the effort by which each stage is gained is called Hal (a state). It is a condition of joy or longing. And when this condition seizes on the 'seeker" he falls into ecstasy (Wazd). The dervishes in their monasteries may be seen working themselves up into a condition of 'ecstasy'.

ছুফীদের পরিভাষায় প্রতি স্তর * যে সাধনার লাভ হয় সেই সাধন-লব্ধ অবস্থাকে (অভিজ্ঞতাকে) বলে 'হাল'। এ হচ্ছে আনন্দ অথবা আশাপূর্তির হাল-হাকিকত। আর যখন তত্ত্বকারীর এই হাল-হাকিকত হাছিল হয়, সে আত্মহারা হয় (ওয়াজ্‌দ্, জজ্‌বা)। দরবেশদিগকে এই হাল-হাকিকত (ওয়াজ্‌দ্, জজ্‌বা) হাছেলের জন্য তাঁদের আস্তানায় কার্যরত (ঐ জেকের ফেকের, কখনো কখনো তার স্বাভাবিক অনুসংগ অন্যগুণ-জ্ঞান-চর্চা-রত) দেখা যেতে পারে। স্পিরিট অব ইস্‌লাম ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ।

বলা হয় কোরআনে তার উল্লেখ কই, রছুল (স)-জীবন থেকে হাদিছে তার নজির কই? কোরআনে যে উল্লেখ আছে এবং ছহি হাদিছেও যে নজির রয়েছে তা আমরা আগাগোড়া পুরোপুরিই তুলে দিয়েছি, আগের আগের জমানার মতো

* স্তরগুলি দেখুন এর পরে 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধের 'পরিশিষ্টে'।

অতো রেখে ঢেকে আর বল্‌লাম কই? কারণ, এই দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক জমানায় আর অতো রাখা ঢাকার দরকার করেনা বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই 'জিজ্ঞাসা', 'সৃষ্টি-রহস্য' ও 'পরমাণবিক' তথ্যে ইতিপূর্বেই মোখতসর এর প্রমাণ পেয়ে গেছেন, 'রকেটের রহস্য', 'অতীন্দ্রিয় রকেট' এবং 'শিল্প সংস্কৃতি (কালচার) কথা' প্রবন্ধে ঐ সকল সংস্কৃতির আরো অভিব্যক্তি পাবেন, বিশেষ করে পাবেন হযরত মোহম্মদ (স), হযরত জালালউদ্দীন রুমী (র) এবং ইমাম গাজ্জালীর জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখে তার চূড়ান্ত। এখানে বিশ্ব-বিশ্রুত হযরত গাউছোল আজম (বড়োপীর) আবদুল কাদের জিলানীর (র) সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ছির্‌রুল আছ্‌বার' থেকে তার আরো নজির দেখুন ঃ

"এল্‌ম্‌সমূহ চার ভাগে বিভক্ত ঃ—প্রথম (প্রকাশ্য) শরিয়তের সমস্ত আদেশ নিষেধাদি (হালাল-হারাম) জাহের এল্‌ম। দ্বিতীয়-গুপ্ত জ্ঞান (এল্‌মে লাদুন্নি); এ হচ্ছে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ—তরিকত, হাকিকত, মারফত (১)।"

—"বেলায়তপ্রাপ্ত আলেমগণ হযরতের গুপ্ত এল্‌মের (এলমে লাদুন্নির) সংবাদ দাতা। বেলায়ত নবুয়তের একটি অংশ। অলি ওঁর বহনকারী এবং নবীর গুপ্তবস্তু অলির নিকট আমানত। প্রকাশ্য শিক্ষালাভ করা ওঁর অর্থ নয়। কেননা হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই এল্‌মের একটি গুপ্ত তত্ত্ব-স্বরূপ আছে, আলেমে বিল্লাহ ব্যতীত কেউই তা' অবগত নন, যদি তারা তা' সহ বাক্যালাপ করেন তাহলে দুনিয়াদার তা' অস্বীকার করে।

হযরত (সঃ) অত্যধিক প্রিয় সাহাবা (বন্ধুগণ) এবং আছহাবে

(১), ভূমিকা 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' আর এক বড়োপীর মহীউদ্দীন ইবনুল আরবীর (র) বিশ্লেষণ থেকেও এর নজির নিন। এঁরা সবাই অজ্ঞ ছিলেন? আর আজকালকার যে সব আলেম এই 'বাতেন এলম' মানেন না, তাঁরা সবাই পণ্ডিত? বিচার করুন।

ছুফ্‌ফাগণ ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ লোকের নিকট তা' প্রকাশ করেননি।

সহস্রাধিক কেতাব পাঠ করেও যদি গুপ্ত এস্‌ম (এসমে লাহুন্নি) প্রাপ্ত না হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে আলেম নামে অভিহিত হবেন না। মানব প্রকাশ্য এলেমের (শরিয়তের) বাহ্যিক আমল দ্বারা রুহানিয়াত (অধ্যাত্ম শক্তি ও জ্ঞান—যথাক্রমে হাকিকত মারফত) প্রাপ্ত হয় না।

প্রকাশ্য (শুধুমাত্র শরিয়তি) আলেম পবিত্র হেরেমে (আল্লাহর গুপ্ত জ্ঞানরাজ্যে) প্রবেশ করতে পারবে না এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।"—(২)

চার তারিকা বা খান্দান মূলতঃ কী, কেন ?

আসল আদত যে আত্মার ধর্মের কথা বল্‌লাম (রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের) তার জেকের (গুণগান) ভাগ চুপে চুপে (খফি), জোরেশোরে (জলি), গানবাজনা ও অপর গুণ-জ্ঞান-চর্চা-যোগে, কি ব্যতিরেকে, দোয়া দরুদ-সহ, কি বাদ দিয়ে হবে ইত্যাদি এখ্‌তেলাফেই (মতভেদে) আসলে হয়েছে নানা তরিকা (পন্থা) কিংবা এক তরিকারই নানা বহিঃরূপ-প্রকাশ মাত্র খান্দান। প্রাচীন কাদেরিয়া জোর দিয়েছে জোরশোর জলি জেকেরে (গজল ও একতালা বাদ্যাদিসহ), নাখ্‌শ-বন্দিয়া চুপ-চাপ অর্থাৎ খফি জেকেরে জোর দিয়েছে ; চিশ্‌তিয়া জলি জেকেরের সংগে গান বাজনা নৃত্য ও অপর গুণ-জ্ঞান চর্চার উপর জোর দিয়েছে ; খফি জেকের, কি দোয়াদরুদও বাদ দেয়নি ; মোজাদ্দেদিয়া খফি জেকেরের সংগে দোয়া-দরুদের উপরও জোর দিয়েছে

(২) ভূমিকা 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' বড় পীর মহীউদ্দীন ইবনুল আরবীর (র) বিশ্লেষণ থেকেও এর নজির নিন। তাঁরা সবাই অজ্ঞ ছিলেন? আর আজকাল-কার যে সব আলেম এই 'বাতেন এলম' মানেন না, তাঁরা সবাই পণ্ডিত? বিচার করুন।

তা' হলেই বোঝা যায় চিশ্‌তিয়া আসলে সকল তরিকার (খান্দানের) মোটামুটি সকল বিষয়-বস্তু গ্রহণ করে' পূর্ণাংগ হয়েছে। আধুনিক জমানায় বিশেষ করে' সকল রকম গুণ ও জ্ঞান চর্চার উপর জোর দিচ্ছে, প্রাচীন চিশ্‌তিয়া তরিকায়ই হয়তো তার অংকুর ছিলো। নাম ঐ চিশ্‌তিয়াই থাক, কি বদল হৌক তাতে করে' বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ মূলতো সকলেরই ঐ একই। কিন্তু গুণ ও জ্ঞান চর্চা অতো গ্রহনের কারণ কী? 'শিল্প-সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে বিশেষ করে' দেখ্‌তে পাবেন যে কোরআন ও ছহি হাদিছ সকল রকম সৎ সাহিত্য, শিল্প-কলা-ছায়াছবি প্রভৃতি গুণ ও জ্ঞান চর্চারই অভিব্যক্তি, সু-প্রকরণ। কারণ ও-সকলই ঐ একই উৎস-মূল থেকে উৎসারিত, অভিব্যক্ত, —বোঝবার অবকাশ মাত্র।

আসল কায কিন্তু ঐ হেরার গুহার, কোহেতুরের, এমন কি তপোবনের ঐ একই রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা ও জেকের— চিরন্তন আত্মার চিরন্তন একই উৎস-মূল পরমাত্মায় পৌঁছানোর পন্থা—পক্রিয়া-প্রণালী—তা বার বার ধর্মে ধর্মে বাহ্যিক দিকটার বাড়াবাড়ির কারণে বদ্ধমূল ভুল ধারণা দূর করবার জন্য বল্‌ছি অর্থাৎ বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

এখন ন্যায়-দর্শন (লজিক) মারফতও ঐ একই সত্যই পাওয়া যাবে। কী রকম?

হযরত রছুলুল্লাহর (সঃ) হেরার গুহায় গিয়ে ঐ আসল সাত্তিক সাধনার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। তা-হলেই স্বভাবতঃ লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র জাগে। কী রকম? রছুল (সঃ) ঐ আসল আদি অকৃত্রিম সাধন ভজন-যোগে আল্লাহর দীদারে মিলনে মে'রাজে পৌঁছেন; এবং নবী হন; আর নবী হবারও প্রায় ১১।১২ বৎসর পরে পুরো মে'রাজ শরীফে পৌঁছে সাধারণের জন্য আসল আদত ধর্ম বা ফরজ কর্তব্য, করণীয় পান যথাক্রমে

নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত। তা' হলে ঐ লজিক বা ন্যায়-দর্শন (শাস্ত্র)-মূল (Syllogism) হবে এরূপ: নবীর বেলা যা-ই হোক, সর্বসাধারণের একমাত্র আসল সাধন-ভজন ঐ নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাত। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য? নিশ্চয়ই আল্লাহ্-প্রাপ্তি, নবী যা হাছেল করেছেন তা-ই, নতুবা নবীর উম্মতের ইতায়াতের অর্থাৎ পদাংক অনুসরনের অর্থ হবে কি? বেহেশত লাভ ও দোযখ-আগুন থেকে বাঁচা কখনও ঐ আল্লাহ্-প্রাপ্ত আল্লাহ্-ওয়ালা নবীর পদাংক অনুসারীদের মূল উদ্দেশ্য হতেই পারে না। হতে পারে ঐ আল্লাহ-প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে আরাধনার ফলে, ঐ অগ্রগতির ফলে আপছে-আপ সে পথের পাওনা, ফাও; আসল ঐ মাবুদ মাওলা। তা হলেই ঐ ন্যায়-শাস্ত্র-মূল বা সিলোজিজম বলে দিচ্ছে: যাঁরাই ঐ এবাদত-বন্দেগী নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাতই করেন, অবশ্য খালেস নিয়তে, খাঁটি আকিদা-আচরণে, তাঁরাই নবীর মতো আল্লাহ্‌র দীদার-মিলনে পৌঁছেন; সুতরাং যাঁরাই নবীর মতো আল্লাহ্‌র দীদারে মিলনে পৌঁছেছেন, ঐ একমাত্র এবাদত-বন্দেগী-যোগেই পৌঁছেছেন, যথা বড়োপীর আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), গরীব নেওয়াজ খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (র) প্রভৃতি। তাদের আর কোন কিছু করবার দরকার হয়নি।

কিন্তু, না, তাঁরা তো শুধু ঐ এবাদত বন্দেগীই করেন নি, আরো করেছেন, তজ্জন্য পীর-মোর্শেদ বা পথ-প্রদর্শক লেগেছে। তা হলে তো ঐ দীদারে মিলনে (রাবেতার পূর্ণতায় মে'রাজে) পৌঁছতে ঐ এবাদত-বন্দেগীই নয়। যদি তা-ই হবে তবে রছুলের (সঃ) জেব্রাইলের (আঃ) তালীম তায়জ্জোহ্‌র মতো তাদেরও পীর মোর্শেদের তালীম তায়জ্জোহ্ লাগবে কেন? সুতরাং সে অপর কোন এবাদত-রিয়াজত। ধরা যাক ঐ এবাদত-বন্দেগীর সংগে সে অতিরিক্ত (additional, extra)। কিন্তু যদি তা-ই হবে, তবে স্রেফ জেব্রাইলের (আঃ) মতো অপরের সাহায্য ও সংশিক্ষা-

দীক্ষা লাগ্‌বে কেন? অপর পক্ষে রছুলের (সঃ) আগের জমানার বোজর্গান বা পয়গম্বরদের যেমন এক চিরন্তন প্রক্রিয়া-প্রণালী লেগেছিল, তা-ই। তাঁদের এবং তাঁদের উম্মতদেরও কোরআনে সেই জন্যই মুসলিম বলা হয়েছে (দেখুন রকেটের রহস্যে নমল ৩৮ আয়াত, শিল্প-সংস্কৃতি-কথা, উপসংহার প্রভৃতি)। নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাতের হুকুম পাবার পূর্বে রছুলুল্লাহ্‌র (সঃ) যা লেগেছিল সেই একই সাধন-ভজনই তো! তা আদৌ অতিরিক্ত পর্যায়ের নয়। বরং তা ঐ সাধারণের এবাদত-বন্দেগী-ব্যতিরেকে অপর কিছু এবং ঐ এবাদত-বন্দেগী হতে ঐ পীর-মোর্শেদ-তালীম-তায়জ্জোহ্‌ মারফত আলাদা ও সম্পূর্ণ সংশ্রব-হীন এক কৃষ্টি (কালচার), পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত (independent of each other)। তা হলে ঐ সিদ্ধান্ত-মূল (syllogism) টিক্‌লোনা, কি টিকানো গেলোনা। বরং যখন রছুলের (সঃ) মতোই তাঁদের পীর মোর্শেদ, তালীম-তায়জ্জোহ লাগ্‌লো, তা হলে নিশ্চয়ই সে এবাদত-রিয়াজত রছুলের ঐ হেরার গুহার এবাদত-রিয়াজতই—যখন নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাতের জন্মই হয়নি। বরং ২৫ বৎসর থেকে, কি তারো আগ থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বয়ং রছুলের (স) এবং ঐ বয়সে রছুলের ঐ করে করে নবী হওয়ার পর ১১ বৎসর পর্যন্ত তাঁর নিজের ও তাঁর উম্মত মণ্ডলীর—১৫ + ১১ = ২৬ বৎসর পর্যন্ত—কি তারপরও আজীবন, কি জীবানান্তেও সেই একই সাধনা, তা কি? —রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের—এক কথায় জেকের ফেকের। রছুলের (স) পরবর্তী ঐ বোজর্গরা ঐ নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাত কম জানতেন না, ওতেই পূর্ণ প্রাজ্ঞ, আল্লাহওয়ালা হওয়া গেলে তারা আর ঐ বিশেষ এবাদত রিয়াজতের ধার ধারতেন না, তাঁদের চেয়ে শরিয়তে কম অভিজ্ঞের কাছেও ঐ আসল আদত এবাদত-বন্দেগীর জন্য দৌড়াতেন না, যেমন অতো বড়ো শরিয়তে কামেল মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (র) গেলেন

তাঁর চেয়ে শরিয়তে অনেক কম অভিজ্ঞ অথচ মারেফাতে কামেল মাওলানা শাম্ছউদ্দীন তাব্রীজের (র) কাছে। আর পীর যদি শুধু শরিয়তই শিক্ষা দিবেন, তবে আর তাঁর কাছে যাওয়া কেন? শরিয়তের আহকাম আরকান সবইতো কোরআন হাদিছ ও অপর কেতাবেই আছে; তা শিখ্তে, জান্তে পীর লাগে না। যে কোন আলেমই শিখাতে পারেন, মক্তব মাদ্রাসায়ও শিখা যায়, লেখা পড়া জান্লে নামাজ শিক্ষাদি পড়েও শিখা যায়, জানা যায়। কাজেই আসল আদত করণীয় (ফরয কায) যে হেরার গুহার, কোহেতুরের, এমন কি তপোবনের আদি অকৃত্রিম অনন্ত-কালীন ধর্ম-কর্ম—হাতে কলমে শিক্ষনীয় ব্যাপার, বিষয়-বস্তু — তা বোঝা যায়। ঐ বিষয়ে অতি-অভিজ্ঞ কেউ শিখিয়ে বুঝিয়ে দেখিয়ে না দিলে তা হতেই পারে না, হবেই না। সুতরাং শরিয়ত করতে করতে মারেফাত আপছে আপ এসে যাবে এমন কথা স্রেফ ধাপ্পাবাজি, ফাঁকা আওয়াজ, গুল। শিক্ষক বা গুরু ছাড়া কোন বিদ্যাই হয় না। এ অধি-বিদ্যা কী করে' সৎ গুরু বা পীর মোর্শেদ ছাড়া হবে? হবেই না!

যাঁরাই ঐ এবাদত-বন্দেগী সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন, একমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভবপর রছুলের (স) ও অন্যান্য উপরোক্ত বোজর্গানের হাল হাকিকত মারেফাত হাছেল, আল্লাহ্ প্রাপ্তি। সুতরাং উপরোক্ত অবরোহী ন্যায় দর্শন (Deductive logic) নয়, আরোহী ন্যায়-দর্শন (Inductive logic) এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে—প্রযোজ্য। অতএব সবদিক বিচারে ঐ হেরার গুহার, কোহেতুরের, তপোবনের, কি বিশ্বে যাঁরাই বিভিন্ন নামে, লকবে আল্লাহ-ওয়ালা, সৃজন-কর্তা-সখা হয়েছেন, তাদের আসল আদত ধর্ম অর্থাৎ এবাদত-রিয়াজত ঐ রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকের। নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত দেয়া হয়েছিল ঐ অনেক পরে ওরই বহিরাবরণ বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে এবং তার সংগে কিছুটা

প্রাথমিক ধর্মবোধ জাগরুক করার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে, সাধারণের ব্রতিক সংস্কৃতি—যতোদিন না ঐ আসলের জরুরাত জ্ঞান হয়, সন্ধান করে ও পায়, ততোদিন তক, কিংবা আসলের সন্ধান পেলেও তারি ব্যবহারিক বিষয়-বস্তু হিসাবে, ঐ ব্যবহারিক আচরণেরও, অনুষ্ঠানেরও মূল উদ্দেশ্য ও মর্ম বুঝেশুনে। আসল অকৃত্রিম আকিদা আচরণ-অনুষ্ঠান বা সংস্কৃতি (কালচার) ঐ সর্ব দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী তাঁদের প্রয়োজনীয় আত্মিক উদবর্তনের, অভিব্যক্তির, তরক্কির (উন্নতি, প্রগতি) ও পরিণতির বিষয়-বস্তু। কারণ কী? কারণ, মানুষের চেহারায় জনে জনে কিছুটা পার্থক্য পার্থিব কারণে হলেও, থাকলেও, পরলোকের বস্তু আত্মা চিরকালই এক, পরমাত্মাও তা-ই। সুতরাং পরমাত্মাকে পাবার ঐ একই রূপ ও প্রকৃতির আত্মার আসল আদত ধর্ম-কর্ম কী করে' নানা রকম সকম হবে? হতেই পারে না, হয়ই না। কিংবা তা কেবল কতকগুলো দোয়া দরুদ, কি মন্ত্র তন্ত্র, অর্থ বুঝে, কি, না বুঝে আওড়ানো নয়, মুখস্থ বুলি নয়, তা আরো বিশেষ বিশ্লেষনের অপেক্ষা রাখে কী? রাখে না।

অবশ্য কোন কোন আয়াত-বয়াত, কি মন্ত্র-তন্ত্র ঐ আত্ম-শুদ্ধি ও সিদ্ধি লাভের আসল আদত ধর্ম-কর্মের অনুসংগ, অতিরিক্ত বিষয়-বস্তু হিসাবে কখনো কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, হয়ে থাকে। তা-ও প্রকৃত বোজর্গানেদীন পীর-মোর্শেদ, কি সৎগুরু থেকেই মাত্র গ্রহণীয়, শিক্ষনীয়। কেতাব বা বই-পুস্তক-মারফত নয়। কেতাব বা বই পুস্তক দিতে পারে সেদিকে ইংগিত, ইশারা, পথের সন্ধান, করতে পারে তার যুক্তি-যুক্ততা, সারবত্তা প্রমাণ, প্রদর্শন—যেমন আমরা করছি। আসল আদত সব-কিছু শিক্ষা-দীক্ষা হাতে কলমে, হাতে নাতে।

আর রসুল (সঃ) ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রকৃত বোজর্গানে দীনেরা যে প্রক্রিয়া-প্রণালী-মারফত আল্লাহ্‌র দীদার-মিলনে (মে'রাজে)

পৌছেচেন, অপরের বেলা তা অন্য উপায়ে হাছেল হবে কী করে? কিন্তু ঐ প্রকৃত বোজর্গদের জীবনী? তাঁরা নিজেরা লিখে যাননি; ভক্তরা লিখেছেন এবং গুরুর মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্য আজগবী অস্বাভাবিক অসম্ভব কিস্সা-কাহিনী পূর্ণ করে রেখেছেন (দেখুন 'জিজ্ঞাসা, বিবর্তন—মানব' প্রসংগ)। আসল ঐ তরিকত, হকিকত, মারফত আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে না তাতে; কিছু খুঁজে পাওয়া গেলেও তা' 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে রয়েছে। সেই সব জমানার বোজর্গরাও অতি গোপন করে' গেছেন। এক—মনসুর হাল্লাজের (রঃ) দুর্দশা ও পরিণতি দেখে'; দুই—তাঁরা কেউ কেউ মনে করতেন এখন নানা দেশে সদ্য ইস্লাম-অবলম্বী সাধারণ মানুষ হয়তো ঐ আসল সত্য বুঝতেই পারবেনা, ওদিকে সাধারণ এবাদত বন্দেগীও হয়তো ঐ আসল পেয়ে ত্যাগ করে' বস্বে, কোন কূল হবে না।

তাঁরা আরো চিন্তা করেছেনঃ মানুষ স্বভাবতঃই পৌত্তলিক। অথচ নিছক জড়পূজায় হয় অধ্যাত্ম অধঃপতন, অধ্যাত্ম উরুজ (উরুজ থেকে মে'রাজ) তরক্কি (উন্নতি, প্রগতি) পরিনতি হয়ই না, হতেই পারে না। ওদিকে, আত্মিক ধর্ম-সাধনায় অপর ঐ জ্বলন্ত আত্মার ছোহ্বত (সাহচর্য) সহায়তা একান্ত জরুরী— ছোহ্বতে ছালেহ্ তোরা ছালেহ্ কুনাদ, ছোহবতে তালেহ্ তোরা তালেহ্ কুনাদ—সুজনের সহবাসে হইবে সুজন, কুজনের সহবাসে হইবে কুজন।—মসনভি রুমী। যেমন বিজলী-ডাইনামো থেকে বিজলি বাতি জ্বালানো, কি মেঘ-পুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ আহরণ, কিংবা জ্বলন্ত বাতি থেকে নিভন্ত বাতি জ্বালানো—এও অনেকটা সেই রকম। কিন্তু যুগে যুগে সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম হাকিকত মারেফাত বুঝতে না পেরে ঐ অধ্যাত্ম, অতি অভিজ্ঞ, অধি-জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদেরই পূজো করতে শুরু করে দিয়েছে; তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের মূর্তি পূজার প্রচলন করেছে। সেই পুনরাবৃত্তি আবার না হয়

তাই ইস্লামের প্রবর্তক আঁ হযরত এবং তাঁর পদাংক অনুসারী ঐ খাঁটি বোজর্গরা অতি গোপন করেছেন, অতি তাহকিক করেছেন, অতি সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কোরআনে আল্লাহও তাই অতি প্রচ্ছন্নভাবে ফল্গু ধারার ন্যায় ঐ অতি-অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি প্রবাহিত করে' দিয়েছেন, তা আমরা দেখিয়েছি, বুঝিয়েছি। কিন্তু সেই রকম অজ্ঞ অধম জমানা এখনও আছে নাকি? আমরা তা' মনে করি না। তাই যতোদূর সম্ভবপর প্রকাশ করে' দিলাম। কারণ, কতোদিন আর মানুষ এসব আসল এবং একান্ত জরুরী বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ অপোগণ্ড অনভিজ্ঞ থাকবে! আর তাই থাক্‌লে যে আসল আদত ধর্ম হয়ইনা, হতেই পারে না, তাওতো দেখেছেন।

যা হোক, ঐ বোজর্গরা—কাজে লাগুক, কি না লাগুক—দেখাদেখি সাধারণ মানুষ নষ্ট না হয়—তাই ঐ সাধারণের আকিদা আচরণ (এবাদত বন্দেগী) পালন করে' গেছেন। আর ধর্মের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়িক (উচ্চ মাধ্যমিক) ও বিশ্ব বিদ্যালয়িক অর্থাৎ শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফত—শিক্ষাদীক্ষা সেই সব জমানায় এক এক জন খাঁটি বোজর্গের হাতেও ন্যস্ত ছিলো এক এক অঞ্চলে। সুতরাং তাঁদের সবটাই করতে হয়েছে, যেমন হযরত রসুলুল্লাহর (স) করতে হয়েছে ঐ আসল আদত এবাদত রিয়াজত করে' নবী হবার ঐ এগারো বারো বৎসর পর থেকে—ঐ মে'রাজের পূর্ণতায় সাধারণের ঐ এবাদত-বন্দেগী পেয়ে একটা ধর্মীয় নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্র গঠন ও সাধারণের প্রাথমিক ঐ অনুগ ধর্মবোধ জাগ্রত করার ও রাখার জন্য। যেমন ঐ একই কারণে আছহাব (রছুলের সহচর), তাবেয়িন (আছহাবের অনুসারী) ও তা:বতাবেয়িনদের (তাবেয়িনদের অনুসারীদের) করতে হয়েছে। তা নাহলে সেই প্রাথমিক জমানায় সাধারন মানুষেরা করবে কেন? মানবে কেন? এক নতুন সমাজ

ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবেই বা কি প্রকারে? তা টিকে থাকবেই বা কিসের জোরে, কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে? অধ্যাত্ম শিক্ষা দীক্ষা তো বিশেষ করে' ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর হাতে কলমে শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়-বস্তু।

কিন্তু পরবর্তী জমানায়! পরবর্তী অনেক জমানায় অনেক খাঁটি বোজর্গ পাওয়া যাবে যাঁরা ঐ আসল আদত এবাদত রিয়াজতের কারনেই—হযরত মোহাম্মদের (স) মাঝে মাঝে ঐ কারনে হেরা পর্বত-গুহায় জীবন যাপনের মতো—জন সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবন যাপন করেছেন! যেমন ইব্রাহিম আদম বলখী (রঃ) [তিনি বলখের বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে নির্জন বাসে ঐ কারণে চলে গিয়াছিলেন], যেমন ইমাম গাজ্জালী (র) [তিনি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য ত্যাগ করে নির্জনবাসী হয়েছিলেন। ছুফীদের সাহচর্যে ঐ কারণে কাটিয়েছিলেন—দেখুন তার জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুনকিদ মিনাল দালাল'—পথভ্রান্তি থেকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর 'কিমিয়া ছায়াদাত বাংলা সৌভাগ্য স্পর্শমণি' ৩য় খণ্ডে নির্জনবাসের উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য]। তাঁরা যে সাধারণের জন্যই বিশেষ করে উপযোগী ও প্রবর্তিত এবাদত বন্দেগী বড়ো একটা করেননি, তা রয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন (ভূমিকা 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' উদধৃত এ সম্পর্কে কতিপয় বোজর্গের, বোজর্গ-সংঘের বাণীও দেখুন)।

আর এ জামানায়? কাল প্রবাহেই কর্ম বিভাগ (Division Labour) হয়ে গেছে, হয়ে রয়েছে অনেকখানি। যারা লোকালয়ে বাস করেন তেমন বোজর্গদের হাতেও আর ঐ শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারেফাত যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক (মহাবিদ্যালয়িক) ও বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষাদীক্ষার ভার একত্রে নেই। সুতরাং তারা ওর সবটাই পালন করবেন, কি

করবেননা সে হয়ে গেছে, হয়ে রয়েছে জমানারই প্রেক্ষিতে তাদের ব্যক্তিগত বিষয় বস্তু, ব্যাপার। কারো দ্বারা কারো ব্যাঘাত না হলেই হলো ; এবং পুর্বেই বলেছি দর্শন বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার এতো বিবর্তনের মোকাবিলা চির মানব-আত্মার ঐ চির বিবর্তনের ধর্ম-কর্মও অতো রাখা-ঢাকার দরকার করে না। যতো দূর সম্ভবপর প্রকাশ করে' বলা দরকার, তা-ই বল্লাম। পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আসল ব্যপার কিন্তু নিগূঢ়, ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তির ব্যাপার। বলে কয়ে তা বুঝানো, দেখানো যাবেনা।

আবার সং শিল্প, গুন-জ্ঞান-চর্চা ঐ আসল আদত এবাদত-বিয়াজতের সংগে ওতপ্রোত জড়িত। কারণ, আত্মার পরম-আত্মার প্রতি এগোনোর ঐ একই আভ্যন্তরিন স্বাভাবিকত্তা বা সংপ্রকৃতি (ফেতরাতুন্স হাছানা—দেখুন অধ্যাত্ম বিবর্তন প্রসংগ) আল্লাহর প্রাকৃতিক ধর্ম (ফেতরাতুল্লাহ—দেখুন ঐ) থেকে ও-সবেরও উৎসারন, অভিব্যক্তি—তা-ও পুনঃ পুনঃ বলতে হচ্ছে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, এম্‌নি এসব আসল আদত স্বভাব ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, খামখেয়ালী, উৎপীড়ক করে রাখা হয়েছে, এবং রাখা হচ্ছে মানুষকে, সমাজকে, কওমকে,— জোর অযৌক্তিক, অর্বাচীন, ধর্মের নামে অধার্মিক, অস্বাভাবিক প্রচারনার মারফত।

যাহোক—

শরিয়তেরও যেমন প্রথমতঃ শিয়া, ছুন্নী, পরে শিয়াদের রাফিজী, খারেজী, ইস্‌মাইলী, কারমাথীয় প্রভৃতি এবং ছুন্নীদের হানাফী, শাফী মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতি মযহাব বা মতভেদ হয়েছে, আসলে বাহিরের দেশ-কাল-উপযোগী কতকগুলোবিষয় বস্তু নিয়েও নামায-রোজা-হজ্জ-জাকাতের কায়দা-কানুন নিয়ে ; আসল কলেমা ও ঈমান মোযমাল, মোফাচ্ছল—বিশ্বাস এবং ঐ চারি করণীয় ফরজ আদায় সম্পর্কে কারো কোন মতভেদ নেই, মারেফাতেরও

তেম্‌নি কলেমারও তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত এই ক্রম অভিব্যক্তি, আর রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা এবং জেকের আসল এই চারি করণীয় সম্পর্কে কারো কোন মতভেদ নেই (প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসা'র পরিশিষ্টে 'চারি কলেমা' ও 'ঈমান মোজমাল, মোফাচ্ছল' প্রসংগও দেখুন)। কিন্তু শরিয়তের ঐ দেশ কাল উপযোগী বহিরংগে বিস্তর প্রভেদ হয়েছে, মারেফাতেরও বহি প্রকাশে অনুরূপ বিশেষ বিশেষ বিভেদ হয়েছে। আসল চিরকাল একই ছিলো, আছে এবং থাকবে, থাক্‌তে বাধ্য। নতুবা তরিকত অর্থাৎ ঐ পন্থা থেকে হাকিকত অর্থাৎ সত্যোপলব্ধি, এবং পরিশেষে মারেফাত অর্থাৎ পূর্ণ প্রজ্ঞা ও চরম পরম উপলব্ধি হতেই পারে না।

আর বিশ্ব চলেছে বিবর্তনে, মানুষও মাতৃগর্ভে ক্রম বিকাশের ভিতর দিয়ে হয় ভূমিষ্ঠ, তারপরও চলে তার ক্রম-বিবর্তন, তার পরে হয় পূর্ণ মানব। কিবা শরিয়ত, কিবা মারেফাত কোন কিছুরই মূল অংকুর উদ্‌গম স্তরে আর থাকা সম্ভবপর ছিলো না। দেশে দেশে যুগে যুগে প্রচারিত হতে গিয়ে, প্রসারিত হতে গিয়ে, তা' আর রয়নি—এ বোঝা দরকার। দেখ্‌তে হবে ঐ শিশু-মানব বড়ো হতে গিয়ে মানব আকৃতি-প্রকৃতিই আছে, না, দানব, কি পশু-আকৃতি-প্রকৃতি পেয়েছে, তা-ই; তেম্‌নি শরিয়তও তার শৈশব কৈশোর ছাড়াতে গিয়ে তার আসল হারিয়ে ফেলেছে, না আছে, মারেফাতও তার শৈশব কৈশোর ছাড়াতে গিয়ে তার আসল হারিয়ে ফেলেছে, না রক্ষা করে' চলেছে,—দেখ্‌তে হবে মাত্র তা-ই; অচলায়তনে জগতের কোন-কিছুই কোনদিন বসে'ছিলোনা, থাক্‌তে পারেনি, থাক্‌তে পারে না, এখনও বসে' নেই, থাক্‌তে পারেনি, থাক্‌তে পারেনা, কোনদিন থাক্‌বেনা।

আর যদি ঐ অংকুর উদ্‌গম স্তরেই চিরকাল থাক্‌বে তবে প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসার' 'পরিশিষ্টে' উল্লিখিত ও প্রমানিত জমানার জমানার মুজাদ্দিদদের আবির্ভাব হবে কী কর্‌তে? ঘাস কাটতে? আর

শরিয়তের বেলাই বা নানা ইমাম-মারফত নানা মযহাব প্রবর্তিত হলো কী করে ? প্রশ্ন উঠবে এবং তা স্বাভাবিক : ঐ মুজাদ্দিদ ও ইমামে মূলত পর্থক্য কী ? কোন কোন জমানায় যিনিই শরিয়তের ইমাম, তিনিই আবার মারেফাতেরও মুজাদ্দিদ— যেমন হুজ্জতুল ইস্‌লাম ইমাম গাজ্জালী (র)। কিন্তু সব জমানায় যে তা' নয় তা বোঝাই যায়। কারণ, সাধারণ ভাবে শরিয়তের উপরও মুজাদ্দিদদের প্রভাব পড়্‌লেও আসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র সংগে যোগা যোগে ঐ যোগাযোগের আসল আদত ধর্ম মারেফাতেরই প্রেম-প্রেরণা-প্রবাহে পরিচালক [পথ প্রদর্শক— পীর মোর্শেদ] অর্থাৎ প্রভাব প্রয়োগ-কারী ; তার দ্বারাই বিশেষ করে' মাশুক (প্রিয়তম) আল্লাহ্‌র আশেক (প্রেমিক) সৃষ্টিকারী, প্রকৃত পক্ষে ধর্ম-প্রাণ আত্ম সমর্পিত (মুসলিম) মানুষ সৃষ্টিকারী। আর শরিয়তের সাধনা মানুষ আল্লাহ্‌র আব্‌দ্‌ অর্থাৎ বান্দা—দাস, আর আল্লাহ্‌ মাবুদ— দাসের উপযোগী উপাস্য মাবুদ (উপাসনার যোগ্য—দাসের প্রভূ) হিসাবে—অতি দূরত্বের মাধ্যমে। আর মারেফাতের ঐ প্রিয়তম, প্রেমিক সম্বন্ধ মানুষকে—সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার মোকাবিলা—সন্নিকটে এনে দেয়, অবশ্য চুলচেরা পার্থক্য সম্ভবপর নয়, উভয় ভাব উভয়ের মধ্যে কখনও কখনও জড়িত হয়ে যায়। তা যাক্‌।

এখন, ঐ কিবা শরিয়ত, কিবা মারেফাত বাহিরের দিকের ঐ কিছু কিছু এখ্‌তেলাফ বা মতভেদের দলিল (সমর্থন কারী নজির্‌) রয়েছে এ ধরনের হাদিছে: 'اختلاف امتی رحمة। (এখ্‌তে লাফুল উম্মাতি রাহ্‌মাতুন) আমার উম্মত বর্গের (যুগে যুগে প্রয়োজনে ঐ কিছু কিছু) মতান্তর মতভেদ (মনান্তর নয়) (আল্লাহ্‌র) রহমত (দয়া) স্বরূপ।'—আর তা স্বাভাবিক। কারণ, জমানার জমানার চাহিদা বা জরুরাত দেশে দেশে তারদ্বারা মিটে। তাতে করেই ইস্‌লাম চিরকাল বেঁচে আছে এবং থাকবে। আর এভাবেই 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'উপসংহারে' উদ্‌ধৃত ইস্‌লাম চির চলিষ্ণু ধর্ম ও সংস্কৃতি (Dynamic Religion and Culture) এবং সভ্যতা (Civilization)—তামদ্দুন-তাহ্‌জিব।

সংশোধনী

	পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জিজ্ঞাসা				
	১৩	১৪	ل مستقر	لمستقر
	২৫	১১	করেছেন	কর্‌ছেন
	৩১	২২	দুই আর চার	দুই আর দুই চার
	৩৭	শেষ লাইন	নিঃলূশ্বাস ফেন	নিঃশ্বাস ফেলুন
	৪৮	২১	তা সমীচিন	অসমীচিন
	৪৯	৫	يالحق	يلحق
	৫৬	টীকা	যুগল শক্তি সাধা	যুগল শক্তি সাধনা
	৬০	৭	পাঠ পুস্তক	পাঠ্য পুস্তক
	৭৭	১৬	ربى	ربک
	৬৫	১২	الوک	لدلوک
	৮০	৮	قولا	تودا
	৮১	১৭	আলিক	আলিফ
	১০১	৮	الملکه	الملئکة
	১০৭		ইমাম মোযমাল	ঈমান মোযমাল
	১১০	১৭	তাতেও করে	তাতে করেও
	১১৩	১৮	আন্তর্জাতিক	আন্তর্জাতিক
জবাব (১)				
	৪০	২৬	مذبدکه	مبرکة
	৬৭	২	চঞ্চল	অঞ্চল
	৭৬	২১	বানব	মানব
	১৩৫	টীকা (৫ লাইন)	বনের পশু	মনের পশু
	„	৭	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যে
	১৪২	১৯	অজ্জ অল ইত্যাদি	অজ্জাহেরো অল বাতেনো
	১৫২	১০	لنورهى من ينشاء	لنوره من يشاء
	১৫৫	১৮	নিরক্ষণ	নিরীক্ষণ
	১৫৫	টীকা (৪ লাইন)	জীবন চরিত্র	জীবন চরিত

[২]

মুদ্রণে ঃ শতাব্দী শত মুদ্রায়ণ, ২৪, কে, এম, দাস লেন, ঢাকা-৩

রকেটের রহস্য

আপেক্ষিক কালের ঘুর্ণী

বিশ্ব নিয়মের রাজত্ব। নিয়ম অর্থ আসলে আপেক্ষিক আচরন। মহাশূন্যে সবই গতিশীল এবং তার চার মাত্রা ঃ এক হলো স্থান, ২য় কাল, ৩য় অক্ষাংশ, ৪র্থ দ্রাঘিমা। এই ভাবে শূন্যমণ্ডলের সব পদার্থ অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদি অনবরত গতি পরিবর্তন করে চলেছে। এদের পরস্পর সম্বন্ধ আকস্মিক নয়, আপেক্ষিক, অর্থাৎ এক এক সূর্য ও তার গ্রহ, গ্রহের উপগ্রহ স্থানের দূরত্বে কালের ভিতরে আপেক্ষিক এক এক রকম গতি-প্রকৃতি-মোতাবেক চল্ছে, সূর্য আবার অপর নক্ষত্রাদির সংশ্রবে এক এক আঞ্চলিক গতি-প্রকৃতিতে অর্থাৎ আপেক্ষিক আচরনে চল্ছে। কিন্তু এর সংগে উড়োজাহাজ বা রকেটের সম্পর্ক কী ?

উড়ো জাহাজের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে সে পৃথিবীর উপরের সাধারণ আকাশস্তরে ইঞ্জিন ও প্রোপেলারের শক্তিতে পাখায় প্রচণ্ড বায়ু চাপের স্থষ্টি করে' পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষনের আপেক্ষিক আচরনকে আর এক আপেক্ষিক মাধ্যাকর্ষনিক গতি-প্রকৃতিতে পর্যবসিত করে' চল্ছে। বাতাস ছাড়া সে চলতে পারে না। তার আপেক্ষিক মূল্য বা মাত্রা তাই তিন ঃ অবস্থান (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা) ও কাল। প্রসংগক্রমে বলতে হয় গতিমান ট্রেন দুইমাত্রা—তার চলার লাইন অর্থাৎ অবস্থান ও কাল। চলমান জাহাজ ও অমনি দুই মাত্রা, কিন্তু একটি রোলার গতিহীন বলে একমাত্রা।

এখন দেখা কর্তব্য রকেট চলে কেন।

রকেটের মূলসূত্র স্যার আইজাক নিউটন ১৬৪৭ খ্রীষ্ট্রাব্দে আবিস্কার করেন। তাঁর তৃতীয় সর্বজনীন নিয়ম (Universal law) হল "প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমপরিমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।"

কিন্তু রকেটের সংগে এর কী সম্পর্ক ? সম্পর্কটি সহজেই ধরা পড়ে যদি একটি বেলুনকে ফুলিয়ে মুখ বন্ধ করে' রাখা যায়। যদি বায়ুপূর্ণ বেলুনটির মুখ থেকে আঙুল সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বেলুনটি ছুটে যাবে। বেলুনের মুখ থেকে বেরোনো বাতাসের চাপ বিপরীত দিকে সমপরিমান চাপের সৃষ্টি করে এবং যে পর্যন্ত বেবাক বায়ু বের না হয় সে পর্যন্ত ওকে দূরে ঠেলে দেয়।

প্রকৃত রকেট আর ঐ স্বল্প পরিমান সীমা-বদ্ধ বায়ুর উপর তোয়াক্কা করে' শূন্য পথে এগোয় না। বেলুনটি কয়েক ফুট পেরিয়েই পড়ে যায়। কিন্তু রকেট যায়না। কেননা বর্তমান জমানায় রকেটের মধ্যে ইঞ্জিন বসানো থাকে। ওর সাহায্যে জ্বালানী (fuel) আর অক্সিজেন দ্বারা শক্তিশালী বায়ুচাপের সৃষ্টি করা হয়। তা রকেটের একপ্রান্ত থেকে ক্রমাগত বের হতে থাকে। জ্বালানী শেষ না হওয়া পর্যন্ত রকেট ওর পথে বরাবর চলতে থাকে।
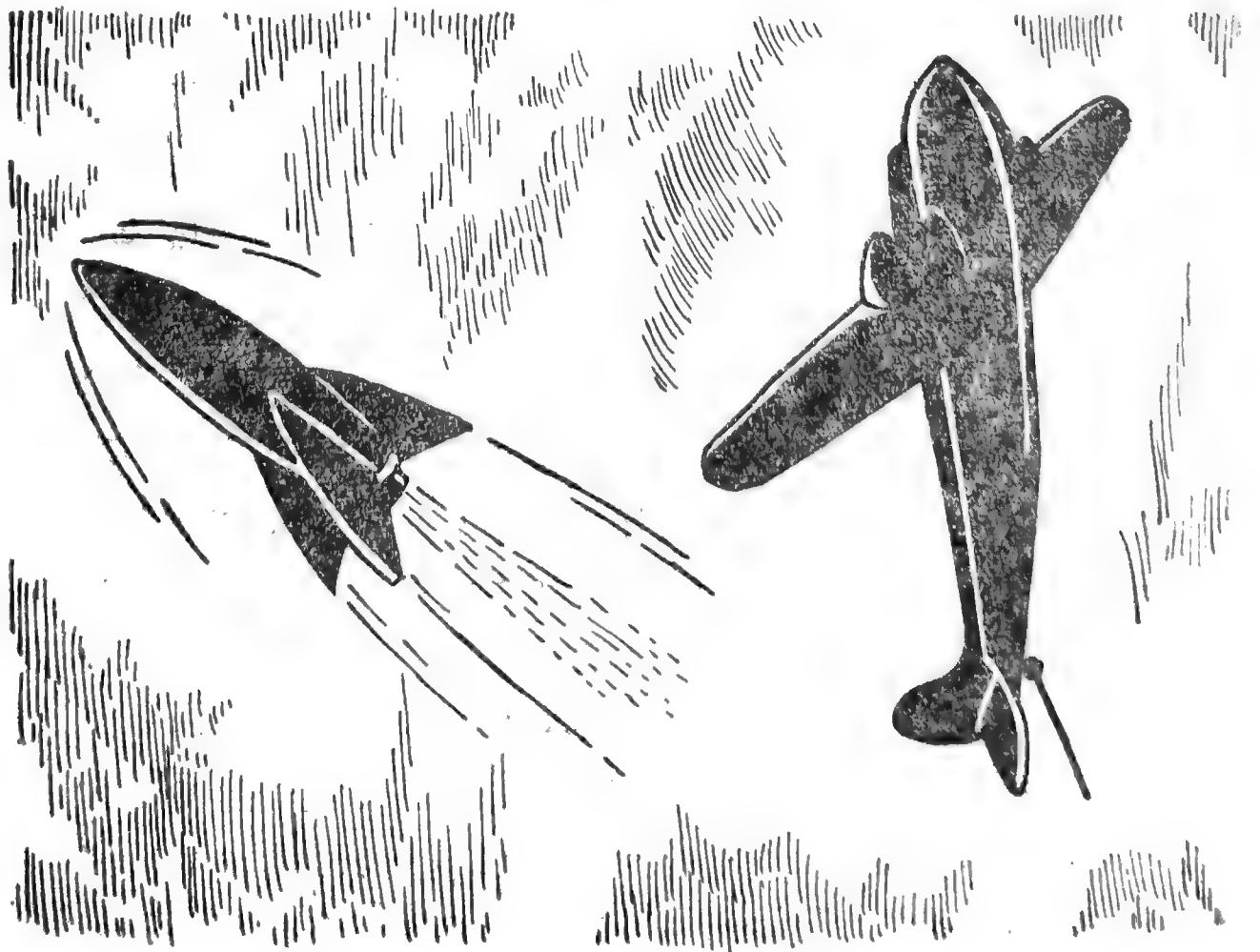
এই আধুনিক রকেট এক বিশেষ ব্যাপার, কোন জমানায়ই বিজ্ঞানের অতোখানি উন্নতি হয়নি যে পৌরানিক মেঘনাদের মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করার কল্পিত কাহিনী তার সংশ্রবে টেনে আন্‌তে হবে, কিংবা রাবনের পুষ্পকরথে চড়িয়ে সীতা অপহরনের কল্প-কথার উল্লেখ করতে পারা যাবে। তবু নিছক অলৌকিকতার মোহ কাটিয়ে আলকোরআনের কোন কোন আয়াতের পানে তাকালে মনে হওয়া আদৌ বিচিত্র নয় যে প্রাক-কোরআন আমলেও এ ধরনের বিজ্ঞান দর্শনের কতকটা উন্নতি হয়েছিল।

و ان لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسا شديدا و شهبا وانا كنا
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجدله شهابا رصدا

অ আন্না লামাছ্‌নাচ্ছামাআ ফাওয়াজাদ্‌নাহা মুলেয়াত হারাছান শাদিদঁ। অশুহুবঁা অ আন্না কুন্না নাক্বয়ূদো মেন্‌হা মাকায়েদা লেচ্ছাম্‌য়ে ফাম ইয়াছতামেয়েল আনা ইয়াজেদ লাহু শেহাবার রাছাদা

আমরা (জীন বা জড়-শিল্পী-বিজ্ঞানীরা) মহাশূন্যে পৌঁছতে কোশেশ করে আস্‌চি, কিন্তু আমরা ওকে কঠিন প্রহরাধীন (কষ্টকর) ও আগুনের শিখা (জ্বলন্ত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা) ভরতি দেখে আস্‌চি।

তথাপি আমরা কোন কোন স্তরে ঘাঁটি করতে পেরেছিলাম কিছু শুনতে (বুঝতে), কিন্তু যে-ই ঐরকম বুঝতে চায় সে-ই দেখতে পায় ঐ আগুনের শিখা তার জন্য অপেক্ষা করে' আছে।---জীন ৮,৯।

ঐ ঘাঁটি শব্দ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় সেই জমানার জড়-শিল্পী বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু দুর রকেট ছুড়েটুড়ে বিশ্ব-রহস্য বুঝতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই সব অবিকশিত জমানায় যে ঐ সব গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ উল্কা ধূমকেতু প্রভৃতি রহস্য বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি, তা ঐ 'আগুনের শিখা তার জন্য অপেক্ষা করে' আছে' কথায় বোঝা যায়। আমরা 'জিজ্ঞাসা' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধ দ্বয়ে বুঝিয়েছি কিরূপে জড় শিল্পী বিজ্ঞানীরা কল্পিত বুরুজের (রাশিচক্রের)

নামধাম রেখে এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাশিচক্রের ও গ্রহ নক্ষত্রের উদয় অস্ত ইত্যাদি দেখে এবং কিছুটা জেনে সাধারণ মানুষকে জড় গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-পূজারী-বানাতো এবং নিজেরা ঐ মিথ্যে ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলে' দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করে' অর্থাদি উপার্জন করতো, ফলে 'তাদের পিছনে ধায় এক জ্বলন্ত অংগার খণ্ড' বলা হয়েছে। তার দার্শনিক তাৎপর্য আমরা সেখানে বলে দিয়েছি [দেখুন 'জিজ্ঞাসা' 'দর্শন-বিজ্ঞান' প্রসংগ ৫-১৩ পৃষ্ঠা]

এখানে এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য হলো ঐ উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ উল্কা ধূমকেতুর রহস্য বুঝতে অর্থাৎ ঐ গুলোকে আকাশে খচিত মনে করে হাউই (রকেট) ছুড়েটুড়ে চাইতো ওদের বিদ্ধ করতে ও ঐ ভাবে ওগুলো কী তা জানতে, কিন্তু তাতে করে যে তাদের ও-সম্বন্ধে জ্ঞান আদৌ বাড়েনি তা ঐ 'আমরা ওকে কঠিন প্রহরাধীন (কষ্টকর) ও আগুনের শিখা (জ্বলন্ত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি) ভরতি দেখে আস্চি' কথায় বোঝা যায়।

আল্ কোরআনের নিম্ন আয়াতের তাৎপর্য থেকেও ঐ ব্যর্থতা বোঝা যায়ঃ

انا زينا السماء الدنيا بزينة الكوكب - و حفظا من كل شيطن مارد لايسمعون الى الملا الا على ويقذفون من كل جانب - دحورا ولهم عذاب واصب - الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب -

ইন্না জাইয়ান্নাচ্ছামায়াদ্দুনিয়া বে-জিনাতেনেল কাওয়াকেব,—অ হেফজাম মেন কুল্লে শায়তানেম মারেদ—লা ইয়াছ ছাম্মায়ুনা এলাল মালায়েল আ'লা অাঁ ইয়ুক্জাফুনা মেন কুল্লে জানেব—দুহুরাঁ অ লাহুম আযাবু অছেব-ইল্লা মান খাতেফাল খাত্‌ফাতা ফা আত্‌বায়াহু শেহাবুন ছাকেব

আমরা তুনিয়ার আসমানকে জ্যোতিষ্ক-রাজির অলংকরনে সুশোভিত করে' রেখেছি, আর অবাধ্য শয়তান থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছি। তারা উচ্চস্তরের সংঘের কথা শুনতে পায়না। বরং প্রত্যেক দিক হতে হয় বাধাপ্রাপ্ত, বিতাড়িত। ওদিকে, তাদের জন্য আছে প্রাপ্য শাস্তি, তাদের ব্যতীত যারা গোপনে প্রকৃত শুনে নেয়, তাদের পশ্চাতে আছে উজ্জ্বল আলোক শিখা।—সাফ্‌ফাত ৬-১০।

তুনিয়ার আছমান কী? নিশ্চয়ই এক এক ছায়াপথ। তা নিয়ে যতোদূর হতে পারে জড়-বিশ্বের সীমা। এর যতোদূর যাওয়া যাক মৃত্যুর পরপারের আছমান জমীন পাওয়া যাবে না, পরলোকে যাওয়া যাবে না। সুতরাং সে কথাই উঠে না। তুনিয়ার জড় আছমান অম্‌নি নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু, গ্যাস প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সুরক্ষিত রাখা হয়েছে অবাধ্য শয়তান থেকে এর অর্থ কী? অন্য আয়াতে আছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে! এই অবাধ্য অভিশপ্ত শয়তান কারা? নিশ্চয়ই এই জ্যোতিষ্কদের আসল রহস্য বুঝবার যাদের হেকমত ছিলোনা, অথচ রকেট ছুড়েটুড়ে বুঝবার ভান করতো এবং আছমানকেই স্বর্গ নরক মনে করে' তা জয়ের স্পর্ধা করতো, জ্যোজিষ্কদের দেব-দেবী কল্পনা করে নিজেরা পূজা দিত, অন্য জনসাধারণকেও পূজা দিতে বাধ্য করতো, গ্রহের ফের, নক্ষত্র দোষ বলে দিয়েটিয়ে রুজী রোজগার করতো। কাজেই তারা যে আসল বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ব্যাপার গুলোকে করে তুলেছিল তাদের অবিশ্বাসের আশ্রয়, তা' ঐ তারা উচ্চ স্তরের সংঘের কথা শুন্‌তে পায় না অর্থাৎ বুঝতে পারেনা কথায় বোঝা যায়। এই উচ্চ স্তরের সংঘ কারা? নিশ্চয়ই সকল জমানারই প্রকৃত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকরা, শিল্পীরা। কিন্তু ঐ দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা যারা বুঝতো না অথচ বুঝবার ব্যর্থ প্রয়াস করতো তাদের স্বর্গ মর্ত পাতাল কল্পনায়—ঐ উর্ধ্ব আছমান স্বর্গ,

পৃথিবী মর্ত ও তার অতল পাতাল বা নরক কল্পনা করে ;—এরা বাধাপ্রাপ্ত, বিতাড়িত হওয়া মানেই তাদের কৃত্রিম রকেট ছুড়েটুড়ে ঐ আসল বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শৈল্পিক সত্য বুঝতে না পারা। ঐ অবাধ্যতার কারনেই তারা অভিশপ্ত। সংশোধনের জন্যেই, তাদের আসল গুণ ও জ্ঞান কর্মমুখী করবার জন্যই ইহকালে, পরকালে কি উভয়ত পেতে হবে শাস্তি। কিন্তু তাদের ব্যতীত ঐ যারা আসল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী অর্থাৎ গুণ-কর্মী জ্ঞানকর্মী। তারা গোপনে শুনে নেয় অর্থ নিরিবিলি ঐ সাধনা করে সিদ্ধি সফলতা লাভের চেষ্টা করেন, ফলে তাদের পশ্চাতে আছে আলোক শিখা অর্থ ঐ গুণ কর্ম ও জ্ঞান কর্মের জন্য যেমন অন্তরে অধ্যাত্ম আলোকশিখা, তেম্‌নি তাদের আবিষ্কার গুলোই তো দুনিয়াকে সংস্কৃতির, সভ্যতার আলো বিতরণ করছে, পরমাণবিক এনার্জি ও রকেট পর্যন্ত যে-আলোক-শিখা আমরা দেখতে পাচ্ছি, জান্‌তে পাচ্ছি।

এ রকম দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বই আছে আল কোরআনের অনেক আয়াতে, যেমন

و لسليمان الريح غدوها شهر و روحها شهر -

অ লে ছোলায়মানার রিহা গোদুভোহা শাহরুঁ অ রা-অহুহা শাহরুন

আর (হযরত) সোলায়মানের (আ) অধীন করে দেই—বাতাসকে, (ফলে) এক সকালে এক মাসের এবং এক সন্ধ্যায় এক মাসের রাহা সফর হতো।—ছাবা ১২।

এতো স্বল্প সময়ে সফর যে সেই জমানায় মহাদার্শনিক বিজ্ঞানী পয়গম্বর সোলায়মানের তৈরী এক প্রকার উড়োজাহাজে চড়ে সম্ভবপর হতো তা' বোঝাই যায়।

কারণ সোলায়মান (আ) বলছেন ঃ

يا يها الناس علمنا منطق الطير و اوتينا من كل شيء - الخ - وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون -

ইয়া আইয়োহান্নাছো উল্লেমনা মনতেকাত্‌ তায়রে অ উতিনা মেন কুল্লে শাইয়িন। অহুশেরা লে ছোলায়মানা জোনুদুহু মেনাল জিন্নে অল এন্‌ছে অত্‌তাইরে ফাহুম ইয়ুজায়ূন

"হে মানবগণ। আমাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে পাখীর ভাষার, আর দেয়া হয়েছে (সেই জমানার আরো দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক) সব কিছু জ্ঞান।" তখন সোলায়মানের কাছে একত্রিত করা হোলো তাঁর মানুষ জীন ও পাখী—সব রকমের সৈন্য আর তাদের সাজানো হলো বিভিন্ন দলে।—নমল ১৬, ১৭।

এই পাখী কি? বলা হয়েছে মনতেকোত্‌তায়ের [পাখীর প্রকল্প—জ্ঞান-বিজ্ঞান]। কাজেই মনে করা স্বাভাবিক যে এ সাধারণ পাখী নয়। কারণ পাখীর প্রকল্প—দর্শন বিজ্ঞানের—কোন অর্থই হয়না। কারণ,পাখী মানুষের মতো কোন বিবেকবান জীব (rational animal) নয় যে তার কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক ভাষা থাক্‌তে পারে আর তাতে কোন প্রকল্প প্রকাশ পেতে পারে। কেবল সহজাত বৃত্তির স্ফুরণ যে-সীমাবদ্ধ ভাষার প্রকাশ তার দুই ঠোটের মাধ্যমে আমরা দেখি এবং শুনি তা এক এক ধরনের পাখীর মাত্র এক এক রকম বুলি, বড়োজোর কোন কোন পাখীর ঐ বুলিরই আরো কিছুটা রকম ফের। আর ময়না তোতা প্রভৃতি পাখীকে যতোটুকু মানব-বুলি শিখানো যাবে তা-ই মাত্র সে না বুঝে-টুঝে যান্ত্রিক ভাবে উচ্চারণ করবে। আর সেওতো মানবের শিক্ষা। খাঁচায় পুরে শিখানো বুলি। তাই কবি গেয়েছেন ঃ

পাখীরে দিয়েছ ভাষা
গাহে সেই গান
আমারে দিয়েছ ভাষা
আমি তার বেশি করি দান।—রবীন্দ্রনাথ

বলা হবে ঃ সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পশুপাখীর ভাষা বুঝতেন, যেমন কোরআনের ছুরা নমলে ১৮ আয়াতে আছে ঃ

حتی اذا اتوا علی واد النمل - قالت نملة یایها النمل ادخلوا مسکنکم-
لایحطمنکم سلیمن و جنوده - و هم لا یشعرون -

হাত্তা ইজা আতাও আলা ওয়াদেন্নাম্‌লে ক্বালাত নামলাতুঁ ইয়া-আইয়োহা ন্নাম্‌লোদ্‌খোলু মাছাকেনাকুম—লাইয়াহ্‌তেমান্নাকুম ছোলায়-মানো অ জোনুদুহু-অ হুম লা ইয়াশ্‌য়ুরুন।

অবশেষে যখন তাঁরা (সোলায়মান আঃ ও তাঁর দল বল) নমল অর্থাৎ পিপীলিকার উপত্যকায় পোঁছলেন তখন একটি নমল (পিপীলিকা) বল্‌লো ঃ হে নমল! তোমরা তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ো যাতে করে সোলায়মান ও তার সৈন্য সামন্ত তোমাদের পদানত করতে নাপারে আর তারা না জানে।

এখানে 'নমল' পিপীলিকা নয়, জিবরিন ও আস্‌কালান পর্বত দুয়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা আর নমল জাতি ছিলো সেই জমানায় সেই উপত্যকার বাসিন্দা উপজাতি বিশেষ। যেমন 'মাজিন' শব্দের আভিধানিক অর্থ পিপড়ের ডিম, কিন্তু তাতে আসলে বোঝাতো ঐ নামীয় এক উপজাতি। আর এ জমানায়ও পশুপাখী পোকাদির নামে কতো ব্যক্তিগত নাম রাখা হয়, জাতিও আছে। যথা ঃ মশা, গুবরে, ময়ূর, নকুল (বেজী) বাঘা, শের (বাঘ বা সিংহ) ; বংশগত উপাধি সিংহ, হাতি, বনিআছাদ (সিংহ গোত্র, গোষ্ঠি বা জাতি) প্রভৃতি।

তাৎপর্য হলো সোলায়মান সসৈন্য শৌর্যে বীর্যে এতো পরাক্রান্ত ছিলেন যে তাদের মোকাবিলা করবার মতো শক্তি সামর্থ ঐ নমল উপজাতির তো ছিলোইনা, এমন কি এদের সভ্যতার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট ধার্মিকতা ইত্যাদি জানবার বুঝবার আগেই হয়তো দুর্ধর্ষ সোলায়মান-সৈন্যদল তাদের শৌর্যে বীর্যে ও সংখ্যাধিক্যে তাদের একেবারে পর্যুদস্ত ও পদানত করে ফেলবেন, তাই তাদের নরপতি, কি সেনাপতি তাদের ঐ পার্বত্য অঞ্চলে তাদের ঘরে ঘরে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করতে বললেন।

আর পিপড়ে মানুষের মতো কথা বলে, তাদের মানুষের মতো ঐ রকম ভাষা আছে, ঘর দোর আছে যাতে লুকিয়ে থাকা যায়, লুকিয়ে থাক্‌তে বলা হলো এও কি একটা কথা ? আর তাদের বিশিষ্ট সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধার্মিকতা ইত্যাদি না জেনে সোলায়মানের দলবল তাদের ধ্বংস করে ফেলবেন তাই মানবোচিত ভাবে ঐ লুকিয়ে পড়ে আত্ম রক্ষার আদেশ দেয়া হলো এও কি একটা বিশ্বাস্য সত্য ঘটনা হতে পারে ? আসল সত্য যা'তা ঐ উপরে দেওয়া হলো, যেমন ঐ পাখীর ভাষার বেলা, হুদহুদ পাখীর বেলা দিয়েছি। তথাপি যদি মানবীয় বিবেক বুদ্ধির মাথায় কুঠার মেরে ঐ পুরান কথা, কিংবদন্তি, গল্পগুজব বিশ্বাস করতে চান, মানতে চান, তবে বিশ্বাস করুন গে, মানুন গে, আমার কী !

তবে কী ? আমরা পুনঃ পুনঃ বলেছি যে আল্লাহ যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান আনুপাতিকই কথা কয়েছেন। সুতরাং সেই জমানার সাধারণ মানুষ যেমন রকেট (হাউই) ও উড়োজাহাজকে পাখী নাম করনে, তাঁর চালককে পাখীদের কোন এক নামে (হুদহুদ) না বললে বুঝতোনা, তেমনি নমল জাতির—সোলায়মানের তুলনায় নিকৃষ্টতা, নির্মূল হবার সম্ভাবনার কথা, তাদের পলায়নের কথা ঐ সাহিত্যিক ভাষায় না বল্‌লে বুঝ্‌তে আগ্রহ প্রকাশ করতোনা, আকৃষ্ট হতে চাইতো না, বুঝতো না।

যা হোক হাউইর মতো, তখ্‌তে সোলায়মানের মতো ঐ হেক্‌মতি যন্ত্র-শিল্প-বিজ্ঞানের কথা ঐ রকম হেক্‌মতি শব্দ-সম্ভার-যোগে বোঝাবার কোশেশ করা হয়েছে। তার আরো কারণ আছে। সে কারণ হচ্ছে কবুতর কি ঈগল পাখী টাখি পুষে তাদের পায়ে চিরকুট বেঁধে-ছেঁদে জরুরী কার্যের সংবাদ আদান প্রদান করার অনুকরণে ঐ ফানুস, হাউই-জাহাজ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেজন্যও ওগুলোকে পাখী রূপকে বয়ান করা হয়েছে। আর জীন যে ঐ জড় শিল্পী বিজ্ঞানী তা তো একটু

আগেও বলেছি। কাজেই জলে স্থলে, কিছুটা শূন্যে, অনেকটা আধুনিক জমানার মত হযরত সোলায়মানের (আ) ছিলো নানা সৈন্য বিভাগ।

و تفقد الطير فقال مالى لاارى الهد هد - ام كان من الغا ئبين -

অ তাফাক্কাদাত্‌ তাইরা ফাক্কালা মালিআ লা আরাল হুদ্‌হুদা—আম কানা মেনাল গায়েবীন।

আর তিনি (সোলায়মান) পাখী বাহিনীর হাজিরা নিলেন এবং বললেন—ব্যাপার কী ! আমি হুদহুদকে দেখছিনা যে সে কি অনুপস্থিত ?—নমল ২০ ।

'হুদহুদ' প্রকৃত পক্ষে কোন পাখী নয়। বিমান বাহিনীর পরিচালক, সেই জমানার বিমান-অধিনায়ক (air marshal) আর কী ?

হযরত দাউদ (আঃ) ও তৎপুত্র হযরত সোলায়মানের (আঃ) জমানায় এইরূপে শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা ও যান্ত্রিক সভ্যতায় সেই জমানা আনুপাতিক শীর্ষ স্থানে পৌঁছেছিল, তা এই ধরনের আয়াতের বিজ্ঞ জনোচিত তফসিরেই মাত্র জানা যেতে পারে, বোঝা যেতে পারে।

কিন্তু কিছুতেই এই জমানার সমকক্ষ প্রমাণ করতে নিম্ন রূপক আয়াত সমুহের শাব্দিক ব্যাখ্যা করে রকেট আমদানা করে শত শত মাইল দুরবর্তী সাবা রাজ্যের রাণী বিলকিসের সিংহাসন শূন্য পথে চক্ষের নিমিষে, কি সোলায়মান (আঃ) সিংহাসন থেকে উঠবার আগে সোলায়মানের (আঃ) দরবারে এনে হাজির করা যায় না।

ياايها الملؤا ايكم يتينى بعوشها قبل ان ياتونى مسلمين -

ইয়া আইয়োহাল মালায়ু আইয়োকুম ইয়াতিনি বে-আরশেহা কাব্‌লা আঁ ইয়াতুনি মুছ্‌লেমীন

হে প্রধানগণ! কে তোমরা তাঁর (ছাবার রাণী বিলকিসের) সিংহাসন নিয়ে আস্‌তে পারো আমার নিকট তাঁরা (রাণী ও তাঁর দলবল) আমার নিকট মুস্‌লিম হয়ে আসার পূর্বে।—নমল ৩৮।

তাৎপর্য হলো ঃ সিংহাসন হচ্ছে রাজত্বের প্রতীক, প্রধান অবলম্বন ; তা যথাশীঘ্র দখল করতে পারলেই রাণী সহ তাঁর দলবল (সে রাজ্যবাসীরা) ঈমান আনবে, মুসলিম হবে।—আন্তর্জাতিক অর্থে সেই এক আল্লাহ বিশ্বাসী এবং প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে যে চিরন্তন আত্মার ধর্ম ইসলামের কথা বলে আসছি এবং বলতে থাকবো সেই সত্য সনাতন চিরন্তন দীন ইস্‌লাম মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পিত (মুসলিম), ফলে আত্মায় চির অনাবিল শান্তিপ্রাপ্ত ধার্মিক (মুছলমান) হবে। নতুবা সংকীর্ণ অর্থে এ-জমানায় যাকে আমরা ইসলাম বলি (অবশ্য তা' ইসলামের এক দিক অর্থাৎ শুরু) তা ঐসব জমানায় ছিলোই না, সুতরাং কী করে সেই জমানার পয়গাম্বর-দের ধর্মকেও ইসলাম ও সেই সেই ধর্মাবলম্বী উম্মতদিগকেও এই রকম বিভিন্ন আয়াতে কোরআনে মুসলিম বলা হবে, অবিশ্বাসীদের মুসলিম হতে বলা হবে? এই রকম শুরুর ইসলাম শরিয়তওতো সেই সব কোন জমানায় ছিলো না। তবে?—দেখুন বাকারা ৬২, ৯৭, আলে ইমরান ৮৩, ১০৯, মোমীন ৭৮, নেছা ১৬৪ ; এর আগের জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধের পুরো পৃষ্ঠা এবং শেষ প্রবন্ধের 'সোলায়মান (আঃ), আঁ হযরত (সঃ), পূর্বাপর' প্রসংগ।

وقال عفريت من الجن انا اتيک به قبل ان تقوم من مقامک - قال‌الذی
عنده علم من الكتب انا اتينک به قبل ان يرتد اليک طرفک -

ক্বালা এফ্‌রিতোম্‌মেনাল জেন্‌নে আনা আতিকা বিহি ক্বাব্‌লা আন তাকুম্‌মা মেন মাকামেক্‌—কালা আল্লাজি ইন্‌দাহু এলমুম মেনাল কেতাবে আনা আতিকা বিহি ক্বাব্‌লা আইয়ারতাদ্দ্‌দা এলাইকা তারফোক

এক শক্তিশালী জীন (সেই জমানার জড় শিল্পী বিজ্ঞানী) বল্‌লো —আমি নিয়ে আসবো আপনার স্থান হতে উঠবার আগে।—ধর্ম্ম-গ্রন্থ-জ্ঞানী (একাধারে ধার্মিক ও বিজ্ঞানী) বললেন—আমি ওটা নিয়ে আস্‌বো আপনার চক্ষের নিমেষে।—নম্‌ল ৩৯,৪০।

বলা বাহুল্য, জীন এক্ষেত্রে যেমন সেই জমানার জড়শিল্পী-বিজ্ঞানী, তেমনি অসভ্য যাযাবর বা গুহা মানব—সে জমানায়ও তাদের অস্তিত্ব কিছু কিছু ছিলো, এ'জমানায়ও যেমন তাদের বংশধর যাযাবর মানুষ এবং অসভ্য গুহামানবদের শাখা প্রশাখা অনার্য (অষ্ট্রীচ) নামে এখনো কিছু কিছু বনে জংগলে রয়েছে। [দেখুন 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বির্তনবাদ প্রবন্ধের 'কোরআন' ও 'মাজমা'-উল-বাহরায়েন' প্রসংগের 'জীন্‌-ইন্‌ছান']। সোলায়মান (আ) তাঁর জামানায় ঐ সব জানোয়ার সদৃশ গুহামানব যাযাবর মানুষ ধরে এনে নানা শ্রম সাধ্য কার্যে এবং জড় শিল্প বিজ্ঞান শিখিয়ে সেই জমানা আনুপাতিক সেই সব যন্ত্রপাতি বানাবার কার্যে বিনিয়োগ করেছিলেন। আবার সভ্য ধার্মিক মানুষদের মধ্যেও শিল্পী, বিজ্ঞানী ছিলেন! তাঁরাও ঐ শিল্প যন্ত্রাদি হযরত সোলায়মানের (আ) আদেশে তৈয়ার করতেন।

জড় ও আধ্যাত্ম সকল রকম দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শী সদলবল হযরত সোলায়মান পয়গম্বরের (আ) কাছে সেই জমানার যে কোন সাম্রাজ্য দখল, সিংহাসন অধিকার করা যে ছিলো অতি অল্প আয়াস-সাধ্য ব্যাপার তা-ই বোঝানো এ-ধরনের আয়াতের লক্ষ্য ; কোন রকম অস্বাভাবিক অলৌকিকতা নয়। 'আপনার স্থান হ'তে উঠবার আগে' কি, 'আপনার চক্ষের নিমিষে' ইত্যাদি সেই অভূতপূর্ব শক্তি-সামর্থের কথাই প্রকাশ করে, প্রমাণ করে। আমরাও তো দূরবর্তী স্থানে যাওয়া আসার বেলা যথাসাধ্য শীঘ্রতা, ক্ষিপ্রতা বোঝাতে বলে থাকি : 'এই যাবো আর আসবো।'—এও অনেকটা সেই ক্ষিপ্রতা, শীঘ্রতা বোঝাতে আরবী ভাষা-মাফিক সুপ্রয়োগ।

قال نكراو لها عرشها - فلما جاءت قيل اهكذا عرشک - کانه هو

ক্বালা নাক্কেরু লাহা আরশাহা—ফালাম্মা জাআত্ ক্বিলা আহাকাজা আরশোক্—ক্বালাত্ কাআন্নাহু হুআ

তিনি (সোলায়মান) (আ) বললেন ; সিংহাসনকে কিছু রদবদল করে ফেলো।—রাণী হাজির হলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো : এই কি আপনার সিংহাসন ? রাণী বললেন : সেই রূপই তো দেখাচ্ছে। —নমল ৪১,৪২।

স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে সিংহাসন অতি অল্প আয়াসেই দখল করা হয়েছিল এবং সোলায়মানের (আ) সামনেই আনা হয়েছিল, রদবদলের কথায়ই তা' প্রকাশ। এখন, অনুমান করা নিশ্চয়ই দোষনীয় নয় যে শত শত মাইল দূরবর্তী এক সাম্রাজ্য দখল, সিংহাসন দখল, তা স্বরাজ্যে নিয়ে আসা—সবই স্থল, জল, বিমান সর্বরকম সংগ্রাম চালিয়ে সম্ভবপর হয়েছিল এবং তাতেই বোঝা যায় সোলায়মানের (অ) জমানায় বিমানে চলাচল কিছুটা সম্ভবপর হয়েছিল। কেবল 'জীন' যে কোন অশরীরি জীব এম্‌নি সব কিস্‌সা কাহিনী ভুলে' জড়-শিল্পী-বিজ্ঞানীদেরই জীন বলা হয়েছে এম্‌নি বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন, বিষয়টা আপ্‌সে আপ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঐ জড়-শিল্পী-বিজ্ঞানীদের দুই কিস্‌ম ছিল—এক অধার্মিক, কখনো কখনো অসভ্য, অথচ সোলায়মান (আঃ) তাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন। তাদেরই বিশেষ করে' বলা হয়েছে 'জীন'। আর এক কিস্‌ম ধার্মিক অথচ মহাবিজ্ঞানী যেমন সোলায়মান (আঃ) নিজে। উভয়ের কথাই কোরআনে উল্লেখিত, তবে ধর্মহীনরা বৈজ্ঞানিক হলেও যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ধার্মিক বিজ্ঞানীরা যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর—ধর্মহীন বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ জীনদের সোলায়মানের (আঃ) অর্থাৎ ধার্মিক বিজ্ঞানী বীরের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে তাই বোঝানো হয়েছে।

فسخرنا له الريح تجرى بامره رخاء حيث اصاب

ফাছাখ্খারনা লাহুর রিহা তাজরি বে আমরেহি রুখাআ হায়ছো আছাব

"এরপর আমরা তাঁর অধীন করে দেই বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে মৃদু মন্দ চল্ত—তিনি যেদিকে যেতে ইচ্ছা কর্তেন।"—স-দ-৩৬।

দুনিয়াবী বাতাসকে তিনি উপরোক্ত শিল্পী বিজ্ঞানীদের দ্বারা তৈয়ারী এক প্রকার পাল-তোলা স্লুপে এবং তৎকালীন তাঁর আকাশযান আধুনিক কালের বেলুন-সদৃশ ফানুস-সিংহাসন (তখ্তে সোলায়-মান) চালানো কার্যে খাটাতেন।

والشيطين كل بناء و غواص - و اخرين مقرنين فى لاصفاد

অশ্শায়াতিনা কুল্লা বান্নায়েঁ অ গাওয়াছ—অ আখারিনা মুকাররানিন ফিল আছফাদ—

এবং শয়তানদেরও—সব রকম শিল্পী—ডুবুরী। আর অপর (জীন) সমূহকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায়। স-দ ৩৭-৩৮।

ঐ শয়তান বা জীন অশরীরি কোন জীব নয়, বরং সেই জমানার জড়-শিল্পী, বিজ্ঞানী। আর অপর জীন বা শয়তান হচ্ছে সেই জমানার অসভ্য মানব—যাদের অতি অসভ্যতার কারণেই শৃংখলাবদ্ধ করে' রাখা হতো এবং ট্রেণিং দিয়ে স্লুপ (সেই জমানার বৃহৎ জাহাজ) চালাবার কাজে এবং ডুবিয়ে মাছ ধরা, কি সমুদ্রতলের মণি-মুক্তা আহরণ কার্যে খাটান হতো। নতুবা অশরীরি জীবকে শিকল দিয়ে বেঁধে ছেদে কাজে খাটান যায় এও একটা কথা !

هذا اعطاؤنا فامنن او امسک بغير حساب - و ان له عندنا لزلفى و حسن ماب

হাজা আতায়ুনা ফাম্নুন আও আমছেক বে গায়রে হিসাব—অ ইন্না লাহু ইনদানা লা জুল্ফা অ হুছনা মাআব।

"এ আমাদের দান (জেব্রাইল অর্থাৎ রুহুল কোদছ বা পবিত্র আত্মা অছিলায় আল্লাহর দান। আল্লাহর সব শিক্ষাদীক্ষা দান এমনি অছিলা বরাবরে হয় বলে' আমি না বলে' আল্লাহ কখনো কখনো আমরা ব্যবহার করেন) তুমি এ (দান) দাও বা রেখে দাও কোন হিসাব লওয়া হবে না—" অর্থাৎ যুগপৎ অধ্যাত্ম ও জড়-শিল্প-বিজ্ঞানের

ঐ গুণ জ্ঞান অপরকেও শিখাও কিংবা নিজেই মাত্র ইছতেমাল কর— কোন দোষ নেই।— নিঃসন্দেহে তাঁর (সোলায়মান আঃ ও অনুরূপ বোজর্গানে দীনের) রয়েছে আমাদের কাছে নৈকট্য ও ফিরবার উত্তম স্থান।— স-দ-৩৯, ৪০।

এখনি প্রাগৈতিহাসিক মিশর, ফিনিসিয়া, অ্যাসেরিয়া, ব্যাবিলন, ভারত, ইরান, গ্রীস ছেড়ে সরাসরি ঐতিহাসিক চীন, আরব, ইউরোপ, অ্যামেরিকায় ফিরে আস্‌তে হয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আঁ হযরতের আমলে চীন হুনার-হিকমতে অর্থাৎ দর্শন বিজ্ঞানে ছিলো ছুনিয়ায় সর্বেসর্বা—সেরা। তাই আঁ হযরত মুছ্‌লিমদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হুকুম দিলেন ঃ

اطلبوالعلم و لو کان باالصین

উত্‌লোবুল এল্‌মা অ লাও কানা বেছ্‌ছিন

জ্ঞান আহরণ করো যদি সেজন্য চীন মুলুক যেতে হয়, তবুও।

এই চীনেই অতি প্রাচীন জমানায় রকেটের হয় গোড়া পত্তন। আঁ হযরতের উপরোক্ত হুকুমের ফল ফল্‌তে দেরী হয় নি। চীন থেকে শুরু করে' সারা ছুনিয়াটা জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে চষে' ফির্‌তে লাগলো মুসলিমরা আর নানা মূল-সূত্র সংগ্রহ করে দর্শন বিজ্ঞানে তাঁরা যা করে গেছেন সত্যিকার ইতিহাস তার সাক্ষী। আর তাঁদের হাতেই বর্তমান জমানার রকেটের মূলসূত্র প্রথম অভিব্যক্তি লাভ করেছিল হাউই নামে। এবং সে হাউইবাজির কথা, আতশবাজির কথা কে না জানেন!

চীন দেশে মংগলীয়রা ১২৩২ খৃষ্টাব্দে যখন পিয়েন কিং অবরোধ করে তখনও চীনবাসী তাদের বিরুদ্ধে রকেট ব্যবহার করেছিল। আমাদের পাক-ভারতে টিপুসুলতান (১৭৮২-১৭৯৯) শ্রীরংগপট্টন অবরোধকালে বিশেষ সাফল্যের সংগে রকেট ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করে ছিলেন। এই রকেটের খোল ছিল লৌহনির্মিত। এর দৈর্ঘ্য ছিল আট ইঞ্চি, ব্যাস ছিল দেড় ইঞ্চি। বাতাসের বাধাকে যাতে করে' সহজে

অতিক্রম করা যায় সেজন্য এর অগ্রভাগ সরু করে বানান হয়েছিল। এই রকেটকে আধুনিক রকেটের জনক বলা যেতে পারে। রকেটের আঘাতে ইংরেজ সৈন্যরা পর্য্‌দস্ত হয়ে পড়ায় ইংরেজরা যুদ্ধে রকেটের গুরুত্ব ভাল করে' বুঝতে পারে। ঐ সময় উইলিয়ম কংগ্রীভ রকেট গবেষণায় আগ্রহান্বিত হন। এর পর ফরাসী বীর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংরেজরা বিশেষ সাফল্যের সংগে রকেট ব্যবহার করেছিল।*

আবার অতি প্রাচীন কাল থেকে আঁ হযরতের আমল পর্যন্ত ওর যে অপপ্রয়োগ চলেছিলো তার অপনিন্দার কাহিনী কঠোর কোরাণিক-ভাষায় তো ইতি পূর্বেই শুনেছেন। কিন্তু তার পর?

সব হারিয়ে গেছে! চীনবাসী ঘুম দিয়েছিল ইউরোপ-আমেরিকার সরবরাহ করা আফিং খেয়ে, আর মুসলিমরা ঘুম দিলো কিছু খেয়ে নয়, না খেয়ে না খেয়ে। তার মানে প্রাণের যে ক্ষুধায় হয় সৃষ্টি তা গেলো মরে'। কেন গেলো সে আর এক ইতিহাস। কিন্তু গেলো যে সে সত্যি ঘটনা। হয়তো উদ্‌বর্তনের সীমানায় আছে এমনি পশ্চাদ্‌-বর্তন। সুতরাং না খেয়ে না খেয়ে অর্থাৎ কৃষ্টির অভাবে মর্‌লো এ-জাতি, হারালো সৃষ্টি!

তারপর? অনেক পরে এদের সমাধি স্তূপের ভিতর থেকে যাদের হলো নব জাগরণ (রিনেসাঁ) তাদেরই অবাক কাণ্ডগুলো এদের মৃত আত্মাগুলি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছে, দেখুক, কখনো কখনো অনুকরন করছে, করুক।

ধর্মমোহের বাড়াবাড়ি, অবিজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা

এখনি ধার্মকিতার মোহে অতি আগ্রহে এক শ্রেণীর অজ্ঞ অপপ্রচারের দিকে আপনাদের বিজ্ঞ দৃষ্টিপাত আকর্ষণ না করে' কী করে' পারি!

* দেখুন কবি জসীমউদ্দীন কৃত পুস্তক 'গল্প-সল্প, 'মহাশূন্যে অভিযান' প্রবন্ধ।

এই উড়োজাহাজ রকেট সফরের উদাহরণ স্ব স্ব পৌরানিক গ্রন্থ-সমূহ থেকে দিতে গিয়ে অনেকসময়ে অতিপ্রাচীন অন্য ধর্মের অবতার এবং ইসলামের প্রাচীন পয়গম্বরদের এবং পরবর্তী সন্ন্যাসী, সন্ত, পীর বোজর্গদের সশরীরে আকাশ-পাতাল সফরের কল্পিত কাহি-নীর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এমন কি হযরত মোহাম্মদের (স) মে'রাজের কাহিনীও আল-কোরআন, হাদিছ থেকে এ প্রসংগে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোথায় অধ্যাত্ম অতি সূক্ষ্ম সফর যোগ-প্রাণায়াম, কাশফ-মে'রাজ প্রভৃতি আর কোথায় উড়ো-জাহাজ, রকেটে স্থূল সফর।—'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিবর্তন-মানব' প্রসংগ আর একবার দেখুন।

এই স্থূল সফরের কার্য কলাপ আগে আরো শুনুন তারপর বিচার করুন অনুরূপ সফর স্থূল দেহে সম্ভবপর কিনা।

ঘণ্টায় ১৮০০০/১৯০০০ হাজার মাইল বেগ-পূরিত রকেট মাধ্যা-কর্ষণের সীমা পেরোতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঐ টান আর চলবার ঐ শক্তি না ফুরান পর্যন্ত তার এক উপগ্রহসহ চক্রাকারে ঘোরে। শক্তি ফুঁকতে ফুঁকতে ফুঁকে দেয়, আর সবশেষে পড়ে যায়, কিংবা মধ্য পথে বায়ুর ঘর্ষণে ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর ২১০০০ মাইল বেগ পূরিত রকেট ঘোরে কিছু বেশী দিন, শেষে পড়ে যায়, কিংবা পুড়ে যায়। আর ২৫০০০ মাইল, কি তদূর্ধ মাইল বেগ-ওয়ালা রকেট মাধ্যাকর্ষণের সীমা পেরিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চাঁদের পাশ দিয়ে গিয়ে সৌর শক্তির টানে তার আর এক গ্রহ হয়ে ঘোরে, কিন্তু তার ঘুরবার সীমা থাকবে নিশ্চয়ই, মহাশূন্যের মহাকাশের মহাশক্তির তুলনায় সে শক্তি কতটুকু! শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় করে পড়ে যায়, কিংবা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে চাঁদে গিয়ে পড়ে।

এখন রাশিয়া ও আমেরিকার মহাশূন্য অভিযানের প্রধান প্রধান কতিপয় ঘটনা তুলে দিলেই বোঝা যাবে এবিষয়ে এপর্যন্ত কতোদূর এগোনো গেছে ও যাচ্ছে, কি যাবে।

রাশিয়া

অক্টোবর ৪, ১৯৫৭—প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে উড়লো।

সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৫৯—লুনিক '২' প্রথম চাঁদে পড়লো।

আগষ্ট ৩য় সপ্তাহ ১৯৬০—বিরাট রকেট 'উড়ন্ত চিড়িয়াখানা' ষ্ট্রেলকা-বেলকা কুত্তাদ্বয়কে নিয়ে মহাশূন্যে গিয়ে ফিরে এল।

এপ্রিল ১২, ১৯৬১—মহাকাশে প্রথম মানুষ উড়লো (ইউরি গ্যাগারিন)।

জুন ১৮, ১৯৬৩—প্রথম নারী যিনি মহাকাশে পাড়ি জমালেন (ভেলেন্টিনা টেরেস্কোভা)।

মার্চ ১৯, ১৯৬৫—প্রথম মানুষ মহাশূন্যে সাঁতার কাটলেন (লিয়োনেভ)।

ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৬৬—'লুনা ৯' প্রথম চাঁদে নিরাপদে নামলো।

এপ্রিল ৪, ১৯৬৬—'লুনা ১০' চাঁদের উপগ্রহ হয়ে চাঁদের দু' পিঠের এবং আবহাওয়ার অপূর্ব খবর দিল।

এপ্রিল ২৪, ১৯৬৭—দ্বিতীয়বার মহাশূন্যাচারী কর্ণেল ব্লাডিমির কমোরভ মহাশূন্য থেকে ফিরে আসার পথে প্রাণ হারালেন (প্রথম মহাশূন্যে মৃত মানব, রাশিয়ার মহাবীর আখ্যায় ভূষিত)

আমেরিকা

জানুয়ারী, ৩১, ১৯৫৮—এক্‌স্‌প্লোরার প্রথম মহাশূন্যে উড়লো।

জুলাই, ৩১, ১৯৬৪—'রেঞ্জার ৭' চাঁদের পৃষ্ঠের বড়ো বড়ো ছবি পাঠালো।

মার্চ, ২৩, ১৯৬৫—'জেমিনী ৩'এ গ্রিসম ও ইয়ং মহাশূন্যে ঘুরে এলেন।

জুন, ৩, ১৯৬৫—ম্যাক ডিভিট পরিচালিত 'জেমিনি ৯' থেকে
বাইরে এসে এডোয়ার্ড হোয়াইট মহাশূন্যে প্রায় ২০
মিনিট সাঁতার কাটলেন।

জুন, ২, ১৯৬৬—সার্ভেয়ার নিরাপদে চাঁদে নামলো।

জুন, ৬ ১৯৬৬—টমাস ষ্ট্যাফোর্ড পরিচালিত রকেট থেকে ইউজিন
সারন্যান বেরিয়ে এসে ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট
মহাশূন্যে সাঁতার কাটলেন।

জুলাই, ২১, ১৯৬৬—জন ইয়ং ও মাইকেল কলিন্স সর্বোচ্চ ৪৭৫
মাইল উপরে উঠে নিরাপদে ফিরে এলেন।

সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৬৬—চার্লস কনরাড ও রিচার্ড গর্ডন সর্বোচ্চ
৮৫৩ মাইল উর্ধে উঠে নিরাপদে
ফিরে এলেন।

জানুয়ারী, ১৯৬৭—ভার্জিল গ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট, ও রোজার
সেফে মহাশূন্যে উঠবার প্রাক্কালে মহাশূন্য-যানে
আগুন ধরে যাওয়ায় মারা যান।

এইভাবে মানুষ শত শত মাইল মহাশূন্যে সফর করে নিরাপদে ফিরে এসেছেন। রাশিয়ার কুত্তা লায়েকা ৯৩০ মাইল উর্ধে উঠে আর ফিরে আসেনি। মৃত্যু বরন করেও মশহুর হয়ে আছে।

তেজষ্ক্রিয় বলয়ের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্য ১৯৬৬ সনে রাশিয়া আরো দুই কুত্তা প্রায় ৫৮০ মাইল উর্দ্ধে মহাশূন্যে প্রায় ২২ দিন যাবত সফর করিয়ে পুনঃ পৃথিবী পৃষ্ঠে ইচ্ছামত স্থানে ও কালে যান্ত্রিক উপায়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

এতো কিছু করার পর কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না যে, শিগ্গিরই মানুষ চাঁদে নেমে পড়বে না, চাই কি, এই সৌরলোকের গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করবে।

কিন্তু অন্য সৌরলোকে ? আমাদের সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা আল্‌ফা সেন্টরী ৪½ আলোক বর্ষ দূরে। তার অর্থ আলোক চলে সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল, মিনিটে তার ৬০ গুণ, ঘণ্টায় তার ৬০ গুণ, তার ২৪ গুণ দিনে, তার ৩০ গুণ মাসে, আর তার ১২ গুণে এক এক আলোক বর্ষ। এক আলোক বর্ষ তা'হলে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি মাইল। ঐ ৪½ আলোক বর্ষের দূরত্ব হবে তাহলে ঐ ৬ লক্ষ কোটি মাইল × ৪½ আলোক বর্ষ = প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি মাইল ; ঐ সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকারই এই বিপুল দূরত্ব। তারপর ত অন্য তারকা, আর হাজার হাজার, কি লাখ লাখ, কি কোটি কোটি আলোক বর্ষের ছায়াপথের তারকাপুঞ্জের পর তারকাপুঞ্জ !—দেখুন 'জিজ্ঞাসা প্রবন্ধে 'বিজ্ঞান—বিশ্বগোলক' এবং জবাব (১) এর 'সৃষ্টি রহস্য' প্রবন্ধে 'বিশ্ব-বিজ্ঞান—আল্লাহ্‌র কুদরত'।

তা হলে চিন্তা করে দেখুন ঐ সূর্যের যদি কোন গ্রহ থেকে থাকে, গ্রহের উপগ্রহ থেকে থাকে, তবে কোন যান্ত্রিক উপায়ে সেখানে যাওয়া যাবে কিনা। বলা বাহুল্য, কতো বারই বলেছি সকল তারকাই সূর্য আর আমাদের সূর্য একটি মাঝারি তারকা মাত্র। আর আমাদের সূর্যের গ্রহ আছে, গ্রহের উপগ্রহ আছে, আর ঐ সব সূর্যের কোনটারই কোন গ্রহ নেই, গ্রহের উপগ্রহ নেই এ আর বিশ্বাস্য নয়, কিংবা ঐ সব সৌরলোকের কোন গ্রহে. কি উপগ্রহে জীব-জন্তু উদ্ভিজ্জ এবং মানুষের মতো কোন জীব—সভ্য কি অসভ্য অবস্থায় নেই—একথা এখন আর ধোপে টেকে না। কিন্তু ঐ বিপুল দূরত্বের কারণেই ঐ জড়-জীব-জগতে পৌঁছবার কোন যান্ত্রিক উপায় নেই। অবশ্য একমাত্র বৈদ্যুত সংকেত আদান প্রদান করা চলতে পারে—যে সব গ্রহ উপগ্রহে এই পৃথিবীগ্রহের মানুষের মতো বিদ্যুতে কথা-বার্তা বলার প্রেরক (transmitter) ও গ্রাহক (receiver) যন্ত্র আবিষ্কারক বিজ্ঞানী মানুষ আছে, তাদের সংগে সেই সব গ্রহে গ্রহে কি উপগ্রহে উপগ্রহে। তাতেও

লাগবে ঐ ৪$\frac{১}{৪}$+৪$\frac{১}{৪}$=৮$\frac{১}{২}$ আলোক বর্ষ সবচেয়ে নিকটবর্তী অপর ঐ সৌরলোকের গ্রহে গ্রহে, কি উপগ্রহে উপগ্রহে সংবাদ আদান প্রদান করতে। আরো দূরবর্তী সৌরলোকের কথা তো সুদূরের চিন্তা! বুঝুন মজাটা! কিন্তু যাবেন কি করে?

কারণ, মানুষের তৈরী এই রকেটের মহাশূন্যে আজ তক দৌড় ঘণ্টায় মাত্র ২৫০০০ মাইল, না হয় ঘণ্টায় ৫০০০০ মাইল কিংবা লাখ মাইল হলো, কিন্তু কোথায় ঘণ্টায় আর কোথায় সেকেণ্ডে প্রায় দু লক্ষ মাইল! সুতরাং মহাশূন্যের বিপুল বিস্তৃত জড়জগতে জড়দেহ কিংবা যন্ত্র নিয়েও এই সৌর লোকেরও সুদূরে, কিংবা তার বাইরের সবচেয়ে নিকটবর্তী সৌরলোকে যাবার চিন্তাও আমরা করতে পারছিনে।

জড়-জগৎ, চিৎ-জগৎ, প্রকৃত রহস্য

এখন ভাবুন মানব দেহে ঐ উড়োজাহাজিক বায়বীয় চাপ কিংবা রকেটের ঐ ক্ষেপন-চাপ প্রয়োগের কথা। কোন উপগ্রহে যাওয়া কিংবা কোন কক্ষপথে ঘোরা তো সুদূরের কথা, ইতিমধ্যেই দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মহাশূন্য সফর শুরু হয়ে যাবে যে!

অবশ্য হযরত মোহাম্মদ (স) এবং অনুরূপ অপর বোজর্গকে নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা হবে। কিন্তু কোরআন যেখানে তাঁদের ব্যতিক্রম মনে করেনি, আমরা তাদের কি করে' ব্যতিক্রম ভাবি?

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى

কুল ইন্নামা আনা বাসারোম মেছ্‌লোকুম ইউহ্যা এলাইআ

বলো [হে মোহাম্মদ (স)] আমি তোমাদের মতই (স্থূল রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার) মানুষ, কেবল (পার্থক্য এই যে) আমার কাছে (আল্লাহর থেকে যোগাযোগে) ওহি আসে।—কাহফ ১১০।

বস্তুতঃ অধ্যাত্ম দিক দিয়ে যা-ই হোক, এক রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার মানুষের বেলা যা সম্ভব কি অসম্ভব, অনুরূপ অপর ব্যক্তির বেলায়ও তা সম্ভব কি অসম্ভব।

আবার দেখুন মে'রাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সংগে মোলাকাত এবং বাত্‌চিৎ। কিন্তু তিনি কি ঐ শূন্যে বসে আছেন যে তাকে পেতে মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে হবে? আসলে সবই তো শূন্যে! আমরাও তো আছি মহাশূন্যে—কেবল পায়ের তলায় মাটি আছে বলে' মহাশূন্য মালুম হয় না। কিন্তু আমাদের মাথার উপরে যে গ্রহ উপগ্রহ দেখি ওতে আমাদের মত কোন বুদ্ধিমান জীব থেকে থাকলে তারাও আমাদের গ্রহ (পৃথিবী) ও উপগ্রহ চাঁদ মালুম করবে মহাশূন্যে ঝুলছে এবং তাদের মাথার উপরেই। আর আল্লাহ্‌ আছেন সর্বত্র. যেমন: نحن اقرب اليه من حبل الوريد

(নাহনু আকরাবো এলাইহে মেন হাবলিল অরিদ)—আমরা অর্থাৎ আল্লাহ এবং অপর সব গায়েব রহস্য) তার (অর্থাৎ মানবের) ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও নিকটবর্তী (আছি)।—কাফ ১৬ এবং

و هو معكم اين ما كنتم

[অ হুয়া মা'কুম আইনা মা কুনতুম]—'তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সংগে আছেন। (হাদীদ ৪)—কিরূপে?

الا انه بكل شئ محيط

[আলা ইন্নাহু বেকুল্লে শাইয়িম মোহিত]—শুনে রাখো, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সবকিছু ঘিরে আছেন।—হা-মীম ৫৪।

অতএব, তাকে পেতে মহাশূন্যে পাড়ি জমানোর কথা ভাবা আসলে ঐ রহস্য বুঝতে না পারা, ফলে বুদ্ধিহীনতার প্রশ্রয় দেয়া, পরিচয় দেয়া।

বল্‌তে পারেন, সোলায়মান (আঃ) তো সশরীরে শূন্যেও গিয়েছিলেন। হাঁ, কিন্তু অধ্যাত্ম সফর ওয়াস্তে যান নি। ঐ যন্ত্রবিজ্ঞানও তিনি আলাদাভাবে এখতিয়ার করেছিলেন। গুণ, জ্ঞান চর্চা সকল পীর-পয়গাম্বরেরই লাগে বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সকলকেই সশরীরে মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে হবে, কিংবা ঐরকম যন্ত্র-বিজ্ঞানে মহা

পারদর্শী হতে হবে। আসলে অধ্যাত্ম দর্শন বিজ্ঞান এক আলাদা বিষয় বস্তুই। আর মহাশূন্যের যতো দূরেই যাওয়া যাক, মৃত্যুর পর পারের অধ্যাত্ম জগৎ, চিৎ-জগৎ পাওয়া যাবেনা। অথচ আত্মিক সফর তো অধ্যাত্ম জগতে, মৃত্যুর পরপারের মহাশূন্য জগতে, সূক্ষ্ম চিন্ময় লোকে, এপারের মহাশূন্যের স্থূল কোন জড়-জগতে নয়, মৃন্ময় লোকে নয়, তা পূর্বেও বলেছি। কিন্তু ঐ অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় লোকের অতি অভিজ্ঞতা-মূলে ইহ-জাগতিক স্থূল সূক্ষ্ম প্রয়োজনীয় অধিঅভিজ্ঞতাও হয়ে যায়। কারণ, উভয়ই পরস্পর পরিপূরক ও জড়িত। যেমন দেহ তেমনি পরমাত্মা পরলোকের দেহ মহাশূন্যময় জড়জগৎ তা জবাব (১) এ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরাণিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে 'মাজমা-উল-বাহরায়েন' প্রসংগে 'রুহ (আত্মা) বোঝাতে গিয়ে ইতিপূর্বে বলেছি।

অতি-অভিজ্ঞতা

আসল ব্যাপার হলোঃ রেডিয়ো টেলিভিশনের মতো অমনি আত্মাকেও যদি উজ্জীবিত উদ্ভাসিত করা যায় তা হলে ইহ-পরকালের অধ্যাত্ম সব কিছুর সংগে একাত্মতা—পূর্ণ যোগ (পূর্ণ রাবেতা) হয়ে যায়, এরই নাম মে'রাজ (সম্পূর্ণ সংযোগ স্থাপন)। বোররাক বা বিজলি বাহন অম্নি আত্ম আব (পানি) আতশ (আগুন) খাক (মাটি—গোস্ত পোস্ত ইত্যাদি) বাদ (বাতাস) অতিপরমাণু বা আত্ম নূরে আহমদ তথা পরমা প্রকৃতির উজ্জীবন, উদ্‌ভাসন, তাতে করেই হয় নূরে আহাদ বা পরম পুরুষে প্রত্যাবর্তন—যেখান থেকে জড় জীব উদ্ভিজ্জের ভিতর দিয়ে আসা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তথায় গিয়ে পৌছা ইতি পূর্বেকার জবাব (১) এতে তা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করেছি। ঐ আত্ম বিজলি উজ্জীবন, উদ্‌ভাসন প্রক্রিয়াকেই বোররাক আরোহন, অধিরোহন রূপকে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, না বুঝে কিস্‌সায় নানা রঙ চড়ানো হয়েছে।

বলা বাহুল্য, বাংলা বিজলি শব্দের আরবী প্রতিশব্দই হলো বোররাক (দেখুন আরবী লোগাত—অভিধান), অবুঝেরা না বুঝে কোন অশরীরি পশু কল্পনা করেছে। আসল তাৎপর্য হলো, সত্য হলো ঃ রছুলুল্লাহ (সঃ) অম্‌নি আত্ম বিজলি তথা নূরে আহমদ (বাংলা প্রতিশব্দ বলেছি পরমা প্রকৃতি) তদীয় পীর মোর্শেদ অশরীরি পবিত্র আত্মা (রুহুলকোদছ) জেব্রাইল (আঃ) সাহায্যে উজ্জীবিত, উদ্ভাসিত করে' প্রথমতঃ কয়েক শত মাইল দূরবর্তী বয়তুল মকদ্দস (জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদ) অন্তর্চক্ষে (কাশফে, intuition এ) দেখে ফেলেন, তাকে রূপকে হয়তো বোররাক বাহন চড়ে' প্রথমতঃ বয়তুল মকদ্দস পৌছাঁ বলা হয়েছে, জবাব (১) এর তৃতীয় প্রবন্ধের যেমন' অধ্যাত্ম' বিবর্তন' প্রসংগ থেকে শেষ পর্যন্ত, তেম্‌নি পরবর্তী 'অতীন্দ্রিয় রকেট' প্রবন্ধে পুরোপুরি এ রহস্য বুঝতে পারবেন।

এ ধরণের আধ্যাত্ম অতি-অভিজ্ঞতা সাধারণ স্বপ্নও নয়, দেহ-মন-প্রাণের এমন একটা পরিবর্তন ও প্রত্যক্ষ অধিজ্ঞান যা অনুরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই মাত্র বুঝতে পারেন, অনভিজ্ঞ অপরকে বুঝাতে পারেন না, বুঝান যায় না। মন-প্রাণ এমনি বিচরণশীল। দেহকেও ঐ সংগে মালুম হয় যেন চলছে। অথচ এক স্থান কালে বসা, খাড়া, শোয়া যেকোন হালহাকিকতে এ অতি এবং অধি অভিজ্ঞতা। ভাষায় বোঝাতে গিয়েই যুগে যুগে এ সম্পর্কে নানা কিস্‌সা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে।

এর প্রাথমিক স্তরের ঐ সত্য স্বপ্নদর্শনও (Prophetic dreams) চিরকাল রয়েছে (দেখুন পরবর্তী প্রবন্ধে 'নিদ্রা' ও 'স্বপ্ন দর্শন')। তারপরই যা' তার সংগে স্থূল রেডিও, টেলিভিশন, রাডার ও রকেটের তুলনা করা ছাড়া বোঝানো যায় না, যদিও স্থূল যান্ত্রিক উপমা উদাহরণেরও অতীত এই অতি এবং অধি অভিজ্ঞতা (দেখুন পরবর্তী অতীন্দ্রিয় রকেট প্রবন্ধ সবটা)। আত্মা অর্থাৎ নূরে

আহমদ এম্‌নি তার শরীরস্থ আব-আতশ-খাক-বাদ-নূর বা বিজলি এবং মানসিক অনুরূপ সব তাজল্লি লয়ে ছায়ের করে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, শেষমেশ নূরে আহমদ পরমা প্রকৃতির পরম পুরুষে অবিশ্বাস্য একাত্মতা, অহরহ অধিরোহন, অবগাহন, অতিবিহার [তওহীদ অর্থাৎ একত্ব-বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিণতি]।

রহস্যটা তাহলে বুঝতে পেরেছেন। বস্তুতঃ অন্তর্চক্ষু অর্থাৎ কাশফের কাছে রেডিও টেলিভিশন যন্ত্রের মতো দূর ধার বলে' কিছু আছে কি ? নেই, তা পূর্বেও বলেছি। কারণ বিদ্যুৎ বা আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল, তা-ও কতোবার বলেছি। মন প্রাণ আত্মাও তো তেমনি আপন আলোকে—যথাক্রমে নূরে আহমদ (পরমা প্রকৃতি) ও নূরে আহাদে (পরম পুরুষে)—উজ্জীবিত উদ্‌ভাসিত হয়ে সফর করেন। কেউ কেউ মানবস্থ ঐ নূরে আহাদ আত্মাকে শরীরস্থ নূরে আহমদের সংগে একীভূত মনে করে একত্রে নূরে আহমদই বলেন এবং স্রষ্টার নির্গুণ অবস্থাকেই নূরে আহাদ কল্পনা করেন, সগুণ স্রষ্টা—অবস্থাকে তারি নূরেআহমদ মনে করে থাকেন।—দেখুন জবাব [১], তৃতীয় প্রবন্ধের রূহ-সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু।

যা হোক সবই অতি কাছে সবই অতি সুদূর ; কেবল গায়েবের ইচ্ছায় যে অধ্যাত্ম দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পীর যখন যেরূপ দূর বা ধারে উপলব্ধি হয়, দীদার—দর্শন—মোশাহেদা—হয়, তা-ই মাত্র। আর এ-ধরনের অতি এবং অধি অভিজ্ঞতা যে নিছক স্বপ্নও নয়, আত্মার মতো অতি সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম পরমাত্মার, স্রষ্টার সৃষ্ট এক রেডিও টেলিভিশনের অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক অতিসাত্তিক অধিঅভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি, তা একটু আগেও তো বলেছি এবং প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে সত্য স্বপ্ন-দর্শনও (Prophetic dreams) এর সংগে ওতপ্রোত জড়িত, প্রয়োজন, পরে রূপ বদলালে অর্থাৎ স্বপ্ন—বিকৃতির

অপসারনে—নির্ভেজাল নিরংকুশ হলেও এর প্রয়োজনীয়তা কোন দিন ফুরায় না, তা-ও বুঝুন। অতএব

ব্যাপারটা যে অনেকটা রেডিও টেলিভিশনের মতো, আল্‌কোর-আনের নিম্ন আয়াত থেকেও তা পরিস্কার বোঝা যায়।

يا يها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم

ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানুছতাজিবু লিল্লাহে অ লেররাছুলে ইজা দাআকুম লেমা ইয়ুহ্‌য়ীকুম

হে ঈমান আন্‌লেওয়ালাগণ! আল্লাহ (নূরে আহাদ) এবং রছুলের (নূরে আহমদের) ডাকে সাড়া দাও যা দেবে তোমাদের অধ্যাত্ম উজ্জীবন (উদ্ভাসন যার সংগে ওতপ্রোত জড়িত)। (কিভাবে)?

واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون

অ আ'লামু আন্নাল্লাহা ইয়াহুলো বাইনাল মারয়ে অ কাল্‌বেহ্‌ অ আন্নাহু এলাইহে তুহ্‌শারুন

এবং জেনো (ঐ ডাকে প্রকৃত সাড়া দিতে পারলে, ডাকার মতো ডাকতে শিখলে, জানলে ও পারলে) আল্লাহ্‌ মধ্যস্থ (বরযখ) হন মানুষ ও তার ক্বলবের (হৃদয়-মন-প্রাণের) মাঝখানে, আর (এইভাবে রেডিও টেলিভিশনে বিদ্যুৎ চার্জে কথাবার্তা বলা, শোনা ও দৃশ্যাদি দেখার মতো) নিশ্চয়ই তারি কাছে (তাতে) গিয়ে তোমরা জমায়েৎ হও।"—আনফাল ২৪। তখন চর্মচক্ষু ও অন্তর্চক্ষু একাকার একচক্ষু হয়ে যায়। তাজ্জব! ঘুমে জাগরণে, চক্ষু খোলা, বুজা সর্ব অবস্থায় সব প্রয়োজনীয় সম্ভবপর সত্য দর্শন-বিজ্ঞান অভিব্যক্তি অভিজ্ঞতা হতেই থাকে, চলতেই থাকে, মিলন, সম্মেলন (জমায়েৎ) এমনি ইহ-পরকালে সব সময়ের জন্যে সর্বস্থানে কিংবা স্থানকালের অতীত অবস্থায়—হাল হাকিকতে—হতেই থাকে, চলতেই থাকে, বাইরের থেকে দেখে তা' বোঝা যাক, কি না যাক।

সুতরাং মানব-আত্মাও যে ঐ ভাবে রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি শিল্প-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-ভরা রকেটের মতো স্থানকালের অতীত এক

অতুলনীয় দার্শনিক শিল্প-বৈজ্ঞানিক **'রকেট'** তা', আশা করি, এখন ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন। আল্ কোরআন তারও অতুলনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ গবেষণায় প্রকাশ করে দেন, যা অন্য ধর্মগ্রন্থে অনুপস্থিত, কি বিরল, তা-ও আশা করি এখন পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন। আর এও বুঝুন, "পবিত্র কোরআনকে তিনিই সত্যিকারভাবে বুঝতে পারবেন যার কাছে তা রছুলুল্লাহর (স) কাছে যেভাবে নাজেল হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই নাজেল হয়েছে, নচেৎ অসম্ভব।"—জনৈক ছুফী।—'ইছলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' ১৬৯ পৃঃ।

অতীন্দ্রিয় রকেট

মানব-জীবনে 'নিদ্রা' এবং 'স্বপ্নদর্শন' এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। যদি কোনদিন নিদ্রা না থাকতো আর কেউ যদি অমনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তো তা' হলে তা দেখে অন্যান্য মানুষ কি আশ্চর্য হয়ে যেতো! অহরহ ঘটে বলে' আমরা আর আশ্চর্য হচ্ছি না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে নিদ্রা মৃত্যুরই ভাই, আর স্বপ্নদর্শন অধ্যাত্ম জগতেরই সোপান। সে জন্য এই দুই রহস্য প্রথমতঃ বুঝিয়ে বললে অর্থাৎ বলতে পারলে, আশা করি এ পর্যন্ত ঐ অধ্যাত্ম দর্শন যা বলা হলো তার সম্বন্ধে সন্দেহের অনুস্বর বিসর্গও আর অবশিষ্ট থাকবে না। এর পর শবে বরাত, শবে কদর, শবে মে'রাজ এবং 'পরিশিষ্টে' তার অভিব্যক্তি চার অধ্যাত্ম রাজ্য সফর বুঝতেও কোন অসুবিধে হবে না।

নিদ্রা

و هو الذى يتوفكم باليل

অ হু আল্লাজি ইয়াতাওয়াফ্‌ফাকুম বেলাইলে

তিনি তোমাদের রুহ (আত্মা) নিয়ে যান রাত্রিতে।—আনআম ৬০

الله يتوفى الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منا مها

আল্লাহু ইয়াতাওয়াফ্‌ফাল আন্‌ফুছা হিনা মাওতেহা অ আল্লাতি লাম তামুত ফি মানামেহা

আল্লাহ (মানুষের) আত্মা নিয়ে যান মৃত্যুকালে, আর যার মৃত্যু আসেনি তার নিদ্রাকালে।—যোমার ৪২।

আশ্চর্য! এই সোজা কথাটাও বুঝতে না পেরে' কল্পনা করা হয়ঃ নিদ্রা-কালে আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় এবং খবর-বার্তা সংগ্রহ করে চলে আসে, তাই স্বপ্ন দর্শন। আত্মা বুঝতে কী রকম গোলমাল আগা গোড়া করে রাখা হয়েছে তাই ঐ ভ্রান্তি। কিন্তু নিদ্রাকালে আত্মা চলে

গেলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগের জীবন-কার্য চলে কী করে ? আত্মা চলে' গেলে তো মানুষ মরে'ই যায়। আত্মা যে আসলে কী তা' ঐ জবাব (১) এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের 'অধ্যাত্মবিবর্তন' থেকে 'মাজমা-উল-বাহরায়েন' প্রসংগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পড়ে' ভালোরূপ বুঝুন, জানুন। আসলে আত্মাই জীবন, শরীরটা খাঁচা বা খোলস মাত্র—যেমন চিংড়ি মাছ, কি সাপের খোলস। আসলে আত্মার সর্ব অবয়ব—অংগ-প্রত্যংগ রূপ ধরেই শরীররূপ খাঁচা বেঁচে-বর্তে আছে। আত্মা চলে গেলে দেহ অসাড়, অকর্মন্য, ক্রমে ক্রমে পচে গলে যায়। সুতরাং আত্মার নিদ্রাকালে চলে যাওয়ার ধারনাটা কিয়াস কল্পনা মাত্র।

فیمسک التی قضی علیها الموت و یرسل الاخریٰ الی اجل مسمی
ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون

ফাইয়ুমছেকে৷ আল্লাতি কাজা৷ আলাইহাল মাওতা অ ইয়ুরছেলোল উখরা এলা আযালেম মুছাম্মা ইন্না ফি জালেকা লা আয়াতেল্লে কাওমেঁ ইয়াতাফাক্‌কারুন

তারপর যাদের মৃত্যু সাব্যস্ত হয়েছে তাদের আত্মা (আল্লাহতালা) রেখে দেন, আর সকলের আত্মা অর্থাৎ নিদ্রিতদের রুহ এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (জীবন-তক্) ফিরিয়ে দেন। নিশ্চয়ই এতে নির্দর্শন রয়েছে চিন্তাশীল (মোরাকেবা মোশাহেদা) সাধকদের জন্য।—যুমার ঐ ৪২।

আসল কথা হলো ঘুমও আল্লাহরই ব্যবস্থাপনা। শরীরের অংগ-প্রত্যংগের, ইন্দ্রিয়াদির বিশ্রামের জন্য ওর প্রয়োজন ; সেই রকম করেই গড়া রুহের কল-কব্জার আনুপাতিক শারীরিক কল-কব্জা। কিন্তু মৃত্যু কি ? মৃত্যুও তো ঘুম। ঘুমের অবস্থার মতোই অংগ প্রত্যংগ, ইন্দ্রিয়াদি নিঃসাড়, নিস্তেজ হয়ে যায়। পার্থক্য হলো ঘুমে মানুষ ঐ নিঃসাড়, নিস্তেজ অবস্থা কাটিয়ে উঠে যাকে ঐ 'এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (জীবন-তক্) ফিরিয়ে দেন' কথার রূপকে বলা হয়েছে। আর মৃত্যুর ঘুমে ঐ অবস্থা আর কোন জীব কাটিয়ে উঠতে পারে না। রুহ তার

স্বকীয় গূঢ় কল-কব্জাসহ দেহ ছেড়ে, দেহের কল-কব্জা—ইন্দ্রিয়, অংগ-প্রত্যংগ—ছেড়ে' পরলোকে চলে যায়। 'রুহ মোছাফির' নামটা অবশ্য আত্মার মোছাফিরের সফর করার মতো জাগ্রত, কি নিদ্রিত খোয়াবে নানা খবর সরবরাহ-শক্তির রূপক—সন্ধ্যাভাষা। এইভাবে এক রুহেরই পাঁচ শক্তি মাফিক পাঁচ রুহ (পঞ্চ প্রাণ) কল্পনা করা হয়েছে :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান (প্রাণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনুসারে এদের পঞ্চ বায়ুও বলা হয়)। মুছলমানী তাসাউফ শাস্ত্রে একে আর একভাবে কল্পনা করা হয়েছে, যথা : রুহ রহমানী—আসল আত্মা বা যাত নূর ; রুহ জেছমানী—শরীর আত্মা বা খাকের নূরে ছেফাত ; রুহ হাওয়ানী—জীবাত্মা বা আতশের নূরে ছেফাত ; রুহ মকীম—স্থায়ী রুহ বা আবের নূরে ছেফাত, তা-ই সর্বদেহস্থ পঞ্চরসের মূল, আসল। পঞ্চরস—যথাক্রমে **আদি চন্দ্র**—পুরুষের বীর্য, নারীর ডিম্ব, জরায়ুরস ; **সরল চন্দ্র**—মিঠা পানি ; **গরল চন্দ্র**—লোনা, তিতা, কষায় পানি ; **রোহিনী চন্দ্র**—রক্ত, নারীর রজঃ, স্তন্য প্রভৃতি ; আর **বাদ**—বায়বীয় জলীয় অংশ। এর স্থান যথাক্রমে পুরুষের শুক্রাধার, অণ্ডকোষ, লিংগ, নারীর জরায়ু, স্তন ; মুখ, তালু ; চোখ, নাক, কান, পাক-যন্ত্রাদি, মল-মূত্রাশয়, কলিজা, ফুসফুস প্রভৃতি। এবং রুহ মোছাফির—সঞ্চরণশীল আত্মা বা বাদের নূরে ছেফাত—মনন শক্তি নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভর করে' চলে বলে' এবং জাগ্রত কি নিদ্রিত স্বপ্নে খবরাখবর আনয়ন বেশী মাত্রায় বিশেষ করে' ওর উপরে নির্ভর করে বলেই ঐ নাম। আসলে সব শক্তি মিলেমিশেই আসল রুহ ঐ যাতনূর আত্মার কার্যকলাপ চলে। 'তুই না খাও তোর পাঁচ পরাণে খাক'—ইত্যাকার কথা ঐ কল্পিত পাঁচ প্রাণের ক্ষেত্রে—ওদের উল্লেখ করেই—বলা হয়।

আসলে বিবর্তন অনুসারে রুহের পাঁচ হাকিকত হবে এই রূপ : নাফছ আম্মারা, লাওয়ামা, মুৎমায়েন্না, মুলহেমা ও রাহমানী।

নাফ্‌ছআম্মারা রুহের নিম্নস্তর বা হায়ওয়ানী (পাশবিক) খাছলত ; নাফছ লাওয়ামা সাধারণ মানবীয় খাছলত, তার কথা জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধে 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' প্রসংগে বলেছি, তা পুনঃ দেখুন।

পরবর্তী নাফছ মু'মায়েন্না, মুলহেমা ও রাহমানী মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। নাফছ মুৎমায়েন্না—শুদ্ধি শান্তি শান প্রাপ্ত হাল হাকিকতি আত্মা—কায়েম দায়েম হলেই হয় নাফছ মুলহেমা—একমাত্র আল্লাহর এলহামে (নবীর বেলা ওহি)—প্রেম প্রেরণায় পরিচালিত আত্মা। জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধের ঐ 'অধ্যাত্ম বিবর্তন' থেকে তা আবার দেখুন।—আর এই হাল-হাকিকতে আল্লাহ্‌র মারেফাত, জামাল জালাল প্রকাশ পায় বলে আল্লহ্‌র রহমান নাম থেকে বলা হয় নাফ্‌ছ রাহমানী। 'জামাল, জালাল' ঐ প্রবন্ধের 'হাল-মোকাম' প্রসংগ থেকে পুনঃ দেখুন।

আল্লাহ এবং বান্দা, আত্মা এবং পরমাত্মা, আশেক এবং মাশুক তখন একীভূত ; কিন্তু তার মধ্যেও কখনো কখনো ছেদ হয়। কি ভাবে ? যেমন নাফ্‌ছ আম্মারা থেকে নাফ্‌ছ লাওয়ামায়, নাফছ লাওয়ামা থেকে নাফছ আম্মারায় পতন উত্থান চলে বহুকাল [হযরত আদমের সেই স্বর্গ বিচ্যুতি—Paradise lost এবং স্বর্গ পুনঃ প্রাপ্তি—Paradised regained।—দেখুন জিজ্ঞাসা ৩৮ পৃঃ এবং 'বিবর্তন—মানব' প্রসংগ], তেমনি নাফছ মুৎমায়েন্না থেকেও নাফছ লাওয়ামায় পতন, আবার সেখান থেকে নাফছ মুৎমায়েন্নায় উত্থানও চলে বহুকাল ; শেষে নাফছ মুৎমায়েন্না কায়েম দায়েম হলেই গিয়ে নাফছ মুলহেমায় পৌঁছা সম্ভবপর হয়। সেখান থেকেও নাফছ মুৎমায়েন্নায় আনা গোনা চলে। নাফছ মুলহেমা পাকা কায়েক দায়েম হলেই সম্ভবপর নাফছ রাহমানী। সেখান থেকেও নাফছ মুলহেমায় আনাগোনা অবধারিত ; সেখান থেকে একেবারে রহমানুর রহিমের খাছলত হাছেল হলেই বলা

যাবে নাফ্‌ছ রাহমানী—'তাখাল্লাকু বে-আখ্‌লাকিল্লাহ—আল্লাহর গুণাবলিতে, চরিত্রে অবসিত হও, হাদিছ একারনেই। কিন্তু বলেছি নাফ্‌ছ মু'মায়েন্নার শান্তি, মুলহেমার এলহাম এবং নাফ্‌ছ রাহমানীর জামাল (শান্ত সৌন্দর্যচ্ছটা) জালাল (রুদ্র সৌন্দর্যচ্ছটা) ও মারেফাত (প্রতি ও অধিপ্রজ্ঞা) পরস্পর বিজড়িত, এক ছাড়া আর নয়।

স্বপ্ন-দর্শন

সাধারণ স্বপ্ন দুই প্রকার—ঘুম-ঘোরে স্বপ্ন ও দিবা স্বপ্ন (Day dreams)। ঘুম-ঘোর স্বপ্নই দেখুন আগে। স্বপ্ন ছাড়া মানুষের ঘুমই হয় না, কতক মনে থাকে, কতক থাকে না। সাধারণ স্বপ্ন দেখার কারণ ঘুমের মধ্যকার বাসনা মন স্বপ্নের রূপক দিয়ে পূরণ করতে চায়, যাতে করে ঘুম ভেঙে না যায়, যেমন পানির পিপাসায় মন ঝর্ণা, নদীর পানি, পানির পেয়ালা প্রভৃতি 'প্রতীক' কল্পনায় আমদানী করে ঘুম রক্ষা করতে চেষ্টা করে, তথাপি অনেক সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। আবার নাফছ আম্মারা (ষড়রিপু) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের যে কোন একটি, কি একাধিক ঘুমঘোরে প্রবল হলে মন স্বপ্নে তার প্রতীক বানিয়ে ঘুম রাখ্‌তে প্রয়াস পায়—সচরাচর যোয়ান বয়সেই এ মামেলা ঝামেলা বেশী ; যথা ঃ ঘুম-ঘোরে কাম-রিপুর খাহেশ প্রবল হলে মন যুগপৎ ঐ খাহেশ পূরণ করতে এবং ঘুম রক্ষা করতে পুরুষের বেলা নারী এবং নারীর বেলা পুরুষ প্রতীক আমদানী করে এবং তার সংগে কাল্পনিক উপভোগ ও অন্যান্য ফূর্তি ঘটায়। রহস্য এই যে ঐরূপ স্বপ্নে সাধারণতঃ পুরুষের বেলা খোব ছুরত রমণী মূর্তি এবং রমণীর বেলা ঐরূপ পছন্দসই পুরুষ মূর্তি আসেনা, বরং কালো কুশ্রী পুরুষ রমনী মূর্তিই দেখা যায়, পাওয়া যায়। ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে। অপর কতক স্বপ্ন মানসিক পীড়ার ফল, কি বাতিক। মদ গাঁজা, আফিং, ভাঙ প্রভৃতির মতো মাদকদ্রব্য সেবনেও ঐরূপ বিতিকিচ্ছি স্বপ্ন দেখা যেতে পারে।

এখন দিবা স্বপ্ন। অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মতো দিবাস্বপ্নে ভোগে। সাধারণতঃ ঘর-কুণো (introvert) ছেলে-মেয়েরা যে অসম্ভব, কি অসামাজিক আকাংখা বাইরে পূরণ করতে পারে না, ঘরে বসে কল্পনায় তা পূরণ করে নেয়। এ দিবা-স্বপ্ন খুব মারাত্মক নয়, কাজে কর্মে লাগাতে পারলে সেরে যেতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে সেরে যায়। আবার আর এক ধরণের ছেলেমেয়ে নিজেদের পরিবেশে সন্তুষ্ট না হয়ে, নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে' অতিমাত্রা বাহিরমুখো (extrovert) হয়, অসম্ভব অসম্ভব দুঃসাহসিকতার দিবাস্বপ্ন দেখে এবং বহির্জগতে তার উদ্দেশ্যে ছোটে, অনেক দুঃসাধ্য অসাধ্য কার্যে হাত দেয়। দুর্ঘটনা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত এ ধরণের ছেলেমেয়ে ঘটিয়ে ফেলতে পারে। বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তাদের পরিস্থিতি ঠিক রেখে দিতে পারলে তাদের দ্বারা দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের অনেক মূল্যবান কাজ হতে পারে।

আর এক রকম দিবাস্বপ্ন ঐ নেশাখোররা বিনা ঘুমেই দেখে (Hallucinatin-Illusion-Delusion)। অনেক অজ্ঞ অনভিজ্ঞ ফকির দরবেশরা ওকে মোকাশফা (অন্তর দর্শন) মোশাহেদা (অধ্যাত্ম দর্শন) মনে করে।

উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া সন্নাশ রোগ-টোগেও ঐ রকম জাগ্রতস্বপ্ন দেখা যায়। ভৌতি, জীনের আছর মনে করে' অজ্ঞ লোক অযথা ভয়ে মরে, ওঝা ডাকে, ঝাড়-ফঁুক দেওয়ায়, কিন্তু চিকিৎসা করায় না। কেউ কারো দরবেশী হাছিল মনে করে' ভয় করে, ভক্তি করে, ঝাড়-ফঁুক লয়, পানি পড়া খায়। ঝড়ে কাউয়া (কাক) মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে—এম্নি কতো সুফল পায়, কেউ কেউ ভেট যোগায়, মুরীদও হয়।

কতক ঘুম-ঘোর স্বপ্ন অবচেতন মনের ক্রিয়া। জন্ম-পূর্ব, মাতৃ-গর্ভ শিশুকাল বা যে কোন বয়সের অনেক অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে

আত্ম গোপন করে থাকে। যেমন দেখা ভালো মন্দ কাণ্ড কারখানা, শোনা ভালো মন্দ বাণী। রাত্রে ঘুম-ঘোরে সুযোগ পেয়ে তা অবচেতন মন থেকে এসে সিনেমার ফিলমের মতো স্বপ্ন-দৃশ্য ঘটায়। কিন্তু যা খারাব তা হলো অনেক অসম্ভব, অস্বাভাবিক, অসামাজিক ইচ্ছা দিবসে আত্ম গোপন করে অবচেতন মনে। ঘুম ঘোরে কোন বাধা না থাকায় তা' স্বপ্নের আকারে পূরণ হতে চায়। ঐ সকল স্বপ্ন তাই অবোধ্য দুর্বোধ্যও হয়। কারণ দিবসের জাগরনের ভয় লাজ না থাকলেও মন একেবারে খোলামিলা তা পূরণ করতে বাধ-বাধ ঠেকে, তাই নানা অদ্ভূত অদ্ভুত প্রতীকের, বিকল্পের মাধ্যমে তা পূরণ করে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন কি? এতক্ষনেও তা না বলায় নিশ্চয়ই আপনারা বিরক্ত হয়ে উঠছেন। তা হ'লে শুনুন। সে স্বপ্ন হচ্ছে সত্য স্বপ্ন দর্শন (Prophetic dreams)। তা অনেক সময়ে খাটে।

ঐ নাফ্‌ছ আম্মারা (ষড়রিপু) সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠার মাঝখানে আছে নাফ্‌ছ লাওয়ামা, তার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। সেই বিবেকবান ধার্মিক আত্মা—চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদির নালখাল ঘুম-ঘোরে নিঃসাড়, নিস্তেজ হলে—অদৃশ্য থেকে অনেক অতীত, ভবিষ্যৎ ব্যাপার সিনেমার ছায়া ছবির আকারে দেখে ফেলে। কিন্তু অনেক সময়ে তাও ঘোলাটে হয়ে ধায় নাফ্‌ছ আম্মারার তাবে; অর্থাৎ ঐ ষড়রিপুর কারণে বিগড়ানো মন মস্তিকে ঐ সত্য স্বপ্ন দর্শন অবিকল আকারে আসতে গিয়েও অন্তর্নিহিত ওর দাপটে, প্রভাবে সত্য মিথ্যায় তাল গোল পাকিয়ে যায়। অভিজ্ঞ, ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরাই মাত্র ওর খাটি তাবীর (ব্যাখ্যা) দিতে পারেন। নতুবা হয় কিয়াস-কল্পনা, কিস্‌সা, যেমন বাজারের খোয়াব-নামা। অনেক সময়ে ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করলে, এবং লক্ষ্য রাখতে পারলে ও-যে খেটে যাচ্ছে তা বোঝা যায়।

ইমাম গাজ্জালী (র) কিমিয়া ছায়াদাত (সৌভাগ্য স্পর্শমণি) দর্শন পুস্তকে সত্য স্বপ্ন দর্শনের এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সংক্ষেপে তা এই :

তালাব-তড়াগের বাইরের নালখাল বন্ধ হলে পাতাল থেকে পানি আসা টের পাওয়া যায়। তেমনি ঘুম-ঘোরে বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বকের ক্রিয়া সাময়িক নিঃসাড় হলে, দুর্বল হলে, কোন কোনটির ক্রিয়া সাময়িক একেবারে বন্ধ হয়ে থাকলে, যেমন চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বকের ক্রিয়া—অতীন্দ্রিয় পথে গায়বী (অদৃশ্য) জগৎ থেকে সিনেমার ফিল্মের আকারে অনেক অদৃশ্য ছবি দৃষ্টি গোচর হয়। ভালো মন্দ অনেক খবর জানা যায়। এ-ও হলো ঐ নাফছ লাওয়ামা স্তরের কথা।

নাফ্ছ মুৎমায়েন্না মূলহেমা ও রাহমানী স্তরে যেমন ঐ সত্য স্বপ্ন দর্শন হয় ঘুম-ঘোরে, তেমনি হয় জাগ্রতে—এই জাগ্রত দর্শনের শ্রবনের, স্মৃতির নামই কাশফ। ঐ সাধকের রাবেতা, মোরাকেবা মোশাহেদা, জেকেরে—এক কথায় জেকেরে ফেকেরে অতীন্দ্রিয় রেডিয়ো টেলিভিশন রাডার ফিট করা আত্মিক রকেটে দৃশ্য অদৃশ্য জগতের দূর ধার থেকে অহরহ অফুরন্ত সত্য দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি আসতেই থাকে। অধ্যাত্ম শক্তিও সংগে সংগে বেড়ে যায়—যার কথা আমি 'জিজ্ঞাসা' 'বিবর্তন-মানব' প্রসংগে বুঝিয়েছি। ইতিপূর্বে 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধে 'জড় জগৎ, চিৎজগৎ, প্রকৃত রহস্য' এবং 'অতি-অভিজ্ঞতা' প্রসংগে বুঝিয়েছি। কোথাও যাওয়া লাগে না যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না, কারণ সবই অতি কাছে, আবার সবই অতি সুদূর—কেবল অতি ও অধি অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ, তা পূর্ব প্রবন্ধেও বুঝিয়েছি, পরেও দেখতে পাবেন।

রছুল (স)-জীবন

এখন রছুল (স)-জীবন থেকে এই আত্ম দর্শন, তত্ত্বদর্শনের মাত্র তিন অধ্যায় বুঝতে পারলেই অধ্যাত্ম সমগ্র জীবন-দর্শন মোটামোটি

বোঝা যায়। এই আখের জমানায় রছুল (দঃ) জীবনই তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী এরূপ সকল বোজর্গ জীবনের প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া। এজন্য বিভিন্ন প্রকৃত বোজর্গ জীবন-দর্শন মারফত ধর্মকে আবার খণ্ড খণ্ড করা লাগে না। এক ইছলাম নামে, এক মোহাম্মদ আহমদের জাহের বাতেন আদর্শে মূলসূত্রে চল্‌ছে, চলবে, দরকারে যেটুকু রদবদল বা নতুনত্ব প্রয়োজন তা ধর্মের বিভিন্ন নামে নয়, বিভিন্ন প্রকৃত বোজর্গের নামে নয়, বরং একই ধর্মেরই, একই আকিদা আচরনেরই স্থান কাল পাত্র পরিবেশ অনুযায়ী স্বাভাবিক কিছু বিছু বৈচিত্র, বৈশিষ্ট্য, অভিব্যক্তি (schools of thoughts)। অতএব দেখে যান।

১। শবে বরাত ঃ—

প্রথম প্রথম রাছুলুল্লাহ্‌র (স) কাছে স্বপ্ন দর্শন মারফত অহি নাজেল হতো [তাঁর পরবর্তী প্রকৃত বোজর্গদের বেলা তা-ই এলহাম, তা পূর্বেও অনেকবার বলেছি, দেখুন পুনঃ নিদ্রা প্রসংগ]

لقد صدق الله رسوله الرء يا بالحق -

লাকাদ ছাদাকাল্লাহু রাছুলাহুর রুইয়া বেল্‌ হাক্কে

নিঃসন্দেহ্‌ আল্লাহ সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাঁর রছুলকে। ফতহ ২৭। অনুরূপ প্রকৃত বোজর্গকে এখনও আল্লাহ তা-ই দেখান, চিরকাল দেখাবেন।

এই স্বপ্ন দর্শনই ক্রমবিবর্তিত, বিকশিত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে দিব্য দর্শনে—কাশফে। তারি এক প্রাজ্ঞ নজির শবে বরাত।

ঘটনাটি এইরকম ঃ একদা শাবান মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে হয্‌রত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) গভীর রাত্রে ঘুম থেকে জেগে দেখেন হযরত রছুলুল্লাহ (স) বিছানায় নেই। চার দিকে তখন কাফেরদের ষড়যন্ত্র রছুলুল্লাহকে (স) মেরে ফেলবার জন্য। আয়েশা বিবি (র) চিন্তিতা হলেন। চারদিকে খোঁজ করতে করতে মক্কার অদূরবর্তী কোরেশ বংশের পূর্ব পুরুষদের কবরস্থান 'জান্নাতে বাকীয়াতে' গিয়ে

দেখেন ঃ হযরত রছুল্লাহ (স) সেজদায় পড়ে আছেন, বাহ্যজ্ঞান নেই। আয়েশা সিদ্দিকা (র) অনেকবার ডেকেও কোন সাড়া পেলেন না। সুতরাং চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। কারণ, এমন হাল-হাকিকত অাঁ হযরতের মাঝে মাঝে হয়েই থাকে। অনেকক্ষণ পরে হযরত রছুলুল্লাহ্-র (স) মোরাকেবা মোশাহেদা ভংগ হলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রা) দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ

—একি ! তুমি উঠে এসেছো ?

—আপনাকে বিছানায় না দেখে'।

—আতংকিত হয়ে ছুটে এসেছো ?

—জী, হাঁ।

—আল্লাহ আমায় কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। চলো।

যেতে যেতে রছুলুল্লাহ (স) তাঁর প্রিয়মতা বিবি আয়েশাকে বললেন আমি আজ আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি।

—কী ঃ

—জেব্রাইল (আ) এসে আমাকে এখানে নিয়ে এলে তাঁর প্রেম প্রেরণা (এলহাম)-প্রবাহে ও প্রভাবে অভিভুত (মাগ্‌লুবুল হাল) হয়ে পড়লাম [দেখুন 'জবাব [১]' এর তৃতীয় প্রবন্ধে ''মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন' ও বেলায়ত-নবুয়ত' প্রসংগ]। তারপর দেখলাম আছমান জমীনে লাওহেমাহফুজের দরোজা খুলে গেছে (লাওহে মাহফুজ্ বুঝুন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের ৪৯, ৫০ পৃষ্ঠায়) এবং সকল জীবজন্তু মায় মানুষ এবং অপরাপর চেতন অচেতনের অ-দৃষ্ট লিপি (তাক্‌দীর—ছায়া-ছবি আকারে প্রকারে) উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে।

সুতরাং শবেবরাত বা অদৃষ্ট রাত্রি অম্‌নি কাশফের ব্যাপার। আল্লাহ মানুষের মতো বছর বছর কিছু মাপেন না। তা হলেতো তাকে মানুষই মনে করা হবে (দেখুন ঐ জিজ্ঞাসা প্রবন্ধ ৬১—৬৪ পৃষ্ঠা, ভূমিকা 'জিজ্ঞাসার জরুরাত')।

আসলে সকলই আল্লাহ্‌র 'আমর' অর্থাৎ প্রকল্পে এক সুনিয়ম সুনির্ধারনে চল্‌ছে, সেই সুনিয়ম সুনির্ধারনই (ঐ লাওহেমাহফুজ, আয়ানে ছাবেতা) একদা ঐ জান্নাতে বাকিয়ার কবরস্থানে জেব্রাইল (আঃ) অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রভাবে দিব্যচক্ষে কতকটা ধরা পড়ে। দিব্য কর্ণে অনুরূপ অদৃষ্ট লোকের কথা-কাহিনী শোনাও যায়, তা-ই দিব্য শ্রুতি। আর স্বীয় অতীত জীবন ভবিষ্যৎ জীবন জানাও যায়, তা-ই দিব্য স্মৃতি— অপরেরও অনেক কিছু অদৃষ্ট দেখা যায়, জানা যায়, শোনা যায়' কহা যায় (কহুন, কি না কহুন)—এ সকলই কাশ্‌ফ্‌।

এখন আল্‌কোরআন থেকে এই দিব্য দর্শন, শ্রুতি ও স্মৃতির উদাহরণ নিন, লায়লাতুল বরাত (শবেবরাত) সম্পর্কে ক্রমশঃ একটা মোটা-মুটি ধারনা হবে।

حم - والكتب المبين - انا انزلنه فى ليلة مبركة انا كنا منذرين -
فيها يفرق كل امر حكيم -

হা-মিম! অল কেতাবেল মোবিন। ইন্না আনজালনাহু ফি লায়লাতেম মোবারাকাতেন—ইন্নাকুন্না মুন্‌জেরিন। ফিহা ইয়ুফ্‌রাকো কুল্লো আমরেন হাকিম।

হা-মিম—বিবেচ্য সেই কিতাব (লাওহে মাহফুজ) যা প্রকাশক (সত্য-মিথ্যা দোযখ-বেহেশত প্রভৃতি কার্যপ্রণালী পরিস্কার প্রকাশক) আমি এ-কে (এই সত্য-সত্ত্বা জ্ঞান বা হাকিকত) অবতীর্ণ করেছি এক মোবারক (পুন্যময়, পবিত্র) রাত্রিতে, আমি (আল্লাহ) তো লোকদের (এইভাবে বোজর্গান-মারফত) সতর্কই করে থাকি। সেই রাত্রিতে হয় মীমাংসা সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের (পাপ-পুণ্য, দোযখ-বেহেশত প্রভৃতি পার্থিব-অপার্থিব ব্যাপারের সম্ভবপর পূর্ণ-জ্ঞান)—ছুরা দুখান ১-২-৩।

কিন্তু কিস্‌সার জ্বালায় অস্থির। কোরআন 'লায়লাতুল কদরে নাযেল হয়েছে। আবার বলা হলো এই মোবারক রাত্রি 'শবেবরাতে' নাযেল হয়েছে। এই রকম অসংগতির সামঞ্জস্য বিধান করতে না পেরে কতক গায়ের ছহি [জয়ীফ (দুর্বল), মাউজু (জাল) প্রভৃতি অশুদ্ধ ও

অসিদ্ধ] হাদিছের বরাত দিয়ে কোন কোন তফসির কারক বয়ান করেছেন ঃ কোরআন প্রথমতঃ লাওহেমাহফুজে ছিলো, সেখান থেকে শবেবরাতে ফেরেশতাদের উপাসনালয় বয়তুল মামুরে নেমে আসে, সেখান থেকে শবে কদরে দুনিয়ায় নেমে আসে।

কিন্তু কোরআন কি বাদ-প্রতিবাদ (Dialectics) ভরা বই আকারে প্রথমেই লাওহে মাহফুজে, ছিলো না dialectics (বাদ প্রতিবাদ) প্রয়োজনে অল্প অল্প অল্প নাজেল হয়? স্থূল কোন-কিছু কি সূক্ষ্ম পরলোকের জগতে থাকা সম্ভবপর? (তা-ও বাদানুবাদ পর্যায়ে!) এ সব হাকিকত মারেফাত কি ঐ সব তফসির কারকেরা স্মরণে রেখে লিখেছেন, না, বুঝতে না পেরে, ইতিহাসের ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কিস্‌সা-কাহিনী বানিয়ে গোঁজামিল দিয়েছেন, এখন বিজ্ঞ-জনকে তা বুঝে দেখ্‌তে অনুরোধ করি এবং জিজ্ঞাসা' প্রকল্পের 'ইস্‌লামিয়াৎ' প্রসংগের (২) এবং (৩) নং পুনঃ দেখ্‌তে অনুরোধ করি।

বয়তুল মামুর আসলে কাবাঘর এবং শুদ্ধ-সিদ্ধ অন্তকরনও। কারণ, আমর (আদেশ, প্রকল্প) থেকে মামুর আদিষ্ট, প্রকল্পিত—কাজেই বয়তুল মামুর আল্লাহর আদিষ্ট জাহের বাতেন ঐ দুই গৃহ।

বিশেষতঃ জড়লোকেই মানুষের ঘর দরজা এবং উপাসনা গৃহ দরকার হতে পারে। ফেরেশতা তথা পূত পবিত্র (পাকছাফ) আত্মা অশরীরি, অজড়, অমর জীব; তাদেরও থাকবার জন্য, কি উপাসনার জন্য স্থূল জড় গৃহ লাগ্‌বে—এ রকম সব ধারনাই সেই অবিকশিত অবৈজ্ঞানিক অদার্শনিক অশিল্পিক জমানায় সম্ভবপর ছিলো, স্বাভাবিক ছিলো। এ জমানায় মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তির কষ্টি-পাথরে তার সংগতি অসংগতি বিচার করে' বিশ্লেষণ করে' প্রকৃত সত্য ও সংজ্ঞা আবিষ্কার করুন।

(২) **শবে কদর**। লায়লাতুল কদর বা বোজর্গ রাত্রি এই লায়লাতুল বরাত (শবেবরাত) তথা অদৃষ্ট রজনীরই আর এক পাঠ, আর এক অতিঅভিজ্ঞতা, অধিজ্ঞান, অভিব্যক্তি।

انا انزلنه فی لیلۃ القدر - وما ادرک ما لیلۃ القدر - لیلۃ القدر خیر من الف شهر - تنزل الملئکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر - سلم - هی حتی مطلع الفجر -

ইন্না আন্‌জালনাহু ফি লাইলাতেল ক্বাদরে—অ মা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরে—লাইলাতুল ক্বাদরে খায়রো মেন আলফে শহর—তানাজ্জালোল মালায়কাতো অররুহো ফিহা বে-এজনে রাব্বেহিম মেন কুল্লে আমরেন—ছালাম—ছালামুন হিয়া হাত্তা মাতলায়েল ফাযর।

এ-কে (এই কোর-আন-বাণী) কদরের রাত্রিতে নাজেল করেছি, আর কিসে তোমাকে ওয়াকিব-হাল করাবে যে, কদরের রাত্রি কী? কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; (কেননা) নেমে আসে তাঁদের প্রভুর অনুমতি-ক্রমে ফেরেশতা সকল এবং রুহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে—(আর) শান্তি ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

তফসির (১) রমজান মাসের ২১শের রজনী থেকে ২৯শের মধ্যে রছুলুল্লাহর (সঃ) রেয়াজতে আবার মোকাশফা * হয় আর সেই সময়ে রুহ—মানে জেব্রাইল (আঃ) মারফত এই ছুরা নাযেল হওয়ার সংগে সংগে কাশ্‌ফে আর আর ফেরেশতা এবং রুহের প্রতি ব্যাপারে তাঁদের প্রভু আল্লাহর হুকুমে কিভাবে কার্য-কলাপ এন্‌তেযাম হয় তা দেখ্‌তে জানতে বুঝতে পারেন। কাযেই হাজার—মানে অনেক মাসের এবাদত রিয়াজতের ফল এই এক রাত্রে হাছিল হয় বলে এ-রাত্রিকে লায়লাতুল কদর—মানে বোজর্গ রাত্রি—এবং হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, আর সারারাত ধরে ভোর পর্যন্ত এই শান্তি—মানে এই রকম অপার্থিব ব্যাপার ঘটার সংগে সংগে অন্তরে অনাবিল শান্তি-ধারা বইতে থাকে।

(২) পুনঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যুগেযুগেই নবুয়ত খতম না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র আত্মা জেব্রাইলের (আঃ) তালিম

---

* কাশফ (অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি) থেকে মোকাশফা—ঐ হাল-হাকিকত।

তাওয়াজ্জয় আবিভূর্ত হতেন নবী, তাঁর মারফত মানব সকলের জাহের বাতেন শিক্ষা দীক্ষার জন্য নাযেল হতো ওহী। নবুয়ত খতমের পরে ঐরূপ গায়বী পীর মোর্শেদের তালিম তাওয়াজহ্‌য় নাযেল হয়ে আস্‌চে, হতে থাক্‌বে মোযাদ্দিদ। তাঁরা এলহাম যোগে বিশেষ করে বেলায়তের পথ প্রদর্শন করবেন, কখনো কখনো বিকৃত ভেজাল মিশ্রিত শরিয়তের সংস্কার সাধন করবেন কোর আন-কালাম ও প্রকৃত ছহি হাদিছ থেকে ইজতেহাদ (জ্ঞান-গবেষনা) মারফত।

লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—মানে অনেক হাজার রাত্রির আসল আদত এবাদত রিয়াজতে (রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকেরে) এমন মানুষের অভিব্যক্তি লাভ হয়, আবির্ভাব হয়।

'তানাজ্জালোল মালায়েকাতো অর রুহো—ফেরেশতা এবং রুহ নাযেল হয়'—কথা তা হলে বোঝা গেলো। নবুয়তের জমানায় ফেরেশতা ছিলো যুগপৎ মালায়েকাতো অর রুহ—ফেরেশতা এবং পবিত্র আত্মা। কোরআনে রুহল কোদস (পবিত্র আত্মা), রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা) রূপে বহুল তার উল্লেখ।

انه لقول رسول كريم - ذى قوة عند ذى العرش المكين - مطاع ثم امين -

ইন্নাহু লা কাওলো রাছুলিন করীম—জি কুওয়াতিন ইন্‌দা জিল আর-শেম মোকীন—মুত্বায়ীন ছুম্মা আমীন—

নিঃসন্দেহ এ (কোরআন) এক সম্মানিত রছুলের (জেব্রাইলের আ প্রমুখাৎ) বাণী যিনি সমস্ত (বিশ্ব) আরশ (সিংহাসন) অধিপতির নিকট পদস্থ, মর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত (আমীন)।—তক্‌ভির ১৯-২১।

نزله روح القدس من ربك بالحق -

নাজ্জালাহু রুহল কোদুছে মের রাব্বেকা বেল হাক্কে

এ-কে (কোরআন-বাণী) পবিত্র আত্মা তোমার প্রভুর তরফ থেকে সত্যসহকারে নাযেল করেছেন।—নহল ১০২।

নবুয়ত খতমের পরেও ঐ পাক (পবিত্র) রুহের, বিশ্বস্ত (আমীন) রুহের আনাগোনা একেবারে বন্ধ হয় না, কি, হবে না কোনদিন— যোগ্য দর্শন, শ্রুতি ও স্মৃতিতে (কাশফে) তা প্রতিভাত হয়. পরিপূর্ণতার (কামালিয়াত) জন্য অবশ্য তার প্রয়োজন হয়।

لا تجو قوما يؤمنون بالله و اليوم الاخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عسيرتهم - اولئك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه - و يدخلهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها - رضى الله عنهم و رضوا عنه - اولئك حزب الله - الا ان حزب الله هم المفلحون -

লা তুজেদো কাওমাঁ ইয়ুমেনুনা বিল্লাহে অল ইয়াওমেল আখেরে ইয়ুওয়াদ্দুনা মান হাদ্দাল্লাহা অ রাছুলাহু অ লাও কানু আবায়াহুম আও আবনায়াহুম আও এখওয়ানাহুম আও ইয়াশিরাতাহুম উলায়েকা কাতাবা ফি কুলুবেহিমুলইমানা অ আইয়াদাহুম বেরুহেন মেনহু—অ ইয়ুদখেলু হুম জান্নাতেন তাজরি মেন তাহতেহাল আনহারো খালেদীনা ফিহা—রাজি আল্লাহু আনহুম অ রাজু আনহু—উলায়েকা হেজবুল্লাহ—আলা ইন্না হেজবাল্লাহে হুমুল মোফলেহুন—

তুমি পাবে না এমন লোক যারা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে (প্রকৃত) বিশ্বাস করে তাঁরা ভালোবাসে তাদের যারা আল্লাহ ও রছুলের (যুগের যুগের নূরে আহমদ-মোহাম্মদ, তার অছিলায় নূরে আহাদের আত্ম প্রকাশের) বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাঁদের পিতা পুত্র ভ্রাতা, কি অপর আত্মীয় স্বজন হয়। তাঁদের অন্তরে তিনি লিখে দিয়েছেন (প্রকৃত) ঈমান (এলমুল একীন, আইনুল একীন, হক্কোল একীন) এবং তাঁদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর (নূরে আহাদের) তরফ থেকে রুহ (নূরে আহমদ-মোহাম্মদ)-যোগে। আর তাঁদিগকে তিনি দাখেল করেন (জেন্দায় ও মওতে) বেহেশতে যার নিম্নদেশ দিয়ে বহু নাহর বয়ে যাচ্ছে (ঐ অছিলা বরাবরে আল্লাহর প্রেম-প্রেরণা-প্রবাহের রূপক, প্রতীক)। তথায় (সেই হাল হাকিকত মারেফাতে) তাঁরা থাকবেন

চিরকাল। আল্লাহ্ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁরা আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট, তাঁরা হেজবুল্লাহ—আল্লাহর দল,—আর নিশ্চিত জেনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই (যুগে যুগে) হন সফলকাম।—মোযদিলা ২২। *

নতুবা আখেরি জমানার মানুষ এমন কি পাপ করলো যে তাদের কাছে গায়বী কোন রকম পথ প্রদর্শক (হেদায়েতকারী) আর আসবেনই না। বলবেন কোরআন হাদিছই তো আছে। কিন্তু শুধু কথায় কি চিড়ে ভিজে! জীবন্ত আদর্শ, অনুপ্রেরণা লাগে যে। অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হাতে কলমে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপার, তা কতোবারই তো প্রতিপন্ন করেছি। আর এখনও কোটি কোটি বৎসর চলমান দুনিয়ায় ঐ রকম পাক রুহ, বিশ্বস্ত রুহযোগে শিক্ষাদীক্ষা যে ঐ রছুলুল্লাহর (স) পরেও আল্ কোরআন ঐ স্বীকার করে, ঘোষণা করে তার কী? গোঁজামিলী অন্য প্রকার অপব্যাখ্যা যে নাকচ তা ঐ পয়গম্বরদের বেলায়ও ঠিক অনুরূপ শিক্ষাদীক্ষার উল্লেখেই বোঝা যায়। চিরন্তন আত্মাকে চিরন্তন পরমাত্মার শিক্ষাদীক্ষা তো ঐ চিরন্তন একই, মূলতঃ এক পরিক্রমা, পর্যায়ে; তা আর কতো, কাঁহতক বোঝাবো!

এরূপ আধ্যাত্ম শক্তিশালী আত্মার আবির্ভাবেই যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার, অজ্ঞান অন্ধকার এক এক জমানায় এক এক অঞ্চলে হয় বিদূরিত—তারো রূপক বয়ান—'ছালাম—ছালামুন হিয়া হাত্তা মাতলায়েল ফায্‌র্—(অশান্তি অজ্ঞান অন্ধকার রাত্রি) ঐ মহামানবমারফত অপসারিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত শান্তি এবং প্রজ্ঞার আলো 'ফযর' অর্থাৎ সুপ্রভাত।

এই **কাশফ**—দিব্যদর্শন, শ্রুতি, স্মৃতির—আর এক প্রামাণ্য পরিচিতি পাঠ করুন ছুরা তাকাছুরে:

---

* 'জিজ্ঞাসা' প্রকল্পে ও জবাব [১]-এর তৃতীয় প্রবন্ধে 'পরিশিষ্ট' এবং এই জবাব [২]-এর শেষ প্রবন্ধের শেষে 'পরিশীলন' দেখুন।

الهكم التكاثر - حتى ذرتم المقابر - كلا سوف تعلمون - ثم كلا سوف تعلمون - كلا لو تعلمون علم اليقين - لترون الجحيم - ثم لترونها عين اليقين - ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم -

আলহাকোমুত্তাকাছুর হাত্তা জুরতুমুল মাক্কাবের—কাল্লা ছাওফা তা আলামুন ছুম্মা কাল্লা ছাওফা তাআলামুন—কাল্লা লাও তাআলামুনা এল্‌মাল ইয়াকীন—লাতারাবুন্নাল জাহিমা—ছুম্মা লাতারাবুন্নাহা আইনাল ইয়াকীন—ছুম্মা লা-তুছ য়ালুন্না ইয়াওমায়েযেন আনেন্নায়ীম

বাহুল্য লাভের বাসনা তোমাদিগকে মুগ্ধ করে রাখে যাবৎ না কবরের সামনাসামনি হও ; না, না জল্‌দি তোমরা জানতে পারবে ; ফের (বলচি) কখনই না, শীঘ্র জানতে পারবে। না, না যদি তোমাদের দিব্য-জ্ঞান থাকতো তাহলে নিশ্চিত তোমরা দোযখ (সুতরাং বেহেশতও—কারণ উভয়ই পরস্পর পরিপূরক) দেখতে পেতে (প্রমাণ পেতে) ; অতঃপর সেইদিন (মওত-পর) আল্লাহর নেয়ামত (দান অনুগ্রহ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

তফসির ঃ ধন জন মান সম্মান প্রতিপত্তি প্রভৃতি বাড়ানোর বাসনা [মায়া-মোহ-মহব্বত], কোশিশ মানুষকে মত্ত করে রাখে। আল্লাহ এবং আখেরাত ঐ কারণে ভুলে থাকে। হঠাৎ তখন একদিন মৃত্যু-সময় ও কবর এসে হাজির হয়। কিন্তু যদি এতে মত্ত মগ্ন না হয়ে আল্লাহর প্রকৃত এবাদত রিয়াজত করতো তাহলে হয়তো দিব্য-জ্ঞান (এলমুল একীন) হাছিল হয়ে দোজখ-বেহেশত—মানে এরূপ অনেক গায়বী গুণ, জ্ঞান, শানের—প্রমাণ পেতো, আর দিব্য চোখ (কাশফ) খুলে গেলে তো দিব্য নয়নে (আইনুল একীনে) তা দেখতেই পেতো এবং পাবে (কেননা পাপ-পুণ্য পতন-উত্থান বিকর্ষণ আকর্ষণের ভিতর দিয়ে ইহ-জীবনে, কি পরজীবনে একদা ঐ দিব্য-দর্শন জ্ঞান, বিশ্বাস হয়)। কিন্তু ঐভাবে সাত্তিক এবং উচ্চ স্তরের সাধক না হওয়ার ফলে আল্লাহ্‌ দুনিয়ায় যা যা নেয়ামত (ইহ-পরজীবন

উপযোগী সব রকমের লিয়াকত, তাকত, রেজ্‌ক—যার যা প্রয়োজন) দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আখেরাতে জওয়াবদিহী হ'তে হবে, কারণ ওদের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয়নি। আর ঐ পেয়ে ঐ বাড়ানোর লালসায় কোশেশে আল্লাহ্‌ এবং আখেরাত ভুলেছিলো, অথচ ভুলে থাকতে আদৌ বলা হয়নি। কাজেই আল্লাহ্‌মুখী করবার জন্য প্রয়োজন হয় সংশোধনী কঠোর শাস্তির (বিকর্ষণ-আকর্ষণ)।

ঈমাম-বিল-গায়ব (জ্ঞান অগোচর) বিশ্বাস শরিয়ত কি ভাবে তরিকতে এলমুল একীনে—প্রমাণ পেয়ে দিব্য জ্ঞান বিশ্বাসে, হাকিকতে আইনুল একীন—দৃষ্ট জ্ঞান বিশ্বাসে, পরিশেষে মারেফাতে হক্কোল একীন—একমাত্র সত্য জ্ঞান বিশ্বাসে, —পরিনতি লাভ করে তারি আভাষ ঐ ছুরা তাকাছুরে রয়েছে।

শরিয়তের ঐ জ্ঞান-অগোচর বিশ্বাস—ইমান বিল গায়ব—সম্পর্কে কোর-আনের প্রথমেই রয়েছে ঃ

الم - ذالک الکتب لاریب فیه - هدی المتقین الذین یؤمنون بالغیب -

আলিফ-লাম মীম। জালেকাল কেতাবো লারায়বা ফি হুদাল্লিল মোত্তাকীনা আল্লাজিনা ইয়ুমেনুনা বিল গায়ব

আলিফ-লাম-মীম। এ কেতাব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা জ্ঞান আগোছর বিশ্বাস—ঈমান-বিল-গ্বায়েব—পোষণ করে (শরিয়তের সেই) মোত্তাকীনদের (ধর্মপ্রাণদের) এ পথ প্রদর্শক।

ঐ জ্ঞান-অগোচর বিশ্বাস ঈমান-বিল-গায়ব নিশ্চিত বিশ্বাসে পর্যবসিত করার হুকুম রয়েছে এভাবে ঃ

و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین -

অ আবোদ্‌ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াকীন

এবাদত করো তোমার প্রভুর যাবৎ না লাভ হয় নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ বিশ্বাস।—হিযর ৯৯।

ঐ এলমুল একীন, আইনুল একীন—হক্কোল একীনে গিয়ে পরিণত হলেই হবে ওর পূর্ণতা।

و انه لتذكرة للمتقين - و انا لنعلم ان منكم مكذبين - و انه لحسرة على الكافرين - و انه لحق اليقين -

অ ইন্নাহু লা তাজকেরাতুল লিলমোত্তাকীন—অ ইন্না লা না'লামু আন্না মেন্‌কুম মুকাজ্জেবীন অ ইন্নাহু লা হাছারাতুন আলাল কাফেরীন অ ইন্নাহু লা হাক্কুল ইয়াকীন

ধর্ম-প্রাণদের জন্য এ নিশ্চিত স্মারক—আর আমরা নিঃসন্দেহে জানি কারা কারা তোমাদের মধ্যে মিথ্যা জানো (অবিশ্বাস করো)। এবং অবিশ্বাসীদের জন্য আক্ষেপ—আক্ষ নিশ্চিত এ হচ্ছে হক্কোল একীন—সত্য সঠিক জ্ঞান-বিশ্বাস।—আল হাক্কা ৪৮-৫২।

তফসির ঃ কোর্‌আন-মারফত যে অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্তন বোঝানো হচ্ছে তা প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসীদের জন্য নিশ্চিত স্মারক—অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় ক্রম অভিব্যক্তি। কিন্তু অবিশ্বাস যারা করে তারাও করে ঐ অভিব্যক্তির অভাবে—তাদের ঐ স্তরে পৌঁছবার দেরী আছে বলে'। তাই তাদের জন্য আক্ষেপ, মানে তাদের ওর জরুরাত জ্ঞান লাভ হতে দেরী আছে, তা হবে ইহ-পরকালে সংশোধক সংস্কারক শাস্তি বা দোযখ মাধ্যমে। কিন্তু কথা হচ্ছে ঃ শেষমেশ ঐ অভিব্যক্তি সত্য-সুন্দর শিব (মাংগলিক) জ্ঞান ও বিশ্বাস—হক্কোন্‌নূর—জ্যোতির্ময় সত্য ও সত্যময় জ্যোতির অনুভূতি, উপলব্ধি অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি।

এখন, ঐ ক্রম অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, অভিব্যক্তির উদাহরণ নিন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের 'চারি কলেমা', ঈমান মোয্‌মাল-মোফাচ্ছল' থেকেও। এর সংগে মিলিয়ে পড়ুন বিষয়টা পুরোপুরি বুঝ্‌তে পারবেন। এখন, 'শবে মে'রাজে দেখুন ওর পূর্ণতা যাতে করে' এ সম্পর্কে আর কোন রূপ অর্বাচীন সন্দেহ আর কোনদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে না পারে।

(৩) শবে মেরাজ

এদেরি—এই প্রাথমিক স্বপ্ন দেখা, শবে বরাতে সর্ব অদৃষ্ট জানা এবং শবে কদরে সব ফেরেশতা, রুহ সকলের কার্যসমুহ দেখার পূর্ণতা মে'রাজ—স্বয়ং আল্লাহর নূর, শুধু দেখা নয়, তাঁর সহিত মিলন, বাতচিত (কথাবার্তা)।

এই মে'রাজ বা পূর্ণ মিলন হয় হযরত রছুলে করীমের (সঃ) নবী হবার একাদশ বৎসর পরে দ্বাদশ বৎসরে। এই মে'রাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, একমাস রোযা, হজ্জ এবং জাকাতের হুকুম হয়। এখন জিজ্ঞাস্য ঃ এই প্রায় দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত রছুলই বা (সঃ) কী এবাদত রিয়াজত করেছেন? অপর মুছলমানরাই বা কী এবাদত-রিয়াজত করেছেন? তা-ই কোহেতুর, হেরার গুহা এবং তপোবনের চিরন্তন এবাদত-রিয়াজত, তার কথা কতোবার বলেছি।

سبحن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصا الذى بركنا حوله لنريه من ايتنا - انه هو السميع البصير -

ছোবহানাল্লাজি আছ্‌রা বে আবদিহি লায়লাম্মেনাল মাছজেদেল হারামে এলাল মাছজেদেল আক্‌ছাল্লাজি বারাকনা হাওলাহু লেনুরিয়াহু মেন আয়াতেনা-ইন্নাহু হুয়াচ্ছামিয়্‌ল বাছির

তাঁর মহিমা যিনি এক রাত্রিতে তাঁর বান্দাকে [হযরত রছুলকে (সঃ)] পবিত্র মস্‌জিদ (কাবা) হতে দূরের মস্‌জিদে (বয়তুল মকাদ্দসে) নিয়ে গিয়েছিলেন যার আবেষ্টন আমরা সুপবিত্র করেছি,--এইভাবে

আমরা তাঁকে [রছুলকে (সঃ)] আমাদের কতকগুলি নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা (বনি এছরাইল)।
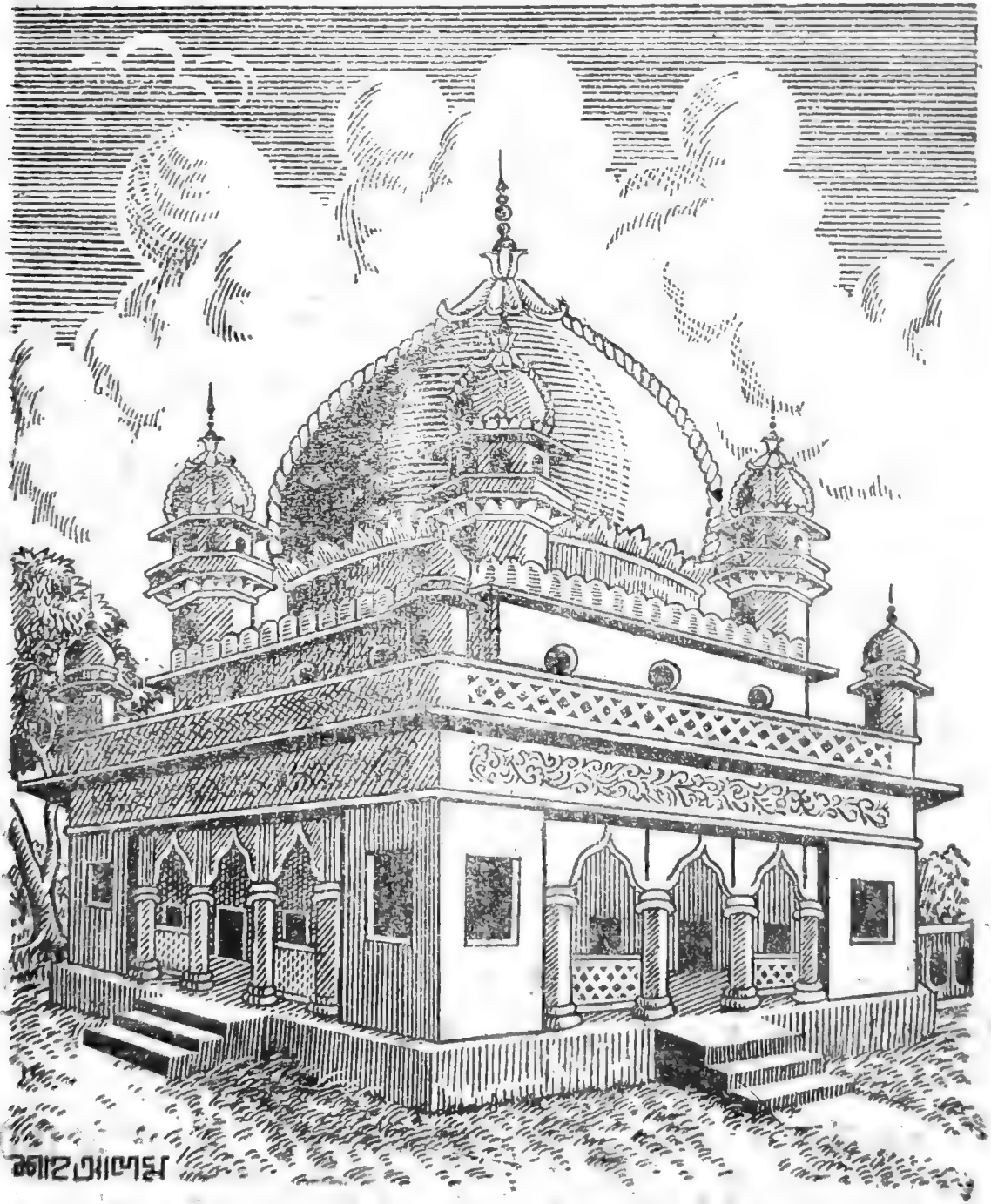
এও সত্য, ঐ অধ্যাত্ম দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীর কাছে ঐ রকম আত্ম উজ্জীবিত, উদ্ভাসিত হয়ে 'দর্শন' গমনেরই নামান্তর।

و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس - وما جعلنا الرؤیا التی ارینک الا فتنة لاناس و الشجرة الملعونة فی القران - و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا -

—অ ইজ্‌কুল্‌না লাকা ইন্না রাব্বাকা আহাতা বেন্নাছে, অ মা যায়ালনার রুইয়া আল্লাতি আরায়নাকা ইল্লা ফেৎনাতাল্‌ লেন্নাছে অশ্‌শাজারাতাল মাল্‌য়ুনাতা ফিল কোরআনে, অনুখাওভেফুহুম ফামা ইয়াজিদো হুম ইল্লা তুগ্‌ইয়ানান কাবিরা

"এবং স্মরণ কর (সেই শবে বরাত, কদর, মে'রাজ) যখন আমরা তোমাকে (রছুলকে সঃ) বলেছিলাম যে তোমার প্রভু সমগ্র মানব জাতিকে ঘিরে আছেন।" (সুতরাং আল্লার দীদারের নিমিত্ত আকাশে বাতাসে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং আগের প্রবন্ধেই দেখেছেন যে তা' সম্ভবপরই নয়, প্রয়োজনই নেই, হয় না)। "এবং আমরা বন্দবস্ত করেছিলাম রুয়া (সত্য স্বপ্ন দর্শন) যা তোমাকে দেখিয়েছিলাম (দিব্য দর্শন-শ্রুতি-স্মৃতি অর্থাৎ কাশফ), এ মানব সাধারণের পরীক্ষার নিমিত্ত ব্যতীত নয়" অর্থাৎ এ দ্বারা আখেরি জমানায়ও মানুষ আত্ম গুণ, জ্ঞান, শানের সন্ধান পাবে তোমার মারফতে এবং তোমার উম্মত মণ্ডলীস্থ প্রকৃত বোজর্গানে-দীন-মারফতে— "এবং কোরআনে উল্লেখিত সেই অভিশপ্ত বৃক্ষেরও" অর্থাৎ নাফছ আম্মারা—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—যাদের যে কোন এক বা একাধিকের আধিক্যে পতন হতে পারে, আবার আয়ত্তাধীনতায় অনুপম উরুজ সম্ভবপর হয় [জবাব (১) এর তৃতীয় প্রবন্ধে তা' দেখেছেন]। "আমি তাদের ভয় দেখাই"—ঐ পতন, পাতক ও তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া, পরিণামের—যাতে কোরে তারা সৎপথে বিচরণ করে (আকর্ষণ), আদম হাওয়ার মতো পদস্খলিত না হয় (বিকর্ষণ) "কিন্তু (তথাপি) বৃদ্ধি করচে তাদের (কাফেরদের) অবাধ্যতা।—" আকর্ষণে কাজ হচ্ছে না, বিকর্ষণ পথেই কতক মানুষ

(কাফেররা) রয়ে যাচ্ছে, যাবে (তাদের উরুজের দেরা আছে এবং থাকবে বলে')।—বনি এস্রাইল ৬০।

تعرج الاملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة -

তাআরুযুল মালায়েকাতো অররুহো এলাইহে ফি ইয়াওমেন কানা মেক্‌দারোহু খাম্‌ছিনা আল্‌ফা ছানাতেন

ফেরেশতা এবং রুহ একদিনে তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে উরুজ (উত্থান) করে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।—ছুরা মে'রাজ।

তফসিরে আজিজীঃ আরবীয়রা সেই যুগে হাজারের অধিক গণনা জানতো না বলে' হাজারের মেছালে বর্ণিত হয়েছে। আসলে বহু লক্ষ বা কোটি বছরের সফর শেষ হয়ে যায় এক মূহূর্তে [সে প্রামাণ্য ইতিহাসের জন্য 'আত্ম দর্শন, তত্ত্ব দর্শন' বইর অপেক্ষা করুন]।

এখন হযরত রছুলুল্লার (সঃ) জীবন থেকে এক ছহি হাদিছ সংকলন করলেই আশা করি' এ সম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়; কেননা, ইতিপূর্বে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে এ রহস্য যথেষ্ট বুঝানো হয়েছে।

মক্কার কাফেররা যখন-তখন আঁ হযরতের অনুপম জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে ছিলো বদ্ধ পরিকর। অথচ আঁ হযরত পিছন দিকে আদৌ না চেয়ে পথ চলতেন, এতে করে' নও মুছলিমরা একদা বললেন—"আঁ হযরত। আপনি পিছনে না তাকিয়ে পথ চলেন, কাফেররা যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে!" আঁ হযরত বল্‌লেন—"মনে কোরনা আমার সামনেই দুটো চোখ (অতএব দৃষ্টি), আমি পিছনেও দেখি যে।"—এই অহরহ জীবন-দর্শনেরই প্রধান তিন অধ্যায়—শবে বরাত, শবে কদর, শবে মে'রাজ।

চান্দ্র মাসের ১৪ শাবান রাত্রি শবে বরাত, ২০....২৮রমজান রাত্রি শবে কদর (সাধারণতঃ ২৬ দিবাগত ২৭ রমজান রাত্রি) এবং ২৬শে রজব রাত্রি মে'রাজ;—শরিয়ত মারফত এবাদত রিয়াজত যোগে

পালনীয়। ঐ সব রাত্রিতেই যে সকলের অনুরূপ অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি হাছিল হবে—তা নয়, কারণ সে সম্পূর্ণ পাক-পরওয়ারদিগারের মনোনয়ন, মর্জি। তবে এবাদত রিয়াজত দরকার।

কিন্তু ঐ তিন রজনীতেই কেন? কারণ বিভিন্ন প্রকৃত বোজর্গের বিভিন্ন অনুরূপ অধ্যাত্ম অতি-অভিজ্ঞতা-অভিব্যক্তির রজনী মান্তে গেলে, প্রতিপালন করতে গেলে ইস্‌লামিক সামাজিক অখণ্ডতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতা বজায় থাকে না। ইসলাম আবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে, যেমন আগের জমানায় ঐ একই ইস্‌লামই নানা নবীর আবির্ভাবে নানা মতবাদে বিভিন্ন ধর্ম হয়ে গেছে। ভেজাল প্রক্ষেপ দূর করতে গিয়েই তা-ই হয়েছে। সর্বশেষ সংস্কৃত ইসলাম আবার নানা নামে, নানা বোজর্গের অতি-অভিজ্ঞতার দিন তারিখ ধরে' নানা রকম সকম না হয় তা-ই ঐ ব্যবস্থা, তা পূর্বেও বলেছি। আর অতি এবং অধি অভিজ্ঞতা তো মূলতঃ এক রকম-সকমই, সুতরাং তা আবার বিভিন্ন প্রকৃত বোজর্গানেদীনের দিন তারিখ ধরবার, সে দিন তারিখে পালন করার দরকারই বা কী!

কিন্তু আমরা মূলতঃ করি কী? আসল ইসলামকে লৌকিক ইস্‌লাম, পরগাছা ঠাওরিয়ে শাস্ত্রীয় ইসলামই মাত্র একমাত্র সত্য মনে করে মান্‌ছি। অনেক সময়ে না বুঝেশুনে বিকৃত আকারে প্রকারে পালন করচি, কতোদূর ফল হচ্ছে না হচ্ছে তা এখন আপনারাই বিচার করুন।

পরিশিষ্ট

কিয়াস-কল্পনা (কিস্‌সা) খতম

বলা হয় রছুল মকবুল (স) মে'রাজ শরীফ থেকে ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর ওজুর পানি তখনও গড়াচ্ছে। ঘরের কপাটের কড়া তখনও নড়্‌ছে। এ সত্য কথন, না, কিয়াস-কল্পনা এ নিয়ে হাদিছে যথেষ্ট এখ্‌তেলাফ (মতভেদ) আছে, অতএব সন্দেহ জনক। সত্য হলেও মে'রাজ শরীফ অধ্যাত্ম সফর বিধায় তা সম্ভবপর। আলোকের গতির ঐ সেকেণ্ডে ১৮৬২৮৪ মাইল পরিমাণ থেকেই তা বোঝা যায় (দেখুন 'রকেটের রহস্য'২৪—২৫পৃষ্ঠা)। কারণ, মে'রাজ তো আত্মিক সফর, শারীরিক বিজলি উদ্ভাসন উজ্জীবনে আত্মিক বিজলির অভিব্যক্তিতে পরমাত্মিক যোগাযোগে ইহ-পরকালে সফর। আত্মার কাছে ঐ দূর ধার বলে' আসলে তো কিছু নেই। সুতরাং সম্ভবপর।

এখন, কিস্‌সার কিছু জবাব দেই। মে'রাজ শরীফ ও অন্যান্য মোযেজা কেরামত সম্পর্কে অনেক আজগবী আজগবী কিস্‌সা কাহিনী আছে কিতাবে, তার সকলের নিরসনের জায়গা এ নয়। আলাদা পুস্তকে (সত্য দর্শনে) তার সম্যক জবাব দিবার ইচ্ছে রলো, বাকী খোদার মর্‌জি। এখানে মে'রাজ শরীফ সম্পর্কে ঐ রকম কয়েকটি অর্বাচীনতা দেখুন এবং তার জবাব শুনুন।

(১) বলা হয় মে'রাজ শরীফে গিয়ে রছুলুল্লাহ (স) প্রথমত পঞ্চাশ ওয়াক্ত দৈনিক নামাজ এবং বারো মাস রোজা রাখার হুকুম আহ্‌কাম নিয়ে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে মুছার (আ) আত্মার সংগে দেখা। তিনি শুনে বললেন : দৈনিক অতো গুলো ওয়াক্ত নামাজ আদায় এবং সারা বছর রোজা রাখা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। রছুল (সঃ) ফিরে গেলেন। ২৫ ওয়াক্ত দৈনিক নামাজ ও ছয়মাস রোজার হুকুম

নিয়ে ফিরে এলেন। মুছা (আ) আবার বলে দিলেন তা-ও সম্ভবপর নয়। মুছার (আ) পরামর্শ মতো এইভাবে কয়বার গেলেন, কয়বার এলেন। আল্লাহর সংগে মেছুয়া হাটার দর কসাকসি করে শেষমেষ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও একমাস রোজার হুকুম নিয়ে ফিরে এলেন। মুছা (আ) বল্লেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা সম্ভবপর।

এই কিসসা কাহিনী যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধির কিছু বাকী থাকে কি? প্রথনতঃ আল্লাহ্ কী? অনন্ত অসীম সত্তা। মানুষ কি? তারি জাহের বাতেন স্ফূলিংগ বিশেষ, তা বিভিন্ন প্রবন্ধে আমরা প্রতিপন্ন করেছি, প্রতিবিম্বিত করেছি। এখন সমুদ্রের এক ফোটা পানির তার অতল অপার পানির সংগে মিলনে কি দর দস্তুর করার অস্তিত্ব, অবস্থা থাকে? না, ঐ মহাপানির রাশি সম্ভবপর মতো ঐ এক ফোটা পানির ভিতর দিয়ে তার অতুল ঐশ্বর্য-ছটার খানিকটা প্রকাশ করেন, প্রকাশ করেন জিজ্ঞাসায় তারি জবাব, তখন ঐ এক ফোটা পানির ইচ্ছা কি অনিচ্ছা থাকে কোথায়? থাকা কি সম্ভবপর? সুতরাং আল্লার সংগে ঐভাবে দরকসাকসি করা যে সম্ভবপরই নয়, সে জ্ঞান আমাদের কবে হবে! দ্বিতীয়তঃ রছুলুল্লাহ্ (স) কি বুদ্ধি বিবেচনায় মুছার (আ) চেয়ে খাটো ছিলেন যে কেবল কেবল তারি কথা মতো পাগলের মতো ছুটাছুটি করলেন। আর বারবার হুকুম পালটিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন? আর আল্লাহ্ যেনো মানুষ আর কী, মহা মানব সম্রাট আর কী! সিংহাসনে ঐ আছমানে বসে আছেন, তাই সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে ঐ হুকুম আহ্কাম পাল্টানো সম্ভবপর হয়। এর বিন্দু বিসর্গও সত্য হলে উল্লেখ থাক্তো কোরআনে, লিখা থাকতো প্রকৃত ছহি হাদিছে।

(২) খড়ম পায়ে দিয়ে মে'রাজ শরীফে গিয়ে রছুলুল্লাহ (স) শরমেন্দা, আর আল্লাহ্ মিঞা শরম ভাঙাতে তাঁর খড়ম জোড়া আরশে (সিংহাসনে) রাখলেন, আরশ পবিত্র হলো বল্লেন।

এই শিশু-জনোচিত কিস্সারও জবাব দিতে হয়। আল্লাহ্ যেনো একজন মানুষ আর কী ? (কারণ মিএ্যা তো !) তার সোনার সিংহাসন আছে, তা-ও অদৃশ্য অজড় জগতে ; আর তা মাটির মানুষের মাটির পদার্থের তৈরী খড়মের দ্বারা পবিত্র হয় (এতোদিন কি তবে অপবিত্র ছিলো ?)। আর এই সব নিয়ে অদৃশ্য জগতে, অজড় অমর আলো-কের জগতে দৌড়ান যায়, বোররাকে চড়ে যাওয়া যায় ! মানুষকে অজ্ঞ, শিশু ঠাওড়িয়ে আজো ওয়াজ মজলিসে কী ধরণের ওয়াজ-নছিহত মারফত তাদের কোথায় কতোদূর অপোগণ্ডতা অনৈছলামিকতার দিকে ঠেলে দেবার এবং নেবার চেষ্টা চরিত্র করা হয়, চিন্তা করুন। আর চুপ করে' না থেকে তার প্রতিবাদ করুন, প্রতিকার করুন। তা না হলে ইসলামও যে অপরাপর ধর্মের মতো এক এক কিসসা-কাহিনীর জগা-খিচুড়ি হয়ে রয়েছে, আরো হতে চলেছে, তা কি দেখছেন না !

(৩) মে'রাজ শরীফে রছুলুল্লাহ্র ২৭ বৎসর কেটে গেলো, ৯০ বৎসর বয়স স্থলে তাই তিনি মাত্র ৬৩ বৎসর বাঁচলেন, এও একটা কথা ! আর এতো কোরআনের কথার বিপরীত। কারণ, কোর্আনে আছে ঃ

كل نفس ذائقة الموت

কুল্লো নাফ্ছিন যায়েকাতুল মাওত

প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে।— আলে ইম্রান ১৮৫।

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتبا مؤجلا -

অ মা কানা লে নাফ্ছিন আন্ তামুতা ইল্লা বে-এজ্নিল্লাহে কেতাবাম মুআজ্জালা

এবং কারো সাধ্য নেই যে আল্লাহ্র বিনা হুকুমে মরে, তার অর্থাৎ মরণের সময় লিখিত (নির্ধারিত)।—আলে ইমরান ১৪৫।

রছুলুল্লাহকে (সঃ) বাদ দিয়ে আর এ-সব কথা বলা হয় নি।

(৪) আবার, ছিদ্‌রাতুল মূন্‌তাহা [স্বর্গীয় বদরি (বরই) বৃক্ষ-সীমা] পর্যন্ত জেব্রাইল (আ) সাহায্যে রছুল (স) গেলেন। এর পর নাকি জেব্রাইল (আ) আর যেতে পার্‌লেন না। তার আগুনের পাখাও নাকি পুড়ে যায় [আগুন পোড়ে আবার কী আগুনে, কিভাবে ?] তার পর গেলেন কিসে ? রফরফে চড়ে ! তাহলে স্বর্গীয় ঘোড়া বোররাকে চড়ে গেলেন বয়তুল মকদ্দস পর্যন্ত, সেখান থেকে ঐ ছিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গেলেন জেব্রাইল (আ) সাহায্যে। তারপর রফরফে চড়ে। এই রফরফ আবার কেমন জানোয়ার ?

বোর্‌রাকের আসল তাৎপর্য 'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধেও দেখেছেন। রফরফের কী তাৎপর্য হতে পারে তা একটু পরেই দেখবেন। এই ছিদরাতুল মুন্‌তাহা প্রভৃতি মকামের তাৎপর্য আগে দেখুন, বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যাবে !

(¡) ছিদরাতুল মুন্‌তাহা

ولقد راه نزله اخرى عند سدرة المنتهى - عندها جنة الموى -

লা কাদ রাহু নাজলাতাঁ উখ্‌রা এন্‌দা ছিদরাতেল মুন্‌তাহা এনদাহা জান্নাতুল মা'ওয়া

এবং আর একবার তিনি দেখেন (মোশাহেদা লাভ করেন) সীমান্তের বদরী (বরই) গাছের নিকট, তার কাছেই আছে জান্নাতুল মাওয়া।— নাজ্‌ম্‌ ১৩-১৫।

বদরী গাছ অর্থ বরই গাছ। তার রূপকে আসলে বিশ্ব-রূপ বা প্রাকৃতিক রহস্যের সীমা—তাসাউফের ভাষায় 'নাছুত'।— আত্মিক সফরে শারীরিক বিজলী উদভাসন উজ্জীবনে যেমন দেহস্থ তাজল্লি প্রকাশ পায়, তেমনি প্রকৃতির স্থূল জড় রূপের অন্তরালবর্তী অদৃশ্য

অজড় অমর রূপ রাশির দীদার (মোশাহেদা—দর্শন) মিলে। আর তাতেই অন্তরে অনাবিল শান্তির ফোয়ারা বইতে শুরু করে বলে বলা হয়েছে তার কাছেই জান্নাতুল মাওয়া—শান্তি-সংস্কৃতির বাগান, জগতের মধ্যে অন্তর্জগতের অবস্থান—শরণ-স্থল।

(ii) মোকামুম মাহমুদা

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا -

আছা আঁ ইয়াবআছাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা

শিগগিরই তোমার প্রভু তোমাকে মোকামুম মাহমুদায়—সর্ব প্রশংসিত মোকামে পৌঁছাবেন।— বনি এছরাইল ৭৯।

ঐ সর্ব প্রশংসিত মোকামুম মাহমুদাই তাসাউফের ভাষায় 'মলকুত' মোকাম--পরলোকের মালায়েকা অর্থাৎ ফেরেশতা ও আরওয়া (সাধারণ রুহ) জগতের অভিজ্ঞতা তখন হাছিল হয়—ঐ ছিদরাতুল মুন্তাহার পরক্ষণে পরবর্তী ঐ জান্নাতুল মাওয়া—শান্তি সংস্কৃতির বাগান—শরণ-স্থল।

(iii) ছোলতানুন্ নাছিরা

واجعل لى من لدنك سلطنا النصيرا -

ওা আয্‌আল লি মেল্লাদুনকা ছুল্‌তানান্‌ নাছিরা

আর (প্রভুহে) তোমার খাস তরফ থেকে [পূর্ণ যোগাযোগে—রাবেতার পূর্ণতায় মে'রাজে, মিলনে] আমাতে ব্যবস্থাপনা করো (ইহ-পরলোকে) তোমার খাস প্রবল প্রতাপ সাহায্য, সংস্কৃতি।— বনি এছরাইল ৮০।—

আর তা যে করা হয়েছিল, করা হয়ে থাকে. তা বলাই বাহুল্য। আর তা-ই তো তাসাউফের ভাষায় 'জাবারুত' মোকাম।—এ স্তরেই 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'বিবর্তন-মানব' প্রসংগে বর্ণিত অধ্যাত্ম কাশফ (অন্তদর্শন) ও অপরাপর সম্ভবপর মোযেযা, কেরামত—সম্মোহকদের

মতো প্রবল ইচ্ছা শক্তি (will force) প্রয়োগে—স্থান কাল পাত্র ভেদে—কম বেশী কার্যকর হয়।— জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদে' 'মাজমাউল বাহরায়েন' প্রসংগে এই খাস অভিজ্ঞতা (এলমে লাদুন) ও রহমত দেখেছেন। পুনঃ দেখুন।

(iv) লা-মাকান

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর শেষ পরিণতি, তথা অধ্যাত্ম বিবর্তনের পূর্ণতা লা-মকান একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব রাজ্যে অভিসার, এক মাত্র তাঁরি এলহাম, ওহীতে পরিচালিত মহাত্মা। তাছাউফের ভাষায় 'লা-হুত'। এতে চিরস্থিতি ইতিই 'হা-হুত'।— তাসাউফ পন্থা কেউ কেউ আলাদা তার উল্লেখ করেন, কেউ কেউ করেন না। কারণ এতো লা-মকান লাহুতেরই শেষ স্তর, শেষ অধিরাজ্য, উল্লেখ না করলেও ক্ষতি নেই। আর এসবের কাহিনীই তো আগা গোড়া আমরা যতোদূর সাধ্য সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতে প্রয়াস পেলাম। জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধের 'প্রজ্ঞার বিবর্তন' প্রসংগ ও 'পরিশিষ্ট' পুনর্বার দেখুন।

ঐ চার, কি পাঁচ [হাহুত ধরে'] অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতায় চার কি পাঁচ অধ্যাত্ম রাজ্য হাছেলের সংগে ঐ জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের 'মাজমা-উল-বাহ্‌রায়েন' প্রসংগে উল্লেখিত চারি যোগাযোগের ব্যাপার চার হাল মোকামকে কেউ তাল গোল পাকিয়ে না ফেলেন তাই বলছি:

সে হলো 'ফানা' আর 'বাকা'। স্বীয় মোর্শেদে (পীর, গুরু), রছুলে (নূরে আহমদ-মোহাম্মদী) এবং শেষমেশ আল্লাহ্‌তে ফানা অর্থাৎ অস্তিত্বহীন হয়ে পুনঃ তাতেই চির বাকা অর্থাৎ তাঁদের হাল-হাকিকত (অবস্থা) অবস্থিতি, অভিজ্ঞতা (মারেফাত)। তাতে করেই অবশ্য ঐ চার, কি পাঁচ অধ্যাত্ম রাজ্যও ক্রম অভিজ্ঞতা-মূলে,

অভিব্যক্তি-মূলে হাছেল হয়ে যায়, পরস্পর বিজড়িত। ঐ হাল মোকামের সংগে এই চার কি পাঁচ অধ্যাত্ম চক্র তথা রাজ্যাভিষেক-লীলা মিলিয়ে পড়ুন, বিষয়টা পুরোপুরি বোধগম্য হবে।

এ সকলই কোন দুজ্ঞেয় অদৃশ্য শক্তির প্রত্যক্ষ প্রেরণায় হয়। প্রথম স্তরে যখন জড় দেহের অতি-পরমাণু অর্থাৎ বিজলি (বোররাক) বিকৃতি বিদুরিত হয়ে নাছুতি (বিশ্ব-প্রকৃতি) রূপ-দর্শন হাছেল হয়, তখন তাকেই বিশেষ করে রূপক অর্থে ছিনাছাক (বক্ষ-বিদারণ) বলা হয়েছে। স্থূল বক্ষ চিড়া-ফাড়া নয়, তা হলে তো ডাক্তার হেকিমরাই রুহ (আত্মা) ও পরম রুহ (পরমাত্মা) পেয়ে যেতেন। প্রতিস্তরেই অম্নি বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ প্রেম ও প্রেরণা এবং সেই আনুপাতিক রুহের আভ্যন্তরীণ বিকাশ (বিবর্তন) ও প্রকাশ তথা হাল-হাকিকত রয়েছে। ছুরা ইন্‌শিরাহ্‌য় একে লক্ষ্য করেই বিশেষ করে বলা হয়েছে ঃ

الم نشرح لک صدرک

আলাম ন্‌াশরাহ লাকা ছাদরাকা

আমি (আল্লাহ, জেব্রাইল অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দুজ্ঞেয় শক্তি সাহায্য প্রেরণ করে, সেই যোগাযোগে) কি তোমার বক্ষ বিকশিত (বিবর্তিত) করিনি ? —করেছেন। এবং হযরত মোহাম্মদ (স) অছিলায় অনুরূপ বিশ্বের সর্ব কালের সর্ব দেশের প্রকৃত অধ্যাত্ম বোজর্গের হাল-হাকিকতই ঐ ভাবে কোরআনে এবং তার সাপক্ষে ছহি হাদিছে (কি অপর প্রকৃত ধর্ম গ্রন্থেও) ব্যক্ত করা হয়েছে। ইতি পূর্বেকার প্রবন্ধে এবং পরবর্তী প্রবন্ধে তা আরো পরিস্কার বুঝিয়েছি।

তা হলে দৈহিক বিজলি বিকৃতি বিদুরণ করে উজ্জীবন উদ্‌ভাসন, ফলে অতি এবং অধি-অভিজ্ঞতাকে ভাবার্থে, রূপক তাৎপর্যে যেমন বোররাক (বিজলি) আরোহণ বলা যেতে পারে ('রকেটের রহস্য'

প্রবন্ধের 'অতি-অভিজ্ঞতা' প্রসংগ পুনঃ দেখুন)' তেমনি রুহ অর্থাৎ আত্মার আরো অতি সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম) অতি পরমাণু (বিজলি) উজ্জীবন, উদভাসন করাকে ভাবার্থে, রূপকে রফরফ আরোহণ বলা যেতে পারে। তাতে করেই হয় পরম রুহের, পরম আত্মার পুরো সন্ধান ও প্রাপ্তি—রাবেতার (প্রেম-আকর্ষণ-সম্পর্ক স্থাপনের) পূর্ণতা, মে'রাজ মিলন, আরো অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি, সর্বশেষ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি, এখন যা-ই বলুন। ভাষায় আর কতো, কাঁহাতক প্রকাশ করা যায়।

শিল্প-সংস্কৃতি (কালচার)-কথা

সংজ্ঞা

শিল্প-সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি ? সংজ্ঞা পরে হবে, উদাহরণ দেখুন আগে। কারণ, আগে জিনিস না চিনলে তার সংজ্ঞার কী মূল্য হবে ? এক এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের আদব-কায়দা, চাল-চলন ঐ সামাজিক সংস্কৃতি। এক এক ধর্মীয় উপাসনা-পদ্ধতি ঐ ধর্মীয় সংস্কৃতি। ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, যথা, মুসলমানদের ঈদুলফিতর, ঈদুলআজহা, (কোরবানী) মোহররম—হিন্দুদের দুর্গা পূজা, কালিপূজা প্রভৃতির—কায়দা-কানুন, যথাক্রমে ধর্মীয় সম্প্রদায়িক, সামাজিক সংস্কৃতি। এ-সকলের মধ্যে কী ভালো কী মন্দ সে বিচার আলাদা ব্যাপার। বুঝতেও হবে আলাদা গবেষণা করে। সেজন্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে স্বীকার্য ঐ পৃথক পৃথক সংস্কৃতি।

এখন সংজ্ঞা খুঁজুন, বুঝতে সুবিধে হবে। সংস্কৃতি তাহলে এক এক পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ধারণা মাফিক ভালো সংস্কারগুলো যে আকুতি প্রকৃতি নিয়ে পরিস্ফুট হয় তা-ই। কোন কোন ক্ষেত্রে তা রসায়িত রূপায়িত হয়ে প্রকাশ পেলেই হয় শিল্প ; উভয় মিলে মিশে শিল্প-সস্কৃতি। এবং এরকম বহুতর শিল্প-সংস্কৃতি, দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে এক এক সভ্যতা। ইংরেজী কালচার শব্দে যে কোন রূপ, গুণ, জ্ঞান চর্চাই বোঝায়, আবার শিল্প সংস্কৃতির সীমিত অর্থেও কখনও কখনও ওর ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের এ প্রবন্ধে কালচার ঐ উভয় অর্থেই স্থান ভেদে আমরা প্রয়োগ করেছি। মনে হয় তাতে করেই বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি ভালো। বস্তুতঃ সংস্কৃতির সংজ্ঞা বহু বিতর্কমূলক। সে ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে পথ না হারিয়ে সোজা কথায় যেভাবে বোঝা যায়, বোঝানো যায় সে পথই আমরা বেছে নিয়েছি।

তা হলে ঐ সংস্কারের বাইরের দিকটা যেমন রসায়িত রূপায়িত, অর্থাৎ শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়ে শিল্প-সংস্কৃতি হতে পারে, তেমনি ওর অন্তরঙ্গ দিকটাও শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়ে সুন্দর শিল্প সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে, যথা—হিন্দুদের শ্যামা সংগীত, বাউল সংগীত, কীর্তন প্রভৃতি, মুসলমানদের ইসলামিক গজল-গান, কাওয়ালী, মারফতী, মোর্শেদী প্রভৃতি। আবার ধর্মের ঐ অন্তরঙ্গ উপাসনার উন্মাদনা (ecstasy, জজ্‌বা, ওয়াজ্‌দ্‌) ক্ষেত্রে হিন্দুদের ধর্মীয় নৃত্যগীত রয়েছে, মুসলমানদের অমনি দরবেশী নৃত্যগীত রয়েছে, এ সকলই ঐ অন্তরংগ কালচার কিংবা ঐ কালচারের অনুসংগ। বাদ্যভাণ্ডেও হিন্দুদের বাদ্যভাণ্ড ও তা বাজাবার ভংগী, মুসলিম বাদ্যভাণ্ড ও তা বাজাবার ভংগীতে কিছু কিছু তফাৎ আছে। সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন স্থাপত্য শিল্পাদির বিষয়বস্তুতে, পদ্ধতি, রীতি-নীতিতে কিছু কিছু তফাৎ আছে। বলাবাহুল্য, আমরা হিন্দুমুসলিম কালচারের বৈশিষ্টের ভিতর দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি যে অপর সকল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সামাজিক কালচারেরও বৈশিষ্ট অর্থাৎ পার্থক্য রয়েছে।

তারপর নিরপেক্ষ কালচার, যথা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ব্রহ্ম সংগীত ও অপর সংগীতসমূহ, কাব্য-সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্র-কলা, নজরুল ইসলামের গান, কাব্য-সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক। সকল ধর্মাবলম্বীই ধর্মভাবে কোন প্রকার আঘাত না পেয়ে এগুলোর রস আস্বাদন করতে পারেন। কারণ, কোন এক ধর্মভাবের কথা নয় এগুলি। বরং সকল ধর্মের সেই চিরন্তন সত্যের উজ্জীবক, রূপায়িত, রসায়িত। কিংবা বলা যেতে পারে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠে যে মননশীলতা এ তারই সার্বজনীন মানবিক প্রকাশ। কিন্তু নজরুল ইসলামের আবার হিন্দুয়ানী মুসলমানী আলাদা, আলাদা গানগুলি ঐ এক এক সাম্প্রদায়িক-সামাজিক কৃষ্টির বৈশিষ্ট প্রমাণ করে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-শিল্প-কর্মের অধিকাংশই মূলতঃ নিরপেক্ষ কাল-

চার। নজরুল, কি মাইকেল-সাহিত্যের, শিল্পকর্মের কতক তা-ই। কোন মহৎ সাহিত্য, শিল্পকর্মকেই সব সময় হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃষ্ট এরকম চিহ্নিত করা যায় না, কিংবা চিহ্নিত করা ঠিক নয়। বরং ঐ রকম পরিবেশে, ঐতিহ্যেও কোন কোন সৃষ্টি-কৃষ্টি যে আন্তর্জাতিক, বিশ্ব-জনীন হতে পারে তারি প্রমাণ প্রদান করে; শর্ত—যদি ওর ভিত্তিমূল ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ওর আবেদন হয় জাতিধর্মনির্বিশেষে সার্বজনীন। আর মহৎ সৃষ্টি-কৃষ্টি-কর্ম মানেই তো ঐ রকম যেকোন পরিবেশ পারিপার্শ্বি-কতায় তার জন্ম, কিন্তু তা ছাপিয়ে ছাড়িয়ে সে সর্বদেশকাল পাত্রের সম্পদ, আনন্দ অবদান হতে পেরেছে বলেই তো সে মহৎ, মানবিক।

সাহিত্য, সুকুমার শিল্প (Fine Arts—কাব্য, সংগীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রশিল্প, বাদ্যভাণ্ড) প্রভৃতির কথাই বলছি। এক দেশ কাল, কি ধর্মীয়-সম্প্রদায়ে ওর সামাজিক বৈশিষ্ট, অর্থাৎ বিষয়বস্তু, কায়দা-কানুনে কিছু কিছু তফাৎ রয়েছে। তাতে কী? দেখতে হবে ওর আবেদন মাত্র ঐ সম্প্রদায়ের, কি ঐ দেশের, না দেশকাল পাত্র জাতিধর্ম নির্বি-শেষে সকলেরই হৃদয়গ্রাহী, রসের আবেদন মিটাচ্ছে। সে বিচারেই হতে পারে ওর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন। এক.মানবিকতাবোধের জন্ম তো এইভাবেই সহজ-সাধ্য, সম্ভবপর হতে পারে। আবার, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে কালচারাল (সাংস্কৃতিক, কৃষ্টিক) মিশন আদান-প্রদানের মাধ্যমেও ঐ হৃদয়গ্রাহী, কি প্রয়োজনীয় (Pragmatic) বৈচিত্র, বৈশিষ্ঠ সবাই স্বীকার করে' নিয়েই তো এক মানবিকতাবোধে এক মানব-গোষ্ঠি সৃষ্টি সম্ভবপর হয়, আর তাতে করেই সমগ্র বিশ্ব-শান্তি—যুদ্ধবিগ্রহের মতো মানব এবং সৃষ্টি-কৃষ্টিধ্বংসী বিপর্যয়ে নয়—বরং ঐভাবে সৃষ্টি-কৃষ্টির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভাবের আদান-প্রদানেই শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসতে পারে, আর এই রকম সত্যিকার সার্বজনীন বিশ্বজনীন গুণ, জ্ঞান, শান কর্মই তো অনুরূপ গুণী জ্ঞানীদের মারফতই

সৃষ্ট হতে পারে, হয়ে থাকে। বিশ্ব-মানবের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, হিতের জন্য, সংহতির জন্য যুগে যুগে তার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে।

শিল্প সংস্কৃতি [কালচার] সম্পর্কে আল্ কোরআন :

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة اصلها ثابت و فرعها فى السماء - تؤتى اكلها كل حين باذن ربها - و يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون - و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ن اجتثت من فوق الارض مالها من قرار -

আলাম তারা কাইফা দারাবাল্লাহু মাছালান কালেমাতান তাইয়েবাতান কাশাজারাতিন তাইয়েবাতিন আছলুহা ছাবেতুঁঅ ফারয়ুহা ফিচ্ছামায়ে—তু'তি উকুলাহা কুল্লা হিনেম বে-ই্জনে রাব্বেহা—অইয়াদ-রেবুল্লাহুল আম্ছালা লিন্নাছে লায়াল্লাহুম ইয়াতাজাক্কারুন—অ মাছালু কালেমাতিন খাবিছাতিন কাশাজারাতিন খাবিছাতেন্নেজ্তুচ্ছাত মেন ফাওকেল আর্দে মালাহা মেন কারার

তুমি কি দেখোনা (এখানে জানোনা অর্থে) আল্লাহ কিরূপ ভালো কথার (কালেমায়ে তাইয়েবার) মেছাল দেন যেন ভালো গাছ যার মূল (আসল) মজবুত (ছাবেত), আর শাখা প্রশাখা আকাশে—যা রীতিমত ঋতুমাফিক ফল দেয় তার প্রভুর আদেশে। আর আল্লাহ্ এভাবে মানুষের জন্য মেছাল দেন যেন তারা বুঝে দেখে। এবং মন্দ কথার (কলেমায়ে খবিসার) তুলনা মন্দ গাছ, যা মাটির উপর থেকে উপড়িয়ে ফেলা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।—ইব্রাহিম ২৪-২৬।

মানুষ এক ক্রম-বিবর্তিত-বিকশিত জীব, জড়-উদ্ভিজ্জ-জানোয়ার-স্তর থেকেই তার ক্রমবিবর্তন হয়ে দেহ-মন-প্রাণ আত্মার দিক দিয়ে এই মানব-আকৃতি-প্রকৃতি ধারন করেছে। কিন্তু আত্মা তার মূলতঃ বিশ্ব-ব্যাপী পরমাত্মারই অতিপারমাণবিক বিচ্ছুরণ। কাজেই তার ভিতরে যুগপৎ এই দুই খাছলত রয়েছে। ঐ জড়-জীব-উদ্ভিজ্জ তথা আব-আতশ-খাক-বাদ-তাছিরে তার মধ্যে রয়েছে বদ খাছলত, আর পরমাত্মা থেকে

আগত আত্মায় মৌল পরমাত্মিক সু-খাছলত। কাজেই ঐ মন্দ খাছ-লতের মন্দ কার্য ও সেই মাফিক মন্দ কথা 'কলেমায়ে খবিছায়' যেমন হয় তার অধঃপতন, তেম্‌নি পরমাত্মিক, পরমার্থিক সৎকার্য ও সেই মাফিক সৎ কথা 'কলেমায়ে তাইয়েবা' মারফত হয় তার আত্ম উদবর্তন। আর এই করে করে একদা হয় গিয়ে আল্লাহ্‌তে উপনীত—যথাকার বস্তু তথা গিয়ে পরিসমাপ্তি, পরিণতি। 'শাখা প্রশাখা আকাশে' অর্থাৎ উর্ধ্বগতি আর 'মাটির উপর থেকে উপড়িয়ে ফেলা হয়, অর্থাৎ গাছের মুলোৎপাটনের মতো নিম্নগতির মেছাল দিয়ে যথাক্রমে ঐ 'কলেমায়ে তাইয়েবা' ও 'কলেমায়ে খবিছা' কি সুন্দর বোঝানো হয়েছে !

এখন, মন্দ কথা ফাহেশা (অশ্লীল) মিথ্যা কথাদি, সেই আনু-পাতিক মন্দ গাছের (মানুষের মন্দ কৃতকর্মের) মন্দ ফল, আত্মার সাময়িক অধঃপতন ঘটায়, কিন্তু আত্মা পরমাত্মা থেকে আগত এক চিরন্তন বস্তু বা এনার্জী (সূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ)। সুতরাং তাকে একেবারে কিছুতেই কেউ ধ্বংস করতে পারে না, বিকৃতি জন্মায় মাত্র। সংস্কার সংশোধনই দোযখ বা শাস্তি, তাতে করেই পুনঃ হতে পারে সে স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ, আসলমুখী। কাজেই মন্দ কথা কার্যের ঐ বিকার অস্থায়ী। তেম্‌নি ভালো কথা মানে যেমন সত্য কথা, তেমনি সকল রকম সৎসাহিত্য—সুনির্বাচিত সৎ ছায়া ছবি, নাটক-নভেল, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য-কলা প্রভৃতি—এবং দর্শন বিজ্ঞান। নির্দোষ আনন্দ অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে সে দিতে পারে বেহেশতের সওগাত (স্বর্গসুখ)। আত্মার উন্নতি সাধন করে' বলে' সে সাময়িকের পরেও কারো কারো বেলা তাই ঐ হিসাবে চিরস্থায়ী। অর্থাৎ ঐ ভালো গাছের (কৃত সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের) ভালো ফুল-ফসল (উকুল) মন্দগাছের মন্দ ফলের মতো অস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী। এই রকম সর্ব সৎ সাহিত্য, শিল্প-কলা, দর্শন-বিজ্ঞানই ব্যাপক অর্থে সত্য-সংস্কৃতি, অবশ্য তার বিকাশের, প্রভাবের মাত্রা অনুসারে তারও স্থায়িত্ব, চির

স্থায়িত্ব, কি অস্থায়িত্ব অর্থাৎ কোন কোনটি মাত্র সাময়িক চাহিদা মিটায়।

الم تر ان الله يسبح له ما فى السموت والارض والطير صفت - كل قد علم صلاته و تسبيحه - والله عليم بما يفعلون

আ-লাম তারা আন্নাল্লাহা ইয়ুছাব্বুহা লাহু মা ফিচ্ছামাওয়াতে অল আর্‌দে — অত্‌তাইরো ছাফফাতেন—কুল্লো কাদ আলেমা ছালাতাহু অ তাছ্‌বিহাহু—অল্লাহু আলিমুম বিমা ইয়াফ্‌আলুন

গদ্য এবং পদ্য উভয়তঃ এর তরজমা দেখুন ঃ

গদ্য ঃ তুমি কি জানো না যে আল্লাহর গুণগান করে যা-কিছু আছমান জমীনে আছে (সকলে)? পাখা মেলে দিয়ে পাখীরাও (গুণ গায়)। প্রত্যেকেই তার ছালাত (নামায) ও গুণগান (তসবিহ তাহলিল) জানে। আর আল্লাহ জানেন যা কিছু তারা করে।—নূর ৪১।

পদ্য ঃ গুণ গান যার দোজাহানে গায় সবাই গায়
সেইতো আল্লাহ, জানো নাকি চেনো নাকি তায়?
পাখীরাও পাখা মেলি' প্রশংসা গীত গায়
যার স্বাভাবিক তসবিহ ছালাত সেইতো করে যায়।
জানেন আল্লাহ কী গুণ গান কে করে কোথায়।

কাজেই, ছালাত (নামায) তসবিহ তেলাওত এক এক ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক শব্দ! তা যে কতোভাবে আদায় হয়ে যেতে পারে আল্‌কোরআনের ঐ ভাবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের মাধ্যমেও বোঝা যায়।

و ترى الملئكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

অ তারাল মালায়েকাতা হাফ্‌ফিনা মেন হাওলেল আরশে ইউ-ছাব্বেহুনা বে-হামদে রাব্বেহিম

আর তুমি ফেরেশতাদের দেখবে আরশের চারধারে ঘুরে ফিরে (নৃত্য করে আর কি) তাদের প্রভুর গুণগান করছে।—জোমার ৭৫, মোমেন ৭।

এখানে লক্ষ্যের বিষয় ঐ সংস্কৃতির এক জরুরী অংগ নৃত্যগীত।— হজ্জে ওমারায় * কাবা শরীফের চারদিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিন) করতে হয়। সেই সাত পাক ঘুরবার সময়ে প্রতিবারে সুর করে' লাব্বায়েক' লফজ (শব্দ) উচ্চারণ করার সংগে সংগে নিম্নরূপ দোয়া দরুদ পাঠ করতে হয়ঃ

لبیک لبیک - الھم لیک - لا شریک لک لبیک - ان الحمد و النعمة
و الملک لک - لا شریک لک - لبیک -

লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক! লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক! ইন্নাল হামদা অল নেয়ামাতা অলমুলকা লাকা—লা শরীকা লাকা—লাব্বায়েক!

হে আল্লাহ, আমি তোমার খেদমতে হাজির (৩ বার), তোমার শরীক নেই, (আমি তোমার খেদমতে হাজির) নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, সব নেয়ামত (কল্যান দান), সমগ্র সম্রাজ্য তোমারই, তোমার শরীক (কাজের অংশীদার) নেই, হাজির আছি, ইত্যাদি।

'লাব্বায়েক' শব্দকে ধূয়া বা কোরাস করে' আরবী কায়দায় সুরছন্দ অর্থাৎ গজল গানেরই বা কী বাকী রইলো! আর ঐ ঘূর্ণনের মধ্যে নাচেরই বা বাকী রইলো কী? × প্রকৃতির ছায়াপথে চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, প্রভৃতি সবাই ঐ রকম এক এক কেন্দ্র করে নৃত্য করে' চলেছে, আর পূর্বেই দেখেছেন ফেরেশতারা নৃত্য করে' গুণ গান করেন আরশের চার দিকে, আর পাখীর কণ্ঠে, নদীর কলতানে,

---

* হজ্জ যার জন্য ফরজ নয় সে, কিংবা যখন ফরজ নয় তখন যদি যার জন্য ফরজ সেও—হজ্জের নিয়মাবলি পালন করে তখন তাকে বলে ওম্‌রা।

× হজ্জ ওমরার সংগে তুলনা করায় অমনি লাফিয়ে উঠবেন না। ধীর-স্থির ভাবে চিন্তা করেই আসলে হয় সত্য আবিস্কার। বুদ্ধি-শুদ্ধি উত্তেজনা-

বাতাসের শোঁশোঁ শব্দে—প্রভৃতি প্রকৃতির সর্বত্র সংগীত, শুনতে পাচ্ছেন মেঘে বাজনার আওয়াজ, আর এই ভাবে সবাই যার যার তসবিহ্ (প্রশংসা গীতি), ছালাত (নামাজ) পাঠ করে চলেছে, তাও দেখেছেন। সুতরাং ওরই আরো আত্ম ভোলা হাল হাকিকতে (জজবায়, ওয়াজ্দে) আরো অভিভূত অভিব্যক্তি বা বিবর্তন প্রকাশ পায় দরবেশী নৃত্যগীত। কোন্ মূলসূত্র থেকে এসেছে তাকি আরো বুঝিয়ে বলার দরকার আছে ?

দেল ব-দাস্ত আবাদকে হজ্জে আকবরাস্ত
আজ হাযারা কাবা এক-দেল বেহতরাস্ত।

দীলকে আবাদ আপন করা আকবরী হজ্জ
হাযার কাবার চেয়ে সেরা একটি হৃদয় বশ।

কাবা বনুগাহে খলিল আজরাস্ত
দীল গুজারগাহে জলিল আকবরাস্ত।

মাটির কাবা আজর-ছেলে খলিলের 'বানান'
দীলের কাবায় দিন গুজরান জলিল রহমান।—মসনভি।

কেন না ঃ

শানা অ মেছওয়াকো তছবীহে ব-দছ্ত্
ছদ্ বোতে দারি মেহ্ঁা অ্যায় বোত পোরছ্ত্!
বোত সেকান্দ বারহাম বেজাম বোত খানারা
চঁু খলিলুল্লাহ্ বেশা কুন খানারা।

(হে ভণ্ড!) তোমার হাতে তস্‌বিহ, মেছওয়াক ও চিরুনি রেখেছ অথচ তোমার অন্তরে শত শত মূর্তি লুকিয়ে রেখেছো, (যদি ভাল চাও) মূর্তিগুলোকে চুর্ণ-বিচূর্ণ কর ও পুতুলের ঘরও ভেঙে ফেলো। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর (আঃ) মতো নিজ অন্তরকে কাবা-স্বরূপ গড়ে তোলো।

বশে হারিয়ে নয়। আর অনর্থক বুদ্ধি হারানোও ইস্‌লাম নয়, কোন ধর্মই নয়।

চুঁশবি এবতেদা আজ বাহারে নামায
দিল শওয়াদ দর খা অখর অ্যায় হিলাছাজ্ !

ই নামায আখের তোরা ছাজ্দ তবাহ্
ফিকরে বাতেলহা কুনাত রোয়েৎ ছিয়াহ্।

যখন ছালাত (নামাজাদি) সাধন করতে দাঁড়াও, হে ধূর্ত ! তোমার অন্তর গরু গাধার দিকে যায়, এইরূপ ছালাত (নামাজাদি) তোমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করবে এবং অনর্থক দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে যাবে।

মুখে বললাম 'আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ)' মন বললো, 'ঐ বাড়ীর বউটি সুন্দর', কিংবা মুখে বললাম 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ !' মন বললো 'খাবো মাগুর মাছের কল্লা'—এতে করে কি আসল আদত ধর্মের কিছু হলো ?

কাজেই ইরানী (পারশ্য) ভাষার এবং পশ্চিম এশিয়ার এশিয়া মাইনরের আর্দরুমের মহামরমী (ছুফী) কবি জালাল উদ্দীন রুমী (র) [১২০৭—১২৭৩ খৃঃ] ঐ মূলসূত্র অনুসারে ওর একটি রসায়িত রূপায়িত সর্বদেশকাল-পাত্র-উপযোগী একমাত্র আল্লাহওয়ালা স্বরূপ প্রকাশ করেন 'দরবেশী নৃত্যগীত' *

* তুর্কীরা, ইরাণীরা সেই জমানা থেকে আজও ঈদ উৎসবে এবং অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে, কি ঐ মহামনীষির উর্সে তাঁর প্রবর্তিত কায়দায় নৃত্যগীত করে থাকেন। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান, কি ভারতের নানা দরগাহে ফকির দরবেশদিগের অনুরূপ জলসারও উৎস যে কোথায় তা উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়।
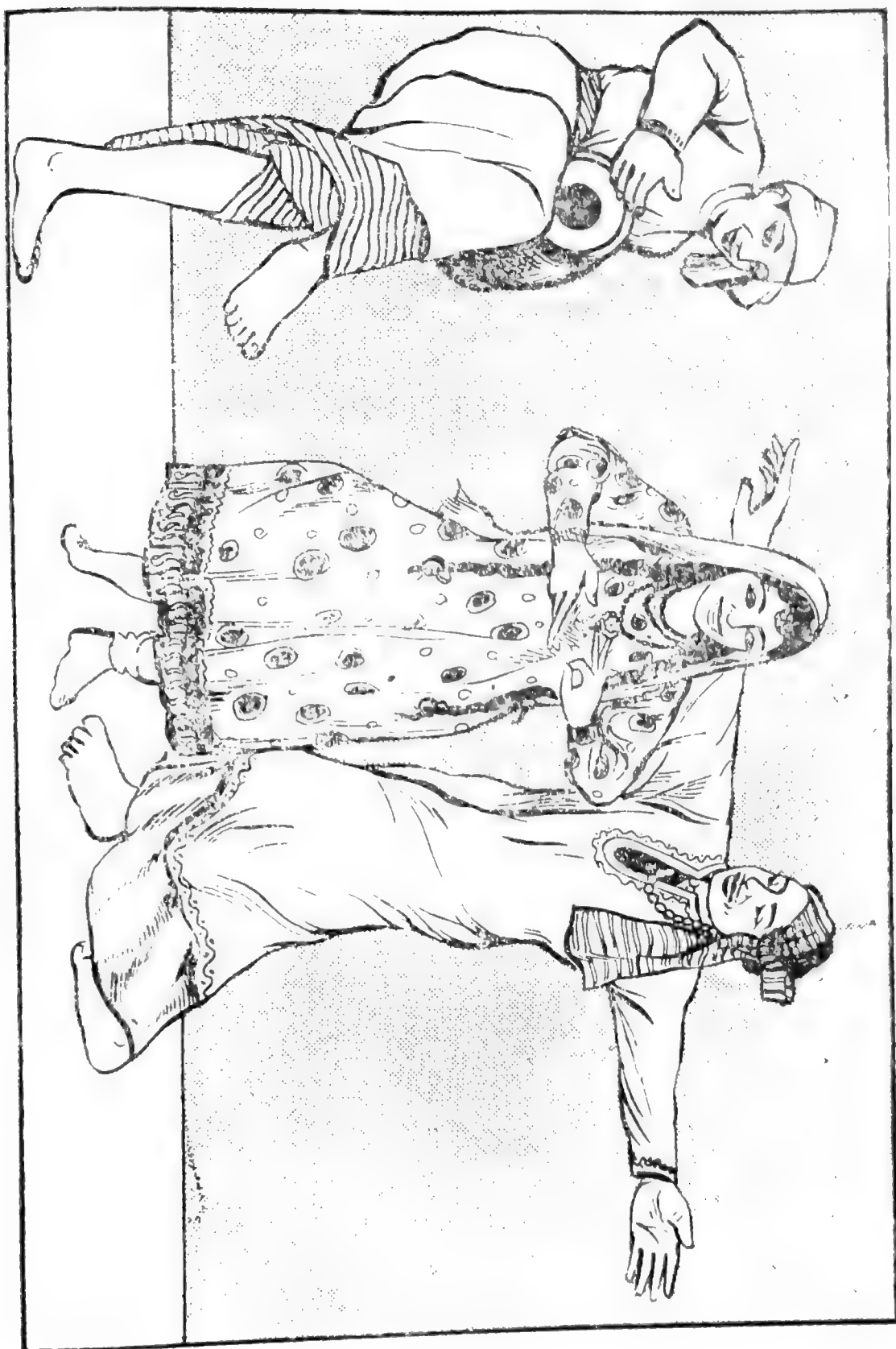
জেছমে খাক আয় এশ্‌কে রব আফলাক শোদ
কুহ দর রক্‌ছ আমাদ ও চালাক শোদ।

প্রেম-গুণে খাক-বাদ-আব-আতশ-দেহ শূন্যে
প্রেম-গুণে নাচে যেন পাষান্‌ পাহাড় পূত পুণ্যে।

এশ্‌ক জানে তুর আমাদ আশেকা
তুর মস্ত্‌ ও খার্রা মুছা ছায়েকা।

তুর যেনো প্রাণ পেয়ে নাচে প্রণয়ে
নাচে তুর আর মুছা বেখোদ পেয়ে প্রেম-ময়।—মসনভি।*

'রকেটের রহস্য' প্রবন্ধের 'জড়-জগৎ, চিৎ-জগৎ, প্রকৃত রহস্য' এবং 'অতি-অভিজ্ঞতা' প্রসংগে বুঝিয়েছি কিভাবে মানব-দেহস্থ আব-আতশ-খাক-বাদের মূল অতি-পরমাণু অর্থাৎ নুরেআহম্মদ (পরমা প্রকৃতি) উজ্জীবিত উদ্ভাসিত করে মানবাত্মার পক্ষে নূরেআহাদ অর্থাৎ পরম প্রেমময় পুরুষ পরমাত্মাকে পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাঁর সংগে একীভূত, একাত্ম হওয়া যায়, তওহীদ (একত্ব) বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিণতি সাধিত হয়—তা পুনঃ দেখুন। 'অতীন্দ্রিয় রকেট'—রহস্যও পুনঃ দেখুন।

আর মরমী মহামুসলিম মনীষি আল্লামা জালালুদ্দীনের (র) অনেক আগেই আর এক মুসলিম মহামনীষি হুজ্জতুল ইসলাম (ইসলামের সেই জমানার প্রমাণ-স্বরূপ হেফাজতকারী) আল্লামা আবু হানিফ মোহাম্মদ ইমাম গাজ্জালী (র) (১০৫৮—১১১১) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহিয়াউল উলুমুদ্দীন (ধর্ম-জ্ঞানের সঞ্জীবক)' ও তার সংক্ষিপ্ত সার 'কিমিয়া সায়াদাতে' (সৌভাগ্য স্পর্শমনি)' ঐ দরবেশী এবং সর্বরকম নৃত্যগীতের মূল সূত্র এভাবে বয়ান করে গেছেন ঃ

'নৃত্যগীত নির্দোষ হবার প্রমাণ এই যে, একদা হাব্‌শী লোকেরা মসজিদে নৃত্য-গীত করছিলো, তা রসুলের (সঃ) কাঁধে ভর দিয়ে মহামান্যা বিবি আয়শাও (র) দেখেছিলেন (বোখারী ৫৬ পৃঃ)। আরো

* লেখকের অক্ষম কাব্যানুবাদ মাফ করবেন।

দেখুন, মহাপুরুষ হজরত রসুল (সঃ) একদা মহাত্মা আলীকে (কঃ) বলেছিলেন—তুমি আমা হতে, আর আমি তোমা হতে অর্থাৎ আমার প্রভাব হতে তোমার প্রভাব এবং তোমার প্রভাব হতে আমার প্রভাব। —এ-কথা শুনে মহাত্মা হজরত আলী আনন্দে অধীর হয়ে নেচেছিলেন। তৎকালে স্বীয় পবিত্র পদ কয়েকবার ভূতলে আঘাত করেছিলেন। আরবীয় লোকেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলে ঐ ধরণে নৃত্য করে থাকে। অন্য একদিন মহাপুরুষ হজরত (সঃ) জাফরকে বলেছিলেন—'তোমার স্বভাব আমার মতো' এ শুনে তিনিও নেচেছিলেন। হারেছের পুত্র জায়েদকে যে সময়ে মহাপুরুষ হজরত রসুল (সঃ) বলেছিলেন—'তুমি আমার ভ্রাতা ও প্রভু' তখন তিনিও নেচেছিলেন। যাহোক যদি কেউ বলেন যে ঐরূপ নৃত্য হারাম, তবে তারা বড়ো ভুল করবেন। ঐ নাচকে যদি কেউ মন্দ বলে' বিবেচনা করেন তথাপি ক্রীড়া কৌতুক ভিন্ন কিছুই বলা যেতে পারে না ; ক্রীড়া কৌতুককে কখনই হারাম বলা যেতে পারে না। 'কেউ হৃদয়স্থ (কাল্‌ব্‌ সমূহের—লতিফা, মোকাম-মঞ্জিলের) অবস্থাকে (হাল-হাকিকতকে) বলবান করবার জন্য নৃত্যগীত করলে তা' অবশ্যই উত্তম কার্য হবে।'—সৌভাগ্য স্পর্শমনি, ৩য় খণ্ড ব্যবহার পুস্তক, 'সংগীত' ও সংগীত মোহ' অধ্যায়।

বজ্র-বাজনা, ঢোলক

و يسبح الرعد بحمده و الملئكة من خيفته

অ ইয়ুছাব্বেহুর রাদো বে-হামদিহি অল্ মালায়েকাতু মেন খিফ্‌তিহি

আর বজ্র (বাজনা বাজিয়ে) তাঁর (আল্লাহ্‌র) গুণগান করচে, আর ফেরেশ্‌তারা করছেন (স্বভাবত) সভয়ে।—রাদ ১৩।

বজ্রের আওয়াজ ও ঢোল ঢংকা নাকাড়ার আওয়াজ একই রকম। বজ্রের বাজনার প্রশংসা এবং প্রকৃতিতে অম্‌নি যে কোন আওয়াজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে স্রষ্টারই ঐ গুণ-কর্ম, জ্ঞান-কর্ম ; সুতরাং সংস্কৃতির অংগ অনুরূপ যে কোন বাদ্য-ভাণ্ডও আর না-জায়েজ থাকে না, অবশ্য আচরনীয় (ফরজ) হয়ে পড়ে।

তবু ঢোল সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার। কারণ, গ্রামে এই বাজনাটি নিয়েই একটু বেশী আপত্তি তোলা হয়। শহরে অবশ্য সব বাজনাই বাজনা, তাদের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয় না, দরকারই বা কী ?

গ্রামে বলা হয় ঢোল বাদ্যভাণ্ড দ্বারা নাকি হিন্দুদের ঐ বাদ্যভাণ্ডের তাশাবো (মিলঝিল) করা হয়, অতএব না-জায়েজ। কিন্তু এ রকম তাশাবো না করা হয় কোথায় ? হারমোনিয়াম, গীটার প্রভৃতিও তো বিদেশী বিধর্মীদের বাজনা, তা-ও তাহলে বাদ দিতে হয়। সরকারের ব্যাণ্ডবাদ্যও তা হলে ত্যাগ করতে হয়। হিন্দুরা দুধ কলা খায়, কি পূজায় অর্ঘ্য দেয়, সুতরাং ঐ তাশাবো হয় বলে কি মুসলমানদের তা ত্যাগ করতে হবে ? এ রকম কতো তাশাবোর কথা বল্‌বো।

আবার এক তালা দোতালার কথা তুলে জিনিসটা আরো ঘোলাটে করা হয়। হযরত রছুলুল্লাহ্‌র (স) আমলে হয় তো এক তালা অর্থাৎ একদিকে তালি-যুক্ত দফ (ঢোল) আবিষ্কৃত ছিল। সেই পর্যন্ত জায়েজ রাখার যুক্তি খাড়া করা হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য ! কেবল বাজনার মাত্র সেই জমানার এতোটুকু উদ্‌ভাবন ঠিক রাখার কোশেশ করা হয়। কিন্তু রছুল (স) যে পায়দলে ছাড়া মাত্র উটের পিঠে কি ঘোড়া গাধা খচ্চর পিঠে চড়েছেন, ততোটুকু আর জায়েজ রাখা হয় না। প্রয়োজনে ট্রেণ, বাস, মটরলঞ্চ, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, এমন কি রকেট পর্যন্ত জায়েজ হয়ে যায়। কারণ কী ? কারণ ট্রেণ, বাস, মটরলঞ্চ, ষ্টীমার, এরোপ্লেন যে অনেক ফতোয়াবাজদেরই তীর্থ যাত্রায়ও কাযে লাগে, রকেট হয়তো ভবিষ্যতে কাযে লাগবে। অপর দিকে, সেই জমানার নলখাগড়ার, কি পাখীর পালকের কলম প্রমোশন পেতে পেতে ঝর্ণা কলম হয়ে গেছে, তা দুরস্ত। ভূর্জপত্র, তামার পাত, হালাল পশুর হাড্ডি, চামড়া, পাথর আর ধর্ম গ্রন্থাদির কওল-কালাম লিখতে ব্যবহৃত হয় না ; নানা উন্নত, অতি উন্নত ধরনের কাগজ

ব্যবহৃত হয়, তা-ও ফতোয়ার এক আঁচড়ে জায়েজ হয়ে যায়, কেবল না-জায়েজ থেকে যায় বেচারা ঢোল তথা দফের ঐ ক্রম বিকাশ, স্বাভাবিক পরিণতি। নিজস্ব প্রয়োজন ও প্রীতির পক্ষপাতিত্ব আর কাকে বলে!

কিন্তু ঢোলও আর এক তালির দফ্ থাকেনি। ইরাণীরা ওকে দুতালিযুক্ত 'দহল' বানিয়ে নেয় ঐ নিছক প্রয়োজনে, সেখান থেকেই পাক-ভারতে এসে 'ঢোল' নাম গ্রহণ করে। প্রাচীন ঐ দহল যে ঢোল হয়ে গেছে উচ্চারণের তারতম্যে তা'বোঝা যায়।* পুনরায় পাঠান আমলে পাক-ভারতেই ইরাণী ভাষার মহা কবি সুরকার ও গীতি শিল্পী বুলবুলে হিন্দ্ হযরত আমীর খসরু ওকে পুনঃ ডানে বাঁয়া ভাগ করে ডুগী তবলা করে নেন। কারণ, যে কোন সংগীতের সুর ও তালমান ঠিক রাখতে তা ছিলো এক অনিবার্য বিবর্তন।

উচ্চাংগ মার্গ সংগীত ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুংরীর সংস্কার করেন প্রধানতঃ মুসলমান ওস্তাদেরা। নতুন মার্গ সংগীত—খেয়াল, তারানা, দাদরা প্রভৃতি—সৃষ্টি করেন তাঁরা। সেতারা এসরাজ, বাঁয়া, তবলা প্রভৃতি সৃষ্টি করেন উপরোক্ত হযরত আমির খসরু (র)। পূর্বোক্ত চলা-ফিরার যান বাহন, লেখ্বার ঝর্ণা-কলম, কাগজের মতো এসবই যে স্বাভাবিক সুবিধে জনক, সুন্দর বিবর্তন, বিশেষ করে' মুসলিম মনীষার অবদান, এ বুঝলে এবং জেনে নিলে অকারণ 'তাশাবো, তাশাবো' করে চিৎকার করা, কি প্রাকৃতিক পরিবর্তনশীল প্রগতি, পরিণতির বিরুদ্ধে আর বে-ফায়দা, বেহুদা না-জায়েজের, জাহান্নামের ফতোয়া ঝেড়ে' দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীদের হাসির খোরাক যোগানো লাগেনা।

বড়োপীর আবদুল কাদের জিলানীর (র) এই সদুদ্দেশ্যে গানবাজনা সম্পর্কে অতি অভিজ্ঞ বাণী আর বাকী থাকে কেন, তাও শুনুন, বিষয়টা

* দেখুন ডাঃ মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেবের 'বাংলা ভাষায় পারশী প্রভাব' সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫।

সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা হবে, যেটুকু সন্দেহ এখনও থাকতে পারে, আশা করি, তার নিরসন হবে।

(১) প্রেমিকগণের ও পাখীকুলের শব্দসমূহ ও অর্থপূর্ণ মিষ্ট স্বর প্রভৃতি রুহের শক্তি। এইরূপ ওয়াজ্‌দের (ভাবাবেশ) মধ্যে কুপ্রবৃত্তি বা শয়তানের কোন প্রবেশ অধিকার নেই। (২) কোরআন পাঠ, জ্ঞানপূর্ণ কবিতা, প্রেম, ভালোবাসা, (খোদার) ধ্যান আনয়নকারী শব্দসমূহ রুহের নূরাণী শক্তি। (৩) প্রেমের গান, ঐ কবিতা সমূহের ছন্দ, বসন্তকাল, সারিন্দা, তারবিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যার প্রেমশক্তি জন্মেনা, তার অন্তঃকরণের স্বাস্থ্য ধ্বংস প্রাপ্ত, তার কোন ঔষধ নেই এবং সে 'পাপী'—গর্দভ, বরং সমস্ত চতুষ্পদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী।— ছিরুল আছ্‌রার।

শীস (বাঁশী), হাত তালি, ইস্রাফিলের শিঙা

কী মুশকিল! কখনো কখনো সংস্কৃতির স্বাভাবিক অংগ, অনুসংগ শীস, বাঁশী এবং হাত তালিতে আপত্তি তোলা হয়, সভ্য-সমিতিতে হাত তালি দিলে গোস্বা প্রকাশ করা হয়। বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে কোরআনের এই আয়াত খাড়া করা হয়ঃ

و ما كان صلا تهم عند البيت الا مكاء و تصدية - فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون -

অ মা কানা ছালাতুহুম ইন্‌দাল বাইতে ইল্লা মোকাআন অ তা্‌ছদিয়াহ্‌ ফাজুকোল আযাবা বিমা কুনতুম তাক্‌ফুরুন

এবং এদের (কাফের কোরেশদের) ছালাত (নামায) কাবাগৃহের নিকটে শীস বা হাততালি দেয়া ব্যতীত নয় [অর্থাৎ আসল গুণগান বা উন্নত স্তরের ভাবধারা, গুণ-জ্ঞান-চর্চা নয়, বরং মিছেমিছি অস্বাভাবিক অসামাজিক শীস ও হাততালি দেয়া মাত্র, সুতরাং ঐ রকম বেহুদা বেফায়দা শীস এবং হাততালি যে না-জায়েজ তা আমরাও বলি]। (হে কাফেরগণ!) তোমরা শাস্তির মজা চাখো তোমাদের অবিশ্বাসের দরুন।''—আনফাল ৩৫।

সুতরাং, আসলে ঐ কুফরীর কারণেই শাস্তি, শিস বা হাততালির জন্য নয়, তা বোঝাই যায়। অতএব প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণ ও জ্ঞান-কর্ম অনুশীলন ক্ষেত্রে, কি অনুষ্ঠানাদিতে ওর না-জায়েজ হওয়ার কোন যুক্তি-সংগত কারণ নেই। ঐ আয়াত ঐ প্রসংগে দলিল হিসাবে উল্লেখ না-বুঝদের কায। ওতো মাত্র সেই জমানার কাফেরদের কাবা গৃহের নিকটে—ছালাত বা নামাজের আসল হাকিকত ভুলে,—আল্লাহ্‌র বদলে মূর্তির মোকাবেলা—অহেতুক বেহুদা অস্বাভাবিক (বিকৃত) শীস ও হাত তালি সম্পর্কে সমালোচনা, নিন্দা বাক্যও নয়, নিষেধাজ্ঞা তো নয়ই।

দাউদ (আ), ইস্রাফিল (আ)

و لقد اتين دود منا فضل - يجبال اوبى معه و الطير -

অ লাক্বাদ আতায়না দাউদা মিন্না ফাদ্‌লান—ইয়া জেবালু আওবেবি মায়াহু অত্তাইরা

আর নিশ্চয়ই আমরা দাউদকে (আ) আমাদের তরফ থেকে ফজল (সুন্দর স্বাভাবিক সুর স্বর) দিয়েছিলাম, (অতএব) হে পর্বত সকল, তার সংগে আল্লার গুণগানে যোগদান করো। আর হে পাখী সকল তোমরাও (যোগ দাও)।—সাবা ১০।

সুতরাং দাউদকে দেয়া ফজল যে স্বাভাবিক গান-বাজনা-যোগে গুণ জ্ঞান আহরণ ছিলো, তা বোঝা যায়, নতুবা পাখীর গান, পাহাড় পর্বতের ঝর্ণা-টর্ণার সুর স্বরের কথা এ প্রসংগে উঠতোই না !

و اقصد فى مشيک واغضض من صو تک - ان انكر الاصوات نصوت الحمير -

অক্‌ছেদ ফি মাশিকা অ আগজুজ মেন ছাওতেক—ইন্না আনকারাল আছওয়াতে লাছাওতুল হামীর

তোমার স্বর কোমল কর (সুরেলা সুন্দর কর), কারণ সকল সুর স্বর অপেক্ষা বাস্তবিক গাধার আওয়াজ নিকৃষ্ট।—লোকমান ১৯।

সুতরাং সুরের ভালো মন্দ, পছন্দ অপছন্দ বলে' দিয়ে স্রষ্টাই সুরের চর্চার দিকে আমাদের উদবুদ্ধ কর্‌ছেন, আহ্বান করছেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধাচরণ করাই বরং পাপ, গোনাহ্‌। পাখী এবং পাখীর মতো ঐ রকম স্বাভাবিক গুণগান করনেওয়ালা প্রাণীর স্বভাব-ধর্ম বন্ধ করে'রাখলে, কি নষ্ট করে' দিলে কেন গোনাহ্‌ হবে না ? তথাপি বলবো সুর-স্বর চর্চা করা নাজায়েজ ? তাহলে কবিতাও তো না-জায়েজ, কারণ সেও তে. সুর ! অবশ্য গানের চেয়ে কম টানতে হয় এই যা তফাৎ। আবার, ইস্‌রাফিলের ছুর বা শিঙায় তো আল্লাহ্‌র দেওয়া এই সুর। বহুল তার উল্লেখ কোরআন-কালামে :

و يقولن متى هذا الوعد ان كنتم صدقين - ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم و هم يخصمون -

অ ইয়াকুলুনা মাতা হাজাল ওয়াদু ইন কুন্‌তুম ছাদেকীন—মা ইয়ান-জুরুনা ইল্লা ছায়হাতাঁ ওয়াহেদাতান তাখুজুহুম অহুম ইয়াখেচ্ছেমুন

এবং তারা বলে কখন এই ওয়াদা (পূর্ণ হবে), যদি তোমাদের কথা সত্যই হয়। তারা শুধু এক মহাধ্বনির (শিঙার সুর) অপেক্ষা করছে যখন তারা পরস্পর কলহ করতে থাক্‌বে।—ইয়াছিন ৪৮,৪৯।

و نفخ فى الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون

অ নুফেখা ফিচ্ছুরে ফা ইজা হুম মেনাল আযদাছে ইলা রাব্বেহীম ইয়ানছেলুন

আর ছুরে (শিঙায়) ফুঁক দেয়া হয় (বাজান হয়) তখন তারা কবর ছেড়ে তাদের প্রভুর পানে ফিরে যায়।—ঐ ৫১।

ان كانت الا صيحة واحدة فاذا جميع لدين محضرون

ইন্‌ কানাত ইল্লা ছায়হাতাঁ ওয়াহেদাতান ফাইজা জামিয়ুল্লাদায়না মুহ্‌জারুন

(আরো) এক ধ্বনি (শিঙার সুর) অমনি তারা সকলে আমাদের কাছে সমবেত।—ঐ ৫৩

يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا

ইয়াওমা ইয়ূনফাখু ফিচ্ছুরে ফা তা'তুনা আফওয়াজা

সে দিন ছুরে (শিঙায়) ফুঁক দেয়া হয় (বাজান হয়) আর (অমনি) সকলে দলে দলে ছুটে আসে।—নবা ১৮।

বলা বাহুল্য, শিঙা (ছুর) বুঝ্‌তে আবার কেউ যেন ভুল না করেন। শিঙায় ফুঁক দিবেন আর পৃথিবী ফানা হয়ে যাবে তাই ইছরাফিল ফেরেশতা শিঙা হাতে আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষার দাঁড়িয়ে আছেন এ রকম কিস্‌সা—এ সব আয়াতের আসল অর্থ বুঝতে—ভুল্‌তে হবে। কেননা আল্‌কোরআনে ইছরাফিলের শিঙা ফুঁকবার কথা থাকলেও সেজন্য তার রুটি হস্তে দাঁড়িয়ে থাকবার কিস্‌সার নাম গন্ধও নেই। রুটি হস্তে কেন? কারণ, কখন আল্লাহ্‌র আদেশ নাজেল হয় ঠিক কি? কাজেই খেতে তিনি সাহস করছেন না, যদি খেতে থাকা কালে আদেশ নাজেল হয়! কিন্তু এতো কিস্‌সা! কারণ, পৃথিবীতো আর ও-রকম ধ্বংস হচ্ছে না, বরং স্বীয় আগুন, পানি, বাতাসের শক্তি ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে অতি ধীরে চাঁদের মতো শুষ্ক শূন্য নিরেট হবার দিকে, ফলে একদা জীব ধারনে অক্ষম হবার দিবে একটু একটু করে' এগোচ্ছে, তার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসা' ও জবাব (১)এর প্রথম প্রবন্ধ 'সৃষ্টি রহস্যে' পেয়েছেন। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও শেষ কিয়ামত সেখানে দেখেছেন যথাক্রমে ব্যক্তিগত মৃত্যু, সমষ্টিগত অনেকের নানা দৈব-দুর্ঘটনা যুদ্ধ-বিগ্রহ, কি মহামারি ইত্যাদিতে মৃত্যু, আর শেষ কিয়ামত তো ঐ শুষ্ক শূন্য পৃথিবীর জীব ধারনের অনুপযোগী অবস্থায় সেই সময়ে যে সব জীব-জন্তু আগুন, পানি, বাতাসের পরিমিতির অভাবে শেষ ছট ফট করে' মরবে। আর অশরীরি পবিত্র আত্মা (রুহুল কোদছ) ফেরেশতা শরীরি জীবের স্থুল খাদ্য (ভাত) রুটি খাবেন, পানীয় পান করবেন, এও একটা কথা হলো! আর তা বিশ্বাস্য? মানুষের স্বাভাবিক গল্পের মোহ, আর মিথ্যা অলৌকি-

কতার প্রতি আস্থা আর কাকে বলে ! [অলৌকিকতা কী এবং কিভাবে কতোটুকু সম্ভবপর তা প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসায়' 'বিজ্ঞান—বিশ্ব গোলক' এবং 'বিবর্তন—মানব' প্রসংগে পড়েছেন, আবার পড়ুন]।

তবে কি ?

আসলে এ-সবক্ষেত্রে বাতাসের শক্তিকে (energy) ইছরাফিল, আগুনের শক্তিকে আজরাইল, পানির শক্তিকে মেকাইল ও মাটির শক্তিকে জেব্রাইল কল্পনা করা হয়েছে। তাৎপর্য হলোঃ যেমন বহির্বিশ্বে আগুন, পানি, বাতাস উদ্বেল হয়ে খণ্ড প্রলয় ঘটায় (সমষ্টিগত কিয়ামত) তেমনি জীবের ঐ এক বা একাধিক শক্তি সবিশেষ বাড়তি কমতিতে শেষ নিংশ্বাস পড়ে (ব্যক্তিগত কিয়ামত), আর পৃথিবীর জীব ধারনের অনুপযোগী অবস্থায় ঐভাবে ব্যক্তিগত শেষ সব জীব-গোষ্ঠির শেষ নিঃশ্বাস পাত (শেষ কিয়ামত). এ-সবই ইছরাফিলের শিঙা ফুঁকা। আর কবর এসব ক্ষেত্রে আত্মা যেখানে চলে যায় সেই ইল্লিয়ুন (সাধু লোকদের পারলৌকিক সূক্ষ্ম স্থান, কি হাল-হাকিকত), আর সিজ্জিন (পাপীদের পারলৌকিক কষ্ট-দায়ক সূক্ষ্ম স্থান কারাগার, কি ঐ হাল-হাকিকত)। নতুবা যাদের কবর দেয়া হয় না, পুড়ে ফেলা হয়, কিংবা মাছে, কুমীরে, বাঘে, চিল-শকুন-কাকে খায় তাদের বেলা ?—'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে 'ইস'লামিয়াৎ প্রসংগের ৫নং এবং 'জবাব [১] এর তৃতীয় প্রবন্ধে' 'রুহ' পুনঃ দেখুন।

ইছরাফিলের ছুর বা বাতাসের শক্তি অমনি প্রকাশে সুর-ময়, নৃত্য-দোদুল। এমনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সবই ছন্দময়, গতিশক্তি সম্পন্ন, নৃত্য-দোদুল সুর-ময় তা বোঝাতেই এতো কথা বলা। গোটা ছায়াপথ গুলোই তো অসংখ্য সূর্য (নক্ষত্র) গ্রহ উপগ্রহ উল্কা, ধূমকেতু গ্যাস প্রভৃতি নিয়ে ঘূরপাক খাচ্ছে অর্থাৎ নাচ্ছে, অবশ্য সে প্রবুদ্ধি সম্পূর্ণ দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাপার এবং দেখুন পুনঃ প্রথম প্রবন্ধ জিজ্ঞাসার 'বিজ্ঞান—বিশ্ব-গোলক' প্রসংগ, আর ঐ জবাব [১] এর প্রথম প্রবন্ধ (সৃষ্টি রহস্য)।

কাজেই গান-বাজনা চর্চা, নৃত্য-কলা নির্দোষ না হলে কোরআন কালামে ঐ রকম বিভিন্ন ধরনের সুর-ব্যঞ্জনা ও নৃত্য ছন্দোময়তার কথা উল্লেখই থাকতো না। আর প্রকৃতির মতো আল্‌কোরআনও তো নৃত্য-দোদুল, ছন্দোময়, গতিশীল সুর-প্রধান। সুতরাং স্রষ্টার সৃষ্টি যখন এই, কথা যখন ঐ, তখন তার বিরুদ্ধে কোন দলিল প্রমাণ উত্থাপন করাই তো নিরর্থক বুদ্ধি খরচ করা, নেহায়েৎ বোকামী ছাড়া আর কি !

কবি

তবু, যুক্তির চেয়ে, সত্যের চেয়ে অনেক সময়ে আমাদের জেদই দেখা দেয় বড়ো হয়ে, মুখের জোরে এবং তাতে সফলকাম না হলে গায়ের জোরে জিতবার জন্য। আর তার স্বপক্ষে তখন অন্য ধরনের সেই সাড়ে তের শত বৎসরের পুরনো সাময়িক চাহিদার কোরআন-আয়াত পাল্টা জবাব হিসাবে পেশ করতে বাঁধে না, যথা ;

و الشعراء يتبعهم الغاون - الم تر انهم فى كل واديهيمون - وانهم يقولون مالا يفعلون -

অশ্‌ শোয়ারায়ু ইয়াত্তাবেয়োহুমুল গা'ভুন—আ লাম তারা আন্না হুম ফিকুল্লে ওয়াদেঁইয়াহিমুন অ আন্নাহুম ইয়াকুলুনা মা লা ইয়াফ্‌আলুন

আর এই কবিদের অনুসরন করে বিপথগামীরা, তুমি কি দেখোনা তারা উপত্যকায় উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় মাথা ঘুলিয়ে এবং তারা যা বলে তা তারা করে না।—শোয়ারা ২২৪-২২৬।

শানে নজুল হচ্ছেঃ কোরআন আয়াতের বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব হিসাবে একদল সমসাময়িক কবি মিথ্যা এবং কুৎসামূলক কবিতা লিখে এবং তাদের সাংগপাংগদের মারফত তা ছড়িয়ে কোরআন-আয়াতের সত্যকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল, সেই ধরনের সেই জমানার কাফের কবি ও তাদের কুফরি কালাম-ভরা কবিতা সম্পর্কেই প্রতিবাদ হিসাবে ঐ আয়াত নাজেল। 'এবং তারা যা বলে তা তারা করে না' কথার

তাৎপর্যই হলো রসুলের (স) মারফত কোরআন-আয়াত নাজেল ও প্রচারিত হলেও এবং তার ভাব ভাষা বহুল কাব্য-মণ্ডিত সংগীতময় হলেও তা রসুলের (স) জীবনে ছিলো কর্ম-প্রেরণারও উৎস, রসুলের কথা ও কাজ ছিলো এভাবে পরস্পর জড়িত ও পরিপূরক। কিন্তু সমসাময়িক ঐ কাফের কবিদের কথা ও কাজ তা ছিলো না। তবু ব্যাপক ভাবে সত্যিকার কোন কবি ও কাব্য-সাহিত্যকে আদৌ নিন্দা করা হয়নি, কিংবা তা পরিহার করার কথাও উঠে না, কারণ, এর পরক্ষণেই আছে :

الا الذين امنوا و عملوا الصلحت و ذكروا الله كثيرا و انتصروا من بعد ما ظلموا و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون

ইল্লাল্লাজিনা আমানু অ আমেলুচ্ছালেহাতে অ জাকারুল্লাহা কাছিরাঁও অ আনতাছারু মিম বা'দে মা জুলেমু—অছাইয়া'লামু আল্লাজিনা জালামু আইয়া মুন্‌ক্বালাবেঁ ইয়ানক্বালেবুন

কিন্তু ঐ সকল কবি ও তাদের দলবল ব্যতীত যাঁরা ঈমান রাখে, সৎকার্য করে, আল্লাহর জেকের (ফেকের) করে প্রচুর, এবং কেবল উৎপীড়িত হলেই আত্মরক্ষা করে [সুতরাং অকারণ অস্ত্র ধারন করা, জেহাদ করাও নিষেধ] এবং যারা উৎপীড়ন করে তারা শিগ্‌গিরই জানতে পারবে তাদের কি পরিবর্তন ঘটে।—ঐ ২২৭।

সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে' কাফেরদের কপালে ঐ পরিবর্তন (প্রতিক্রিয়া) ঘটেছিল। মক্কা, মদিনা ও ক্রমে সমগ্র জজিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) বিজিত হয়েছিল। অত্যাচারীরা অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। সে দেশের অধিকাংশ অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছিল এবং এই বিজয়-বাহিনীর মধ্যে অনেক সত্যপন্থী কবি, সাহিত্যিক ও তাদের দলবল বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। ফলে, বিজয় লাভ আল্লাহর ইচ্ছায় অতি দ্রুত সম্ভবপর হয়েছিল। যা হোক সমসাময়িক ঘটনা যা-ই হোক তাকে সর্বকালীন দলিল হিসাবে পেশ করা যায় না, অসিদ্ধ।

শিল্প-সংস্কৃতির স্বপক্ষে অমন সুস্পষ্ট কোরআন-আয়াত থাকা সত্তেও যদি কেউ হাদিছ খাড়া করেন, তা হলে বুঝতে হবে, হয় ঐ হাদিছ বানানো, জাল, না হয় মিথ্যা ও অশ্লীল কথাবার্তার বিরুদ্ধে হাদিছ বলার মতো অশ্লীল গান-বাজনা, নৃত্য-কলার বিপক্ষে, রছুল (স) কোন কোন হাদিছ বলে' থাকলে তা-ই সর্বত্র সকল গান-বাজনা ও নৃত্য-কলার বিরুদ্ধে অকারণ এখনো কোন কোন সময়ে টেনে আনা হচ্ছে।

ঐ রকম কুন্দুলে মছলা নাকচ। তার কারণ দুই ঃ

(১) পুনঃ ছহি হাদিছ ঃ

যদি আমার নামে প্রচলিত প্রচারিত কোন হাদিছের—পরবর্তী কালে কোরআন-কালামের সংগে ঐক্য না হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে ও-কথা আমার নয়' কিংবা আমার কথার বিকৃতি মাত্র, সেক্ষেত্রে কোরআনের বাণীই গ্রহণ কর্তে হবে, আমার কথা নামে কথিত মিথ্যা কিংবা আমার কথার বিকৃতি বর্জন করতে হবে।— ইবনে আছাকার, ইবনে ওমর।

(২) বোজর্গানে দীন

সুর করে' মৌলুদ শরীফ পাঠ, সুরেলা ওয়াজ-নছিহত তা'হলে জায়েজ হয় কী করে? রুমী (রঃ) হাফিজ (রঃ), শেখ সাদী (র) প্রভৃতি বোজর্গানেদীনের গজল গান, কাছিদা, মসনভি প্রভৃতি অপর বোজর্গরাও তো গেয়ে এসেছেন, শুনে এসেছেন, গেয়ে থাকেন, শুনে থাকেন, তা' এতোকাল চলে এলো কী করে, চল্ছে কেন? বলা হবে গজল, কাছিদা, মসনভি দূরস্ত, গান দুরস্ত নয়। তা হলে আরবী মায়ুন দুরস্ত, আর বাংলা জল, পানি, কি ইংরেজী ওয়াটার (water) দুরস্ত নয়? আসলে এতো বুঝবার ভুল, প্রকৃত নিরপেক্ষ বিজ্ঞ বিচারকের বিচারে রায় হবে তো তা-ই। তা না হলে সুর করে কোরআন তেলাওত এবং কবিতা আবৃত্তিও তো হারাম হয়ে যায়। কারণ,

সর্বত্রই তো সুর, কেবল টান কম বেশী, কি তানের ওজনে পার্থক্য* তাতে কী! কারণ, বাজারে ঘটঘটি, গাড়ু, বদনা—জিনিসতো একই—ঐ পানির পাত্র, কেবল বানানোর কায়দা-কানুনে, ফলে আকৃতিতে পার্থক্য, তারতম্য, তাই বিভিন্ন নাম।

উপরোক্ত ধরনের গজল-গান, কাছিদা, মসনভিই বাজনা-যোগে কাওয়ালী রূপ নিয়েছে। সেই রকম ভালো কবিতা, কি কাওয়ালী গজল-গান, মসনভি, কাছিদার সুস্পষ্ট নিদর্শন নির্দেশ এভাবে পাওয়া যায়ঃ

فبشر عبد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه - اولئک الذين هدىهم الله و اولئک هم اولو الالباب -

ফাবাশ্‌শের এবাদেল্লাজিনা ইয়াছতামেয়ূনাল কাওলা ফাইয়াত্তাবেয়ূনা আহ্‌ছানাহু—উলায়েকা আল্লাজিনা হাদাহুমুল্লাহু অ উলায়েকা হুম উলুল্‌আল্‌বাব

খোশখবর দাও ঐ সকল আবেদকে (সাধককে) যারা কওল (কথা) শুনে থাকেন (ইয়াছতামেউনা), আর তার মধ্যকার উত্তমটির অনুসরন করেন। ঐ সকল লোকই তাঁরা যাঁদিগকে আল্লাহ্‌ হেদায়েৎ (সৎপথ প্রদর্শন) করেছেন, আর তাঁরাই জ্ঞানবান।— জোমার ১৭, ১৮।

কোরআনের কওল বা কথা-কালামের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম কী? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কোরআনের আয়াতের মধ্যেও ক্রমবিকাশ আছে, আর সে সম্পর্কে আমরা হাদিছ উত্থাপিত করেছি প্রথম প্রবন্ধ 'জিজ্ঞাসায়' 'বিবর্তন—মানব' প্রসংগে। কাজেই উচ্চ মননশীলতা অর্থাৎ কালচার—সংস্কৃতি—সাব্যস্ত হয় যে-সব আয়াত মারফত—সেই দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা-বিষয়ক আয়াতই ক্রমবিকশিত

---

* বিভিন্ন রকম মোখারেজ আদায়ে কারীয়ানা কোরআন-তেলাওত শুনলেও তা বোঝা যায়—কী সুন্দর সুর। আর আরবীর মতো উর্দু, পারশী কবিতা আবৃত্তিও তো ঐ সুরে অর্থাৎ সংগীতে।

বিবর্তিত পর্যায়ের; তা-ই এখানে উত্তম কওল, কালাম। আর কোরআন-কালামের ঐ ধরনের উচ্চ মননশীলতা (শিল্প-সংস্কৃতি) জ্ঞাপক বিষয়বস্তু-গুলোকেই আদিতে সুরে ছন্দে বেঁধে সৃষ্টি করা হয়েছিল কাওয়ালী গজল-গান, কাছিদা, মসনভি। আরও বিবর্তনে যেমন আরব ইরানে তেমনি নানা মুসলিম দেশে স্বভাবতঃ সৃষ্টি হয়েছে আরো নানা সুর-ছন্দের ইসলামী, দরবেশী গান-বাজনা, নৃত্যকলা।—কারণ জগৎই বিবর্তনশীল। বীজ থেকে হয় চারা গাছ, চারা গাছ থেকে হয় বিরাট মহীরুহ। কাজেই যারা ঐ উন্নত মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন ব্যাপকতঃ বৃহত্তর তাৎপর্যে তাঁরা সবাই কাওয়াল, যদিও এক ধরনের বিশেষ ইসলামী সুর ছন্দকেই বলা হয় কাওয়ালী, ঐ কাওয়ালী গায়কদের বলা হয় কাওয়াল। কাজেই যাঁরাই ঐ গজল, গান, কাসিদা মসনভী, মারফতী, মোর্শেদী প্রভৃতি সৃষ্টি করে গেছেন, নৃত্যগীত ও তার পরিপোষক সহায়ক বাজনা সৃষ্টি করে গেছেন, গেয়েছেন, বাজিয়েছেন, গেয়ে থাকেন, বাজিয়ে থাকেন, দরকারে নৃত্যগীত করে থাকেন, তাঁরাই আসলে আল্লাহ্‌র কথা-কালামের উচ্চতর মননশীল উত্তমগুলোর অনুধ্যায়ী, অনুসারক ;আর বাদ বাকী কওল-কালাম দিয়েই হয়েছিল আদিতে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, উত্তমগুলোর ভাব ও ভাষার বিবর্তনের মতো নব নব মুসলিম দেশ কালে ঐ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠক কওল কালামেরও যুগোপযোগী, দেশোপযোগী বিবর্তন ও ইজতেহাদ দেখতে পাবেন।

ঐ 'ইয়াছতামেউনা' 'ছামেউন' ধাতু (মাদ্দা) থেকে, যার অর্থ 'শোনা'। তা থেকেই আউলিয়া দরবেশরা, কাওয়ালরা যা শোনার যোগ্য সুন্দর সুরেলা স্বাভাবিক কওল-কবিতা, কথা কালাম; তাকেই এক কথায় কাওয়ালী, ইসলামী 'ছমা' নাম দিয়েছেন। মানে কী ? মানে সব রকম স্বাভাবিক সুর, সংগীত, নৃত্যগীতাদি ঐ সর্বাঙ্গীন কালচার—শিল্প-সংস্কৃতি।

প্রকৃতি, পরম প্রজ্ঞাবান প্রভু, শিল্পী

و السماء رفعها و وضع المیزان - الا تطغوا فی المیزان - و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان -

অচ্ছামায়া রাফাআহা অ অযাআল মিযান—আল্লা তাত্‌গায়ু ফিল্‌ মিযান অ আকিমুল অজ্‌না বিল্‌কিছ্‌তে অ লা তুখ্‌ছেরুল মিযান

আকাশকে তিনি ঊর্ধে বিন্যাস করেছেন এবং সর্বত্র মিজান—ব্যাপকতঃ ছন্দ, সুর, তাল-মান, পরিমাপ—সব ঠিক করে' দিয়েছেন [তাতে তিনি কোন প্রকার হেরফের করেননি] (যেন) তোমরাও হেরফের না করো। তোমরা তোমাদের ওজন—ব্যাপকত ঐ মাপ—ছন্দ, সুর, তালমান—ঠিক রেখো, কমতি করো না [কোন রকম ছন্দ পতন ঘটিয়ো না]।—রহমান ৭,৮,৯।

لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار - و کل فی فلکی یسبحون -

লাশ্‌শাম্‌ছো ইয়াম বাগি লাহা আন তুদরেকাল কামারা অলাল্লাইলো ছাবেকোননাহারে—অ কুল্লো ফি ফালাকে ইয়াছ্‌বাহুন

চাঁদকে সূর্য পার হয়ে যায় না [ঐ মীজান, চাঁদ ও সূর্যের সীমায় এসে পড়তে পারে না] দিনও রাতকে এসে ধরে না (ঐ বিভিন্ন ওজন), সব-কিছু শূন্যমণ্ডলে [যার যার পথে নিয়ম নিগড়ে] সাঁতরে বেড়াচ্ছে।—ইয়াছিন ৪০।

নিয়ম শব্দটা ঐ সব আয়াতে না থাকলেও পরিস্কার বোঝা যায় আল্লাহ্‌র নিয়ম-নিগড় মেনেই যে মহাশূন্যমণ্ডলে সবকিছু চলছে তা-ই শিক্ষা দেয়াই ঐ সব আয়াত এবং আরো এরূপ অসংখ্য আয়াতের লক্ষ্য। আর নিয়ম মানেই এক একটা বিশেষ ছন্দ, সুর, তাল-মান। সৈনিকদের চলার গতিতেও তা' বেশ পরিস্কার ফুটে উঠে। অন্তরীক্ষে পরস্পর আকর্ষণের মহা-আকর্ষণজাত আয়তক্ষেত্রে চলা আবার এমন যে তা' এক প্রকার যৌথ নৃত্য। পাক খেতে খেতে দরবেশী নৃত্য।

সুতরাং সব মিলে মিশে আল্লাহ্‌র প্রকৃতি থেকেই যে মহা নৃত্যগীত,- ছায়া ছবি, নাটক নভেল, চিত্রকলা প্রভৃতি এসেছে তা কি আরো বুঝিয়ে বলতে হবে ?

আল্লাহ্‌ হলেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা; তা থেকে মানবাত্মা মূলতঃ কী নিয়ে এসেছে ?

فطرت الله التى فطر الناس عليها

ফেতরাতাল্লাহে আল্লাতি ফাতারা ন্নাছা আলাইহা

আল্লাহর প্রকৃতি যার থেকে মানব-প্রকৃতি উদ্ভুত।—রুম ৩০।

এখন, পরমাত্মার সৃষ্টি-প্রতিভা-প্রকৃতি থেকে আগত মানব-আত্মা-প্রতিভা-প্রকৃতিতে যে গুণ, জ্ঞান, শান তা আসলে কার প্রকাশ ? বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে রিরাট বিপুল অফুরন্ত ঐ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি তারই ছোটখাট প্রকাশ নয় কি ? পরমাত্মার ধর্ম যদি ঐ অফুরন্ত সৃষ্টি-কৃষ্টি তাহলে, তার থেকে আগত আত্মার আসল আদত ধর্মও তো এই গুণ, জ্ঞান, শান সৃষ্টি—এক কথায় বলুন সংস্কৃতি (কৃষ্টি—কালচার)। এখন বিচার করুন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ কবিরা (মহা পাপ) না, গোনাহ ছগিরা (ছোটখাট পাপ) ?

তুলবেন অশ্লীলতার কথা। সাহিত্যে সুরুচির অভাব হতে পারে, চিত্রকলা, নৃত্যগীতে হতে পারে। কিন্তু তা কি এই গুণকর্মগুলোর দোষ ? না ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত কোন সংঘের দোষ ? অশ্লীল, মিথ্যা কথা হারাম বলে কি মানুষের মনের ভাব-প্রকাশক সব কথা, হাবভাবকে হারাম ঘোষণা করবেন ? আপনার হাত পা কাউকে আঘাতের অস্ত্র হতে পারে, মস্তিষ্ক কারো সর্বনাশের পরিকল্পনা করতে পারে, সে জন্য কি আপনার একান্ত প্রয়োজনীয়, অবিচ্ছেদ্য ঐ অংগ-প্রত্যংগ ও মস্তিষ্ক বাদ দেবার কথা চিন্তা করতে পারেন ? কিংবা কেটে ছেটে বাদ দিলে কি বাঁচবেন ? ব্যবহার দোষে ভালো জিনিসও খারাপ হতে পারে, প্রয়োজনীয় জিনিসও ক্ষতিকর হতে পারে। সে কার দোষ ?

সে খারাপ, ক্ষতিজনক পথ ত্যাগ করে ওদের—ঐ গুণ-কর্মগুলোকে —সঠিক, সুশীল, সুশ্লীল পথে চালান, ঐ গুণকর্মগুলোই, জ্ঞানকর্মগুলোই হবে আপনার আত্মার আহার এবং আসল আদত ধর্ম। অতএব আপনার জীবনের ইহ-পরকালীন উন্নতির, প্রগতির, পরিণতির প্রধান প্রধান অবলম্বন :

আর অশ্লীলতা মূলতঃ কী ? তার বিচারের আরো অনেক দিক আছে। কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল, কতো দূর শ্লীল, কতোদূর অশ্লীল এ বিচার নিয়ে যৌন বিজ্ঞান বিব্রত। কারণ দেশ, কাল, সমাজ এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। সুতরাং সহসা কোন কিছু আচরণ অশ্লীল ঘোষণা করবার পূর্বে ঐ দেশ, কাল ও সমাজ বিবেচ্য ; আন্তর্জাতিক যৌন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভংগীতে বিচার-বিবেচনা করারও যথেষ্ট দরকার আছে। নতুবা হবে ওবিষয়ে অপোগণ্ডতা, অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান ও প্রহসন। ফলে দেখতে হবে, বিবেচনা করতে হবে দেশাচার, সেই সমাজ নির্ধারিত সীমা, ব্যক্তিগত কোন আচরণে অপরের বাস্তবিক কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় কিনা, না, কেবল গতানুগতিক মোহে পড়ে অশ্লীল, অশ্লীল চিৎকার করা হচ্ছে, তাও দেখতে হবে। আবার একজনের কাছে যা অশ্লীল, আর একজনের কাছে তা অশ্লীল মনে নাও হতে পারে। কারণ, মানুষের সৌন্দর্য-বুদ্ধি (aesthetic sense) বিভিন্ন জনে জনে বিভিন্ন রকম। একজনের কাছে যা অশ্লীল, জঘন্য, আর একজনের কাছে হয়তো তা-ই নিছক সৌন্দর্য উপভোগের বিষয়-বস্তু। যে বিবসন চিত্রকলা এদেশে অবহেলিত, কি অপকর্ম বলে' বিবেচিত হতে পারে, সেই গ্রীক আর্ট, রোমান আর্ট (ভাস্কর্য, চিত্রকলা) সৌন্দর্য-বুদ্ধি-দীপ্ত লোকের কাছে, সমঝদারের কাছে মনে হবে, বিবেচিত হবে একান্ত অত্যাবশ্যক জীবন-বোধ, জীবন-বাদ, জীবন-শিল্প। কেবল দরকার উন্নত রুচির অনুশীলন, বিবর্তন, আর শিল্পীর দৃষ্টিভংগী, গাম্ভীর্য, গভীরতা এবং নিছক সৌন্দর্য স্পষ্টির ক্ষমতা, সূক্ষ্ম শিল্পবোধ।

এইভাবে কালে কালে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে জনে জনে—আর দশটা দিকের মতো—যৌন-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি পরিশীলনে—মানুষের যৌন দিকটার শ্লীল অশ্লীল ধারণাও রূপ বদলাতে বাধ্য। মুৎফারকা কথা, যে দেশে যে সমাজে বাস কর্‌ছেন, যতোদিন যতোটুকু যৌন আবেদন, আচরন প্রকাশ সেই দেশে, সেই সমাজে শ্লীল বলে' বিবেচিত হচ্ছে ততোদিন ততোটুকু দেশাচার, সমাজ-ব্যবস্থা মেনে, কিংবা যৌন আবেদন নিবেদনের মতো স্থূল দিকটার ঊর্ধে উঠে সবকিছু শিল্পকলাই চর্চা করে যান—এই আপনাদের কাছে আমাদের আপাতঃ আবেদন * তথাপি কিছুতেই শিল্প কলা চর্চা বাদ দিতে পারেন না * সেই চিন্তাই কোন ক্রমে সত্যিকার মুসলিম হিসাবেই জায়েজ নয়, করতেই পারেন না। কারণ ইতি পূর্বেই দেখেছেন এ সমাজের পথিকৃৎ আল-কোরআনই এক মহা-গুণ-জ্ঞান-কর্ম-ভাণ্ডার। সেই সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প-কলার স্রষ্টা এবং বিশ্ব-সাহিত্য দর্শন, শিল্প-কলা-স্রষ্টা তার সুপরিচয়, সঠিক সংজ্ঞা দিচ্ছেন এইভাবে ঃ

---

* * গুন, জ্ঞান কর্মে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা হয়তো সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়না, তেমন গুণী, জ্ঞানী হয়তো সকলে নন। কিন্তু মানুষ মাত্রই ওতে কমবেশী উদবুদ্ধ হন, আনন্দিত হন, সে স্বভাব ধর্ম। সে স্বভাব ধর্ম বাদ দিতে পারেন না, তাতে আত্মারই ক্ষতি। সুতরাং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভবপর না হোক, ঐ রূপ অনুষ্ঠানে যোগ দান করে' তো পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সে দিক দিয়েও কোন সুন্দর অনুষ্ঠান আত্মার কম উপকারক নয়। এভাবে যেমন কোন করুণ কাহিনীতে (ট্রাজেডিতে) চোখের জলের মাধ্যমে হয় আত্মারই অভিব্যক্তি, তেমনি কোন সুখকর কাহিনীতেও (কমেডিতে) হয় আত্মার উন্নতি। আসলে ট্রাজেডি ও আমাদের আত্মায় বেদনার অনুভূতি সৃষ্টি করে' দেয় অতি-আনন্দ। এ জন্য এই অবদান যুগে যুগে কমেডির চেয়ে বেশী কদর পেয়ে বেচে বর্তে আছে।

هو الله الخالق البری المصور له الاسماء الحسنی - يسبح له ما فی السموات و الارض و هو العزيز الحكيم -

হু আল্লাহুল খালেক্কুল বারিয়ুল মুছাব্বেরু লাহুল আছমায়ুল হুছনা ইয়ুছাব্বেহু লাহু মাফিচ্ছামাওয়াতে অল আরদ অহুয়াল আজীজুল হাকিম।

তিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী! সর্বাংগ সুন্দর (সর্ব সাহিত্য শিল্প কলা সংস্কৃতি সাধক) সুনাম সব তাঁরই (আল্লার খলিফা বা প্রতিনিধি মানুষের ঐ ধরণের গুণ-জ্ঞান-কর্ম-শক্তি আবার এসেছে কোত্থেকে? মূলতঃ স্রষ্টার থেকেই তার সৃষ্ট মানুষে তাঁরই গুণ-কর্ম জ্ঞান কর্ম-শক্তি ও তার প্রকাশ) আছমান জমীনস্থ সব কিছু তাঁরি প্রশংসা গুণ গান করে। আছমান জমীনের সব কিছু তারি ঐ সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন শিল্প-কলা-সংস্কৃতিই অর্থাৎ ঐ গুণ-কর্ম জ্ঞান-কর্মগুলোই প্রকাশ করে চলেছে বস্তুতঃ তিনি প্রবল-প্রতাপ (মহাগুণী) এবং পরম জ্ঞানী (সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক)!—হাশর ২৪।

ব্যাখ্যা (তফসির) এখন—এই উদ্‌বর্তিত, বিবর্তিত জমানায়—আর বিবর্তনের সেই অংকুর উদগমের জমানার সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত, কিংবা কল্পিত কিস্‌সা-কাহিনা-গ্রস্ত রাখতে পারেন না, এবং আসল সত্য যে এই, আর এভাবে উদঘাটিত হয়ে চলেছে, চলতে থাকবে তা-ও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না, কিংবা পারবেন না। সুতরাং মিছেমিছি সাহিত্য শিল্পকলা না বুঝে, দর্শন-বিজ্ঞান না পড়ে, এ সবের উৎস সন্ধান না করে', না চিনে—সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ফতোয়া টতোয়া প্রকাশের কী মূল্যমান এখনো আছে এবং আরো বিবর্তিত জমানা সমুহে থাকবে, চিন্তা করুন।

সোলায়মান (আ), আঁ হযরত (স), পূর্বাপর

يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب و قدور رسيت -

ইয়ামালুনা লাহু মা ইয়াশায়ু মেম্মাহারিবা অ তামাছিলা অ জেফানেন কাল জাওয়াবে অ ক্কুদুরের রাছিয়াত

তারা (সেই জমানার শিল্পীরা, বিজ্ঞানীরা) বানাতো তাঁর (হযরত সোলায়মানের) জন্য যা কিছু তিনি চাইতেন ঃ বড়ো বড়ো দালান (স্থাপত্য শিল্প), মূর্তি (তামাছিল—ছায়া ছবি ছুরত—সাদৃশ্য, ভাস্কর্য-শিল্প), চৌবাচ্চার মতো বড়ো বড়ো থালা বাসন (সেই জমানায় বহু লোক হয়তো একত্রে তা থেকে খানাপিনা কর্তো) আর মজবুত ডেগ।—ছাবা—১৩।

সুতরাং দেব-দেবী-জ্ঞানে পূজা-অর্চনার জন্য না হলে ঐ তামাছিল—ছায়া ছবি ছুরত—চিত্র কলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার সুকুমার শিল্প কলা (Fine Arts) আল্‌কোরআন থেকেই সম্পূর্ণ জায়েজ কালচার (শিল্প সংস্কৃতি) প্রমাণ হয়ে যায়, সাব্যস্ত হয়ে যায়। কী করবেন ? হয়তো বলবেন হযরত সোলায়মান পয়গাম্বরের জমানায়—জায়েজ ছিল শেষ পয়গাম্বরের আমলে না জায়েজ হয়ে গেছে। কিন্তু এই রকম বিচার ভুল তথ্যের উপর খাড়া করা হয়েছে। কারণ, ঐ সব জমানায়ই ছবি-ছুরত-পূজাদির প্রচলন ছিলো বেশী। সেই সব জমানায় যদি ঐ শিল্প-সংস্কৃতি নাজায়েজ না থেকে থাকে, তবে তা এই আখেরী জমানায়—দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্প সংস্কৃতির জমানায় নাজায়েজ হবে কোন্ দুঃখে ? কোন্ আইনে ? বিশেষতঃ নাজায়েজ সৃষ্টিকৃষ্টির এতো গুণগানই বা আল্ কোরআনে আল্লাহ এতো সুরে ছন্দে করলেন কোন্ বিচারে ? এবং নিজেকেই বা মহাশিল্পী সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে জাহির করলেন কেন, পরিচয় দিলেন কেন ? হাদিছের দোহাইও এ সকল গুণ-কর্ম, জ্ঞান-কর্ম ক্ষেত্রে অচল ! কারণ, পূর্বেই দেখেছেন কোরআনের সিদ্ধান্তের বিপরীত হাদিছ স্বয়ং রছুলুল্লাই (স) তাঁর আসল হাদিস নয় বলে' নাকচ ঘোষণা করে গেছেন [জবাব (১) এর প্রথম প্রবন্ধ 'সৃষ্টি রহস্যে' 'হাদিছে কিয়ামত' প্রসংগও পুনঃ দেখুন]

বস্তুতঃ বিচারের মাপকাঠি এ জমানায় কেন, কোন জমানায়ই সংকীর্ণ রাখা ছিল নিষিদ্ধ।

(i) و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک -

অ লাকাদ আরছালনা রুছুলা মেন কাবলিক মেনহুম মান কাছাছনা আলাইকা অ মেন হুম ম্যাল্লাম নাক্কছুছ আলাইকা

তোমার (হযরত মোহাম্মদের সঃ) পূর্বে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছি, তাদের কতকের কথা তোমার নিকট বলেছি, কতকের কথা বলিনি ।— মোমীন ৭৮, নেছা ১৭৪ ।

(ii) قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبک باذن الله مصدقا لما بين يديه و هدى و بشرى للمؤ منين -

কুল মান কানা আদুব্ব্ল লেজেবরিলা ফাইন্নাহু নাজ্জালাহু আলা কালবিকা বে-ইজনিল্লাহে দুছাদ্দেকাল্লেমা বাইনা ইয়াদাইহে অ হুদা অ বুশ্‌রা লেল মোমেনিন

বল (হে মোহাম্মদ (সঃ)) জেব্রাইলের শত্রু কে হবে ? সে তো আল্লাহরই হুকুমে এ-কে (কোরআন) তোমার দীলে নাজেল করেছেন, পূর্বে যা নাযেল হয়েছে তার (সেই বেদ, বেদান্ত, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, তৌরাত, জাবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতির) সত্যতার সাক্ষী স্বরূপ এবং বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ স্বরূপ ।—বাকারা ৯৭ ।

(iii) قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الاالله و لا نشرک به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله - فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

কুল ইয়া আহলাল কেতাবে তাআলাও এলা কালেমাতিন ছাওয়া-য়েম বাইনানা অ বাইনাকুম আল্লা নাআবুদা ইল্লাল্লা অলা নুশরেকা বিহি শাইয়া অ লা ইয়াত্তাখেজা বাদুনা বাদান আরবাবা মেন দুনিল্লাহ ফাইন তাওয়াল্লাও ফাক্কুলুশহাদু বে আন্না মুছলেমুন

বল হে কেতাবী লোক ? এসো তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে যা সাধারণ তার দিকে, (তা কী ?) ঃ আমরা অর্চনা করবো না আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে, তাঁর শরীক (সমকক্ষ, সমতুল্য) বানাবো না

আর কাউকে (সেই লাত, মানাত্ ওজ্জা প্রভৃতি পুতুলদের)। আর, তাদের কাউকে প্রভু বানাবোনা আল্লাহকে বাদ দিয়ে।--- এর পরেও যদি তারা মুখ ফিরায় তবে বলো তোমরাই সাক্ষী 'রও আমরা মুসলিম।— আলেইমরান ৬৩।

সুতরাং ঐ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি ভেজাল বিকৃতিবাদ সর্ব সত্য-সুন্দর শিব (হক-নূর-হাছনাত) কালচারই মূলতঃ ব্যাপকতঃ ইস্‌লাম, আর তার অনুসারী অনুগামীরাই মূলতঃ ব্যাপকতঃ মুসলিম।

এ হিসাবে প্রাচীন শাহনামা, ইউছুফ-জোলায়খা, হাতেমতায়ী, লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক উপকথা, কল্প-কথা নিয়ে কতো যে নাটক নভেল, নৃত্য নাট্য, সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে, হবে—তার ইয়ত্তা কী! অপর দিকে, কারবালাকাহিনী, আল্‌ফ-লায়লা প্রভৃতি প্রচুর নাট্যধর্মী, এবং সেগুলি নিয়ে প্রাচীন কাল হতে জারী, সারি, নাটক (যাত্রাভিনয়—প্রাচ্যের প্রাচীন গীতাভিনয়) চলে আস্‌ছে। সুতরাং ইস্‌লামে অন্য শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি থাকলেও নাটক নেই এ কথা বলা কতোদূর সত্য, না সত্যের অপলাপ, তা বিদগ্ধ পাঠক পাঠিকাদের বিচার করে' দেখতে অনুরোধ করি। আবার, সামাজিক নাটক নভেল প্রভৃতি সব দেশেই ঊনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর অবদান। ঐ ছোট গল্প আরো পরের। সিনেমা শিল্পতো মাত্র সেদিনকার। সুতরাং মুসলমান সমাজ-চিত্র নিয়েও অনিবার্য যুগ-ধর্মে ঐ সকল শিল্প-কলা যে সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে, হবে, তাতো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।

উপসংহার

তা হলে উপসংহারে ফিরুন এর মূল তাৎপর্যের দিকে। তা কী? বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টিই আসলে দর্শন বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যুগ যুগ চলেছে তার নব নব অনুশীলন, উদ্ভাবন, আবিষ্কার। অপর পক্ষে সাহিত্য শিল্প-কলা সে আবার কোন্ উৎস-মুখ হতে উচ্ছ্বসিত?

তাকান বিরাট বিপুল প্রকৃতির দিকে, অজস্র সাহিত্য শিল্প-কলার সে নয় কি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পট-ভূমিকার পর পট-ভূমিকা ? আর নাট্য কলা ? সংসার থেকে চোখ ফিরান বিশ্বের আনাচে কানাচে, রঙমঞ্চের পর রঙমঞ্চে কী অপরূপ স্থানকাল বিস্তৃতির নাটকের পর নাটক হচ্ছে অভিনীত ! আর সংগীত ? সর্বত্রই ছন্দ, সুর। অবশেষে নৃত্যকলা ? যেমন ঐ নাটকের পর নাটক অভিনয়ে, তেমনি সৃষ্টির পরতে পরতে নৃত্যরস এবং লাস্যলীলা।

সুতরাং প্রাচীন আরবীয় ইরাণীয় ও অপর প্রাচীন মুসলিম দেশ ও সমাজে প্রচলিত কালচারে, সংস্কৃতিতে নাটক, সুকুমার শিল্পকলা, দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি কম আছে, কি বেশী আছে, কিংবা নেই এ সব কথা অবান্তর কি না, বুঝে দেখুন। অতীতের মানুষ বিশ্ব-সৃষ্টি রহস্য ও কোরআন হাদিছ, কি অপর ধর্ম-গ্রন্থেরও আসল উদ্দেশ্য ও মননশীলতা না বুঝে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করে' থাকলে চিরকাল সে ভুলের জের চল্‌বে এ কোন কাযের কথা নয়, সংশোধন সংস্কার করতে হবে যে !

তা হলেই আসল ইস্‌লাম বিচার হবে সঠিক কিভাবে, কোন্ পথে ?

এভাবে, এই পথে ঃ--ওর বহিরংগ বা শুরু **শরিয়ত** (১)--ব্যবহারিক রূপ, বিশেষ করে প্রাথমিক ধর্মবোধ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক। তাতে কী আছে না আছে তা মুসলিম সমাজ ও ইস্‌লামিক রাষ্ট্র গঠনের বেলায় গবেষণা-মূলক ও বাচনীয়। আসল স্বরূপ অন্তরংগ, তার তিন ধাপ বা স্তর—প্রথম ঐ গুণ, জ্ঞান-কর্ম অনুশীলন বা পথ-চলা **তরিকত** (২)—ওর প্রগতি **হাকিকত** (৩) এবং পরিণতিই **মারেফাত** (৪)—এ না বোঝা, না মানা পর্যন্ত যতো নিরর্থক গোলমাল, গোঁজামিল।

অবশেষে আল্ কোরআন দৃষ্টে সর্ব শিল্প সংস্কৃতির উপসংহারের উপসংহার দেই যদি এভাবে, কী দোষ আছে ?

قل امنا بالله و ما انزل علينا و ما انزل على ابزهيم و اسميل و
اسحق و يعقوب و الاسباط ما اوتى موس و عيسىٰ و النبيون من ربهم -
لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون -

কুল্ আমান্না বিল্লাহে অমা উন্জেলা আলাইনা-অমা উন্জেলা আলা ইব্রাহিমা অ ইসমাইলা অ ইছহাকা অইয়াকুবা অল আছবাতে অ মা উতিয়া মুছা অ ইছা আন্নাবীয়ুনা মের রাব্বেহিম—লা নুফাররেকু বাইনা আহাদেম মেনহুম, অ নাহনো লাহু মুছলেমুন

বলে দাও (হে মানুষ) আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি আর যা আমাদের প্রতি নাযেল হয়েছে তাতে, এবং ইব্রাহিম, এছমাইল, এছহাক, এয়াকুব, আর তাঁদের বংশধরদের উপর যা নাযেল হয়েছে তাতে, আর মুছা, ইছা এবং (সকল দেশ, কাল ও জাতির) সকল নবী তাদের প্রভূর তরফ থেকে যা পেয়েছিলেন তাতে। আমরা তাদের মধ্যকার কারো সংগে কারো পার্থক্য (দেখিনা, অতএব) করিনা, আর (এই ভাবে) আমরা তাঁর (আল্লাহ্র) ওয়াস্তে মুছলমান [আত্মার দিক দিয়ে ঐ একই স্বাভাবিক ধর্ম-কর্মে আল্লাহ্তে সোপর্দ, আত্মসমর্পিত, সেই চিরন্তন একই পরমাত্মা প্রাপ্তির সেই চিরন্তন একই আত্মার ধর্ম ইস্লাম অবলম্বী, শান্তি-শান-প্রাপ্ত]।—আলে ইমরাণ ৮৩।—

কিন্তু অন্তরে রয়েছে স্বাভাবিক উচ্ছৃংখলতা, অসভ্যতা ; কাজেই সহসা অসভ্যজনোচিত উচ্ছৃংখল যৌন আচরণে অন্তরে অনুতপ্ত হন, তাই স্বর্গ অর্থাৎ আত্মার শান্তি বিচ্যুতির রূপক। উদভ্রান্ত হয়ে এক ময়দানে গিয়ে আল্লাহর জেকেরে (গুণকর্মে) ও ফেকেরে (জ্ঞান কর্মে) এবং পরস্পর কামে থেকে নিষ্কাম প্রেম সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর দীদারে পৌঁছেন, ঐ মারেফাত হাছেল করেন, সেজন্য পরবর্তীকালে তাঁদের স্মৃতি জাগরুক ঐ ময়দানের নাম রাখা হয় আরফাত ; আবার তাঁদের সেই বনভূমে ফিরে আসেন ; ঐ মহাজ্ঞান সাফল্য সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা সেখানেই হাছেল হয়, এবং পরকালের জান্নাতের সুখ শান্তির তুল্য বলে সেই স্বর্গীয় নন্দন-কাননের নামে ঐ বন-অঞ্চলের পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয় ঐ স্মৃতি জাগরুক 'জান্নাতে আদন (এডেন বন্দর অঞ্চল)'। যেনো স্বর্গ থেকে পতনের পরে (Paradise Lost) পুনঃ স্বর্গ প্রাপ্তি (Paradise Regained) আর কি !

বয়তুল্লাহ্ও (কাবা ঘর) ঐ জেকের ফেকের উদ্দেশ্যে আদিতে তাঁরা বানিয়েছিলেন বলা হয় (যদিও তার কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি)। নুহ নবীর (আ) আমলে বন্যায় তা ভেঙেচুরে গিয়েছিল। বহু পরবর্তী কালে তাঁর বংশধর নবী ইব্রাহিম (আ) তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাইলের (আ) সহায়তায় সমবায়ে পুন তা' নির্মাণ করেন।

আদম হাওয়া (আ) ঐ বেলায়ত (আল্লাহর বন্ধুত্ব) হাছেল করে' তাঁর বংশধর সর্বসাধারণের জন্য ঐ নাফ্ছ আম্মারা-সুশাসক সুনিয়ন্ত্রক কোন নবুয়ত অর্থাৎ শুরু-সূচনার তৎকালীন সামাজিক ও তৎকালীন গোত্রীয় রাষ্ট্রিক বিধি ব্যবস্থা শরিয়ত দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রধান গোত্রীয় নবী নুহের (আ) আমলে ঐ একই কারণে শরিয়ত (নবুয়ত) দানের উল্লেখ আছে আলকোরআনে, তা জবাব [১] এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে দেখতে পেয়েছেন। পরবর্তী প্রধান গোত্রীয় নবী ইব্রাহিমের (আ) আমলে বিশেষ

করে ‘ও’ ‘এক বৈশিষ্ট্য’ মণ্ডিত হয় ‘কাবাঘর তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ)’, ‘ছাফা-মারওয়া পাহাড় ছয়ী (দৌড়)’, ‘রমী (শয়তান উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ)’, ‘মিনা বাজারে হালাল পশু কোরবানী’ এবং ‘আরফাত সম্মেলন’ প্রভৃতি আকারে ; তার আসল তাৎপর্য ঐ প্রবন্ধেই দেখুন। (১৩৪—১৪০ পৃঃ)

এখন এই নবুয়ত বা শরিয়ত বিভিন্ন দেশ কাল পরিবেশের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আত্মার আসল আদত যে-ধর্মের কথা আমরা বলেছি তা কি নানা রূপরঙময় হতে পারে ? হাঁ, হতে পারে তার বাইরের প্রকাশের ভংগীতে, পরিবেশের কারণে। কিন্তু আত্মার পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণ, সেই স্বাভাবিক গুণ জ্ঞান (জেকের-ফেকের) মৌলিক বিভিন্ন হবে কী করে ? হতে পারে না, হয়নি, হবে না কোন দিন, তা-ও ঐ প্রবন্ধে, বিশেষ করে তার পরিশিষ্টে পুনঃ দেখুন ।

কাজেই দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী পরিবর্তনশীল সামাজিক, সাম্প্রদায়িক, কখনও কখনও রাষ্ট্রিক ধর্ম-সহ আত্মার ঐ ধর্ম যে চির মানব জাতির চিরন্তন ধর্ম তা দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নামে ওর অস্তিত্ব রয়েছে। যথা ঃ শংকরাচার্যের হিন্দু ধর্ম-দর্শনে ওর নাম যথাক্রমে **ব্যবহারিক সত্য, প্রতিভাসিক সত্য, পরমার্থিক সত্য, ও এক মাত্র ব্রহ্ম সত্য** (১)। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে ও হচ্ছে **স্থূল** (পুরুষ প্রকৃতি), **প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধি**। অবশ্য অনেক পরবর্তী কালে এক শ্রেণীর হিন্দু বাউল ও মুসলিম ফকির নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থে সহজ সাধনার নামে ওর ব্যবহার করেছেন। তারা নারী পুরুষের যৌন রসকেই ‘স্থূল’ ও ওর থেকে ডিম্বানু ও শুক্রানুকীট গ্রহণ ‘প্রবর্ত’ ও সেই থেকে শক্তি

---

(১) ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত,—পৃঃ ১৫৭—১৫৮।

লাভের সাধন-কামীদের 'সাধক' ও ঐ শক্তি লাভকেই 'সিদ্ধি' বলে চালিয়েছেন (২)। যা হোক কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মেও ওর বিকৃতিটুকুই অনেক ক্ষেত্রে বিরাজ করছে, 'আসল' পৌত্তলিকতায় বা জড় পূজায় ভেসে ভেস্তে গেছে, যাচ্ছে। মুছা (আঃ), ইছার (আঃ) যথাক্রমে ইহুদী, খৃষ্টান ধর্মে ওর বাহ্যাচরণ দশ আদেশমালা (Ten Commandments) পরিপ্রেক্ষিত স্থূল ভাগ (শরিয়ত) অতিরিক্ত প্রচারণা ও নানা আকার-প্রকারে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়ের ফলে ঐ আর প্রধান ও প্রাকৃতিক স্তর ত্রয় অনুরূপ লোপ পেয়ে গেছে, যাচ্ছে।

মুছার (আঃ) দশ আদেশ মালা

হযরত মুছার (আঃ) কাছে নাজেল হয় ঐশী গ্রন্থ তৌরাত। তাতে আছে দশ আদেশমালা—Ten Commandments—তা' সেই জমানার লিখবার সরঞ্জাম সাকীনায় (দুই প্রস্তর-ফলকে) বেশ বড়ো বড়ো হরফে লিখে লিখে প্রচার করা হয় ; তা' মুলতঃ এই ঃ

১। তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে খোদা মানবে না।

২। (পূজার জন্য) খোদাই করা মূর্তি ও অনুরূপ সাদৃশ্য বানাবেনা।

৩। ঐ মূর্তির সামনে প্রণত হবেনা বা পূজা করবে না (সুতরাং পূজার কারণেই যে মূর্তি ও সাদৃশ্য বানান নিষিদ্ধ হয়েছিল তা' বোঝা যায়)।

৪। (সপ্তাহে পালনীয় বিশ্রাম ও উপাসনা দিন) ছাবাথ ভুলবে না। পবিত্র রাখবে (প্রার্থনাদির মাধ্যমে পালন করবে)।

৫। পিতা-মাতাকে মান্য করবে।

---

(২) দেখুন ঐ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তন বাদ' প্রবন্ধের 'বেলায়ত নবুয়ত' প্রসংগে ঐ সম্পর্কীয় টীকা। অপেক্ষা করুন আমার 'বাউল দর্শন' গ্রন্থের।

৬। নরহত্যা করবে না!

৭। ব্যভিচার (জেনা) করবে না।

৮। চুরি করবে না।

৯। স্বীয় প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

১০। প্রতিবেশীর পত্নী, ঘর-বাড়ী, জমি-জমা, দাস-দাসী, গৃহ-পালিত পশু ও অন্যান্য বস্তুর প্রতি লোভ করবে না।

কোরআন দৃষ্টে দেখা যায় ঐ নিয়ম শৃংখলা ভংগের অর্থাৎ অপরাধের দণ্ড ছিলো এইভাবে ঃ

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن - والجروح قصاص - فمن تصدق به فهو كفارة له - ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون -

অ কাতাব্‌না আলাইহিম ফিহা আন্নান্নাফ্‌ছা বেন্নাফ্‌ছে—অল আইনে বেল আইনে অল আন্‌ফা বেল আন্‌ফে অল উযুনা বেল উযুনে অচ্ছেন্না বেচ্ছেন্নে—অল জুরুহা কেছাচুন—ফামান তাছাদ্দাকা বিহি ফাহুআ কাফ্‌ফারাতুল লাহু—অ মাঁ লাম ইয়াহ্‌কুম বিমা আন্‌জালা ল্লাহু ফা উলায়েকা হুমু জ্জালেমুন...

আর ওতে (তৌরাতে) আদেশ দিয়েছিলাম জীবনের বিনিময়ে জীবন (প্রাণদণ্ড), চক্ষুর বদলে চক্ষু, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, ঐ সব আঘাতের ঐ বিনিময়। কিন্তু যে বিনিময় মাফ করবে অর্থাৎ বদলা ঐ প্রতিশোধ নেবে না তার জন্য হবে কাফ্‌ফারা। খোদা যা নাজেল করেছেন সেই মর্মে যারা বিচার করে না তারাই অত্যাচারী। —মাইদা ৪৫।

ফরিয়াদীর ফরিয়াদ সত্য প্রমাণিত হলে সে ঐ সব বিনিময় 'প্রতিশোধ' গ্রহন করতে পারতো কিংবা মাফ করে দিলে আসামীর

থেকে কাফ্‌ফারা অর্থাৎ মুক্তিপণ গ্রহন করে' তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিতেও পার্‌তো।

বলা বাহুল্য, ঐ সব জমানায় জেলখানা, নির্বাসন বা অন্য কোন রূপ সংশোধনাগার (Reformatory) না থাকায় ঐ বিনিময় আর স্বভাব-চোরের হাত কেটে ফেলার বিধান কোরআন মারফত প্রযোজিত হয়েছিলো, কিন্তু ঐ জেলখানা, নির্বাসন, সংশোধনাগার (Reformatory) প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়ায় ঐ আইন-কানুনের অনেক রদবদল (ইজতেহাদ) হয়েছে, আরো কতো হতে পারে, হচ্ছে, কি হবে।

প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বের প্রবর্তিত ঐ আইন-কানুন সমূহই গ্রীক ও রোমান আইন-কানুনেরও (Greek & Roman laws) ভিত্তি-ভূমি কিনা তাও পরখ করুন।

বিকৃতি

ঐ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে 'বেলায়েত-নবুয়ত' বোঝাতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি আসলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণেই 'বেলায়তের' নিগূঢ় সাধনার (esoteric এর) ব্যবহারিক, বাহ্যিক (exoteric) রূপ 'নবুয়ত' দেবার দরকার হয়েছিল। সকল ধর্মেরই ঐ মূল করনীয়—যার দ্বারা আল্লাহর দীদারে, নৈকট্যে পৌঁছা যায়, বেলায়েত (বন্ধুত্ব) হাছেল হয়—আসলে চিরন্তন, একই। কিন্তু অন্য ধর্মে তা হয়তো তলিয়ে গেছে, হারিছে গেছে। হজরত মোহাম্মদ (সঃ) পুনঃ নবুয়ত তথা শরিয়তকে মুছার (আঃ) দশ আদেশমালার ভিত্তিমূলে মোয়ামালাত ও তারি সংগে খাপ খাইয়ে আসল করণীয়, কর্তব্যের—রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা, জেকেরের—এক কথায় জেকের-ফেকেরের—নিগূঢ় সাধনা ঐ রিয়াজতের—বহিঃ রূপ প্রাথমিক এবাদত ভাগ দিয়েছেন যথাক্রমে নামাজ (আরবী ছালাত), রোজা (আরবী ছিয়াম), হজ্জ ও জাকাত। কিন্তু মাধ্যমিক ঐ চিরন্তন স্বভাব ধর্ম-সাধনা তরিকতেই (পন্থা-প্রক্রিয়া-প্রণালীতেই)

হাছেল হয়ে এসেচে যুগযুগ, এখনও হতে পারে, হয়ে থাকে মহা-বিদ্যালয়িক (উচ্চ মাধ্যমিক) হাকিকত—সত্য সব তত্ত্বজ্ঞান তথা অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি—কাশফ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়িক মহাগুণ জ্ঞান শান মারেফাত—আল্লাহর সাক্ষাৎ পরিচয়, প্রজ্ঞা, ঐ অতীন্দ্রিয় দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি তথা কাশফ কেরামত মোযেযার পরাকাষ্ঠা। এ সবের কথাই আমরা কতোবার কতোভাবেই না প্রমাণ করেচি! কিন্তু করলে কী হবে? বিকৃতিটা কোথায়, কি ভাবে, কেন, কতোদূর তা-ই বোঝাতে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হ'লো।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) পুনঃ পরিষ্কার ঐ সকল-স্তরের সন্ধান ও সাধনতত্ত্ব প্রচার করে' গেলেও প্রতীচ্যে প্রচারিত, প্রবর্তিত ঐ উপরোক্ত দুই প্রধান প্রাচীন ধর্মের খণ্ডিত রূপের অনুকরণে অনুসরণে অতি আধুনিক শিক্ষিত মুছলিম মহলের অধিকাংশ ওর সংগে মিলঝিল দেখানোর অতি আগ্রহ-বশে ঐ দুই ধর্মের অবশিষ্ট মাত্র একদিকের সংস্কার সংশোধনই ইছলাম বলে চালাতে চাচ্ছেন। মুখবন্ধ 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' উল্লেখিত আল আশারী ও ইবনে তাইমিয়া-পন্থী **ওহাবীদের** অতি-প্রভাবও সেক্ষেত্রে এবং প্রায় সর্বত্র শিক্ষিত অশিক্ষিত মহলে কার্যকরী হচ্ছে। হচ্ছে কিনা এই বই সম্পূর্ণ পড়ে' বুঝুন, আর পরবর্তী বইগুলোর অপেক্ষা করুন।

শিক্ষিত অধিকাংশ মুছলিম এবং অধিকাংশ আরবী শিক্ষিত উলেমা প্রধানতঃ তিন কারণে **ওহাবী** মতবাদ আংশিক, কি পুরোপুরি অবলম্বন করচেন। (১) **ওহাবী** মতবাদ মান্‌লে 'বাতেন এল্‌ম' বলে কোন কিছু মানার দরকার হয় না, 'শরিয়ত তথা জাহের এল্‌মই' একমাত্র ধর্ম ও ইছলাম মান্‌লে 'তরিকত' 'হকিকত', 'মারফতের' জন্য আর কারো দ্বারস্থ হতে হয় না, অপর ধর্ম তথা দর্শন বিজ্ঞানের আর ধার ধারা লাগে না। (২) যাঁদের কাছে ঐ কারণে যাওয়া লাগতো তাঁদের কেউ কেউ হয়তো জাহের এল্‌ম

ও ডিগ্রী ডিপ্লোমার দিক দিয়ে তাঁদের কাছে খাটো, অন্ততঃ তাঁদের বিচারে, সুতরাং তাঁদের এড়িয়ে থাকা যায়। (৩) স্কুল কলেজের ডিগ্রী ডিপ্লোমা কি মাদ্রাসার জমাতে উলা, কি টাইটেল ইত্যাদি পেতে শিক্ষকের দরকার হয়ে থাকলেও, 'হাকিকত' 'মারফত' শিখতে পন্থা 'তরিকতের' মোর্শেদ বা মধ্যস্থ না মানার সুবিধে এই যে ঐ জাহের এলম, ডিগ্রী ডিপ্লোমার যদৃচ্ছা গৌরব করা যায়, পণ্ডিতম্মন্য হওয়া যায়।

অবশ্য ওহাবীদের একদিকে প্রশংসনীয় কার্য রয়েছে, তা অস্বীকার করাও হবে সত্যের ও সততার সমান অপলাপ। তা হচ্ছে ইছলামের শরিয়তের রাষ্ট্র-শক্তির উদ্বোধন করে' ইংরেজ সরকারের হাত থেকে পাক-ভারতীয় ও অপর বিদেশী রাষ্ট্রের হাত থেকে অপরাপর ইছলামীয় অঞ্চলের রাষ্ট্র-শক্তি করায়ত্ত করার কোশেশ। যদিও সর্বত্র তাঁরা সফলকাম হন্‌নি তথাপি কোন ভালো উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ব্যর্থ কর্মাবলীই একেবারে ব্যর্থ নয়, বরং কবি বলেছেন:

যে নদী মরু-পথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।—রবীন্দ্রনাথ

আর বর্তমান জমানার আজাদীর মূল এ কারণেই তাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ অনুকরণ রয়েছে অতি মাত্রায়, যদিও এ জমানার স্বাধীনতা আন্দোলনে এ জমানার আলেমদের অবদান নগণ্য। তথাপি ঐ বিগত ওহাবী যোদ্ধাদের কেহ কেহ নাম করা আলেম ছিলেন বলেও এজমানার আলেমরা সাধারণভাবে এবং ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ বিশেষভাবে তাদের আকিদায় মোটামুটি বিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন।

বিকৃতি বিদূরণ

কিন্তু কোন একদিকে ভালো কার্য রয়েছে বলে' গোটা ইছলামের বিকৃতি, সংকীর্ণতা সাধনের পাপ কিছু মাত্র খাটো হয় না, বরং

প্রয়োজনে তাদের ভালো আদর্শ নেয়া ও বিকৃতি, প্রক্ষেপ বিদূরণের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে।

আর আমরা পুনঃ পুনঃ বলবো : যা হক (চির-সত্য, সত্তা) তাই নূর (চির-সুন্দর), আবার তাই হাছানাত (চির-শুভ-শিব), অতএব সব মিলেমিশে **হক্কোননূর**—চির-সুন্দর-শুভ সত্য, সত্ত্বা, আবার চির-সত্য-শুভ-সত্ত্বাময় সুন্দর—পরস্পর পরিপূরক, এক—তওহিদ—। সেই একক (তওহীদ) বিশ্বাসের পূর্ণ কার্যে পরিণতি অর্থাৎ ক্রম-বিবর্তন ও তার পরাকাষ্ঠাই তো আমরা পূর্বাপর বুঝিয়ে আসচি।

এই আসল প্রজ্ঞা-প্রাপ্ত সকল প্রকৃত বোজর্গানেদীনের অধিকার রয়েছে কোরআন হাদিছ থেকে নব যুগানুযায়ী নব ইজ্‌তেহাদ দানের, যথা :

১নং হাদিছ : তোমরা ইজ্‌তেহাদ করো (জ্ঞান-গবেষণা করে' কোরআন হাদিছ থেকে নববিধান দাও), যদি 'ঠিক সিদ্ধান্তে' পৌঁছো তবে তোমাদের জন্য ছুটো পুণ্য, আর যদি 'ভুল সিদ্ধান্তেও' পৌঁছো তবু তোমাদের জন্য এক পুণ্য।—দেখুন 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের পরিশিষ্টও।

২নং হাদিছ : তোমরা এখন এমন এক যুগে আছো, যখন যে-সব আদেশ-নির্দেশ তোমাদের দেয়া হয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগ ত্যাগ করলে তোমরা ধ্বংস হবে। কিন্তু এমন যুগ আসবে যখন এই সব আদেশ নির্দেশের দশ ভাগের এক ভাগ পালন করলে তোমরা নাজাত (মুক্তি) পাবে।

সে জমানা কি এখনও আসেনি ?

তাৎপর্য হলো : নাফ্‌ছ আম্মারা ঐ ষড়রিপু সুশাসনমূলক গুরু হিসাবে নবুয়ত বা শরিয়ত যে ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা তা দেশকাল পাত্র অনুসারে বদলায়, বদলাতে বাধ্য (ঐ ইজতেহাদ), তা বলা হয়েছে প্রথম হাদিছটিতে। আর, কালক্রমে বাহুল্য বোধে, কি অনুপযোগী, অপ্রয়োজন, অকার্যকর হওয়ায় পরিত্যক্ত হয় ওর অনেক কিছুই, হতে

বাধ্য, তা-ও ইজ্‌তেহাদ করে' নিতে হয়, তা-ই ঐ দ্বিতীয় হাদিছটিতে বলা হয়েছে। কিন্তু নাফ্‌ছ আম্মারা প্রদমন-প্রশাসনের সংগে সংগেই ওর প্রগতিমূলক চিরন্তন আত্মার চিরন্তন পরমাত্মার দিকে এগোনোর যে চিরন্তন ধর্ম-সংস্থা তরিকত বা নাফ্‌ছ লাওয়ামার (অনুতাপ প্রবণ আত্মার) ধর্ম, তার আর রদবদল কী, পরিত্যাজ্য কী? বাইরে প্রকাশ ভংগীতেই মাত্র কিছু কিছু পার্থক্য, প্রভেদ দেখা যেতে পারে, দেখা দিয়ে থাকে, তা' জবাব (১) এর তৃতীয় প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে, বিশেষ করে' তার 'পরিশিষ্টে' বিশ্লেষণ করেছি, বুঝিয়েছি, তা পুনঃ দেখুন।

আরো দেখুন ঃ

ان الصلوٰة تنهى عن الفحشاء والمنكر - ولذكر الله اكبر -

ইন্নাচ্ছালাতা তানহা আনেল ফাহ্‌শা-এ অল মোনকার অ লা-জিকরোল্লাহে আকবর ঃ

নিশ্চয়ই ছালাত (নামাজ) ফাহেশা (অশ্লীল ও অপর) বদ কায থেকে ফিরায় এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র জেকেরই সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা [এবাদত —রিয়াজত]। —আন্‌কাবুত ৪৫।

নামাজের সংগে রোজা হজ্জ জাকাত যেমন সমজড়িত, তেমনি ঐ জেকেরের সংঙ্গে ফেকের--রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা--জড়িত, এক ছাড়া আর হয়ইনা, হতেই পারেনা, তা-ও অনেকবার দেখেছেন; সুতরাং নাফ্‌ছ আম্মারা (ষড়রিপু)-সুশাসক ধর্ম-প্রণালীই যে শরিয়ত-উক্ত ঐ নামাজ রোজা—দরকারে ধনীর পক্ষে আরো ঃ হজ্জ, জাকাত—তা বলাই বাহুল্য। আর তরিকত অর্থাৎ আত্মার প্রগতির পন্থাই যে, প্রক্রিয়া প্রণালীই যে ঐ রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা এবং জেকের, এক কথায় জেকের ফেকের তা কোরআন-কালামের ঐ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, বোধে বোঝা যায়।

অবশ্য শরীয়তই একমাত্র ইস্‌লাম এবং নামাজ রোজা হজ্জ জাকাতই সর্ব শ্রেষ্ঠ, কি একমাত্র এবাদত তা বোঝাবার জন্য ঐ আয়াতের অর্থের বিকৃতি সাধন করে বলা হয়ঃ 'নামাজ ফাহেশা, বদকাম থেকে ফিরায়, আর ইহা অপেক্ষাও মহত্তম (উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজে) আল্লাহর ধ্যান।'—দেখুন মৌঃ মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের কোরানের বংগানুবাদে ঐ আয়াতের অর্থ।

কিন্তু জেকের যে ধ্যান নয়, বরং মোরাকেবা অর্থই ধ্যান তা এধরনের—মাত্র জাহের্ এল্‌ম্ শরিয়তের ভাণ্ডারীদের—জানা নেই, আর 'নামাজ (ছালাত) ফাহেশা বদকাম থেকে ফিরায় এবং জেকের সর্বশ্রেষ্ঠ—'এবং' যোগ করে ঐ জেকের-ফেকের-প্রণালী-প্রক্রিয়া যে আলাদা এবং ধর্ম-সাধনা হিসাবে সর্ব শ্রেষ্ঠ'—তা' বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তরিকতের উপরোক্ত সাধন প্রক্রিয়া-প্রণালী আলাদা আকিদা, আচরণ, অনুষ্ঠান তো বটেই, বরং তা সর্ব শ্রেষ্ঠও, এ সব বোঝানই ঐ ধরনের কোরআন কালামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাকি আরো বিশ্লেষণ করার দরকার আছে?

আছে; কারণ,

اقيموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين -

আকিমুচ্ছালাতা অ আতুজ্‌জাকাতা অ আরকায়ু মাআর্‌রাকেরিন

কায়েম করো ছালাত, আদায় করো জাকাত, আর নত কর শির তাদের সংগে যারা শির নত করে (আত্ম সমর্পন করে)।—বাকারা ৪৩।

ছালাত (নামায) ধরলাম সকলের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত, কিন্তু একই আয়াতের কতক অংশ ঐ 'আদায় করো যাকাত' মাত্র ধনী-দিগের জন্য কেন? এতে করে কি একই আয়াতের সংগতি ও সামঞ্জস্য ঠিক র'লো? ঐ যাকাত মাত্র ধনীদিগের জন্যই হয়ে থাক্‌লে তা সকলের জন্য আদিষ্ট নামাজের সংগে অসংগতভাবে অসমঞ্জস-ভাবে ওত-প্রোত জড়িত না করে' আলাদা আয়াতেই ঐ আদেশ প্রদান করা

উচিত ছিলো। তা হলেই বোঝা যায় আল্লাহ্ ভুল করেন নি, আল্‌কোরানেও ভুল করে ঐ অসংগতি, অসামঞ্জস্য ঘটানো হয়নি, বরং ছালাত যেমন ব্যাপক অর্থে জেকের ফেকেরও বটে [দেখুন জবাব (১) এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তন বাদ' ১২৮-১৫৫ পৃষ্ঠা] তেমনি যাকাতেরও সার্বজনীনতা বিশ্বজনীনতা আছে, তা কী? তা হচ্ছে মালের জাকাত দিয়ে ধনীদের মালমাত্তা পাক ছাফ করার মতো মনের জাকাত-যোগে অর্থাৎ পাক-পবিত্রতা-কারক জেকের-যোগে মনের পবিত্রতা সাধন করা। নতুবা গরীবরা এমন কোন পাপ (গোনাহ্) করেনি, অপরাধ (কসুর) করেনি যে যাকাতের ফরজ-ফজিলত হতে চিরদিন তারা বঞ্চিত থাক্‌বে, ধনীরাই কেবল ওর ফায়দা উঠাবেন।

ছুরা হা-মীম ৬,৭ আয়াতে আছে ঃ

و ويل للمشركين الذ ين لايـؤتون الـزكـة

অ অয়লুল্লিল মোশ্‌রেকিনা অল্লাজিনা লাইয়ুতুনাজ্জাকাতা

আর আফ্‌শোস পৌত্তলিকদের জন্য যারা জাকাত দেয়না।

আছহাব ইবনে আব্বাস বলেন—এখানে জাকাত দেয়না অর্থ যারা লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ—জেকের—ইয়াদ এখ্‌তিয়ার করেনা ; তা-ই হচ্ছে আত্মার জাকাত, কারণ, তা আত্মা পাক-ছাপ করে। —তফসিরে খাজেনা।

নতুবা অমুছলিমদের বেলা জাকাতই বা কী, উল্লেখ বা কেন ?

সপক্ষে হাদিস।—হযরত আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণিত আছে যে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল—হে আল্লাহ্‌র রসুল ! ইছলামের বিধানগুলি (অর্থাৎ শরিয়ত-উক্ত নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাত প্রভৃতি এবাদত-বন্দেগী) আমার নিকট বড্ড কষ্টকর বোধ হচ্ছে। সুতরাং আমার জন্য যা সহজ সেরূপ একটি বিধানের (পন্থার) সহিত পরিচয় করিয়ে দিন। রসুল বল্‌লেন—আল্লাহ্‌র জেকেরের দ্বারা তোমার রসনা অনবরত যেন সিক্ত হয় (অর্থাৎ শরিয়ত-উক্ত এবাদত-বন্দেগীর অন্তর্নিহিত এবং অতীত রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা জেকের—এক কথায়

তরিকতের জেকের-ফেকের দ্বারা যেন রসনা অনবরত সিক্ত হয়)। —এবনে মাজা ; মোঃ ফজলুল করীম কৃত মেশকাত শরীফের বংগানুবাদ ৪র্থ খণ্ড 'জেকের অধ্যায়' ৪৭ নং হাদিস, পৃঃ ১৫৩০ !

ঐ অনবরত জেকের যে পাছ আনফাছ, হেফ্‌জদম (দমে দমে, শ্বাস-প্রশ্বাসে) জেকের এবং রাবেতা (প্রেম), মোরাকেবা (ধ্যান) এবং মোশাহেদা (দর্শন) যা অহরহ, কি যার পক্ষে যতোদূর সাধ্য ততোদূর গুণ-কর্ম, জ্ঞান-কর্মও বটে, তা কতোবার কতোভাবেই না বলেছি। কাজেই পাঁচ ওয়াক্‌ত যেমন নিম্নতম সাময়িক প্রার্থনা (ছালাত, নামাজ), এ ছালাত বা নামাজ তেমনি অহরহর, অনবরতের [সব সময়ের—জেনেশুনে নিয়ে যার পক্ষে যতোদূর ঐ পাঁচ ওয়াক্‌তের অতিরিক্ত সময় সম্ভবপর], হাতে করো হাতের কাম, মুখে লও আল্লাহ্‌র নাম, অবশ্য কাযকর্মের মধ্যে মনে মনে বটে, ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা' বলাই বাহুল্য। তেম্‌নি রোজা (আরবী—ছিয়াম), হজ্জ, জাকাতও সাময়িক, কি কারো কারো পক্ষেই মাত্র ফরজ—অবশ্য করণীয় এবাদত [যেমন হজ্জ, জাকাত—কেবল মাত্র মালদারের জন্য ফরজ], ওর উচ্চ মূল্য মানে (higher & highest values) ঐ অহরহর, অনবরতর রাবেতা অর্থাৎ প্রেম-আকর্ষণ (ছালাত—নামাজ)-সিক্ত মোরাকেবা (ধ্যান, জ্ঞান-গবেষণা), মোশাহেদা (দর্শন) এবং ঐ জেকের [আত্মা পরমাত্মার যোগাযোগ-মূলক স্বাভাবিক স্মরণ]।

বাস্তবিক আমাদের দেহ-যন্ত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত নিয়মিত যে ঐ নিশ্বাসে 'আল্লা' টেনে প্রশ্বাসে 'হু' ফেলা যায় অহরহ, অনবরত, অপরের অজানা, অদেখা। ঐ ভাবে ঘুমের আগেও ঐ নাম নিতে নিতে ঘুমান যায়, ঘুমের মধ্যেও যেন ঐ নাম চলে ; অভ্যেস করতে পারলে মৃত্যু সময়ও ঐভাবে ঐ নাম ইয়াদ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া যায়। ওরই রকমারি আবার শ্বাস-প্রশ্বাসে নাভিমূলে নাফ্‌ছআম্মারা লতিফায়

'লা', বুকের মধ্যস্থলে ছির লতিফায় 'এ', কপালের অভ্যন্তরে খফী লতিফায় আবার এলাহার 'লা' এবং তালুর ভিতরে আখ্‌ফা লতিফা কেন্দ্রে 'হা'=লা-এ-লা-হা—নাই এলাহা (উপাস্য) এবং বুকের ডান পার্শ্বে রুহ্‌ লতিফায় 'ইল্লা' পরে বুকের বাম পার্শ্বে কলব লতিফায় 'ল্লাহ্‌'=ইল্লাল্লাহ্‌—কিন্তু (আছেন) আল্লাহ্‌, অথবা আল্লাহ্‌ ব্যতীত (১)—এই নফি (নাস্তি; নাই) এবং এছবাত (অস্তি, আছেন) জেকের ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের সংগেই অহরহ বেঁধে নেয়া যায়। এম্‌নি সব প্রকৃত বোজর্গের এবং স্বয়ং রছুলুল্লাহর (সঃ) করা এবং বলা ঐ অনবরত, অহরহর জেকের, আর তার সংগে ফেকের—ঐ রাবেতা, মোরাকেবা, মোশাহেদা তো ছিলোই, আছেই, থাকবেই, হাতে কলমে জেনে শুনে নেয়া দরকার, নিতে হয়। বস্তুতঃ শরিয়তের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (ছালাত), একমাস রোজা (ছিয়াম), হজ, জাকাত ঐ দেহ-যন্ত্র-তন্ত্র না জানার, না বোঝার, না চেনার কারণেও নাফ্‌ছ আম্মারা (ষড় রিপু)-সুশাসন-মূলক প্রাথমিক ছবক হিসাবেই দেয়া হয়েছিল, তা' রছুলুল্লাহ্‌র (সঃ) ঐ নাফছ লাওয়ামার (অনুতাপী আত্মার) জন্য, ঐ বিশেষজ্ঞদের জন্য অবধারিত, অবশ্য নির্ধারিত (ফরজ) ঐ জেকের-ফেকেরের হাদিছ থেকেও বোঝা যায়। বস্তুতঃ আমাদের রুহ (২) এই দেহ মধ্যে জীবনকাল পর্যন্ত, কি তার পরেও ঐ প্রক্রিয়া-প্রণালীতে আল্লাহ্‌র গুণ-জ্ঞান (জেকের ফেকের)-আহরণ উপযোগী করেই গড়া, নিয়ন্ত্রণাধীন, বোঝাবার বোঝ্‌বার অপেক্ষা মাত্র।

---

(১) জবাব (১) এর 'বৈজ্ঞানিক ও কোরাণিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধের 'প্রজ্ঞার বিবর্তন' প্রসংগে ১৪৪—১৫৫ পৃঃ পুনঃ দেখুন।

(২) 'রুহ' দেখুন উপরোক্ত প্রবন্ধে ৯১—১০৩ পৃষ্ঠায় পুনঃ।

ان الانسان خلق هلوعا - اذا مسه الشر جزوعا - واذا مسه الخير منوعا - الا المصلين - الذين هم على صلاتهم دائمون -

ইন্নাল ইন্‌ছানা খুলেকা হালুয়া—এযা মাচ্ছাহুশ্‌শার্‌রো যাযুয়াঁ—অ এযা মাচ্ছাহুল খায়রো মানুয়াঁ—ইল্লাল মুছাল্লিনা আল্লাজিনা হুম আলা ছালাতেহিম দায়েমুন

মানুষকে নিশ্চয়ই সৃষ্টি করা হয়েছে বে-ছবুর, যখন কোন কিছু মন্দ ঘটে, সে দুঃখে বেচায়ন হয়, আর যখন কোন শুভ উপস্থিত হয় সে কৃপন (শোকর গোজারি করেনা—এরা মুছল্লি বা নামাযী হওয়া সত্বেও ঐরূপ, কেননা তাদের প্রকৃত নামায হয় না); কিন্তু ঐ সকল মুছল্লি (নামাযী) ব্যতীত যাঁরা তাঁদের নামাযে চিরস্থায়ী (অহরহ-রত)—ছুরা মা'রিজ ১৯-২৩।

ঐ আয়াত সমূহের পরেই আছেঃ

والذين هم على صلاتهم يحافظون - اولئک فی جنت مکرمون -

অ আল্লাজিনা হুম আলা ছালাতেহিম ইয়ুহাফেজুন—উলায়কা ফি জান্নাতে ম্মোক্‌রামুন।

—এবং যাঁরা তাঁদের নামাযের (অহরহ) হেফাজত করেন (হাফিজ হন) তাঁরাই হন এবং হবেন (সুখের) বাগানে সম্মানিত। —ঐ ৩৪-৩৫।

কোরআনের হাফেজ হওয়া দ্বারা কোন অংশের হাফেজ হওয়া বোঝায় না, সমগ্র কোরাণের হাফেজ হওয়া বোঝায়, কোন কিছুর হেফাজত করা দ্বারা সাময়িক হেফাজত বোঝায় না, অহরহ হেফাজত বোঝায়। সেই রকম নামাযের হাফিজ হওয়া, হেফাজত করাও মাত্র নির্দ্দিষ্ট পাঁচ ওয়াকতেরই হাফিজ, হেফাজত নয়, তা হলে পাঁচ ওয়াকতেরই উল্লেখ থাক্‌তো, বরং ঐ রাবেতাল কল্‌ব্ (১), জেকের—হেফ্‌জ দম (পাছ আনফাছ), হাব্‌স দম (২), ফেকের (মোরাকেবা-মোশাহেদা)—নযর বরকদম (৩), নাফছকোশী (ছবর-শোকর)—প্রভৃতি মারফত দায়মী (সব-সময়ের) নামায; জেনে

শুনে নিয়ে যিনি যখন যতোদুর পারেন ; লক্ষ্য, কোশেশ সব-শোগলে (কায়দায়) সব-সময়ের।

(১) আত্মায় আত্মায় যোগ সাধন করে' পরমাত্মায় পৌঁছানোর কথা অনেকবারই বলা হয়েছে [দেখুন জবাব (১) এর ১০৯-১১৮ পৃঃ, ১২৬-১৩৬ পৃঃ, জবাব (২) এর ২১-২৭ পৃঃ, ৩৬-৫৯ পৃঃ, ৯৫ পৃঃ প্রভৃতি]

(২) হেফ্জ দমের রকম ফের—মাঝে মাঝে দম বন্ধ করে হেফ্জ দম যথাক্রমে পূরক—শ্বাস গ্রহণ, কুম্ভক—শ্বাস বন্ধ করন ও রেচক——শ্বাস ত্যাগ।

(৩) মোরাকেবা মোশাহেদার রকম ফের—প্রতি পদক্ষেপে মোরাকেবা মোশাহেদা।

ছুরা বাকারা ২৩৮ আয়াতে জাহের বাতেন উভয় প্রকার ছালাত (নামায) পৃথকভাবে বোঝানো হয়েছে বলে' মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ঃ—

حفظوا على الصلوات والصلوة الوسطى - وقوموا لله قنتين -

হাফেজু আলাচ্ছালাওয়াতে অচ্ছালাতেল বুস্তা অকুমুলিল্লাহে কানেতীন

সকল (রকম) ছালাতের (নামাযের) এবং (বিশেষ করে') মাধ্যম ছালাতের (নামাযের) হেফাজত করো, আর (এইভাবে) প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্-পরস্ত (বলে')।

এ সম্পর্কে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানীর এরশাদ হচ্ছে এই ঃ শরিয়তের নামাযের প্রকাশ্য ফরজ সমূহ শারীরিক অংগ পরিচালন দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। যথা ঃ—দণ্ডায়মান হওয়া, রুকু ও সেজ্দা দেয়া এবং উপবেশন করা (বিশিষ্ট কায়দায় বসা) এবং তৎসহ আল্লাহর কালাম মৌখিক উচ্চারণ করা।

অতঃপর তরিকতের নামায—এ হচ্ছে সর্বদা দীলের নামাযে লিপ্ত থাকা। আল্লাহর উক্ত বাণীর 'মাধ্যম নামায (ছালাতোল

বুস্তা) হেফাজত করো হুকুম দ্বারা দেলের নামায বোঝায় ; কেননা কলব—শরীর ও দেল, দক্ষিন বাম, উর্ধ, অধঃ শুভাদৃষ্ট অশুভাদৃষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, যথা হযরত বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই বনি আদমের অন্তঃকরণ সমূহ (কুলুব—লতিফা মোকাম মঞ্জিল) দয়াশীল আল্লাহ্ তায়ালার (শক্তির) অংগুলি সমূহের দুই আংগুলের মাঝখানে অবস্থিত, যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপ পরিবর্তন।" দুই অংগুলির মর্ম আল্লাহর গজব ও রহমত (ক্রোধ ও দয়া) এই দুই গুণ। অতএব এই নিদর্শন ও হাদিছ দ্বারা জানা যায় যে, নিশ্চয়ই অন্তঃকরণের নামাযই মূল নামায, বান্দা যখন ঐ নামায ভুলে যায় তখন তার নামায ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যখন আন্তরিক (ঐ মাধ্যম) নামায নষ্ট হয় তখন বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগাদির নামাযও নষ্ট হয়। --ছিররুল আছ্‌রার।

এ জন্যই কোরআনে পুনঃ সতর্কবানী উচ্চারণ করা হয়েছে ঃ

فويل للمصلين - الذين هم عن صلاتهم ساهون - الذين هم يراءون -

ফাওয়ায়েলুল্লিল মোছাল্লিনা-আল্লাজিনা হুম আন ছালাতেহিম সাহুন —আল্লাজিনা হুম ইয়ুরায়ুনা

আফশোস ঐ সকল মুছল্লির জন্য যারা নামায আদায় করে বটে ; কিন্তু নামাজে উদাসীন, যারা লোককে দেখায় মাত্র।

—ছুরা মাউন।

দুঃখের বিষয় صلوة الوسطى (ছালাতুল বুস্তা) অর্থাৎ মাধ্যম নামায বোঝাতে কোন কোন তফসির কারক আছরের নামায বয়ান করেন—মানে ফজর, জোহর, মাগরেব, এশা—এর মাঝখানের আছর নামায। কিন্তু সকল (রকম) নামায বলায়াই তো তারো হেফাজতের কথা বলা হলো, 'এবং মাধ্যম নামায' বলে বিশেষ

করে আর তাকে বলা লাগে না। ও এমন কিছু যা যে-কোন ওয়াক্তের নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই ঐ আলাদা করে ওর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, যদিও সকল রকম নামাযের অন্তর্গত সে-ও। আর 'ও' আছরের নামায হলে তা অমন আলো-আঁধারি (সন্ধ্যা) অস্পষ্ট ভাষায় কেন? হাদিছের দোহাইও এ সকল ক্ষেত্রে অচল, কারণ, কোরআন-কালামের সংগে ঐক্য হয় না যে-হাদিছের তা আসল হাদিছই নয় বলে স্বয়ং হাদিছ-বেত্তা রছুলই (স) ব'লে গেছেন, দেখুন জবাব (১) ৮ পৃষ্ঠা, জবাব (২) ৯৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রবন্ধ জিজ্ঞাসার ৫৯ পৃষ্ঠায় দেখেছেন কোরআনের আয়াতের জাহের বাতেন অর্থ আছে। পরিপূর্ণ বোঝবার জন্য তা পুনঃ তুলে দিচ্ছি ঃ

ان للقران ظاهرا وباطنا ولباطنه باطنا والى سبعة باطنا

ইন্না লিল কোরআনে জাহেরান অ বাতেনান অ লেবাত্‌নেহি বাতেনান অ এলা ছাবআতে বাতেনান

নিশ্চয়ই কোরআনের জাহের (প্রকাশ্য) বাতেন (গোপন অর্থ, তাৎপর্য) আছে, এবং সেই বাতেনের জন্য আর এক বাতেন আছে —এমনি সাত বাতেন পর্যন্ত [সপ্ত স্তরে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পিক অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সকল তাৎপর্য তাবীল তথা গুণ, জ্ঞান, শান হাছেলের ক্রম-বিকাশ, প্রগতি-প্রকাশ, পরিণতি—বিবর্তন শেষ] —হাদিছ।

انزل القران على سبعت احرا ف و لكل ا ية منها ظاهرا وباطنا ولكل هد مطلون

উনজিলাল কোরআনো আলা ছাবআতে আহরাফে অ লেকুল্লে আয়াতেন মেনহা জাহেরান অ বাতেনান অ লেকুল্লে হাদেন মাতলুউন

কোরআন সাত হরূফ অর্থাৎ স্তরে নাজেল এবং প্রত্যেক আয়াতের জাহের বাতেন (প্রকাশ্য ও গোপন) অর্থ আছে, এবং প্রত্যেক সীমায় পূর্ণ প্রকাশ আছে। —হাদিছ।

তা হলে ঐ 'ছালাতুল বুস্তা তথা মাধ্যম নামাযের' জাহের অর্থ ঐ আছর নামায, কি অন্য যা-ই কিছু করা হোক, ওর আসল অর্থ, বাতেন অর্থ যে ঐ বড়ো পীর আবহুল কাদের জিলানীর (র) মতো প্রকৃত বোজর্গানেদীনেরাই মাত্র বোঝ্‌তে এবং বোঝাতে পারেন, তা-ও তো ঐ উপরে দেখ্‌লেন।

ঐ তরিকতে—প্রক্রিয়া-প্রণালীতে—পন্থায় নাফ্‌ছ লাওয়ামার আরো প্রগতিতে হাকিকত বা প্রকৃত সত্য, সত্তা ঐ হক্বোন্‌নূর উপলব্ধি, আর তখনই নাফ্‌ছ মুৎমায়েন্না—শুদ্ধি-শান্তি-শান-প্রাপ্ত সিদ্ধ আত্মা, আর তার পরিণতি, পরাকাষ্ঠাই মারেফাত, এল্‌মে লাহুন—আত্মার পরমাত্মার যোগাযোগে একমাত্র তাঁরি প্রেম প্রেরণায়—এলহামে—সুপরিচালিত সম্ভবপর সম্পূর্ণ মুক্ত, প্রাজ্ঞ, শুদ্ধি-সিদ্ধি-শান্তিশান-প্রাপ্ত আত্মা—নাফ্‌ছ্‌ মুল্‌হেমা।

এখন, 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে বিশেষ করে 'বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতি' বোঝাতে গিয়ে ওরি পরিপূরক ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা দিতে সাধারণ ও অধ্যাত্ম দর্শন-বাদেরও উদ্বোধন করতে হয়েছিল 'দর্শন-বিজ্ঞান', 'বিবর্তন মানব', 'ইস্‌লামিয়াৎ' ও 'পরিশিষ্টে' 'চারিকলেমা—ঈমান', 'মুজাদ্দিদ', 'পাপ-পূণ্য-দর্শন' প্রভৃতি প্রসংগক্রমে ; জবাব (১) এর 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রবন্ধেও বিজ্ঞানের সংগে সংগেই ওর প্রগতি, বিশেষ করে ওর 'পরিশিষ্টে' 'নাস্তিক আস্তিক সমস্যা--সমাধান' প্রসংগে ওর পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করেছেন। 'পরমাণবিক তথ্যেও' স্থানে স্থানে ওর প্রয়োজনীয় পদচারনা দেখেছেন; 'বৈজ্ঞানিক ও কোরানিক বিবর্তনবাদ' প্রবন্ধে বিশেষ করে' কোরআনের তরজমা তফসিরে ও প্রকৃত ছহি হাদিছের দৃষ্টান্তে ঐ উভয়—সাধারণ ও অধ্যাত্ম—দর্শনের প্রকাশ হয়েছে অবাধ, প্রভুত, অভুতপূর্ব। কেবল আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসার জবাব দিলেই তা আরো বিশদ হতে পারতো, তা দেখুন :

يا يها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا--ان اكر مكم عند الله اتقكم ـ ان الله عليم خبير

ইয়াআইয়ুহান্নাছো ইন্না খালাক্বনাকুম স্মেন জাকাঁরে অ উনছা অ জাআল্‌না কুম্‌ শোয়ূবাঁ অ ক্বাবায়েলা লেতাআরাফু—ইন্না আক্‌রামাকুম্‌ এন্‌দাল্লাহে আত্‌ক্বাকুম—ইন্নাল্লাহা আলীমুন খবীর

হে মানবগণ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে বানিয়েছি, আর তোমাদের করেছি নানা জাতির ও বিভিন্ন বংশের যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান যে সবচেয়ে পুন্যবান। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ সব জানেন, সব খবর রাখেন।—হুজুরাত ১৩।

আচ্ছা! এই আয়াত এবং এরূপ আরো আয়াতে কি সকল মানব জাতিকে একই আদম হাওয়ার বংশধর বোঝায়? না, বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মানুষ যে এক এক যুগল নর-নারী অর্থাৎ পিতামাতার সন্তান, তা-ই বোঝায়? নিরপেক্ষভাবে বিচার করে' রায় দিন। অথচ ঐ একই আদম হাওয়ার সন্তান সকল মানব ইত্যাকার অযৌক্তিক অসম্ভব কথাই ঐ আয়াতে এবং এরূপ আরো আয়াত তুলে' প্রতিপন্ন করতে ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়। আরো কী আশ্চর্য! সকলের মুখপাত্র রেডিয়ো থেকেও সেই বুদ্ধিহীন ব্যাখ্যাই সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের নাকের ডগায় শোনানো হয়, দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরূপ কতো অসংগতির কথা, অর্বাচীনতার কথা বল্‌বো! যতোদূর প্রাথমিক ধরা পড়েছে এই পুস্তকে জবাব দিয়েছি, বাকীর জন্য আপনাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে।

কাজেই কী ধরনের পদস্খলনকে সকল দেশ, কাল, জাতির মানবের স্বর্গ বিচ্যুতি ও তা কাটিয়ে উঠাকে স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তির রূপকে বলা হয়েছে, তা এ-ধরনের আয়াত থেকেও বোঝা যায়ঃ

و لقد خلقنكم ثم صورنكم ثم قلنا لملئكة اسجدوا لادم ـ
فسجدوا الا ابليس ـ لم يكن من السجدين

অ লাকাদ খালাক্বনাকুম ছুম্মা ছাভারনাকুম ছুম্মা ক্ব্‌লনা লেল মালায়েকাতেস্‌জুদু লে আদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস্‌,—লাম ইয়াকুন মেনাল সাজেদীন

আর আমিই তোমাদের বানাই (রুহরূপে) এবং পরে তোমাদের (দৈহিক) আকৃতি দেই, আর ফেরেশতাদের (সৎগুণ জ্ঞানাবলীকে) বলি ‘সজ্‌দা করো আদমকে [ঐ মানব-সত্তাকে মানো, তাৎপর্য হলো ঐ সৎগুণ-জ্ঞানাবলীই মানব-আত্মা ও পরমাত্মার সেতুবন্ধ, তা-ই মান্য করার ঐ রূপক]’, তখন সকলেই সজ্‌দা করে [ঐ সব সৎগুণ জ্ঞানাবলী মানব-আত্মা ও পরমাত্মার অনুসারী, অভিসারী হয়, সহায়ক হয়] ইবলিস ব্যতীত [অর্থাৎ ষড়রিপু ঐ সৎগুণ জ্ঞানাবলীর অন্তরায় হয়] সে যোগ দেয় না সজ্‌দায় [মানব আত্মাকে তার উৎস-মূল পরমাত্মা থেকে ফিরিয়ে রাখে, পদস্খলন ঘটায়]’ —আরাফ ১১।

এ এক চিরন্তন মামেলা ঝামেলা—তা ঐ জবাব (১) এর ৩য় প্রবন্ধ পুরো পড়েই বুঝুন।

এই জবাব (২) এর ‘রকেটের রহস্য’ প্রবন্ধে হয়েছে ঐ অধ্যাত্ম উরুজের (উন্নতির) অতি-অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি, ‘অতীন্দ্রিয় রকেটে’ হয়েছে তার চূড়ান্ত—অধি-অভিজ্ঞতা-অভিব্যক্তি। সর্বশেষ এই ‘শিল্প সংস্কৃতি (কালচার) কথা’ প্রবন্ধেও হলো গিয়ে তারি শৈল্পিক প্রকাশ—অনিবার্য—অবারিত—অবধারিত।

আমাদের দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলা, ক্রমশঃ অধ্যাত্ম দর্শন বিজ্ঞান শিল্প-কলা—এক কথায় সর্ব সভ্যতা সংস্কৃতির—মৌল মূল্যবোধ (higher & highest values)—প্রকাশিকা জিজ্ঞাসা সমূহের জবাবের পর জবাবে এ-ভাবে এখানে এসে শেষ কথা বেরিয়ে পড়ছে; তা কী?

ইছলামকে আমরা চিরকাল বলে আসছি পূর্ণাংগ জীবন দর্শন—Complete code of life. তা হলে মাত্র একাংশ, তাও অনেক সময়ে বিকৃত, ভেজালপূর্ণ একাংশকে কী করে' ইছলাম বলে' চালাচ্ছি। চালাচ্ছি ভাসা ভাসা জ্ঞানে পূর্ণাংগ জীবন-দর্শন বোঝতে ও বোঝাতে চির পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তুময় ধর্মকে (Socio-political religion) পূরো ইছলাম মনে করে'। আসলে সমাজ, স্বজাতি ও স্ব-রাষ্ট্র মাত্র জীবনের এক দিক—তা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু সে শুরু এবং ব্যবহারিক দিক—শরিয়ত ; তার অন্তর্নিহিত অথচ অতিরিক্ত পন্থা (**তরিকত**) ও ক্রম প্রগতি-প্রকাশ (**হাকিকত**) ও পরিণতি (**মারফত**) ছাড়া কি ভাবে ইছলাম পূর্ণাংগ জীবন-দর্শন হতে পারে ? হয় না, হতে পারেনা।

সূর্য পূব থেকে পশ্চিমে যায় এটা **ব্যবহারিক সত্য** বা শরিয়ত, দুনিয়ার কায-কর্ম এন্তেজামে তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা **আসল সত্য** অর্থাৎ ওর হাকিকত হলো পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে যায়, তাই সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি।

ওর আরো গভীর সত্য অর্থাৎ মারেফাত হলো শূন্য মণ্ডলে কিছুই স্থির নয়, সব বস্তুপুঞ্জই—জড় পদার্থই—পরস্পর প্রবল আকর্ষণে ঘুরপাক খাচ্ছে, ইত্যাদি কতো কিছু। এই রকম সঠিক সত্য গুণ-জ্ঞান-শান হাছেলের পন্থাই আবার তরিকত ; সর্বত্র এম্‌নি শরিয়ত, তরিকত, মারেফাত রয়েছে' তা' আমাদের বইগুলোতে পুরো দেখান হয়েছে ও হচ্ছে।

কাজেই, যতো গোঁজামিলই দিন, ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন দর্শন—খালি শরিয়ত—তাও না বুঝে, অনেক সময়ে বিকৃত আকার-প্রকারে পালন করে—হবে না, হতে পারে না, কোনদিন হয়নি। কোন ধর্মই তা' হয়নি, হতে পারে না, হবে না। কারণ, ধর্মের **ঐ স্থূল (শরিয়ত)** ঐভাবে ধরে' **ক্রম মর্ম অনুধাবনের (বিবর্তনের), উপলব্ধির**

(Realisation এর) **পন্থা** পূর্বোক্ত **তরিকতে** চলে' সেই **অনুধাবন (বিবর্তন) উপলব্ধির সত্য—হাকিকত**—হাছেল করে' সর্বশেষ **সম্পূর্ণাংগ গুন জ্ঞান শান হাছেলই মারেফাত**—আসল আদত ধর্ম, চিরন্তন আত্মা পরমাত্মার যোগ সাধন, সত্যিকার শান (আল্লার হুজুরে সম্মান, সুমহিমা, সুমর্যাদা) লাভ। জন সাধারণ সবাই তা বুঝুক আর না বুঝুক, খুঁজুক, কি, না খুঁজুক।

ইজ্‌তেহাদ—দৃষ্টান্ত

আবার শরিয়তের নামে অনেক সময়ে যে আদেশ নিষেধ জারী করা হয় তা যে কতোদূর সত্য, সুতরাং সব দেশ-কাল-পাত্রের, তা নিম্নলিখিত কতিপয় দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝাতে পারবেন।

হানাফী মযহাবের দোহাই দিয়ে এক সময়ে বলা হতো: এক বৈঠকে তিনবার তালাক বাইয়েন উচ্চারণ করলেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে? কিন্তু আজ? দেশ কালের সংগে খাপ খাইয়ে বর্তমান সরকার 'মুসলিম পরিবার আইন অর্ডিন্যান্স' মারফত তিন মাসে (৯০ দিনে) ঐ তালাক পূর্ণ হতে পারবে বলে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তা-ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বর এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষের শালিস মান্য মারফত (মুসলিম পরিবার আইন অর্ডিন্যান্স দেখুন)।

ওর সপক্ষে প্রকাশ-অপেক্ষায় পথ-চেয়ে-থাকা আমার 'আল্‌কোরআনে নরনারী' গ্রন্থ থেকে একটি ঘটনা শুনুন:

ঐ গ্রন্থে দেখ্‌তে পাবেন ঐভাবে রাগের মাথায় একক্রমে তিন তালাক বায়েন দিয়ে ছেড়ে দেয়া সন্তানবতী এক বধূর পক্ষে কোরআন আয়াত তুলে' বোঝালাম: 'ঐ তালাক বায়েন হয় নি, এক তালাক হয়েছে, কাজেই কাফ্‌ফারা হবে'। প্রতিপক্ষের মাওলানা বল্‌লেন—'হানাফী মযহাব মতে হয়েছে, নিকাহ্‌ দেয়া

লাগবে অপর পুরুষের সংগে, সে পুনঃ তালাক দিবে অর্থাৎ বাহানা করবে, তারপর ঐ বউ প্রথম স্বামী পুনর্বিবাহ করে' ঘরে আনতে পারবে।' আমি বললাম ঃ 'কোরআন হাদিছ মোতাবেক তা হয় না। আর, এক সময়ে 'যাও', 'যাও', 'যাও' তিনবার বললে যাবে একবার, না, তিনবার?' মাওলানা বল্লেন ঃ 'একবার কোপ দিলে কি কাটে না?' আমি বললাম ঃ 'কোথায় কোপ, আর কোথায় মৌখিক কথা! আর তাতে করে' কোরআন হাদিছের ঐ সময় দেবার উদ্দেশ্যই যে যায় ব্যর্থ হয়ে। সময় দেয়া কেন? না, ঐ সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর হয়ে পুনর্মিলন সম্ভবপর হতে পারে। এই সময় স্ত্রী গর্ভবতী না থাকলে তার তিন মাসে তিন তোহরে (শুদ্ধাবস্থায়) হবে ঐ প্রায় ৯০ দিন, আর গর্ভবতী হয়ে থাকলে গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত ঐ ৯০ দিন ধরে আর যে সময় হয়।' কিন্তু দলে তারা ভারী, কাজেই হানাফী মযহাবের দোহাই দিয়ে, বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা রেওয়াজের দোহাই দিয়ে, কোরআন হাদিছের উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঐ এক সময়ে তিন তালাক উচ্চারণ করাকে তালাক বায়েন অর্থাৎ পুরো তিন তালাক ঘোষণা করা হলো। আমি বলে এলাম ঃ 'নরনারী উভয়ের এজেনে যে বিয়ে তা কখনও এক তরফা বাতেল হতে পারে না, কোরআন হাদিছের বিধান কখনও এরূপ অযৌক্তিক অসংগত হতে পারে না। হানাফী মযহাব এ ক্ষেত্রে ভুল করেছে, শাফী বিধান অন্ততঃ এ ব্যাপারে ঠিক ফায়ছালা দিয়েছে। গবর্ণমেণ্ট একদিন হানাফী মযহাবের নামে প্রচলিত ঐরকম অসংগত অযৌক্তিক ব্যবস্থা সংশোধন করে দিবেন, সু-সংস্কৃত করবেন।' গবর্ণমেণ্ট তা করেছেন। সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ।

এক সময়ে বলা হতো দাদা থাক্তে পিতা মরলে তার সন্তানগণ মদন মিরাশ হবে অর্থাৎ দাদা না দিলে সম্পত্তিতে

কোন অধিকার পাবে না। কিন্তু ঐ আইন অর্ডিন্যান্স মারফত এখন এ ক্ষেত্রে নাতি নাতনীরা তাদের মৃত পিতার ওয়ারিশ সূত্রে ঐ দাদার সম্পত্তিতে অধিকার পাচ্ছে।*

বলা হতো ইংরেজী পড়া হারাম, কুফরি, পড়লে পরকালে জিহ্বা কাটা যাবে, দোযখে যেতে হবে [পরকালে যেন জড়-দেহের মতো রুহেরও স্থূল জিহ্বা আছে আর কী, আর তা' কাটাকুটাও যায় !] কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই সেই ইংরেজী পড়া ইংরেজ আমলে গরজের তাকিদে জায়েজ হয়ে যায়।

বলা হতো : বয়তুল-মাল তহবিল করতে হবে, কারণ, সবরকম সুদই হারাম, এমন কি ব্যাংকের সুদও। আর এখন ? ব্যাংকের সুদ ছাড়াতো দেশই চলে না ; অন্য সুদও জুলুম না হলে আর হারাম বিবেচিত হয় না।

এক সময়ে সবরকম খেলাধূলা হারাম বলা হতো। (কুল্লু লায়াবুন হারামুন)। কারণ দ্বৈত (দুজনে দুজনে মিলে), কি সমষ্টিগত (দল গঠন করে) কোন প্রকার পাল্লা দেয়া নাকি হারাম। তাই কোন কোন মাদ্রাসায় তালিবে এল্‌ম্‌দের (ছাত্রদের) একদিকে ফুটবল খেলতে (ঠেলতে) দেয়া হতো। কিন্তু এখন আর সে ফতোয়া আদৌ শোনা যায় না, ধোপেই টেকেনা যে।

জীবজন্তু এবং মানুষের ছবি আঁকা, মূর্তি বানান এক সময়ে হারাম বলা হতো। বলা হতো : 'জান দিতে পারো যে ছবি আঁকো, মূর্তি বানাও ?' কিন্তু জান দেবার সঙ্গে ছবি আঁকা, মূর্তি বানানোর যে কী সম্পর্ক তা বোঝা যেতোনা। আরো কী মজা ! গাছ লতা পাতার ছবি আঁকা, কি মূর্তি বানান জায়েজ (সিদ্ধ) বলা হতো। গাছ লতা-পাতারও যে জীবন আছে এ বোধটুকু তখন ছিলো না। রসুলুল্লাহ (সঃ) হয়তো পুনঃ আগের আগের

---

* আমার 'সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন' পুস্তকের অপেক্ষা মাত্র।

পয়গাম্বরদের ছবিপূজা, মূর্তিপূজার মতো তাঁরো ছবি পূজা, মূর্তি পূজা হতে পারতো বলে' তাঁর নিজের ছবি আঁকা, মূর্তি বানান মানা করেছিলেন। কিন্তু এও শোনা যায় লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি রসুলুল্লার (সঃ) ছবি আছে ; এ যদি সত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর ছবি অাঁক্‌তে নিষেধ করেছিলেন এ কথাও সত্য প্রমাণিত হয় না। আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ কথার সত্যাসত্যের যাচাই দাবী করি। যা হোক শিল্পকলা হিসাবে ছবি আঁকা, মূর্তি বানান, কি সংগীত চর্চা, নৃত্যকলা প্রভৃতি যে নিষেধ নয়, হতে পারে না, কোনদিন ছিলোনা, তা আমরা 'শিল্প সংস্কৃতি (কাল্‌চার)-কথা' প্রবন্ধেই কোরআন এবং প্রকৃত ছহি হাদিছ থেকে সপ্রমাণ করেছি। আর কোরআনের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন হাদিছ যে আসল হাদিছ নয়, সত্য হাদিছ নয় অর্থাৎ রসুলুল্লার (সঃ) বাণী নয়, হতে পারেনা, তাও সেখানে পুনঃ দেখুন [পৃঃ ৮১]।

বলা হতো ঃ গ্রামোফোনে, রেডিয়োতে ভূতে কথা কয়,'ও' হারাম। রেডিয়ো টেলিভিশনে, গ্রামোফোনে গান বাজনা তো বটেই, রংগমঞ্চে নাটক অভিনয়, নৃত্যগীত, সিনেমার ছায়াছবি প্রভৃতি নর-নারীর একত্র সব রকম মেলামেশা-মূলক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান হারাম। পাকিস্তান ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। ও-সব হারাম কুফরি কাজ এ দেশে চলবে না, আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু তা কি কোনদিন সম্ভব হয়েছে, কিংবা হবে ? ['শিল্প সংস্কৃতি (কালচার)-কথা' প্রবন্ধের প্রসংগগুলো পুনঃ পুরো দেখুন]।

মাইকে বক্তৃতা দেওয়া ভূতের কথা কওয়ার শামিল, অতএব না-জায়েজ (অসিদ্ধ)। আর এখন ? ওয়াজ মহফিলে মাইকের ছড়াছড়ি, মাইক না হলে মহফিল চলেই না। সে ভূতের কথা গেল কোথায় ?

এক সময়ে চার দেয়ালের অন্তরালেই ছিলো মেয়েদের স্থান। আর আজ ? পথে ঘাটে মেয়েদের ছড়াছড়ি—বোরকা সহ, বোরকা

বাদে, শাড়ি-ব্লাউজ-পরা, পাজামা-সালোয়ার-পরা, কখনো কখনো টেডি পোষাকেও। কোথায় গেল সেই মহ্‌লা! অর্থনৈতিক কারণেও নারীপুরুষকে বহির্দুনিয়ার কাযে সমান ভাবে লাগতে হচ্ছে।

এ ছাড়া 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠায় প্রসংগক্রমে আলোচিত 'পরিবার পরিকল্পনা আইন' ধরুন। যদি উপরোক্ত এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম-ফাজেলের কথামতো শরিয়ত চির অচল অটল ঠাওড়িয়ে দেশকালপাত্র-উপযোগী করে' শরিয়তের ইজ্‌তেহাদ (গবেষণা করে' নূতন সমাধান দান—দেখুন ১০২ পৃষ্ঠা) স্বীকার না করেন তা হলে ঐ 'পরিবার পরিকল্পনা আইন' প্রবর্তন করতে পারেন কি? পারেন না। না পারলে কি হবে? বাড়্‌তি জন সংখ্যার চাপে এ দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যাবে ভেঙে, প্রগতি হবে ব্যাহত। কাজেই 'জান দেছেন যিনি, খাওয়াবেন তিনি' এ কথা বলে' আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি কি? পারি না। যদি পারতাম তাহলে চাষ-আবাদ করা লাগতো না। আল্লাহ্‌ই তো খাওয়াতেন। বিজ্ঞানের অপরাপর দান গ্রহণ করতে পারতেম না। গ্রহণ করা উচিত ছিলো না।

আমরা ভুলে যাই যে মানুষ মাতৃগর্ভ হতে নেহায়েৎ অসহায় নিরাবলম্ব অবস্থায়ই তুনিয়ায় আসে। মাতা পিতা, ভাই বোন ও অপর আত্মীয় স্বজনের যত্ন-আত্তিতেই তো রক্ষা পায়। বড়ো হবার সংগে সংগে কতো রকমেই না বিজ্ঞানের দর্শনের শিল্পের শক্তিকে হাতে নিয়ে প্রকৃতির সংগে তুমুল লড়াই করে তাকে বাঁচতে হয়। বস্ত্রাদি পরে' সভ্যভব্য হতে হয়, লেখাপড়া শিখতে হয়, মানুষ হতে হয়, কায কর্ম করে জীবিকা যোগাতে হয়—এ সবই ঐ বিশ্ব বিধাতার বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং এই রকম করে' যুগে যুগে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শৈল্পিক নিত্য নব নব যে সব গুণ ও জ্ঞানের দান আমরা

পাচ্ছি, সে আবার কার দান? কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করছি, সে আবার কার ইচ্ছায়, কার পন্থা!

কেবল পরিবার পরিকল্পনার মতো মাত্র কোন এক ব্যাপারেই কেন আল্লাহ্‌র কার্যের উপর হস্তক্ষেপের ধুয়া উঠবে, তোলা হবে? তা হলে আজ পর্যন্ত জীবন বাঁচাতে, লজ্জা নিবারণ করতে, সভ্য-ভব্য হতে, রোগ ব্যাধি, শীতাতপ, ঝড় বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়াদি থেকে রক্ষা পেতে যা কিছু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও শৈল্পিক দান গ্রহণ করছি, প্রয়োগ করছি, সবই সেই আল্লাহ্‌র কার্যে হস্তক্ষেপ হতো।

সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পীরই অবদান মূলতঃ সকল আবিস্কার ও তার থেকে ফায়দা তোলা (উপকার গ্রহণ)। মানুষের গুণ, জ্ঞান ও শিল্পের প্রকাশও আসলে তাঁরই বিভিন্ন প্রকার আত্ম প্রকাশ [তা পুস্তকের ভিতরে জবাব (১) এর ৩য় প্রবন্ধে এবং জবাব (২) এর সব কটি প্রবন্ধেই ভালোরূপে বুঝিয়েছি, তা পুনঃ দেখুন]।

তাহ'লে পরিবার পরিকল্পনার মতো দেশকাল পাত্র উপযোগী এক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও শৈল্পিক পন্থাকে—প্রক্রিয়া-প্রণালীকে—কেন কেবল মানুষেরই উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, আল্লাহ্‌র কিছু নয় ভাবা হবে? সেটা যে জ্ঞানের অপরিচ্ছন্নতা, অপরিসরতার ফল, তা একটু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর সুমহান অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেছেন: খাদ্য সামগ্রী আমরা বাড়াতে পারি মাত্র গাণিতিক হারে (arithmetical ratio), যথা: ১,২,৩,৪, প্রভৃতি, কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে (geometrical ratio) অর্থাৎ ১,২,৪,৮, ১৬ প্রভৃতি। সুতরাং জন-সংখ্যা-বৃদ্ধি বৈজ্ঞানিক উপায়ে (জন্ম নিয়ন্ত্রণাদি মারফত) না কমালে পৃথিবী জন সংখ্যার চাপে একদা এমন খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হবে যার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মহামারি

প্রভৃতি প্রাকৃতিক অভিশাপ যাবে বেড়ে। ওদিকে খাদ্যাভাবে ব্যক্তিগত স্বভাব প্রকৃতি লোকের নষ্ট হয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহজানি প্রভৃতি তো বেড়ে যাবেই।

প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বৎসর পূর্বে জনগণের কবি বলেছিলেন ঃ

কালের চরকা ঘোর
আজ দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে চড়ে দেড়শত চোর।

ঐ চোর-ডাকাত অর্থাৎ জনগণের অর্থ-সম্পদ-শোষক জুলুমবাদ মাত্র দেড় শত ছিলো কিনা সে গবেষণা-সাপেক্ষ, বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা এইমাত্র ৪০ বৎসরে যে প্রায় ৩৫০ কোটি হয়ে গেছে এবং খাদ্যাভাবের কারণে ঐ চোর অর্থাৎ জুলুমবাজের সংখ্যাও যে আর মাত্র দেড়শত নেই, বহু শত, বা হাজার হাজার, লাখলাখ বেড়ে গেছে এবং বেড়ে যাচ্ছে, তা দুনিয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, ঘুষখোরী, কালোবাজারি প্রভৃতির একটি মোটামোটি খতিয়ান নেবার চেষ্টা করলেই জানা যায়। (খবরের কাগজে যা ছাপা হয় তার হিসেব নিলেই হয়, যা বের হয় না, গোপন, তাতো জানতে পারবেন না)। আর বর্তমান হারে জন-সংখ্যা বাড়তে দিলে নাকি এই শতাব্দি-শেষে পৃথিবীর জন সংখ্যা বর্তমানের ডবল অর্থাৎ প্রায় সাত শত কোটি হবে। তাহলে ঐ চোরের সংখ্যা মোটামোটি কতো হতে পারে, তা' এখন নিজেরাই হিসেব করে বের করুন।

ঐ পরিবার পরিকল্পনার অভাবে আর যে যে অপকার হতে পারে তা ঐ 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠার কথাগুলোর আর একটু বিশদ করলেই ভালো করে' বোঝা যায় ঃ

'অতিরিক্ত সন্তান জন্মদানের ফলে প্রসূতি ও সন্তান উভয়ই ভোগে, আজীবন মা ও সন্তান অনেক সময়ে অকর্মন্য, রোগ-জীর্ণ জীবন যাপন করে, কিংবা প্রায়শঃ অকাল মৃত্যু বরণ করে' ভব-জ্বালা সাংগ করে। ওদিকে পর্যাপ্ত ভরণ পোষণের অভাবে অনেক সময়ে

পিতা মাতা ও সন্তানদের অসৎপথে জীবিকা-সংস্থানের মওকা খুঁজতে হয়। সুশিক্ষা দানের অভাবে সন্তান হয়ে ওঠে সংসারের কার্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করতে অক্ষম। অবহেলিত সন্তান কুসংসর্গে মিশে কুশিক্ষা পেয়ে হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়, দুশ্চরিত্র, দুরন্ত। সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা অনেক সময়ে এ-ধরণের অবাঞ্ছিত নাগরিক দ্বারাও ব্যাহত হয়, বিপন্ন হয়। ধর্ম-কর্ম-জীবনতো ব্যাহত, বিঘ্নিত ও বিপন্ন হয়েই থাকে।

এখন, ঐ 'পরিবার পরিকল্পনার' অভাবে যখন দেশকালপাত্র, ফলে সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীর মহা ক্ষতি, তখন কী করে তা' আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধ আইন হবে? বরং ঐ আইন চালু না করাই হবে আল্লাহ্‌র কার্যে হস্তক্ষেপ। কারণ, আল্লাহ্‌—যিনি চিরকাল মানুষের হাত দিয়েই ধর্ম ও সভ্যতা ভব্যতা গড়ে তোলার উপকরণ যুগিয়েছেন—তিনিইতো আবার ঐ ধর্ম ও সভ্যতা ভব্যতাকে বাড়তি মানব-সন্তানের হাত থেকে বাঁচাতে মানুষের হাতে ঐ পরিবার পরিকল্পনার অস্ত্র, উপকরণ তুলে দিয়েছেন। তাকে অবহেলা করে' দূরে সরিয়ে রাখাই হবে বরং আল্লাহ্‌র কার্যে হস্তক্ষেপ, সুতরাং মহা-পাতকের কায (গোনাহ কবিরা)। ভেবে দেখুন।

চিরন্তন

এই রকম দুনিয়ার পরিবর্তনের সংগে সংগে কালের ধোপে যে সব বিধি ব্যবস্থা টেকেনা, টেকানো যাবে না, কিংবা যা সর্ব দেশ কাল পাত্রের আদৌ উপযোগী নয়, তা নিয়ে এতোকাল ঐ অতো উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করা এবং একটু হেরফের হতে দেখ্‌লেই 'হারাম, হারাম', 'ইসলাম গেলো গেলো' বলে' চিৎকার করা, না-ফরমানীর, কুফরীর ফতোয়া জারী করা কতোদূর সংগত হয়েছিল, কিংবা এখনো কখনো কখনো কতোদূর সংগত এবং সাজে, তা আপনারাই এখন বিচার করুন, আমি আর কতো, কাঁহাতক বলবো!

বরং উচিত ছিলো এবং এখনো উচিত এবং চিরকাল উচিত হবে ঃ চিরন্তন আত্মার চিরন্তন ধর্ম—যার কথা আমরা আগাগোড়া বলে আস্‌চি তার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শন, অনুশীলন। আর শিল্পকলা. দর্শন, বিজ্ঞান যা ঐ চিরন্তন আত্মধর্মেরই, স্বভাব-ধর্মেরই অনুসংগ, আর এক এক প্রকার অভিব্যক্তি, তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা, বুঝতে চেষ্টা করা, বোঝা এবং চর্চা করাই ছিলো সব দিক দিয়ে সংগত কায, এখনো সংগত এবং চিরকাল তা-ও হবে সুসংগত, আর সব মিলে মিশেইতো সংস্কৃতি সভ্যতার সুপ্রসার।

'শিল্প-সংস্কৃতি কথার' শেষে তাই ঐ অন্তহীন দেশকালের, কি দেশকালের অতীত লোকের অধ্যাত্মবাদের (এল্‌মে মারেফাত, এল্‌মে লাহুনের) কাহিনীরও পুনঃ সংক্ষেপ ও বাদবাকী এখানে শেষ করলাম। কেমন হলো ?

আরো জিজ্ঞাসার আরো জবাব এ পুস্তকের মুখবন্ধ 'জিজ্ঞাসার জরুরাতে' উল্লিখিত আমাদের অপ্রকাশিত পুস্তকমালায়ই পুনরায় পেতে পারেন, কিন্তু সেতো সময়-সাপেক্ষ।

যাহোক, To err is human—মানব মাত্রেরই ভুল আছে। কাজেই, কোথাও কারো নজরে কোন অসংগতি আয়েব ধরা পড়লে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করছি, আমরা তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো এবং ইন্‌ শ আল্লাহ্‌ (যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন) আয়েব-ত্রুটি আগামী সংস্করণে সংশোধনের অবশ্য কোশেশ করবো,—অবশ্য ঐ আয়েব ত্রুটি যদি সত্যিকার হয়ে থাকে—আল্লাহ্‌ হাফিজ ! আমীন !

—ঃ তামাম শুদ ঃ—

সংশোধনী

জবাব [২]

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	৫	মু'মায়েন্না	মুৎমায়েন্না
৩২	৬	ঐ	ঐ
৩৩	৩৫	Hallucinatin	Hullucination
৪৬	১০	আরু	আর
ঐ	১৮	শান্তি	শাস্তি
৬২	১১	এক দেশকাল	এক এক দেশ, কাল
৯৯	১৯	হারিছে	হারিয়ে
৬ষ্ঠ ফর্মা		৯৭—১১২ পৃঃ	৭৯—৯৪ পৃঃ